কলিকাতা

বর্ধমান, কল্যাণী

উত্তরবঙ্গ

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের

স্নাতক শ্রেণীর

ও

শিক্ষক-শিক্ষণ স্তরের

শিক্ষাবিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর

বিষয় সমূহের

পূর্ণাঙ্গ

আলোচনা

সুশীল রায়, এম এস্-সি., বি. টি.

অধ্যাপক, আনন্দচন্দ্র শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

জলপাইগুড়ি,

বুক হাউস

২৭, সূর্যসেন স্ট্রীট

কলিকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন
সুধীরকুমার ঘোষ
৭, নিতাই বাবু লেন
কলিকাতা-বারো

প্রথম প্রকাশ—রথযাত্রা,
১৩৬৭

ছেপেছেন
জয়কৃষ্ণ কর
লক্ষ্মী প্রিণ্টার্স
৬৮।৩, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-ছয়

॥ ভূমিকা ॥

শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষাদর্শন যুগে যুগে যে পথনির্দেশ করে যাচ্ছে শিক্ষা-বিজ্ঞান তাকেই কার্যকরী রূপ দিয়ে আসছে। তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিককে আজকে শিক্ষাদর্শন থেকে আলাদা ক'রে আলোচনা করা যায় না। এই বইয়ের প্রথম অংশে দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হ'লেও তার ব্যবহারিক দিককে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তিকে পরিস্ফুট ক'রে তোলার জন্য বইয়ের শেষাংশেও দার্শনিক চিন্তার আতারণা করা হ'য়েছে। সর্বত্রই চেষ্টা করা হ'য়েছে পাঠকের সামনে এক সামগ্রিক ছবি তুলে ধরার।

স্বাধীনতার পর ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন এক বিরাট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তার মধ্যে শিক্ষার দাবীও আজকে বড় ক'রে দেখা দিয়েছে। জন মনের উপযোগী জাতীয় শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। আর যে কোন পরিকল্পনাই রচনা করা হোক না, তাকে কার্যকরী করতে হ'লে চাই দক্ষ কারিগর, চাই সমবেদনামূলক জাতীয় মনোভাব। শিক্ষা-বিজ্ঞানের সামগ্রিক জ্ঞান ছাড়া তা কখনই সম্ভব হবে না। শিক্ষা-বিজ্ঞানের ব্যাপক অনুশীলন ছাত্র, শিক্ষক, সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। এরজন্য চাই সাধারণের উপযোগী বই। **শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন** সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির এক দীনতম প্রচেষ্টা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। বাংলা দেশের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাতত্ত্ব সংক্রান্ত (১ম পত্র) পাঠ্যসূচীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হ'য়েছে বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে। তা'হলেও সাধারণ পাঠকের আগ্রহ যাতে খর্ব না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সর্বত্র চেষ্টা করা হয়েছে ইতিহাসের উপাদানকে বিশ্লেষণ ক'রে, বর্তমানকে মূল্যায়ন করার, ভবিষ্যতের পথ নির্দেশের আশায়।

এই বই রচনার সময় বিভিন্ন প্রামাণিক বই এবং চিন্তাবিদ্-এর সাহায্য নিয়েছি, উদ্দেশ্য, তাঁদের অনুকরণ করা নয়। তাঁদের চিন্তার আলোকে নিজের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি সর্বত্র। তাই লেখার মধ্যে তাঁদের যদি কোন প্রভাব থাকেও, তাকে অবচেতন মনে আপন ক'রেই নিয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকের প্রভাব বিশেষ কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি। তাছাড়া, প্রত্যক্ষ ভাবে এই লেখায় যারা সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সবশেষে, এই বই-এর উন্নতির জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

—সুশীল রায়

॥ যে সব বইয়ের সাহায্য নিয়েছি ॥

1. New Education and Its Aspects—Prof. K. K. Mookherjee
2. Great Educators— Do.
3. Education in New India—Prof. Humayun Kabir
4. Doctrines of the Great Educator—R. Rusk
5. Text-book in the History of Education—P. Monroe
6. Report of the Indian Education Commission (1964-66)
7. Report of the Secondary Education Commission (1948-52)
8. Democracy and Education.—John Dewey
9. Education : its Data and First Principles.—P. Nunn
10. Recent Trends in Education—T. K. N. Menon
11. Report of the Parliamentary Committee on Education
12. National Policy on Education (Resolution of the Govt. of India.)
13. Modern Development in Educational Theory and Practices—John Adaml
14. Measurement of Human Abilities.—P. Vermon
15. Comparative Psychology.—C. Stone

সূচীপত্র

শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য

Meaning and Concept of Education

মানুষের জীবনের দু'টো দিক আছে। একটা হ'ল তার **জৈবিক দিক** (Biological aspect) আর একটা হ'ল তার **সমাজ সত্তার দিক** (Sociological aspect)। এই দু'ধরনের চাহিদাই তার মধ্যে বর্তমান। জৈবিক চাহিদাকে চরিতার্থ করার জন্য আছে খাদ্য, প্রজনন কৌশল প্রভৃতি নানারকম সরঞ্জাম। এই সব কৌশল মানুষ কেন অন্যান্য ইতর প্রাণীদেরও আয়ত্তাধীন। কিন্তু সামাজিক বা সংস্কৃতির দিক থেকে সে প্রাণীকুলে একক। তার কাছে এই দু'ধরনের প্রয়োজনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। জীবনকে স্থায়ী রাখার জন্য যেমন জৈবিক সকল রকম ক্ষুধার পরিতৃপ্তি প্রয়োজন, তেমনি সমাজে সুস্থ ভাবে বাস করতে হ'লেও সাংস্কৃতিক চাহিদার সার্থক উপশম একান্তই প্রয়োজন। তার এই সাংস্কৃতিক ক্ষুধা মেটাতে পারে একমাত্র **শিক্ষা** (Education)। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। গোয়েটিং বলেছেন, "Just as there are certain vital processes of life in a biological sense, so education may be considered as a vital process in a social sense." এই কারণেই শিক্ষা মানুষের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ; শিক্ষার ইতিহাস, মানব সভ্যতার ইতিহাসেরই সমকালীন।

শিক্ষা কি ? (What is Education ?) :

কিন্তু আজকে শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনাকারীদের কাছে বড় প্রশ্ন হ'ল শিক্ষা কি ? যদিও সাধারণ ভাবে শব্দটি আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করি এবং তার দ্বারা কি বুঝাতে চাই তার সম্বন্ধে সচেতন, তবুও তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য সহজ ভাবে প্রকাশ করতে আমাদের অসুবিধা হয়। শিক্ষা কথাটির দ্বারা আমরা এমন একটা কিছু বুঝাতে চাই যা সত্যিই বিমূর্ত (abstract)। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক এই কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন বিভিন্ন যুগে। তাঁদের আলোচনার ধারা বিশ্লেষণ করলে মতবিরোধই লক্ষ্য করি, একক কোন অর্থ বা তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায় না। তবে একটা সংলক্ষণ তাদের আলোচনা থেকে বিশেষ ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, শিক্ষা শব্দটি

যদিও বিমূর্ত তবু সেটি একই গতীয় (dynamic) ধারণা। সমাজব্যবস্থার আদিম যুগ থেকে এই ধারণা মানুষের সহগ। সমাজের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে তাল রেখে, সমাজের প্রকৃতি অনুযায়ী তারও বিবর্তন হয়েছে পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের মধ্য দিয়ে। তাই বিভিন্ন যুগের মনীষীর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা যে পার্থক্য দেখতে পাই তা তাঁদের জীবনাদর্শের প্রভেদ বা সমকালীন সমাজজীবনের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিবর্তনের ধারা আজও থেমে যায়নি; সমাজ অবিচ্ছিন্ন গতিতে, অচিহ্নিত দিকে পরিবর্তিত হ'য়ে চলেছে। মানুষের সমাজ যখন গতিধর্মী, তখন শিক্ষাকেও গতীয় ধর্মসম্পন্ন করতে হবে। আদিম যুগের শিক্ষা মানুষের যে প্রয়োজন বা চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল, সেই শিক্ষার ধারণা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর জটিল জীবন পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা সম্বন্ধে মূল কথা—শিক্ষা সতত পরিবর্তনশীল সমাজে সতত বিকাশমান মানুষের চাহিদা মেটাচ্ছে।

শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি (Origin of the term Education):

শিক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায়, শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শাস্ ধাতু থেকে। এর অর্থ হ'ল 'শাসন করা', শৃঙ্খলিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা, শিক্ষা দেওয়া বা নির্দেশনা দেওয়া। অর্থাৎ বাংলায় আমরা যে শিক্ষা কথাটা ব্যবহার করি তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষ ভাবে শিক্ষা কৌশলকে বুঝায়। আবার অনেক সময় আমরা এর সমর্থক শব্দও ব্যবহার করি, যেমন— 'বিদ্যা' গ্রহণ বা আহরণ। এই বিদ্যা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে এটিও সংস্কৃত বিদ্ ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হ'ল 'জানা' বা 'জ্ঞান আহরণ করা'। এখানেও ঐ জ্ঞান আহরণের ক্রিয়া বা কৌশলের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার ইংরেজী Education শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গিয়ে ভাষাবিদরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এই সব বিশ্লেষণের মধ্যে কোনটি যে ভুল তা নয়। তবে তাৎপর্যের তফাৎ আছে তাদের মধ্যে। এক মতবাদ অনুযায়ী Education শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Educare থেকে। Educare কথার অর্থ হ'ল প্রতিপালন করা বা পরিচর্যা করা (To bring up or to nourish)। অর্থাৎ, এই অর্থে বিচার করলে শিক্ষা হ'ল শিশু বা অপরিণত ব্যক্তিকে যথাযোগ্য যত্নের মাধ্যমে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পন্থা, বা তাকে জীবনোপযোগী কৌশল ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। অপর এক মতবাদ অনুযায়ী Education কথার ব্যুৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ Educere

থেকে, যার অর্থ হ'ল নিষ্কাশন করা বা নির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া (To draw out or to lead out), তৃতীয় মত হ'ল—এই শব্দ মূল ল্যাটিন শব্দ Educatum থেকে এসেছে, যার অর্থ হ'ল শিক্ষাদানের কাজ (teaching)। পূর্বেই বলেছি, ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণের দিক থেকে প্রত্যেকটি অর্থের সম্ভাবনা আছে। তবে তার তাৎপর্যগত দিক যুগের চাহিদার দিক থেকে বিবেচনা করতে হবে।

বাংলায় 'শিক্ষা' শব্দ বা ইংরাজীতে Education শব্দের প্রথম ও তৃতীয় অর্থ খুবই সংকীর্ণ। আর এই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা কথাটাকে আমরা সচরাচর ব্যবহার ক'রে থাকি। শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল কিছু প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করা বা অপরিপক্ব মনকে প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার চাপে ভারাক্রান্ত করে তোলা, এবং তাই করতে পারলে শিক্ষায় কাজ সম্পূর্ণ হবে। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে এমনকি এখনও আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল। এই জাতীয় শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হবে শিক্ষার্থীকে বিদ্যায়তন বা শিক্ষালয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রভাবে রেখে নির্দিষ্ট কতকগুলো পাঠ আয়ত্ত করানো এবং ডিগ্রি গ্রহণের উপযোগী করে তৈরী করা। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা বিশেষ কুশলী শিক্ষকদের উপর এই প্রশিক্ষণের (training) দায়িত্ব থাকবে। তাঁরা হবেন জ্ঞানের আধার আর শিশুরা বা অপরিচিত ব্যক্তিরা হবে নিশ্চেষ্ট গ্রাহক। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে সম্পর্ক হবে দাতা এবং গ্রহীতার। অন্য কোন মানবীয় সম্পর্ক (Human relationship) তাদের মধ্যে গড়ে ওঠার অবকাশ থাকবে না। তৃতীয়তঃ, জ্ঞান দেওয়া বা গ্রহণের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর নিজস্বতার কোন দাম নেই। সমাজের অভিভাবক শ্রেণীরা যা চাইবেন তাই তাদের গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব জন্মগত কোন বিশেষ প্রবণতা থাকতে পারে বা কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি অনুরাগ থাকতে পারে, তা বিবেচনা করার দরকার নেই। তাই ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ থেকে শিক্ষার এই অর্থ পাওয়া গেলেও বা তার মিল সাধারণ ধারণার মধ্যে পাওয়া গেলেও এটাকে বর্তমান শিক্ষাবিদগণ সংকীর্ণ অর্থই বলেছেন। কারণ, এতে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কোন সুযোগ নেই। আর তা না থাকলে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা তার প্রয়োজনীয়তা এবং প্রকৃত তাৎপর্য হারাবে।

ইংরেজী Education কথার যে দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, সেই অর্থে বর্তমান শিক্ষাতত্ত্বে 'শিক্ষা' কথাটা ব্যবহার করা হ'ল। এই মতানুযায়ী শিক্ষার অর্থ

হ'ল 'নিষ্কাষণ করা' বা 'নির্দেশনার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হ'ল শিশুর বা শিক্ষার্থীর মধ্যেকার অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্ভাবনাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা। শিক্ষার এই ব্যাখ্যা মনোবিজ্ঞার (Psychology) ও সমাজবিজ্ঞার (Sociology) বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক মানবশিশু কিছু না কিছু সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'বে তার সেই সম্ভাবনাগুলো পরিপূর্ণভাবে সমাজ উপযোগী ভাবে বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলো যদি পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভের সুযোগ না পায় তাহ'লে ব্যক্তিজীবন হবে পঙ্গু। আর ব্যক্তি যদি তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজজীবনে নিজেকে নিয়োগ করতে না পারে তাহ'লে সে হবে অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষা হবে তার এই উভয় ধরনের চাহিদার পরিপন্থী। শিক্ষাকে এই অর্থে বিচার করলে, আমাদের এই দুই ধরনের উদ্দেশ্যে সিদ্ধি হয়। একে তাই আমরা শিক্ষার ব্যাপক অর্থ (Broader meaning) বলতে পারি। এই অর্থে শিক্ষা কোন সীমিত পরিবেশের মধ্যে সীমিত সময়ের প্রশিক্ষণ নয়। ব্যক্তির জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন চলছে, তাই হ'ল শিক্ষা। এই শিক্ষায় জীবন ধারণের কৌশল শিক্ষার্থীর উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। সে সমাজজীবনে বসবাসের মধ্যেই আয়ত্ত করবে প্রয়োজনীয় সামগ্রী। এতে থাকবে অভিনবত্বের স্বাদ, গতানুগতিক চিরন্তন ভাবধারা পরিবহণের চাপ নয়। শিক্ষক এখানে দাতা নন, সহায়ক মাত্র। তিনি শিক্ষার্থীকে সমাজ নিবদ্ধ পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করবেন মাত্র। জোর ক'রে তার উপর সমাজের বিধি-নিষেধ চাপিয়ে পঙ্গু করে দেবেন না। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা শিক্ষাকে এই অর্থে আলোচনা করবো।

শিক্ষার তাৎপর্য (Concept of Education):

পূর্বেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হ'য়েছে, শিক্ষার তাৎপর্য এবং অর্থ সমাজব্যবস্থা ও পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হ'চ্ছে। তাই বিভিন্ন দেশের চিন্তাবিদ্‌দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে, তাদের মধ্যে অমিলই বেশী স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তবে সমাজ বিকাশের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের মূল্যায়ন ক'রে দেখা যায়, তাহ'লে আর অসঙ্গতির চিহ্ন থাকে না তাদের মধ্যে। ভারতবর্ষে যদি এই চিন্তাধারার অনুশীলন করি তাহ'লে লক্ষ্য করবো তা নিরবচ্ছিন্নভাবে এক মূল লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যুগের ও কালের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বৈদিক যুগে শিক্ষাকে মনে করা হ'ত—আত্মনির্ভরশীল করার ও আত্মকামনা ত্যাগ

করার পন্থা মাত্র (Education is something which makes man self-reliant and selfless)। উপনিষদে বলা হ'য়েছে, শিক্ষা মানুষকে সংস্কারমুক্ত করে (সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে)। পাণিনির লেখার মধ্যে দেখতে পাই তিনি প্রকৃতি বা পরিবেশের কাছ থেকে মানুষ স্বাভাবিক ভাবে যা শেখে তার সমষ্টিকে বলেছেন শিক্ষা। কণাদ্ বলেছেন, শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হ'ল এর দ্বারা মানুষের আত্মতৃপ্তির (Self contentment) যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়। প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্ যাজ্ঞবল্ক বলেছেন, শিক্ষা সৎচরিত্র গঠনের এবং সমাজ উপযোগী ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক কৌশল। কৌটিল্যের মতে শিক্ষা হ'ল, দেশ ও জাতিকে ভালবাসার প্রশিক্ষণ মাত্র। ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যের মতে শিক্ষা হ'ল আত্মজ্ঞান (Realisation of self).

আধুনিক কালেও অনেক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ শিক্ষার তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের ঊনবিংশ শতাব্দী তথা আধুনিক-কালেরও মুখপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ তার শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে বলেছেন শিক্ষা হ'ল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কিছু নয় (Education is the manifestation of perfection already in man)। অন্তর্নিহিত সত্তা বল্‌তে তিনি অধ্যাত্মভাবকে (Spirituality) বোঝাতে চেয়েছেন। বেদান্ত দর্শনানুযায়ী মানুষের (জীবের) মধ্যে যা সনাতন তাহ'ল তার অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মভাব। বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—'We need an education that quickens, that vivifies, that kindles the urge of spirituality inherent in every mind," ঠিক একই ভাবে ঋষি অরবিন্দ বলেছেন, মানুষের বিকাশমান আত্মসত্তাকে পূর্ণ বিকাশ করার প্রয়াসই (Helping the young soul to draw out that is in itself) হ'ল শিক্ষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার মধ্যেও আমরা এই ধরনের আধ্যাত্মবোধ দেখতে পাই। তিনি কোন সুসংবদ্ধ সংজ্ঞা দেননি শিক্ষা সম্বন্ধে। তবে তাঁর বিভিন্ন লেখা ও আলোচনা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার অর্থ ছিল তাঁর কাছে বিশ্বসত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারই প্রভাবে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের প্রয়াস। তিনি এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় (শিক্ষা) বলেছেন "ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি, বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকে লাভ করে তখনই সে অমৃত লাভ করে।

ভারতবর্ষকে আজ সেই সাধনা করিতে হইবে,—নানা তথ্য, নানা বিস্তার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে আজ নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে।" জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, শিক্ষা হ'ল ব্যক্তির দেহ-মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস (By education I mean an alround drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit)। ভারতীয় এই চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর মূলে আছে বিশ্বচেতনা-বোধ বা ধর্মবোধ। ভারতীয় দর্শনে এই দুই ধরনের চেতনা মানবমনের অন্তরে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সকল মনীষীরই শিক্ষা-চিন্তা প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত। বর্তমান কালের দার্শনিক ও শিক্ষবিদ্ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এ সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (১৯৪৮ খ্রীঃ) রিপোর্টে যা উল্লেখ করেছেন তাকেই ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি সমস্ত ধারারই মূল সূত্রের মধ্যে সুন্দর সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতীয় সমাজের জীবন ও মননের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে একথাই বলতে হয় শিক্ষা কথার প্রকৃত তাৎপর্য জীবিকা অর্জনের নয় বা নাগরিকতার প্রশিক্ষণে নয়, শিক্ষা হ'ল দ্বিতীয় জন্ম ; উন্নততর অধ্যাত্মময় জীবনে প্রবেশের প্রথম সোপান হ'ল শিক্ষা। (Education according to Indian tradition is not merely a means to earning a living ; nor it is only a nursery of thought or a school for citizenship. It is initiation into the life of spirit, a training of human souls in the persuit of truth and the practise of virtue. It is a second birth—'dvitiyam janma'.)

পাশ্চাত্য দেশেও শিক্ষাসম্বন্ধীয় চিন্তাধারার বিবর্তনের একই রূপ নয়, সেখানেও সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে 'শিক্ষা' শব্দের তাৎপর্যেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হ'য়েছে। এই ক্রমবিকাশের ধারা অনেক পরিষ্কার। ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের ধারার মূল সূত্র খুঁজে পেতে যেমন বহুযুগের খণ্ড খণ্ড ঘটনার টুকরোকে সংযোজন করার দরকার হয়, পাশ্চাত্য দেশের ক্ষেত্রে তার এত প্রয়োজন নেই। সমাজব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একই তালে শিক্ষার তাৎপর্যের পরিবর্তন প্রকৃষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করলে এটা বোঝা যাবে। প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেছেন, শিক্ষা শিশুর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী দেহ-মনের সার্বিক বিকাশ সাধন করে [It

(Education) develops in the body and soul of the pupil all the beauty and all the perfection he is capable of]। অ্যারিস্টটলও (Aristotle) বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল দেহ-মনের সমান্তরাল সুষম বিকাশের কথা। শিক্ষা দেহ-মনের সুষম এবং পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনের মাধুর্য ও সত্য উপলব্ধিতে সহায়তা করবে (Education is the creation of sound mind in a sound body. It develops man's faculty especially his mind so that he may be able to enjoy the contempletion of supreme truth, goodness and beauty in which perfect happiness essentially consists)। থম্‌সন্ (Thompson) বলেছেন, শিক্ষা বল্‌তে আমরা বুঝি শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব ; যে প্রভাবের দ্বারা শিশুর বাহ্যিক আচরণ, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গীর স্থায়ী পরিবর্তন হয় (Education is the influence of the environment on the behaviour with a view to producing a permanent change in his habits of behaviour, of thought, of attitude)। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অ্যাডামস্ (Adams) বলেছেন, শিক্ষা হ'ল সচেতন এবং ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তার কিছু আচরণের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় (Education is a conscious deliberate process in which one personality acts upon another in order to modify the development of that other by the communication and manipulation of knowledge)। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ নান্ (Nunn) শিক্ষার তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষা বলতে আমরা ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশকেই বুঝাই। এই বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতানুযায়ী মনুষ্য কল্যাণের পথে নিজেকে নিয়োজিত করবে (Education is the complete development of individuality of the child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity)। দার্শনিক জন্ ডিউই (Dewey) বলেছেন, শিক্ষা বলতে আমরা পূর্ণ জীবন বিকাশের কথাই বলি। পূর্ণ বিকাশ বলতে সেই সব গুণের বিকাশকে বলি যার দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশকে সুশৃঙ্খলিত ক'রে নিজের সমস্ত সম্ভাবনার বিকাশ সাধন করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন, এই

ধরনের বিকাশ নিছক বাইরের থেকে চাপিয়ে দেওয়া প্রশিক্ষণের দ্বারা সম্ভব নয়। ব্যক্তি জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে পাওয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যুক্তি ও বিচারশক্তি যাচাই ক'রে যা গ্রহণ করে তাহ'ল শিক্ষা (Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities)।

উল্লেখ করতে গেলে, আরো অনেক মনীষীর কথাই উল্লেখ করতে হয়। তাতে ক'রে আমাদের আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি পাবে মাত্র। এই আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'চ্ছে যে 'শিক্ষার' অর্থ দেশ, কাল ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। তাই বর্তমান কালে শিক্ষার তাৎপর্যকে বুঝাতে গেলে তার কোন একটিকে সম্পূর্ণভাবে উল্লেখ করা যায় না। প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় মতবাদগুলো বিচার করলে এ কথাই ব'লতে হয় যে, সেগুলো বিশেষ ভাবে বাস্তবচিন্তা বর্জিত। আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মূলে আছে অতি বাস্তববাদ। প্রাচীন বাস্তবানুগ চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষা ছিল দ্বিমেরুয় (Bi-polar) প্রক্রিয়া। একদিকে শিক্ষক অপরদিকে শিক্ষার্থী; একদিকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি অপর দিকে অনভিজ্ঞ অর্বাচীন শিশু। এই তাৎপর্যের উল্লেখ আমরা পাশ্চাত্য দেশে যেমন পাই তেমনি প্রাচীন ভারতের চিন্তার মধ্যেও পাই। যেমন বলেছেন, স্যার অ্যাডামস্ (Adams), আবার উপনিষদে আছে "আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপ অন্তেবাসৌ উত্তররূপ, বিদ্যা সংবিধঃ প্রবচনং সংধানং"। এই মতানুযায়ী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর দুই মেরুতে অবস্থান। জ্ঞান শিক্ষকের দিক থেকে প্রবাহিত। এই জ্ঞানই তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করছে। কিন্তু আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষা হ'ল ত্রিমেরুয় প্রক্রিয়া (Tri-polar process)। এর তিন মেরুতে যথাক্রমে আছেন—শিক্ষক, শিশু ও সমাজ। তিন মেরুদেশে অবস্থিত সত্তার পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমেই শিক্ষা সংগঠিত হয়। শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করবেন সমাজের চাহিদার দিক বিবেচনা ক'রে। তাই বর্তমান শিক্ষা-সমাজজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই তিন সত্তা পরস্পর পরস্পরের উপর ক্রিয়া না করলে শিক্ষা সংগঠিত হ'তে পারে না। এ সম্পর্কে আমরা অন্য অংশে বিশদভাবে আলোচনা করব। এই আধুনিক এবং প্রকৃত পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের সমন্বয়

ক'রে বলতে পারি, শিক্ষা হ'ল সমাজের চাহিদানুযায়ী শিশুর উপর পরিণত ব্যক্তিদের সুপরিকল্পিত প্রভাবের সমষ্টি যা সুসমঞ্জস দেহ-মনের বিকাশের মাধ্যমে জীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধিতে সহায়তা করে। অথবা, শিক্ষাবিদ্ রেডেন্ (Redden) যা বলেছেন "Education is the deliberate and systematic influence, exerted by the mature person upon the immature, through instruction, discipline and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, social and spiritual powers of human being, according to individual and social needs and directed towards the union of the educand with the creator as the final end."

শিক্ষার উপযোগিতা (Importance of Education):

পূর্বেই আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা মানব-ইতিহাসের মতই সুপ্রাচীন। জীবনের আদি পর্ব থেকে মানুষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সজাগ। মানুষকে মানবীয় গুণের অধিকারী করার জন্য এই শিক্ষা যে একটা প্রাথমিক এবং প্রয়োজনীয় কৌশল তা প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায়ই স্বীকৃতি লাভ করেছে। অ্যারিস্টটল বলেছেন, মৃত ও জীবিতের মধ্যে যা তফাৎ শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে তাই তফাৎ (Educated men are as superior to uneducated, as the living are to dead)। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রেও আমরা এর উল্লেখ পাই। গীতায় উল্লেখ আছে, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" (জ্ঞানের মত শুদ্ধিকারক আর কিছুই নাই)। বর্তমান সভ্য জগতেও শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থায় শিক্ষাকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও (Indian Education Commission, 1964-66)-এর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। "In a world based on Science and Technology, it is education that determines the level of prosperity , welfare and security of the people. On the quality and number of persons coming out of our schools and colleges, will depend our success in the great enterprise of national reconstruction whose principal objective is to raise the standard of living of our people." এই গুরুত্ব

দেওয়ার মূলে আছে কতকগুলো কারণ যা শিক্ষারই অন্তর্নিহিত। শিক্ষার অনেক ক্ষমতা আছে যা মানুষের জীবন বিকাশের অনুকূল। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক এই উপযোগিতার দিকটা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষার এই প্রয়োজনীয়তা মানব-মনের ধর্ম বা চাহিদার উপর ভিত্তি ক'রেই গড়ে উঠেছে, আর সেই চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এসেছে শিক্ষা।

প্রথমতঃ, শিক্ষা মানুষের **জৈবিক প্রয়োজন** (Biological need) মেটাতে সক্ষম হয়। ইতর প্রাণী তার জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল স্বাভাবিক ভাবে সংস্কারের (instinct) তাড়নায় আয়ত্ত করে। জন্মের কিছুদিন পরই বিড়াল ইঁদুর শিকারের কৌশল আয়ত্ত করে, এমনি করে তার খাদ্যের প্রয়োজন মেটায়। কিন্তু মানবশিশুকে যদি জন্মের পর যথাযথ ভাবে খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী সরবরাহের দ্বারা যত্ন না নেওয়া হয় তবে তার জীবন বিপন্ন হবে। তাই তাকে জীবনপথে যথাযথ ভাবে এগিয়ে দেওয়ার জন্য, তার বিভিন্ন ধরনের জৈবিক চাহিদা মেটানোর জন্য দরকার সাহায্য, আর এই সহায়তারই আর এক নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার একটা জৈবিক উপযোগিতা মানুষের কাছে আছে এবং চিরদিন তা থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা মানুষের সামাজিক চাহিদা (Social need) মেটাতে পারে। অন্যান্য প্রাণীকে বেঁচে থাকার জন্য তাদের জৈবিক চাহিদার পরিপূরক আচরণ করতে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের জৈবিক সত্তা ছাড়াও তার একটা সমাজ-সত্তা (Social aspect) আছে। তাকে সমাজের সংস্কৃতির ধারাও (Cultural heritage) আয়ত্ত করতে হয়। এই সমাজ সংস্কৃতির ধারা যা অতীত অভিজ্ঞতার সমষ্টি, তা জৈবিক বংশানুক্রমিক ধারায় মানুষের মধ্যে আসতে পারে না; মানুষকে অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করতে হয়। আমাদের পিতামাতা বা পূর্বপুরুষেরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গেছেন তা স্বাভাবিক ভাবে আমাদের উপর বর্তায় না। তাই প্রত্যেক মানুষের জীবদ্দশায় শিক্ষার প্রয়োজন। এই কারণেই শিক্ষার একটা সামাজিক উপযোগিতা মনুষ্য সমাজে বর্তমান।

তৃতীয়তঃ, মানুষের **শিক্ষণধর্মী মনই** শিক্ষাকে তার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ করে তুলেছে। জন্ম মুহূর্তে মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্যই সুপ্ত থাকে। প্রকৃতি তাকে ঐ অবস্থাই পাঠিয়েছেন পৃথিবীর বুকে। জন্মের পর সে কথা বলতে শেখে, হাঁটতে শেখে আরও কত একান্ত প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করে। কিন্তু

এই সব কাজ করবার সম্ভাবনা তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তাদের যথাযথ ভাবে প্রস্ফুটিত করার জন্য প্রশিক্ষণ বা শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। প্রকৃতি তাকে এমন ভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, মনে হয় সে যেন শিক্ষা গ্রহণের জন্যই ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় মনুষ্য জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ করার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন এবং তা গ্রহণ করার জন্য তার মানসিক সংগঠনও বর্তমান।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের জন্মগত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করার জন্য এবং কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রবাহকে সজাগ রাখার জন্য শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার দ্বারাই হবে অতীত জীবন ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন, শিক্ষার দ্বারাই উন্মোচিত হবে ভবিষ্যতের সিংহদ্বার। শিক্ষাই আনবে ব্যক্তি জীবনে পরিপূর্ণতা, শিক্ষাই করবে ব্যষ্টি জীবনকে সার্থক। এক কথায় শিক্ষা ব্যক্তিকল্যাণ ও সমাজকল্যাণের পথে গড়ে তুলবে নতুন ও আদর্শ সমাজব্যবস্থা।

প্রশ্নাবলী

1. Education has been used in a wider sense as well as in a narrow sense. Explain clearly the two uses of the word 'Education'.

[C. U. B. A '59]

Ans : ১ হইতে ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. What is meant by the term 'Education'? Discuss the various meaning of the term and discuss the sense in which it is used at present.

Ans : ১ হইতে ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Trace the history of development of the various concept of Education. In what sense the term 'Education' is used at present?

Ans : ৪ হইতে ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. What is Education? What important functions it serves in respect of the individual and the society?

Ans : ১ হইতে ৪ এবং ৯ হইতে ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. "In a world based on Science and Technology, it is education that determines the level of prosperity, welfare and security of the people." Dfscuss the statement.

Ans : ৪ হইতে ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

6. "Every scheme of Education being, at bottom a practical philosophy, necessarily touches life at every point'—Elucidate

[B. T. N. B. U. '67]

Ans : ৪ হইতে ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার কাজ

Functions of Education

শিক্ষার লক্ষ্য (Aims), অর্থ (Meaning), তাৎপর্য (Concept) এবং কাজ (Function) এদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন বিভেদের সীমারেখা স্থির করা খুবই মুস্কিল। কারণ এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তবুও শিক্ষাতত্ত্বে তাদের পৃথক আলোচনার রীতি আছে। তাই আমরা এই অধ্যায়ের অবতারণা করেছি। যদিও এই সব দিকের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই তবুও আলোচনাকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য শিক্ষাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যায়। শিক্ষাতত্ত্বের যে-কোন ছাত্রের কাছে আজকে যে তিনটে প্রশ্ন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল—শিক্ষা কি? শিক্ষার দ্বারা কি হয়? এবং শিক্ষার কি করা উচিত (আদর্শগত ভাবে)। বিভিন্ন অধ্যায়ে এই তিনটে প্রশ্নেরই আলোচনা করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। শিক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য (Meaning and concept of Education) অংশে শিক্ষা কি সে সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে আমরা শিক্ষার কাজ কি সে সম্পর্কে আলোচনা করব এবং পরবর্তী অংশে শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) বা শিক্ষার আদর্শ কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

বর্তমান কালে শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিদ্যা (Psychology) এবং সমাজবিদ্যার (Sociology) জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। আধুনিক ভাবধারা অনুযায়ী শিশু কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। এই সব সম্ভাবনাগুলো প্রকৃতিদত্ত। এই সব সম্ভাবনা ও ক্ষমতাগুলোর বিকাশ সাধন করা হয় শিক্ষার মাধ্যমে। কিন্তু এই বিকাশের একটা দিক নির্দিষ্ট করাও আছে। সেটা হ'ল সমাজ কল্যাণের দিক। অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা শিশুর জন্মগত ভাবে পাওয়া বিভিন্ন সম্ভাবনাকে সমাজ নির্ধারিত পথে বিকাশ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি-কল্যাণ এবং সমাজ-কল্যাণ; কোন একটি নয়। আধুনিক ভাবধারার প্রতীক জন ডিউইর শিক্ষার সংজ্ঞা পুনরাবৃত্তি করলে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন— "Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. It is the development of

all those capacitics in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities."
সুতরাং, শিক্ষার কাজের (Function of Education) কথা বিচার করতে গেলে সর্বপ্রথম যে দুটো দিকের কথা আলোচনা করতে হয় তা হ'ল তার **ব্যক্তি উৎকর্ষণ** ও **সমাজ কল্যাণের** দিক।

॥ এক ॥ **শিক্ষার কাজ-ব্যক্তি-জীবনের সুষম উন্নয়ন (Integrated development of Individual) :** শিক্ষার অর্থ বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক শিশুই থাকে জন্ম মুহূর্তে অসহায়। শিক্ষার কাজ হ'ল এই অসহায় অসমর্থ শিশুকে জীবনোপযোগী ক'রে গড়ে তোলা। আমরা সব শেষ সংজ্ঞায় এবিষয়ে উল্লেখ করেছি। যে সব সম্ভাবনা ও ক্ষমতা নিয়ে সে জন্মেছে তাকে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে। ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া সমাজ-জীবন স্থায়ী হ'তে পারে না। তাই শিক্ষার প্রথম কথাই হ'ল ব্যক্তি কল্যাণ। অর্থাৎ ব্যক্তি-জীবনের প্রতি শিক্ষার একটা কর্তব্য আছে। জন্মাবস্থায় মানবশিশু যেমন পরনির্ভরশীল থাকে, তেমনি নমনীয়ও থাকে। তার এই নমনীয়তার উপর ভিত্তি ক'রে তাকে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে দিতে হবে। তার ব্যক্তি জীবনের সকল সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে তাকে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী ক'রে দিতে হবে। ব্যক্তি-জীবনের এই সুষম বিকাশ তখনই হবে যখন সে যথাযথভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান (adjustment) করতে পারবে; যখন সে তার সমাজ জীবনের সঙ্গে সংগতি সাধন করতে পারবে, তখন সে জীবনের উন্নত আদর্শের (Higher values) অধিকারী হবে এবং নৈতিক আদর্শেরও অধিকারী হবে। ব্যক্তি যদি পরিবেশের সঙ্গে যথার্থভাবে সংগতি বিধান না করতে পারে, তবে তার জীবনে পরিপূর্ণতা আসবে না। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করতে গেলে পরিবেশই হ'ল শিক্ষালয়। শিক্ষা, আধুনিক মতানুযায়ী বাহ্যিক কিছু ক্রিয়া নয়। জীবন পরিবেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, উত্থান, পতনের মাধ্যমে মানুষ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাই হ'ল শিক্ষা। জন ডিউই বলেছেন শিক্ষা ভবিষ্যতের আয়োজন নয়; জীবনই শিক্ষা। জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিবেশের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা মানুষ যা গ্রহণ করবে তাই শিক্ষা। যে সব প্রতিক্রিয়া বা আচরণ-ধারা তাকে সহায়তা করবে আত্মরক্ষা করতে বা সার্থক জীবনযাপন করতে সেই সব আচরণ-ধারার পুষ্টি সাধন করবে ব্যক্তি নিজেই। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ (বসিং) এ সম্পর্কে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, তার

কল্যাণের সংরক্ষণের দিক বজায় রাখার জন্য আমরা শিশুকে যদি নিয়ম মাফিক শিক্ষা দিই তা'হলে সমাজ জীবনে অভিনবত্ব আসবে কি করে, সমাজের অগ্রগতি কি ভাবে সম্ভব হবে। কিন্তু সমাজের অগ্রগতি (Social progress) ছাড়া সমাজের জীবনীশক্তিই থাকে না। একমাত্র প্রকৃত শিক্ষা এই দুই পরস্পর বিরোধী ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। আধুনিক যুগের মানুষ যদি খাদ্যান্বেষণের জন্য আদিম পন্থা অবলম্বন করে, সেটি যেমন হাস্যাস্পদ হবে, তেমনি হবে বেদনাদায়ক। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি সমাজ অগ্রগতিতে তার নিজের ক্ষমতানুযায়ী শক্তি প্রয়োগ করতে না শেখে তা'হলে সমাজ স্থবির হ'য়ে যাবে। ব্যক্তিকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে তোলার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা, সংস্কার ও ধারণার অধিকারী করলে চলবে না, তাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যার দ্বারা সে ঐ সব অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস এবং পুনসংযোজনের মাধ্যমে সভ্যতার অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে পারে। কোনার (Conner) এ সম্পর্কে একটি সুন্দর উক্তি করেছেন সেটা উদ্ধৃত করছি। "If generation had to learn for itselt what has been learned by its predecessors, no sort of intellectual or social develpoment could be possible and the present state of society would be little different from the society of the old stone age." সুতরাং শিক্ষার প্রধান কাজ হবে ব্যক্তিকে উন্নততর সমাজব্যবস্থা স্থাপনের অধিকারী ক'রে গড়ে তোলা। শিক্ষা সমাজ সংরক্ষণ ও সমাজ উন্নয়ন এই দু'য়ের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলবে ব্যক্তি-জীবনকে। এটাই হবে তার প্রকৃত কাজ।

॥ তিন ॥ শিক্ষার কাজ ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের গতি নির্ণয় (Determining direction of individual development) : "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।"—এই হ'ল শিক্ষার গতি নির্ণায়ক কাজ। অসত্য থেকে সত্যের পথে, অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে এবং মর জগতের বন্ধন মুক্ত ক'রে অমৃতলোকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে শিক্ষা। মানব শিশু জন্মের পর থেকেই সামাজিক আচরণ করতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা তার আচরণ-ধারার বিকাশ সাধন করতে চাই। যে সব সংস্কার এবং কর্মপ্রবণতা নিয়ে সে জন্মায় তার পরিপূর্ণ বিকাশ করাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এখন এই বিকাশ কোন পথে হবে সে সম্বন্ধে যদি শিক্ষকের ধারণা না থাকে তাহ'লে সেই বিকাশের ধারা অনির্দিষ্ট বন্ধনহীন লক্ষ্যহীনতার পথে

প্রবাহিত হবে। তাই শিক্ষার কাজ যে শুধুমাত্র জীবনের বিকাশ সাধন তাই নয়; তার গতি নির্ণয় করাও বটে। কোন্ উন্নততর জীবনাদর্শের দিকে জীবনপ্রবাহ বেগবান হবে তা নির্ণয় করে দেবে শিক্ষা। এই বিকাশের গতি স্বভাবতঃই হবে দ্বিমুখী। প্রথমতঃ শিক্ষা হবে বহিঃপরিবেশ (External environment)-মুখী। যার মাধ্যমে হবে প্রাকৃতিক পরিবেশের (Natural environment) সঙ্গে সার্থক সংগতি বিধান এবং সমাজ পরিবেশের (Social environment) সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলন। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা হবে আন্তর-পরিবেশ-মুখী (Internal environment) যার মাধ্যমে ব্যক্তির আন্তরিক চাহিদা ও প্রবণতা তৃপ্তিলাভ করবে এবং আকাঙ্ক্ষিত দিকে বিকাশ লাভ করবে। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিক থেকে, বিচার করতে গেলে, শিক্ষার কাজ হ'বে ব্যক্তির আন্তর-পরিবেশ-মুখী বিকাশে বিশেষ-ভাবে সহায়তা করা, কারণ যে-কোন বহিরঙ্গ দিকই বিশেষ বিশ্লেষণে আন্তরিক কোন অবস্থা থেকেই সৃষ্টি। ব্যক্তির এই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্রের মধ্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এই পথে জীবন বিকাশের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

জীবনের গতি নির্ণয়কে সার্থক করা যায় দু'ভাবে। একটা হ'ল প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের (Direct control) দ্বারা, অপরটা হ'ল ব্যক্তিগত নির্দেশনা (Personal guidance) দ্বারা। প্রত্যক্ষভাবে আচরণের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দৈহিক শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিধির মাধ্যমে। কিন্তু এই ধরনের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব হয় খুবই স্বল্পস্থায়ী। এই শিক্ষা তার কাছে বোঝা স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়। তার প্রতি শিক্ষার্থীর কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে না। কিন্তু শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে আমরা স্থায়ী পরিবর্তন আনতে চাই। আর এই স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক শিশু এবং শিক্ষকের পারস্পরিক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। শিক্ষক ছাত্রদের আস্থা নিয়ে তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা অনুযায়ী তাদের জীবন বিকাশের গতি স্থির করে দেবেন। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে গতির লীলা চলছে, সেই ভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যেও জাগ্রত করতে হবে। তবেই তো সে আপনবেগে এগিয়ে যাবে। নদী যে ছুটে চলেছে, তা-তার আত্মগতিতে, বাইরের কোন শক্তির প্রভাবে নয়। মানুষের জীবনও সেই স্বাভাবিক গতিধর্ম লাভ করুক; তার চিরচঞ্চল অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অমৃতলোকের দিকে ধাবিত হোক। জগৎ স্রোতে ভেসে চলার এই মন্ত্রে শিক্ষার্থীর দীক্ষা হোক, শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা ও

শিক্ষক তার মনে সেই গতি এনে দিন, যার ফলে সে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে উচ্চারণ করবে—তৎত্বং পূষন্নাপাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে। এইটাই হবে প্রকৃত শিক্ষা এবং প্রকৃত শিক্ষকের কাজ।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the various functions served by 'Education' in a society.

   Ans : ১২ হইতে ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities—Discuss how Education serves these functions.

   Ans ১২ হইতে ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. "Lead me from untruth to truth , from darkness to light, from mortality to immortality"—Discuss how education helps nam realising such objectives.

   Ans : ১৬ হইতে ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. "If generation had to learn for itself what has been learned by its predecessors, no sort of intellectual or social development would be possible"—Discuss the statement in the light of the social functions of education,

   Ans : ১৫ হইতে ১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার উপাদান

Factors of Education

শিক্ষাকে তত্ত্বগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় শিক্ষা একটি আদর্শ ধারণা (ideal concept) এবং এই ধারণার মধ্যে যথেষ্ট দার্শনিক ও তাত্ত্বিক যুক্তির অবকাশ আছে। কিন্তু তত্ত্বগত দিক (Theoretical aspect) তা যতই বিমূর্ত এবং আদর্শ হোক না কেন, ব্যবহারিক দিক থেকে তাকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় তার সর্বশেষ পরিণতি হ'ল কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা সংঘটিত হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার উদ্দেশ্য যা হোক না কেন, সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছুতে গেলে দরকার অনুশীলনের। এই অনুশীলন একমাত্র সম্ভব নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। তাই পৃথিবীর যে-কোন দেশেই আজকে আমরা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার (Institutionalized formal education) চল দেখতে পাই। এই শিক্ষাব্যবস্থার কতকগুলো অঙ্গ আছে যাদের আমরা এখানে বলছি শিক্ষার উপাদান (Factors of Education)। অর্থাৎ, শিক্ষার উপাদান বলতে আমরা কতকগুলো খণ্ড খণ্ড অংশকে বলছি, যাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা। সাধারণতঃ এই উপাদান চার ধরনের—শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পাঠ্য বিষয় বা পাঠক্রম এবং পাঠ-পরিবেশ বা শিক্ষালয়। এখানে এদের তাৎপর্য সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

[এক] **শিক্ষার উপাদান—শিক্ষার্থী (Educand or Child as Factor of Education):** শিক্ষার সংজ্ঞা, তাৎপর্য ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি—শিক্ষার দ্বারা আমরা ব্যক্তির বা শিশুর আচরণ-ধারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করতে চাই। তাকে কিছু কৌশল আয়ত্ত করাতে সচেষ্ট হই যার দ্বারা সে যথাযথ ভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান করতে পারে। সুতরাং যে-কোন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কথা হ'ল একজন শিশু বা শিক্ষার্থী অবশ্যই থাকার প্রয়োজন, যার আচরণ-ধারার আমরা পরিবর্তন সাধন করব। শিক্ষার্থী তার জন্মগত সম্ভাবনাকে বিকাশিত করবে শিক্ষার প্রভাবে। তারই উদ্দেশ্যে শিক্ষা উৎসর্গীকৃত। অর্বাচীন, অপরিপক্ক শিশুরই যদি অস্তিত্ব না থাকে

তবে শিক্ষারও কোন প্রয়োজন নেই। তাই শিক্ষার প্রধান উপাদান হ'ল শিশু বা শিক্ষার্থী। এই উপাদানের বৈশিষ্ট্য হ'ল সে দেহ মন-বিশিষ্ট জীব। তার মনোময় জগৎই শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তার প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতা (Instinct) আছে, তার বুদ্ধি (Intelligence) আছে, আকাঙ্ক্ষা বা প্রেষণা (Desires and motives) তার মধ্যে সর্বদা জাগরূক, আগ্রহ আর প্রক্ষোভ (Interest and Emotion) সদা সক্রিয়াশীল তার মধ্যে। এছাড়া তার বৈশিষ্ট্য হ'ল সে নমনীয় (Plastic)। শিক্ষার দ্বারা তার বিকাশের ধারাকে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং সবচেয়ে বড় কথা হ'ল সে সর্বদাই শিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক।

[দুই] **শিক্ষার উপাদান-শিক্ষক (Teacher or Educator as factor of Education) :** শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষাব্যবস্থা চলতে পারে না। বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগে জীবনযাত্রার রীতি যখন অত্যন্ত জটিল। আদিম সমাজব্যবস্থায় যখন নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না, তখন জীবন ধারণের বিভিন্ন কৌশল শিশুরা অনুকরণের দ্বারা নিজেরাই কিছুটা আয়ত্ত করত। তবে সেখানেও পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্কদের প্রভাব তাদের উপর ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়মতান্ত্রিক রূপ ধারণ করেছে, সেদিন থেকেই শিক্ষকের প্রচলন চলে আসছে। তাই শিক্ষক শিক্ষাব্যবস্থার একটি প্রধান অঙ্গ। তাঁর কাজের যতই পরিবর্তন হোক না কেন তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে অপরিহার্য। প্রচীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক বা গুরুই ছিলেন প্রধান। তাঁকে জ্ঞানের আধার হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত ; আর সেই জ্ঞান শিষ্য বা শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনি সঞ্চালনের প্রচেষ্টা করতেন। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার যুগে তাঁর দায়িত্বের পরিবর্তন হ'য়েছে। তিনি কাজ করবেন পরামর্শদাতার, পথ প্রদর্শকের। তিনি তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্ব দিয়ে শিশুকে প্রকৃত জীবনাদর্শের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। বিবেকানন্দ বলেছেন—"Like fire in a piece of flint, knowledge exists in mind ; suggestion is the friction which brings it out." চকমকি পাথরে যেমন আগুন অন্তর্নিহিত শক্তি, জ্ঞানও তেমনি মানুষের মধ্যে সুপ্ত। বহির্জগতের যে-কোন ইঙ্গিত ঘর্ষণের কাজ ক'রে সেই জ্ঞানকে বহিঃপ্রকাশ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকের কাজ হবে এই ইঙ্গিত দেওয়া। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর 'friend, philosopher and guide."

[তিন] **শিক্ষার উপাদান—পাঠক্রম (Curriculum as factor of Education) :** শিক্ষার তৃতীয় উপাদান হ'ল পাঠক্রম। অর্থাৎ, শিশুর

বিকাশের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-অভিজ্ঞতা (Life experience) আমরা শিক্ষার মাধ্যমে তার সামনে উপস্থাপন করি। একে আমরা বলছি পাঠক্রম। সাধারণ অর্থে পাঠক্রম বলতে বুঝায় শিক্ষালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের তালিকাকে কিন্তু পাঠক্রম ঠিক তা নয়। শিক্ষালয়ের বৈচিত্র্যপূর্ণ সব অভিজ্ঞতার সমন্বিত রূপকেই বলা হয় পাঠক্রম। শিক্ষার উপযোগিতা অনেকাংশে এই পাঠক্রমের উপর নির্ভর করে। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি ব্যক্তিত্বের বিকাশের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন করা হয়, তবে শিশুর বিকাশের ধারাকে সে দিকে প্রবাহিত করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনার দরকার। পরিকল্পনানুযায়ী বিকাশমুখী অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ও সংযোগ দরকার। পাঠক্রম এই হিসেবে শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন।

[চার] **শিক্ষার উপাদান—শিক্ষালয় বা শিক্ষার মাধ্যম (Educational institutions or Agencies of Education as factors):** শিক্ষার জন্য যেমন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষণীয় বস্তু বা পাঠক্রমের প্রয়োজন তেমনি প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন; অর্থাৎ, যেখানে শিক্ষা কার্য সম্পন্ন হবে। সমাজব্যবস্থার মধ্যেই সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগেই। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হ'ল ব্যক্তিকে বা শিক্ষার্থীকে জ্ঞানমূলক (intellectual), কৃষ্টিমূলক (cultural) এবং সমাজ মূলক (social) অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীকে দেওয়া। শিক্ষালয় বলতে আমরা বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সব রকম প্রত্যক্ষ শিক্ষার মাধ্যমকেই বলছি। এ ছাড়া আরও যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (social institution) আছে তারাও পরোক্ষ ভাবে শিক্ষাদানে সহায়তা করে। যেমন রাষ্ট্র (state), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (religious institution), পরিবার (family) ইত্যাদি। এদেরই আমরা সামগ্রিক ভাবে বলছি শিক্ষার মাধ্যম (Agencies of Education)। এর ভিতরে বিভিন্ন ধরনের জনসংযোগ সংস্থাও (Mass Communication Media) পড়ে। যেমন, সংবাদপত্র, বেতার, পল্লীগোষ্ঠী ইত্যাদি। এরা প্রত্যেকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার উপাদান।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে পারা যায় শিক্ষা প্রধান চারটি উপাদানের দ্বারা সংগঠিত। এদের মধ্যে কাউকে বাদ দিয়ে শিক্ষাকার্য চলতে পারে না। যে-কোন সুষ্ঠু শিক্ষা-ব্যবস্থায় এই চারটি উপাদানের সুসামঞ্জস্য সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।

এক কথায় বলতে গেলে শিক্ষা হ'ল সুশিক্ষকের নির্দেশনায় সুগঠিত প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষালয়ে সুপরিকল্পিত পাঠক্রমের মাধ্যমে শিশুর সুষম জীবন বিকাশের প্রচেষ্টা।

প্রশ্নাবলী

1. **What is ment by the factors of Education? Discuss the relative importance of the factors in an effective scheme of Education.**

Ans : সমগ্র অংশ দ্রষ্টব্য।

2. **Any effective scheme of Education must be a balance of these four factors—the child, the curriculum, the teacher and his environment.—Discuss the statement fully.**

Ans : সমগ্র অংশ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার লক্ষ্য

Aims of Education

শিক্ষা একটি মানুষের সচেতন প্রক্রিয়া। আমরা শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে কতকগুলো পরিবর্তন আনতে চাই। এই দিক থেকে শিক্ষা সচেতন প্রক্রিয়া (Conscious or deleberate process)। মানুষের যে-কোন রকম সচেতন প্রচেষ্টাই উদ্দেশ্যমুখী (purposive)। শিক্ষা যদি সচেতন প্রক্রিয়া হয় তবে তারও নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য থাকা উচিৎ। শিক্ষার নিজস্ব যদি একটা লক্ষ্য না থাকে তবে. তা ব্যক্তি জীবনে সংগতি বিধান করতে পারবে না। তাই শিক্ষা কথার তাৎপর্যের সঙ্গেই তার লক্ষ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই যে-কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাই হোক না কেন তার নিজস্ব একটা লক্ষ্য থাকবেই। প্রাচীনতম শিক্ষা ব্যবস্থার যদিও আমরা লিখিত কোন আদর্শ বা লক্ষ্যের উল্লেখ পাই না তবুও একথা স্পষ্ট ক'রে বলা যায় যে, তারও একটা লক্ষ্য ছিল তা যতই জৈবিক স্তরেরই হোক না কেন। বর্তমান যুগে জীবন যাত্রার মান অনেক জটিল হ'য়েছে, মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারের সামগ্রীরও বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবনাদর্শের তারতম্য ঘটেছে, তাই শিক্ষার লক্ষ্যকে আর উপেক্ষা করা যায় না। পূর্বেই তা স্থির ক'রে নেওয়ার দরকার। শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব।

শিক্ষার উদ্দেশ্য কেন? (Necessity of Aims of Education):

॥ এক ॥ পূর্বেই বলা হয়েছে, শিক্ষা হ'ল উদ্দেশ্যমুখী সচেতন প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণধারার পরিবর্তন করতে চাই এবং পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা একেবারে অন্ধ প্রচেষ্টা (blind effort) নয়; নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী পরিবর্তন বা নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী পরিবর্তন আমরা আনতে চাই আচরণের। যদি পূর্বেই আমরা সেই মান বা লক্ষ্য স্থির করতে না পারি আমাদের কোন রকম প্রচেষ্টাই সার্থক হবে না। তাই সামনে একটা লক্ষ্য রেখে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির জন্মগত সম্ভাবনা ও কর্মপ্রবণতাকে বিকাশ করতে হবে।

॥ দুই ॥ যে-কোন কাজে উদ্দেশ্য না জানা থাকলে নিজের প্রয়োগ কৌশল যান্ত্রিক হ'য়ে পড়ে। কোন পরিস্থিতির বৌদ্ধিক পরিচালনার ক্ষমতা থাকে না,

ব্যক্তির স্বকীয়তার প্রকাশের সুযোগও থাকে না। জন ডিউই (John Dewey) বলেছেন "Acting with an aim is all one with acting intelligently". শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সামনে না থাকে, তবে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন আচরণের কোন তাৎপর্য বা অর্থ খুঁজে পাবেন না। ফলে শিক্ষা হবে তাঁদের উভয়ের কাছে অর্থবিহীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ, যে-কোন কর্মক্ষেত্রের মত লক্ষ্য শিক্ষাকেও অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে,—শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে। শিক্ষার্থী যদি না জানে কেন সে ইতিহাস পড়ছে বা শিক্ষক যদি না জানেন কেন তিনি ইতিহাস পড়াচ্ছেন, তাহ'লে সম্পূর্ণ বিষয়ই তাদের কাছে অর্থবিহীন অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এই কারণেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ধারণ প্রয়োজন।

॥ তিন ॥ সর্বশেষে লক্ষ্য পূর্ব নির্ধারিত না হ'লে, শিক্ষার অগ্রগতি সঠিক ভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কোন না কোন ধরনের পরিমাপের জন্য একটা স্থির মান দরকার যার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যায়। বিশেষ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীকে বিশেষ এক প্রশিক্ষণের প্রভাবে রাখার ফলে তার কি পরিবর্তন হ'ল তা আমরা সাধারণ ভাবে পরিমাপ করতে পারি তুলনামূলক ভাবে। কিন্তু তার সামগ্রিক বিকাশের ধারাকে যথাযথ ভাবে পরিমাপ করতে গেলে একটি সাধারণ তুলনীয় বস্তুর প্রয়োজন। শিক্ষার সর্বজনীন লক্ষ্য এবিষয়ে আমাদের সহায়তা করে।

শিক্ষার লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য—পরিবর্তনশীলতা (Educational Aims are variable):

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার পরেই আমরা তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করব। শিক্ষার লক্ষ্যকে বিচার করলে দেখা যায় যে, তার কোন একটা বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই ; বা যুগে যুগে তা একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না। তাই শিক্ষার লক্ষ্য না ব'লে লক্ষ্যকে বহুবচন করাই বাঞ্ছনীয়। যুগে যুগে দেখা গেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হ'য়েছে, আদিম মানব সভ্যতার যুগে শিক্ষার যে উদ্দেশ্য ছিল, আজকে তা আর নেই। আবার একই কালে, বিভিন্ন দেশে লক্ষ্য করা গেছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য বিভিন্ন। এটাই যেন তার স্বাভাবিক প্রকৃতি এবং বর্তমান শিক্ষাবিদ্‌রা এই পরিবর্তনশীলতাকে তার স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনে (মুদালিয়ার কমিশন, 1952) বলা হ'য়েছে—"As the political, social and economic conditions change and

new problems arise, it becomes necessary to re-examine carefully and re-state clearly the objectives which education at definite stage should keep in view." কিন্তু কেন এই পরিবর্তনশীলতাকে শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকার করে নিয়েছেন? তার কারণ, প্রথমতঃ শিক্ষা নিজেই একটা গভীর ধারণা; দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর মধ্যে বহু চাহিদার অবস্থান এবং শিক্ষাকে সেই সকল রকম চাহিদাই পরিতৃপ্ত করতে হয়। ফলে তার অন্তর্নিহিত চাহিদার বিভিন্নতা অনুযায়ী শিক্ষারও বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করা হ'য়েছে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষাবিদ্‌, চিন্তাবিদ্‌, রাষ্ট্রনায়ক বা সামগ্রিক ভাবে সমাজের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে দেশ ও কাল ভেদে জীবনাদর্শের পার্থক্য শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য সৃষ্টি করেছে। স্যার পার্শিনান বলেছেন, যে-কোন শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির জীবনাদর্শের সঙ্গে সব সময় সম্পর্কযুক্ত থাকবেই। সুতরাং জীবনাদর্শের যেমন ব্যক্তি, দেশ ও কাল ভেদে পরিবর্তন হয় শিক্ষার লক্ষ্যও সেই ধর্মসম্পন্ন। "Every scheme of education being at bottom a practical philosophy, necessarily touches life at every point.... and as ideals of life are eternally at variance, their conflict will be reflected in educational theories."

সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে মূল কথা হ'ল যে তার (শিক্ষার) কোন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন লক্ষ্য স্থির করেছেন। মানব সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে এই ব্যবস্থা চলে আসছে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তার ধারাবাহিক আলোচনার প্রয়োজন।

শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্য (Different Aims of Education):

পূর্বেই বলা হ'য়েছে, শিক্ষার কোন বিশেষ একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন, এবং তা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন মনীষীদের বিভিন্ন কালের আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের উৎকর্ষণের উপর দৃষ্টি আরোপ করেছেন। তাঁদের এই আলোচনার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ কয়েক শ্রেণীর লক্ষ্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। প্রথমে আমরা এদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করবো।

[এক] **বৃত্তিমূলক লক্ষ্য (Vocational Aim):** প্রাচীন জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সরল ও সহজ। জীবন ধারণের প্রয়োজনে শিশুর

বিশেষ কিছু জটিল কৌশল আয়ত্ত করার প্রয়োজন হ'ত না। খাদ্য সংগ্রহ, বাস সংস্থানকে কেন্দ্র ক'রে সামান্য কিছু আচরণ তাদের আয়ত্ত করতে হ'ত। ফলে ঐ সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা ছিল নিতান্তই অনিয়মতান্ত্রিক (informal)। কিন্তু ক্রমে যতই জীবনযাত্রার পদ্ধতি জটিল হ'তে লাগল, মনুষ্য সমাজে অত্যধিক অভিজ্ঞতার সংযোজনের ফলে, তখন শিক্ষাও নিয়মতান্ত্রিক রূপ ধারণ করলো; তার উপর দায়িত্বও অনেক বেশী এসে পড়লো। পিতামাতা, সংসারে অন্যান্য বয়স্ক প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না শিশুর আচরণধারাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা। সম্ভব হ'ল না তাঁদের পক্ষে শিশুকে এই জটিল জীবন পরিস্থিতির উপযোগী করে তৈরী করে দেওয়া। তাই অনেকে বললেন শিক্ষাকে অনেক গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সে দায়িত্ব হ'ল শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী ক'রে তৈরী ক'রে দিতে হবে। আরো পরিষ্কার ক'রে বললে দাঁড়ায় শিশুকে পরবর্তী জীবনের বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে ভবিষ্যৎ কোন বৃত্তির জন্য প্রস্তুত ক'রে দেওয়া। বর্তমানেও অনেক শিক্ষাবিদ্ এবং অভিভাবক এই লক্ষ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এঁরা মনে করেন শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা জীবনের প্রয়োজন মিটাবে; শিক্ষার দ্বারা জীবনের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাবে, এমন কিছু কথা নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আমরা যদি ব্যক্তির বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণের প্রয়াসকেই ধরি তাহ'লে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে। যেমন— প্রথমতঃ এই ধরনের শিক্ষা ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে এবং এই অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে ব্যক্তির আত্মনির্ভরতা, মানসিক উন্মুক্ততা, নৈতিক বোধ ইত্যাদি আসবে। সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীব হিসেবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। জন ডিউই বলেছেন, ব্যক্তি কি করতে পারে তা নির্ধারণ ক'রে, তাকে সেই কাজে নিযুক্ত ক'রে দিতে পারলে সে সুখী হবে। "To find out what one is fitted to do and to secure an opportunity to do it, is the key to happiness। দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তিমুখী শিক্ষার লক্ষ্য একাংশে মনোবিদ্যার তত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি নিজে যদি তার কাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হয় তবে, তার কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বৃত্তিমুখী উদ্দেশ্য শিক্ষাকালীন আচরণকে শিক্ষার্থীর কাছে অনেক সহজ ভাবে অর্থপূর্ণ ক'রে তোলে। ফলে এই জাতীয় উদ্দেশ্য শিশুকে শিক্ষার প্রতি

আগ্রহী করে। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা এই ধরনের বৃত্তিমূলক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। তৃতীয়তঃ, বৃত্তিমুখী শিক্ষা পরিকল্পনা স্বল্পবুদ্ধি বা ক্ষীণবুদ্ধি শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী, তাদের ক্ষেত্রে পুঁথিগত শিক্ষা বা জ্ঞান আহরণ করার জন্য শিক্ষা বিশেষ কিছু কাজে লাগে না। কারণ তারা নিজেদের সীমিত বুদ্ধির জন্য জ্ঞানের সার্বিক প্রয়োগ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়। বরং বৃত্তিমুখী শিক্ষার দ্বারা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা যায়। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই লক্ষ্যের উপর এমন ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি মন্তব্য করছেন—"It is indeed criminal to attempt anything else with them (feeble-minded ,"

শিক্ষার বৃত্তিমুখী লক্ষ্যের কিছু সুবিধা থাকলেও তার ত্রুটির দিকটাই বেশী। কারণ শিক্ষা দ্বারা মানুষের সকল রকম চাহিদারই পরিতৃপ্তি হওয়ার দরকার। কেবলমাত্র খাদ্য এবং আরাম (food and comfort) তার জীবনের উদ্দেশ্য নয়। উপার্জনশীল হওয়া জীবনের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু সেটাই জীবনের শেষ কথা নয়। মানব মনের আরো অনেক সূক্ষ্ম দিক আছে যে গুলোকে শিক্ষার দ্বারা বিকশিত করতে হবে। মানুষকে সার্থক জীবন যাপন করতে হ'লে বৌদ্ধিক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক. সমস্ত দিকেই পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হওয়ার দরকার। সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা মানুষের মানসিক দিগন্তকে সীমিত ক'রে তোলে। তাই তাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। অধ্যাপক কে. কে. মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—"Life is more than meat as the maxim goes. Man has various other duties such as acquisition of knowledge, realizing his position as a member of the society, and being able to utilize his leisure hours profitably. সুতরাং বৃত্তিমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য খুবই সংকীর্ণ এবং জীবনের সকল রকম সম্ভাবনা বা আদর্শকে বিকাশ করতে সক্ষম নয়। তাই সম্পূর্ণ বৃত্তিমুখী শিক্ষা কোন মতেই আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে কাজ করতে পারে না। শিক্ষা আধুনিক তাৎপর্য অনুযায়ী, জীবনের সকল দিককেই স্পর্শ করবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি বৃত্তিমুখী হয় তবে সেই শিক্ষার দ্বারা হয়তো ভাল কারিগর, বা দক্ষ ইঞ্জিনীয়ার কি ডাক্তার তৈরী হ'তে পারে, কিন্তু আদর্শ মানুষ তৈরী হবে না।

॥ বিশেষ আলোচনা ॥

নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কারিগরি কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রার গতিরও সতত: পরিবর্তন হচ্ছে। প্রতিনিয়তই তার জীবন পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিৎ শিশুকে এই পরিবর্তনশীল জীবন পরিবেশের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা। বৃত্তিমূলক শিক্ষা মনের সেই নমনীয়তা (flexibility) আনতে পারে না। সাধারণ মানবীয় শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান মানব মনে এই ধর্মের সঞ্চার করতে পারে। তাই সাধারণ মানবীয় শিক্ষাকে (general education) বৃত্তি শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক ক'রে অনুশীলন করলে ভুল হবে। তাদের ব্যক্তির প্রয়োজন উপযোগী সমন্বয় আজকের দিনে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। শিক্ষালয়ের পাঠক্রমের ভিতর, সাধারণ মানবীয় জ্ঞান, সংস্কৃতিমূলক অভিজ্ঞতা এবং বৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতা সংযোজন করতে হবে। ছাত্রদের নির্দেশনা দিতে হবে যাতে ক'রে তারা নিজেদের ক্ষমতা উপযোগী বৃত্তিনির্বাচন করতে পারে। শিক্ষার মধ্যে যদি এই সকল উপাদানের সমন্বয় না করতে পারি, গতিশীল জীবন উপযোগী ক'রে তাকে রচনা করা সম্ভব হবে না। মনে রাখতে হবে—ব্যক্তি জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ করতে হ'লে, পারিপার্শ্বকে যথাযথ ভাবে প্রভাবিত করতে হ'লে এই সমন্বয় একান্ত প্রয়োজন।

[দুই] কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য (Cultural Aim): কৃষ্টি বলতে আমরা মানব প্রকৃতির এমন একটা দিক বুঝি যাকে অনুশীলনের মাধ্যমে পরিণতির বা পরিপক্বতার স্তরে উন্নীত করা হ'য়। জন ডিউই বলেছেন, কৃষ্টি হ'ল মানুষের ক্ষমতার চর্চা যার দ্বারা ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে এবং পরিপূর্ণ ভাবে সমাজের সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয় (cultivation of power to join freely and fully in shared or common activities)। এক কথায় বলা যেতে পারে কৃষ্টি হ'ল জগতে যা কিছু ভাল আছে, যা কিছু ভাল ঘটেছে তার চর্চা করা। মনুষ্য সমাজেরও অনেক ভাল অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি বা আচার আচরণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ধারা রূপে নিবদ্ধ থাকে। একেও আমরা কৃষ্টি বলি। কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, মানবশিশুকে সমাজের অতীত সংস্কৃতির ধারায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে ক'রে সে মানব অভিজ্ঞতার মূল ও সুন্দর অংশটিকে গ্রহণ করতে পারে। চর্চা বা অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে আদর্শ আচরণ-ধারার অধিকারী করতে হবে। শিক্ষার এই লক্ষ্যকেই বলা হচ্ছে কৃষ্টিমূলক

লক্ষ্য। এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষায় উদ্দেশ্য হ'ল মানব শিশুকে উন্নততর অভিজ্ঞতার অধিকারী করা। শিক্ষিত ব্যক্তি সেই যার ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ-গুলি (Personality traits) নৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়নে উন্নত, যার সৌন্দর্য বোধের (Aesthetic) সার্থক বিকাশ হ'য়েছে এবং যিনি সমাজের পরিপূর্ণ জীবন যাপনে সক্ষম। এই সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির মধ্যে আসতে পারে যদি আমরা শিক্ষার কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্য গ্রহণ করি।

কিন্তু এই উদ্দেশ্য গ্রহণে নানা রকম অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর সকল সমাজের কৃষ্টিগত মান এক নয়। ফলে আমাদের পক্ষে স্থির করা মুস্কিল কোন্ সমাজ-কৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য ঠিক করবো। তাই বিভিন্ন দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য ভিন্ন হ'তে পারে বা অনেক সময় এক সমাজব্যবস্থা অন্য সমাজব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশকে নিস্তব্ধ ক'রে তাকে গ্রাস করে এমন ঘটনাও বিরল নয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর ব্যক্তিই উন্নত ধরনের কৃষ্টির অধিকারী হ'য়ে থাকেন। বেশীর ভাগ যারা সাধারণ শ্রেণী তারা এর থেকে বঞ্চিত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি কৃষ্টিমূলক হয়, তবে তা সমাজের বিশেষ এক শ্রেণীর হাতিয়ার ছাড়া কিছু নয়। এই আদর্শ বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারার বিরুদ্ধে যায়। তাই এই লক্ষ্যকে গ্রহণ করা যায় না। সব শেষে, কৃষ্টি হ'ল সমাজের অন্তর্নিহিত সত্তা, আর শিক্ষা হ'ল সচেতন মানসিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তিব উৎকর্ষণ। আন্তরিক কোন সত্তাকে বাহ্যিক কোন মাধ্যমের (medium) দ্বারা পরিবাহিত ক'রে স্থানান্তরিত করা যায় না। অন্তরের উপলব্ধির দ্বারাই তাকে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং শিক্ষার এই কৃষ্টিমূলক উদ্দেশ্যকে গ্রহণেরও যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

॥ বিশেষ আলোচনা ॥

আধুনিক কালে কৃষ্টির সম্বন্ধে ধারণার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। পৃথিবীর কোন সমাজব্যবস্থাই মনে করে না যে, সে অন্যের চেয়ে উন্নত। যুগ ধর্মের প্রভাবে ও পারিপার্শ্বিকের চাপে সকলেই আজকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বাসী। আজকের পরিস্থিতিতে তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা হবে যা ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে, সীমিত সামাজিক কৃষ্টি বা সংস্কারের প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে তার মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ জাগ্রত করবে। বিখ্যাত দার্শনিক রাসেল বলেছেন, প্রকৃত কৃষ্টিই হ'ল ক্ষুদ্র সামাজিক গণ্ডী থেকে মুক্তিলাভ

ক'রে বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করা (Genuine culture consists in being a citizen of the universe, not only of one or two fragments of time.)। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিক্ষার ধারা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন "ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হ'চ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ।" আধুনিক কালে প্রত্যেক মনীষীই একই কথা বলেছেন। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গতানুগতিক কৃষ্টিমূলক লক্ষ্য খুবই সংকীর্ণ। শিক্ষার দ্বারা যদি কৃষ্টির উন্নয়ন করতে হয় তবে সে সংস্কৃতি হবে সর্বজনীন বিশ্বসংস্কৃতি।

[তিন] **শিক্ষার নীতিমূলক লক্ষ্য (Moral Aim of Education) :** অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হবে ব্যক্তির নৈতিক মান উন্নত করা বা আদর্শ চরিত্র গঠন করা। তাঁরা মনে করেন শিশু জন্ম অবস্থায় যে দেহ-মনের অধিকারী হয়, তাকেই বিকশিত করার জন্য শিক্ষা। এখন তার দৈহিক গঠন ও তার ক্রিয়াকলাপ যা পরবর্তিকালে সে গ্রহণ করে তার সবটাই প্রায় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে থাকে। তার জন্য বিশেষ কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই। দরকার তার মানসিক উন্নয়ন এবং নৈতিক মূল্য-বোধের বিকাশ। নৈতিক জীবনের বিকাশ ও চরিত্রগঠন এর কোন কাজটাই শিশুর নিজের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষার দ্বারা এই দুটো দিকই বিকশিত করতে হবে। শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যের মূল প্রবক্তা হলেন হার্বার্ট (Herbert)। তিনি নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"The one and the whole work of education which is a long and complex training, may be summed up in the concept morality." দার্শনিক লক্‌ও (Locke) বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্যে হ'ল চরিত্র গঠন। প্রাচীন ভারতেও আমরা এই আদর্শের উল্লেখ পাই গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্যে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আদি ভূমি প্রাচীন গ্রীসেও এই ধারণা ছিল। প্লেটোর শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা এর ইঙ্গিত পাই। তিনি বলেছেন, যা নৈতিক গুণাবলীর বিকাশকে ব্যাহত করে সে রকম কিছু শিক্ষার মধ্যে থাকবে না (Nothing should be admitted in education which does not conduce to the promotion of virtue)। মহাত্মা গান্ধীর আলোচনার মধ্যে আমরা এই নৈতিক মূল্যবোধের গুরুত্বের উল্লেখ পাই।

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনেক চিন্তাবিদ এবং শিক্ষবিদ্ শিক্ষার এই লক্ষ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁদের ধারণা মানুষ অন্যান্য ইতর প্রাণীর মত কতকগুলো জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তার সেই সব জৈবিক চাহিদাগুলোকে যথাযোগ্য পথে পরিচালিত ক'রে তার জীবনকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে তোলা। তবে এই লক্ষ্যকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। ব্যক্তির জীবনের উন্নয়ন শুধুমাত্র নৈতিক মান বা চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। সে দেহ-মন নিয়ে সম্পূর্ণ। তাছাড়া তার জীবনের আধ্যাত্মিক দিকও আছে সুতরাং দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে উপেক্ষা ক'রে শুধুমাত্র নৈতিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করলে ভুল করা হবে। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক মানও সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষে পৃথক। নীতি বোধ সব সময় মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল। একজনের যা ভাল অন্যের কাছে তা ভাল নাও হ'তে পারে। যে আচরণ বিশেষ এক সমাজব্যবস্থায় একান্ত কাম্য বলে মনে করা হয়, অন্য সমাজে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে নাও বিবেচনা করা হতে পারে। সুতরাং ভাল-মন্দ বিচারের মাত্রার কোন সঠিক নির্ণায়ক নেই। সেই হিসেবে শিক্ষার দ্বারা যথার্থই কি উন্নতি হ'ল তা পরিমাপ করা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

॥ বিশেষ আলোচনা ॥

শিক্ষার নৈতিক লক্ষ্যের যে সব দোষত্রুটির কথা উল্লেখ করা হ'ল বা যা সচরাচর বলা হয়, তা কিন্তু নীতি কথাটিকে খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরে নিয়ে। নৈতিক বিকাশ বা চারিত্রিক বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈততার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। তবে সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা মনে রাখার দরকার—নীতিবোধ বা চরিত্র গঠন একেবারে শূন্য অবস্থায় হ'তে পারে না। ব্যক্তির অন্যান্য সত্তাকে ত্যাগ ক'রে বা তার পারি-পার্শ্বিক পরিবেশে বেড়া জাল রচনা ক'রে তাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া বা চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা কল্পনাবিলাস ছাড়া কিছু নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (মুদালিয়ার) এ সম্পর্কে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হ'য়েছে—"Character education has to be visualized not in a social vacuum but with reference to our contemporary socio-economic and political situation."

[চার] শিক্ষার আধ্যাত্মিক লক্ষ্য (Spiritual Aim of Education): আদর্শবাদীরা বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। তারা বস্তু জগতের সমস্ত কিছু বন্ধনকে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একক শক্তিকে উপলব্ধি করা। প্রাচীন ভারতে এই ধারণাই দৃঢ়বদ্ধ ছিল। আধ্যাত্মবাদ প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতীক। কিন্তু সেই আদর্শ বর্তমানে প্রায় লোপ পেয়েছে—কিছুটা আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রভাবে, আর কিছুটা বিদেশী শাসনের প্রভাবে। কিন্তু আধুনিক কালে অনেক শিক্ষাবিদ্ই জীবনের এই দিকেরও উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এবং শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষের কথাই বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর A Poets' School-এ বলেছেন—"আমি একান্ত ভাবে দুটি জিনিসকে মিলিত করার আকাঙ্ক্ষা করেছি: প্রাচ্য সাধকের অন্তর্ময় দৃষ্টি, যার দ্বারা মনের নির্জনে সে দেখা পায় বিশ্বআত্মার, আর সেবা কর্মে সেই ধ্যানেরই বহিঃপ্রকাশ—যা ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগের দ্বারা সংকোচের জড়িমার মধ্য থেকে জাগিয়ে তোলে সম্পদকে, সৌন্দর্যকে, কল্যাণকে।" বিবেকানন্দ বলেছেন—"Mine also is that infinite ocean of life, of power, of spirituality as yours. Therefore, my brethren, teach this life saving, great ennobling, grand doctrine to your children even from their very birth." আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ রাধাকৃষ্ণনও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য জাতীয় কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি নয় বা বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বোধ জাগ্রত করা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের অন্তরে বুদ্ধির অগম্য যে সত্তা আছে তাকে উপলব্ধি করা (Making the individual feel that he has within himself something deeper than intellect, call it spirit if you like.) ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও (1964-66) এই বিষয়ের গুরুত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে বলা হ'য়েছে—"In the development that we envisage in the future, we hope that the persuit of mere material affluence and power would be subordinated to that of higher values and the fulfilment of the individual. This concept of the mingling of science and spirituality is of special signifi-

cance for Indian Education." বিভিন্ন শিক্ষাবিদের বক্তব্য থেকে একটা জিনিসই স্পষ্ট হ'চ্ছে যে তাঁরা প্রত্যেকে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ এবং উন্নত ধরনের জীবনাদর্শ (Higher values of life) বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তাকেই শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন।

কিন্তু শিক্ষার এই আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের সামনে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে আমরা যদি পরমাত্মা বা বিশ্বআত্মার উপলব্ধির বা আত্মোপলব্ধিকে (self-realization) বুঝি, তাহ'লে সেই বিশ্বআত্মার উপলব্ধির নৈর্ব্যক্তিক বহিঃপ্রকাশ কি তা আমাদের জানা দরকার। কিন্তু এই জাতীয় বিমূর্ত ধারণার (abstract ideas) কোন নৈর্ব্যক্তিক বহিঃপ্রকাশ আদৌ সম্ভব কি না তা স্থির করা যায়নি। সুতরাং, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উভয়কেই শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে অন্ধ থাকতে হয়। যদি অগ্রগতি হয়ই তবে তাকেও আত্মোপলব্ধির আলোকেই বিচার করতে হবে। তাই আদর্শগত দিক থেকে এই মতবাদ যতই নির্ভুল হোক না কেন ব্যবহারিক প্রয়োগে যথেষ্ট অসুবিধা আছে। তবে একটা কথা বিশেষ ভাবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার দরকার—, এই ধরনের আদর্শ আমাদের ভারতীয় কৃষ্টি বিকাশের ধারার অনুকূল। প্রাচীন ঋষিদের থেকে শুরু করে, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, রাধাকৃষ্ণন পর্যন্ত প্রত্যেক মনীষীই একই কথা বলে চলেছেন।

(৫) শিক্ষার লক্ষ্য অভিযোজন (Adjustment—as aim of Education): অনেক শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে জীববিদ্যার জ্ঞান প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। জীবের প্রধান ধর্ম হ'ল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন। অভিব্যক্তিবাদের মূলে আছে এই অভিযোজন (adjustment) ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)। যে প্রাণী যত উন্নত সে তত বেশী সার্থক ভাবে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সক্ষম, মানুষের শিক্ষা তাকে সাহায্য করে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে। যে প্রাণী পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পারেনি তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। তাই শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে জীবন সংগ্রামের উপযোগী ক'রে প্রস্তুত ক'রে দেওয়া। অর্থাৎ সে যাতে পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পারে তার জন্য তাকে শিক্ষা দিতে হবে। চ্যাপ্‌ম্যান (Chapman) ও কাউন্ট (Count) বলেছেন—"Education

is a social process is nothing more than an economical method of assisting an initially ill-adapted individual, during the short period of a single life to cope with the ever increasing complexities of the world." শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির জীবনকে চিরপরিবর্তনশীল জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে যথাযথ ভাবে সংগতি বিধানের উপযোগী করে তৈরী ক'রে দেওয়া।

ব্যক্তির পরিবেশ বলতে আমরা সেই সব অবস্থাকে বলছি যা ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে; বিশ্বপ্রকৃতির এমন অনেক জিনিস এবং অবস্থা আছে যাদের কোন প্রভাব ব্যক্তি-জীবনের উপর নেই। তাদের আমরা পরিবেশ বলব না। [By environment we mean sum total of all those stimulations which the individual receives from birth till death-Stone]—যেমন, স্বাভাবিক লোকের কাছে আলোকরশ্মি (Rays of light) তার পরিবেশের অন্তর্গত কিন্তু অন্ধ, যে দেখতে পায় না, আলোকরশ্মির কোন প্রভাব তার জীবনে নেই, সুতরাং তা তার পরিবেশের অন্তর্গত নয়। ব্যক্তির পরিবেশকে আমরা তিন অংশে ভাগ করতে পারি তার জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে সমতা রেখে—প্রাকৃতিক পরিবেশ (Physical environment), সামাজিক পরিবেশ (Social environment)এবং অন্তর পরিবেশ (Internal environment)। সুস্থ জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য এই তিন রকম পরিবেশের সঙ্গেই যথার্থ অভিযোজন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমর সাধারণ ভাবে জড় জগতকে বুঝাতে চাই। আর তার অন্তর্গত আছে বিশ্বপ্রকৃতি। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মানুষ আবহমান কাল ধরে সংগ্রাম করে চলেছে; মানব সভ্যতার আদিযুগ থেকে চলছে, তার সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা। আর এই বোঝাপড়ার মধ্যেই সভ্যতার অগ্রগতি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার উপযোগী করে তৈরী করে দেওয়া; তার মধ্যে এমন গুণের সঞ্চার করতে হবে যার দ্বারা সে বহিঃপ্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে এনে জীবনকে সুখময় করে তুলতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ব প্রকৃতি ছাড়াও মানুষের আর একটি পরিবেশ আছে। তাহ'ল সমাজ পরিবেশ। মানুষ দলবদ্ধ জীব। সে জন্মগ্রহণ করে সমাজ পরিবেশের মধ্যে, সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সবকিছুই তাকে জন্মমুহূর্ত থেকে ঘিরে রাখে। এর থেকে সে মুক্তি পেতে চায় না; এর মধ্যেই সে সার্থকতা চায়। "মানবের মাঝে আমি

বাঁচিবারে চাহি,"—এ তার চিরন্তন বাসনা। তাই শিক্ষার দ্বারা তাকে এই জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হবে। সে যাতে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পারে, সে বিষয়ে সচেষ্ট হ'তে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি-জীবনকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে তৈরী করে দেওয়া। তার মধ্যে এমন কতকগুলি সামাজিক গুণ বিকাশ করা যার দ্বারা সে সার্থক ভাবে সমাজের পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধান করতে পারে, শুধুমাত্র অন্ধভাবে সমাজের আচরণ-ধারা গ্রহণের মাধ্যমে নয়; সমাজ-জীবনকে নিজের স্থবিধানুযায়ী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। সবশেষে আছে ব্যক্তির অন্তর পরিবেশ। মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, সে মনোময়। আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা—দৈহিক ও আধ্যাত্মিক এই সব কিছু নিয়ে এই জগৎ। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির অন্তর পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন। এক কথায় আমরা বলতে পারি, জড় ও প্রকৃতির সঙ্গে সমাজ, পরিবেশ ও অন্তর সত্তার সার্থক অভিযোজনই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

কিন্তু এ ধরনের উদ্দেশ্যের আদর্শগত দিক থেকে বিশেষ ত্রুটি না থাকলেও ব্যবহারিক দিক থেকে এই উদ্দেশ্য গ্রহণের অনেক অসুবিধা আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি সকল রকম পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন হয়, তবে পরিবেশের প্রকৃতি ও ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল হবে শিক্ষানীতি। এতে ক'রে একই পরিবেশের মধ্যেই শিক্ষার নীতি ব্যক্তিভেদে পৃথক হবে। আবার পরিবেশ চিরপরিবর্তনশীল, স্থতরাং পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু পরিবর্তিত হওয়ার দরকার। আদর্শগত দিক থেকে এটা ঠিক হ'লেও তার জন্য যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দরকার তা সব সময় সম্ভব নাও হ'তে পারে। সবশেষে, ব্যক্তিকে সার্থক অভিযোজন করার যোগ্য ক'রে তুলতে হ'লে কি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এর মধ্যে নেই। এই সব কারণে এই লক্ষ্যের মধ্যে তাত্ত্বিক সত্যতা থাকলেও গ্রহণের অসুবিধা আছে।

শিক্ষার বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আলোচনার ফলে একটা ধারণা প্রমাণিত হ'য়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দোষত্রুটি আছে। আবার প্রত্যেকেরই একটা ভাল দিক আছে। তাই তাদের কোন একটাকে যেমন একক ভাবে গ্রহণ করা যায় না তেমনি বর্জনও করা যায় না। এই সব শিক্ষার লক্ষ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলে আর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেক লক্ষ্যের পেছনে কিছু না কিছু ব্যক্তিস্বার্থ জড়িয়ে আছে। চরিত্রগঠন, জীবিকা অর্জন, আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন সব কিছুই

ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। এই সব লক্ষ্যের পেছনে আবার এক একটা দার্শনিক তত্ত্বেরও (Philosophical views) অবদান আছে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে আলোচনা করব। তবে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে আমরা সমাজ উন্নয়নের কথাও উল্লেখ করেছি। এই ব্যক্তি কল্যাণ ও সমাজ উন্নয়ন মতবাদের মধ্যে যে পরস্পর দ্বন্দ্ব সে সম্পর্কে আলোচনা পৃথক ভাবে করব। শিক্ষার লক্ষ্যকে যদি ব্যবহারিক দিক থেকে স্থির করতে চাই তাহ'লে তার সমস্ত ধরনের বিশেষ লক্ষ্যগুলোর সার-অংশকেই গ্রহণ করতে হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে—ব্যক্তিকে কর্মজীবনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া, তার বৌদ্ধিক উন্নতি সাধন করা, তাঁকে সমাজ-জীবনের যোগ্য অধিকারী ক'রে গড়ে তোলা, তাকে আদর্শ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করা এবং সবশেষে আচরণের মধ্যে নমনীয়তার ভাব সঞ্চার ক'রে যে-কোন পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনক্ষম ক'রে গড়ে তোলা। আদর্শ ব্যক্তি-জীবন এদের মধ্যে কোন একটাকে বাদ দিয়ে হ'তে পারে না, একথা চিন্তা ক'রে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (1964-66) প্রদর্শিত পথে জাতীয় শিক্ষার আদর্শ স্থির করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—The educational system must produce young men and women of character and ability committed to national service and development,"

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Individual and Social aims in Education) : শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের সচেতন প্রয়াসের অনেক আগে যখন মানব সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য প্রাকৃতিক নিয়মে অবচেতন মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকত তখন থেকেই লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার লক্ষ্য বিভিন্ন সময়ে দুটো ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হ'য়েছে। এই দুই ধারা হ'ল—ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদ ও সমাজতান্ত্রিকবাদ। শিক্ষার শুধু লক্ষ্য নিরূপণে নয়, শিক্ষার তাৎপর্য, কাজ এবং অন্যান্য আঙ্গিক ক্ষেত্রেও এদের প্রভাব বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে। শিক্ষার যে-কোন লক্ষ্যকে (ইতিপূর্বে যা আলোচনা করা হ'য়েছে) এই দুই শ্রেণীর যে-কোন একটাতেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই দুই মতবাদ বিশেষ ভাবে দুই শ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত। প্রকৃতিবাদ (naturalism) থেকে এসেছে ব্যক্তিতান্ত্রিক-ধারা এবং ভাববাদ (idealism) থেকে এসেছে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা। এছাড়া মনোবিদ্যা

(psychology) এবং সমাজবিদ্যার (sociology) উন্নত জ্ঞান যথাক্রমে তাদের ইন্ধন জুগিয়েছে। প্রথমে আমরা এদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করব।

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য (Individual Aim of Education): ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের উন্নতি সাধন করা। একমাত্র সুশিক্ষিত ব্যক্তিই সমাজে তার নিজের যোগ্যতা উপলব্ধি করতে পারে এবং তার সকল রকম সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়। সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরিবেশ বা সমাজ নিরপেক্ষ ভাবে ব্যক্তির নিজস্ব দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ক্ষমতাবলীর সার্থক উপলব্ধিতে সাহায্য করা। যে ব্যক্তির জীবনে এই ধরনের সামগ্রিক উপলব্ধি এসেছে, সেই প্রকৃত শিক্ষিত। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌দের কাছে ব্যক্তির চাহিদা সমাজের চাহিদার থেকে বড়। শিক্ষা জগতে এই ধারণা বা মতবাদ বিভিন্ন দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে।

॥ এক ॥ জীববিজ্ঞানীদের (Biologists) মতে প্রত্যেক মানুষেরই একক সত্তা আছে। পৃথিবীতে প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব পৃথক সত্তা নিয়ে জন্মায়; প্রত্যেক শিশু অন্য শিশু থেকে আলাদা। তাদের প্রত্যেকের জীবনই নতুন এবং পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু হয়। তাদের চোখের মনির রঙ যেমন আমরা বদলাতে পারি না তেমনি তাদের অন্যান্য প্রকৃতিও আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। ব্যক্তির এই স্বকীয়তাকে সংরক্ষণ করার জন্যই শিক্ষা। অধ্যাপক থমসন্ (Thompson) বলেছেন, শিক্ষা ব্যক্তির পরিপূর্ণ জীবনযাপনে সহায়তার মাধ্যমে তাকে জীবন সংগ্রামে টিকিয়ে রাখে (Education is for the individual: its function being to enable the individual to survive and live out its complete life)। আগে ব্যক্তি পরে সমাজ। ব্যক্তির জন্যই সমাজ, সমাজের জন্য ব্যক্তি নয়। সুতরাং শিক্ষার মুখ্য কর্তাকেই সেবা করা উচিত।

॥ দুই ॥ প্রকৃতিবাদীরা (Naturalist) বলেছেন সমাজ একটা কলুষিত প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ব্যক্তির যদি নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ করতেই হয় শিক্ষার মাধ্যমে, তবে তা সমাজকে বাদ দিয়েই হওয়া উচিত। সমাজের সংস্পর্শে এসেই ব্যক্তি-জীবন কলুষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর জন-জাগরণের নেতা রুশো বলেছেন—"Everything is good as it comes from the hands of Author of nature, but everything degenerates in

the hands of man. Godmakes all things good. Man meddles them and they become evil." সুতরাং ব্যক্তি এবং সমাজ পরস্পর বিরোধী ধারণা। তাই ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসেবে (Man as an individual), এবং ব্যক্তিকে সামাজিক প্রাণী হিসেবে (Man as a social individual) এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না। যেহেতু শিক্ষার লক্ষ্য মহৎ হওয়া উচিত যেহেতু ব্যক্তি তার কাছে প্রধান।

॥ তিন ॥ মনোবিদ্যার (Psychology) বিকাশও ব্যক্তিতান্ত্রিক ধারার বিকাশে সহায়তা করেছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মতবাদ আধুনিক মনোবিদ্যার একটা প্রমাণিত তত্ত্ব। মনোবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন—প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা। দৈহিক-মানসিক উভয় দিক থেকেই ব্যক্তি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সুতরাং যে সব শিক্ষাবিদরা এই তত্ত্বের উপর আস্থাবান তাদের মতে শিক্ষাও ব্যক্তিকেন্দ্রিক হবে। কারণ প্রত্যেক শিশুই তার নিজস্ব স্বতন্ত্র সম্ভাবনা নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের (individual different) ধারাকে বজায় রেখে তার জীবন বিকাশে সহায়তা করা।

॥ চার ॥ ভাববাদী দার্শনিকদের (idealist) তত্ত্বের মধ্যেও ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। এই মতানুযায়ী প্রত্যেক মানুষই পরমাত্মার অংশ। তার মধ্যেই ব্রহ্ম বিদ্যমান। বিবেকানন্দ বলেছেন "Man is potentially devine"। এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তার অন্তর্নিহিত এই ব্রহ্মসত্তার বিকাশ করা। সুতরাং শিক্ষা যদি ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে সম্পন্ন না হয় তাহ'লে ব্যক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ (manifestation) সম্ভব নয়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই পরমাত্মার (absolute) সামিল ক'রে তোলা।

॥ পাঁচ ॥ আবার প্রয়োগবাদীদের (Pragmatists) মতে মানব সভ্যতার বিকাশ হ'য়েছে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বা যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি তাঁদের আবির্ভাবে। নিউটন, আইনস্টাইন প্রভৃতির মত বিজ্ঞানী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, কবীর প্রভৃতির মত ধর্মগুরু, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত সমাজ-সংস্কারক যদি পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত না হ'তেন তা'হলে মানুষের সমাজের এত উন্নতি সম্ভব হ'ত না। আধুনিক কালে প্রয়োগবাদীরা যদিও ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন তবুও প্রাথমিক অবস্থায় তাঁদের তত্ত্বের সংব্যাখ্যানের ঝোঁক অনেকটা বেশী ব্যক্তি-তান্ত্রিক মতবাদের দিকেই ছিল। এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির উন্নতি না

করতে পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব না। ব্যক্তিদের দ্বারাই সমাজের উন্নতি হবে, তাই শিক্ষার আপাতঃ লক্ষ্য হবে ব্যক্তি বা শিশু।

আলোচনা থেকে প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাহ'লেও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে তার অনেক দোষত্রুটি আছে; বিশেষ ক'রে চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের।

[এক] প্রথমতঃ অত্যধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর ক'রে তোলে। পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে অনেক সদ্গুণের সংযোজন হয়, যে-গুলো একক জীবনে সম্ভব নয়। ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মূলে যে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) কাজ করছে, তার অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ অনেক সময় ব্যক্তি-জীবনের সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত করে। বিশেষ ভাবে নৈতিক শিক্ষার (Moral education) ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলতে পারে এবং বর্তমান সমাজে সেই আশংকাই প্রবল।

[দুই] দ্বিতীয়তঃ, জীববিজ্ঞানের (Biology) যে তত্ত্বকে ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে স্থান দেওয়া হ'য়েছে, তাও ভ্রান্ত বা আংশিক প্রয়োগে দুষ্ট। প্রত্যেক মানুষই একক সত্তা এবং স্ব-স্ব স্বাধীন (autonomous) জৈবিক একক (Biological unit) সেটা ঠিক কিন্তু তার গুণ নির্ণয়ে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও যে সব সময় ক্রিয়াশীল একথা তাঁরা অস্বীকার করেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection), সেও যে পরিবেশ-নির্ভর—একথা অস্বীকার করলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভুল সংব্যাখ্যান হবে। তাই শিক্ষার লক্ষ্য শুধু ব্যক্তিকে কেন্দ্র ক'রে নির্ধারিত হ'তে পারে না। তার সমাজ পরিবেশও বিবেচনা করতে হবে।

[তিন] তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে মহৎ ব্যক্তিদের আবির্ভাবের ঘটনাকে উল্লেখ করা হ'য়েছে। মানব সভ্যতা ব্যক্তি জীবনের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে, সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্য হবে তাকে পরিচর্যা করা। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যায়, যে সব মনীষী সমাজ কল্যাণে নিজেদের নিয়োগ করেছেন বা সমাজ অগ্রগতিতে সহায়তা করেছেন, তাঁরা কেউই সমাজের প্রভাবমুক্ত নন। সমাজের অতীত সংস্কৃতির সার্থক অধিকারী হয়েছিলেন বলেই তাঁরা সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁদের সেই সংস্কৃতিবান হওয়ার পেছনে যদি ব্যক্তিতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করতো তা'হলে তা কোন দিনই সম্ভব হ'ত না।

[চার] চতুর্থতঃ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যে জীব জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেই স্বাতন্ত্র্যকে সমাজোপযোগী ব্যক্তি সত্তায় পরিবর্তিত করা। সুতরাং মনোবিদ্যার এই পরীক্ষিত তত্ত্বের বিশুদ্ধ প্রয়োগের মধ্যে ভুল থেকে যায় যদি আমরা তাকে ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। রস্ (Ross) এই স্বতন্ত্র্য সম্বন্ধে বলেছেন "By individuality we have in mind, ideal not yet attained, the attainment of which is the end not only of education but of life." অর্থাৎ এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বলতে এমন কিছুকে বলতে চাইছি যার পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র সমাজ পরিবেশেই সম্ভব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের অনেক দোষত্রুটি আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনকে সৌন্দর্যময় করে তোলা, কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য সে পথে আমাদের বিশেষ সহায়তা করে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে জীবনের বিকাশকে ব্যাহতও করে। তাই চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়।

শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য (Social Aim of Education):

ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের ঠিক বিপরীত এক মতবাদ শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। একেই বলা হয় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মতবাদ। এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা বলেন, মানুষের একক জীবন অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল বলেই সে একদিন সমাজ সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ব্যক্তির সমস্ত রকম নিরাপত্তা (security) সমাজ জীবনের নিরাপত্তার উপর নির্ভর করছে। তাই শিক্ষারও উদ্দেশ্য হবে সমাজ কল্যাণের পথে নিয়োজিত। শিক্ষা এমন হবে যে তার দ্বারা সমাজ জীবন পুষ্ট হবে। সমাজ জীবন পুষ্ট হ'লে ব্যক্তি জীবনও পরিপুষ্ট হবে, তার কারণ ব্যক্তি সমাজেরই একজন। এই মতবাদ জার্মান দার্শনিক হেগেল (Hagel)-এর রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের (Political theory) উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজবিজ্ঞানের (Sociology) উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ্রা বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর এই মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে মানুষ যেদিন থেকে সমাজ গড়ে তুললো, সেদিন থেকেই সমাজের মধ্যে জীবন যাপনের নিয়মাবলীরও সৃষ্টি করেছিল। দল বা সমষ্টির মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এই জাতীয় নিয়মের বা অনুশাসনের প্রয়োজন আছে। ব্যক্তিকে

আয়ত্তে রাখার জন্য প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় কিছু না কিছু এই রকম নিয়ম আছে। তা সে নিয়ম লিখিত বা অলিখিত (formal or informal)—দুই হ'তে পারে। এখন ব্যক্তিরা যাতে ঐ সব নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে, তারও ব্যবস্থা করার দরকার। তার জন্য আবার সমাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা আছে। এদের তাঁরা বলেছেন সমাজ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Means of social control)। শিক্ষা এমনি এক ধরনের সমাজ নিয়ন্ত্রণের উপায় মাত্র (Education is a mean of social control)। শিক্ষার দ্বারা সমাজের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়। আর শিক্ষালয় (Educational institution) গুলো হ'ল সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution)। এই বিশ্লেষণ থেকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ প্রমাণ করতে চাইলেন—শিক্ষা ব্যবস্থার সৃষ্টি হ'য়েছে, সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্য. সুতরাং তার লক্ষ্যও সমাজমুখী হবে।

চরম সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের অনেক ত্রুটি আছে। ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের মত একেও আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

[এক] এই মতবাদে সমাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে, ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে পেছনে। মনোবিদ্যার বিশ্লেষণে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব দেহ-মনের প্রবণতার অধিকারী। তাঁর আশা, আকাঙ্খা, অনুরাগ সব কিছুকে অগ্রাহ্য ক'রে তাকে শিক্ষা দিতে গেলে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শৃঙ্খলা তো আনা দূরের কথা চরম বিশৃঙ্খলা এবং আলোড়ন দেখা দেবে। সুতরাং যে উদ্দেশ্যের পথে আমরা যেতে চাই সেই সমাজ কল্যাণ কোন মতেই সম্ভব হবে না।

[দুই] প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে একই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, ব্যক্তির নিজস্ব সৃজনী প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হবে না। এতে ক'রে সমাজ-অগ্রগতি ব্যাহত হবে।

[তিন] বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই শিক্ষার ভার রাষ্ট্রের (সমাজের) উপর থাকে। হবস্ (Hobbs)-এর লেভিয়াথানে (Laviathan) বর্ণিত সামাজিক চুক্তিতে (Social contract) বিশ্বাস করুন বা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাস করুন, যে-কোন রাষ্ট্রের শিক্ষার লক্ষ্য রাষ্ট্রনায়ক, বা শাসক গোষ্ঠীর মতবাদের দ্বারাই নির্ণীত হবে। তাতে ক'রে সকল ব্যক্তির কল্যাণ হবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয় (Synthesis of Individualistic and Socialistic Aims of Education):

শিক্ষা দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন দেশ এই একটি মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। এথেন্সের নগররাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিতান্ত্রিক। প্রাচীন ভারতে আশ্রমিক শিক্ষাও ছিল বিশেষ ভাবে চরম ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির (Self realization) মাধ্যমে জীবনের উন্নতিসাধনই ছিল প্রধান লক্ষ্য। আবার প্রাচীন স্পার্টা রাষ্ট্রে শিক্ষা ছিল পুরোপুরি ভাবে সমাজতান্ত্রিক। রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য বৃদ্ধির জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল সামরিক বাহিনীর; তাই তাদের শিক্ষা ছিল সৈনিক তৈরীর শিক্ষা। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সমাজতান্ত্রিক ভাবের প্রভাব দেখতে পাই। এমনি ভাবে প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বা সমাজে যেমন এই দুই মতবাদের অস্তিত্ব দেখতে পাই, তেমনি আধুনিক যুগেও তাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষাবিদ এবং দার্শনিকরা (Educational philosophers) এঁদের মধ্যে কোন একটিকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেননি। তাঁরা দু'টিরই চরম ভাবকে বর্জন করেছেন। তার কারণ, চরম ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক ভাবে গড়ে তুলবে আর চরম সমাজতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব গুণাবলীকে বিকশিত হ'তে দেবে না। বর্তমানে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ এই দুই মতবাদের এক সমন্বিত-রূপকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাবিদরা প্রত্যেকে মনে করেন ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশই নেই। আসলে তাদের মধ্যে যে বিরোধ তা আমাদের জীবন সম্পর্কে আংশিক বা অসম্পূর্ণ ধারণা থেকে এসেছে। মানুষের জীবনের দু'টো দিকই বর্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজস্ব চাহিদা, অনুরাগ, বিশেষ প্রেষণা, বিশেষ ক্ষমতা এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে। এটাই তার ব্যক্তিগত দিক। কিন্তু একই সঙ্গে তার জীবনের আর একটা দিকও আছে। কোন ব্যক্তিই একক বা নিঃসঙ্গ নয়। সে সমাজ পরিবেশে জন্মায়, সমাজ পরিবেশে বৃদ্ধি লাভ করে। এটাই তার জীবনের সামাজিকতার দিক ও সেই সমাজের বৃহত্তর অঙ্গের একক। শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য—ব্যক্তি একান্ত নিজস্ব দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য তার সমাজ জীবনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান কালে

শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, তাঁর জীবনের এই দুটি দিকের মধ্যে কোন একটির গুরুত্ব কম নয়। তা ছাড়া তারা পৃথক বা পরস্পরবিরোধী নয়; বরং পরস্পর নির্ভরশীল।

প্রথম ব্যক্তির নিজস্ব দিকের কথা বিচার করা যাক্। ব্যক্তি নিজস্ব চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, অনুরাগ এবং সকল রকম সম্ভাবনা নিয়েই জন্মায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, মানব-শিশু জন্মাবস্থায় একান্তই অসহায়। তার জীবন ধারণের জন্য অন্যের বা বৃহত্তর অর্থে সমাজের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। সমাজ পরিবেশ বা পরিবারের মধ্যে যদি সে আশ্রয় না পায় তাহ'লে তার অস্তিত্ব বজায় রাখা মুস্কিল হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে আমরা যদি ব্যক্তি-কল্যাণ ধরেই নিই, তাহ'লেও বলতে হয় ব্যক্তির এই কল্যাণ সমাজ পরিবেশের বাইরে হ'তে পারে না। জীবধর্মের নিয়মই হ'ল—তার বিকাশ হয় নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায়। বীজের অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য দরকার উপযুক্ত পরিমাণ বায়ু, জল ও তাপ। তেমনই ব্যক্তির জীবনের সম্ভাবনার বিকাশের জন্যও দরকার যথার্থ পরিবেশ। সেই পরিবেশগত উপাদান যোগায় সমাজ। তাই ব্যক্তিজীবন সমাজ থেকে একেবারে আলাদা নয়, তার উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি তার জীবন বিকাশের জন্য আহার্য সংগ্রহ করে সমাজ থেকে—দার্শনিক শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই এই মত প্রকাশ করেছেন। শিক্ষবিদ্ রেমণ্ট (Raymont) বলেছেন—"The isolated individual is a figment of the imagination". রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'শান্তিনিকেতন'-এ বলেছেন "মানুষের কাছে কেবল জগৎ প্রকৃতি নয় সমাজ প্রকৃতি বলে আর একটা আশ্রয় আছে।...মানুষকে একই সঙ্গে দুই ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারই সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। শিক্ষাই সেই সামঞ্জস্য সাধনায় নিযুক্ত।'

আবার সমাজ জীবনের কথা বিচার করলেও আমাদের একই সিদ্ধান্তে আসতে হয়। ব্যক্তি ছাড়া সমাজের কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজ বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির সচেতন এবং সক্রিয় সমবায়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সঙ্গে সক্রিয় মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যুক্ত। একজনের অনুভূতি অপরের মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া সমাজের উন্নতি হ'তে পারে না। ব্যক্তি যত উন্নত হবে সমাজ ততই উন্নত হবে। পৃথিবীর যে-কোন উন্নত সমাজ ব্যক্তিবিচ্ছিন্ন ও সামগ্রিক-প্রচেষ্টারই ফল বলা যেতে

পারে। কৃতিমান্ ব্যক্তি অনেকাংশে সমাজের ও সভ্যতার উন্নতির জন্য দায়ী। যেমন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন প্রভৃতি মনীষী আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কম উন্নতি করেননি। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সমাজ কল্যাণের জন্য ব্যক্তিকল্যাণ একান্ত প্রয়োজন।

সুতরাং উভয় দিক থেকে বিচার ক'রে দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তিজীবন যেমন সমাজের উপর নির্ভরশীল, তেমনই সমাজও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যের কল্যাণ সম্ভব নয়। ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব যদি সমাজ পরিবেশ তার অনুকূল হয়; আর সমাজ উন্নতি তখন সম্ভব যখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে। রাস্ক (Rusk) বলেছেন'—"Individuality is of no value and personality is a meaningless term apart form the social environment in which they are developed and made manifest. Self-realization can be achieved only through social service and the social ideas of real value can come into being only through free individuals who have developed valuable individuality". জীবনের এই দু'দিকের কথা বিবেচনা করে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এমন শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করেছেন যার মধ্যে উভয়ের গুরুত্বকে স্বীকার করা হ'য়েছে। যেমন জন ডিউই বলেছেন, শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির সেই সব সম্ভাবনা বা ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা যার দ্বারা সে পরিবেশকে আয়ত্তে আনতে পারে এবং যার মাধ্যমে তার জীবনের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়—(Education is development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his responsibilities)। তিনি বিশেষভাবে ব্যক্তি (individual) এবং তার দায়িত্ব (responsibilities) সমাজিক দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাঁর শিক্ষাদর্শনে বিশেষ ভাবে চারটি উদ্দেশ্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্য হ'ল—(১) বৃদ্ধিই শিক্ষা, (২) জীবনই শিক্ষা। (৩) সামাজিক যোগ্যতা অর্জনই শিক্ষা এবং (৪) অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাসই শিক্ষা, এ সম্পর্কে আমরা পরে আরও বিশদভাবে আলোচনা করব। এখানে আমরা আধুনিক কালের আর এক শিক্ষবিদের মন্তব্যের উল্লেখ ক'রে এই আলোচনা শেষ করবো তা হ'ল স্যার পার্শিনানের। তিনিও শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এই দুই মতবাদের

সমন্বয় করেছেন। তিনি এই দুই দিকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন মানুষের এমন অনেক আচরণ আছে যাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সামাজিক আচরণ বলতে পারি। কিন্তু সে সব আচরণের মধ্যেও একটা প্রবল অহং সত্তা কাজ করে। আবার, যে ব্যক্তি নিজস্ব একান্ত বৈশিষ্ট্যে পৃথিবী বরেণ্য তাকেও সঠিক ভাবে বুঝতে হ'লে তার সমাজ পরিবেশকে জানা দরকার—(The most clearly 'social' conduct implies a strong 'self' behind it. The most original personality is unintelligible apart from the social medium in which it grows)। এই বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে তিনি যা স্থির করেছেন তাতে ব্যক্তির বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেও সমাজের প্রভাবের কথা একেবারে অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন শিক্ষার উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যার মধ্যে ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারে, —"Educational efforts must be limited to securing for everyone the conditions under which individuality is most completely developed,—that is to enable him to make his original contribution to the variegated whole of human life as full as truely characteristic as his nature permit." নানের এই বক্তব্যের মধ্যে দুটি শব্দ—Conditions এবং individuality বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। তাছাড়া তিনি ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ (complete development) বিকাশের কথাও বলেছেন। Condition বলতে তিনি বিশেষ ভাবে সমাজ পরিবেশের কথাকেই ইঙ্গিত করেছেন সুতরাং তাঁর মতবাদের মধ্যে আমরা সমাজতান্ত্রিক এবং ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয় পরিষ্কার ভাবে দেখতে পাই।

॥ আলোচনা ॥

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬ খ্রীঃ) ও জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য [Indian Education Commission (1964-66) and Aim of National System of Education] : তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ভারতের জাতীয় সরকার চিন্তা করেন যে, দেশের সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা না করলে পরবর্তী শিক্ষা

পরিকল্পনা রচনা করা সম্ভব নয়। তাই ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার ডঃ ডি. এস. কোঠারীর সভাপতিত্বে এক কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এই কমিশন ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টে ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'য়েছে; এই রিপোর্ট ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাঙ্গীন বিপ্লব আনবে আশা করা যায়। তার কারণ, ইতিমধ্যেই ভারত সরকার এক রেজলিউসনের মাধ্যমে এই কমিশনের নির্দেশিত পথে জাতীয় শিক্ষাসম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করেছেন। এই রেজলিউসনে বিশেষ ভাবে উল্লেখ ক'রে বলা হ'য়েছে—"The Government of India is convinced that a radical reconstruction of education on the broadlines recommended by the Education Commission is essential for economic and cultural development of the country for national integration and for realising the ideal of a socialistic pattern of society." সুতরাং ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এই কমিশনের আলোচনা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। এই কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

'Education and National Objectives'—এই অধ্যায়ে রিপোর্টে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে। এখানে বলা হ'য়েছে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করতে হ'লে তাকে প্রকৃত জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার উপযোগী ক'রে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে। আর তা করতে হ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে চতুর্মুখী—(১) জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করা, (২) সামাজিক সংহতি ও জাতীয় সংহতি স্থাপন করা, (৩) আধুনিক ভাবধারার দ্রুত প্রবর্তন এবং (৪) সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। শিক্ষা কমিশন এদের সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কমিশনের সদস্যদের মতে ভারতবর্ষের মত দেশ যেখানে জীবনের সকল দিকের উন্নয়ন একান্ত ভাবে প্রয়োজন সেখানে শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হ'লে, তাকে শুধু জ্ঞানমুখী করলে চলবে না। জাতীয় সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পথে শিক্ষাকে নিয়োজিত করতে হবে। শিক্ষাকে যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে হয়

তার জন্য যে ব্যয় হবে তা তাকে নিজেই বহন করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই শিক্ষার মাধ্যমে যাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা অনেকগুলো উপায়ের কথাও বলেছেন। যেমন—(ক) বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার (Science Education), (খ) কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার সুযোগ দান (Work experience), (গ) প্রয়োগ-মূলক বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ, (ঘ) বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে কৃষি ও শিল্পকেন্দ্রিক বৃত্তি সমূহের। কমিশনে আরো বলা হ'য়েছে জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করা, এবং সমাজ ও জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে সহায়তা করা। সে উদ্দেশ্যে—(১) বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সুযোগের সংগতি আনতে হবে; (২) শিক্ষাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, বাধ্যতামূলক, জনসেবামূলক কাজের সংযোজন করে; (৩) সার্থক ভাবে ভাষানীতি নির্ধারণ করতে হবে এবং (৪) জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে হবে, অতীত কৃষ্টির অনুশীলন ও পুনর্বিন্যাস ক'রে আধুনিক সমাজ জীবনের অধিকারী হতে হ'বে। শিক্ষাকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী করতে হ'লে তার ভিতর আধুনিক ধারার প্রবর্তন করতে হবে এবং তা যাতে ত্বরান্বিত হয় তার চেষ্টা করতে হবে। মানুষের জ্ঞানের প্রসারতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। সব শেষে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমহারে যাতে নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ সকলের মধ্যে জাগ্রত হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিকের সূচনা করেছেন বলা যেতে পারে। বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, এই উদ্দেশ্য একদিকে যেমন দেশের আর্থিক সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি জনগণের মধ্যে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্য বোধ জাগাতেও সচেষ্ট হয়েছেন। এই উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যমুখী অপর দিকে তা মানবীয় গুণ সঞ্চারণে সচেষ্ট। আবার এর মধ্যে আমরা একদিকে পাই পাশ্চাত্য ধারার অতি আধুনিকতার উপর আস্থা, অন্যদিকে ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে সেই আধুনিক ধারার সমন্বয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, এই উদ্দেশ্য আমাদের প্রাচীন কৃষ্টির সঙ্গে আধুনিক গতিবাদী সভ্যতার ভালদিকের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করেছে। তাই শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে প্রায় একমত হ'য়ে **The committee of members of parliament on Educa-**

tion তাদের ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন "development of a national system of education —"...to the which will—

—accelarate the transformation of existing social system into a new one based on the principles of justice, equality, liberty and dignity of the individual, enshrived in the constitution of India.

—Provide adequate and equal opportunity to every child and help him develop his personality to the fullest.

—make the rising generation conscious of the fundamental unity of the country.... ; and

—emphasize science and technology and the cultivation of moral, social and spiritual values."

প্রশ্নাবলী

1. Since the child is destined to live out his life, not as an abstract individual but as a member of a community, we may consistantly define education as the making of good citizen.—Develop the idea of the aim of education keeping the above aspect in mind.

[B. T., C. U, 1951, '54]

Ans : ২৮ হইতে ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Discuss—(a) The general aims of education and (b) The specific aims of India's Secondary Education. [B. T., N. B-U. '68]

Ans : ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা এবং ৪৫ হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. The goal of education is sometimes said to be adjustment. Adjustment may be either to the Nature or the social environment.

[B. T., C. U. 1952]

Ans : ৩৩ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. Critically examine different views regarding the aims of education. What in your opinion should be the ultimate aim of Education ?

[B. T., C. U. '61]

Ans : ২৪ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. Education teaches social adjustment. Consider the definition and attempt a more comprehensive definition of Education.

[B. A., C. U. 75']

Ans : ২৮-৩০ পৃষ্ঠা ; ৪২ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

6. The general aim of education should be to offer the fullest possible scope to individuality, while keeping in view, the claims and needs of society in which every individual citizen must live"—Criticize the present day Secondary Education in West Bengal in the light of the above statement. [C. U., B. T. '46]

Ans : ৩৬ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

7. What do you understand by the individualistic and socialistic aim of Education? Which would you advocate and why?

(C. U., B. A. '09)

Ans : ৩৬ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

8. How can the demands of personal development and the needs of the society be met by education in a democratic society (C. U., B. T. '55)

Ans : ৪২ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

9. Critically examine the modern concept of the development of individuality as the goal of Education. [C. U., B. A. '65]

Ans : ৩৬ হইতে ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

10. "What could education do better than to strengthen men's sense of the worth of individuality, teaching them to esteem the individual life, not as a private possession, but as the only means by which real value can enter the world?"—Discuss (B. T., N. B. U. '63)

Ans : ৪২ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

11. Educational efforts must he limited to securing for everyone the conditions under which individuality is most completely developed. Do you agree? Give ieasons for your answer? (B, T., C. U. '62)

Ans : ৩৬ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

12. Education is the process through which man learns how to live a good life in society as a creative individual.' Analyse this statement and explain its implications regarding the aims of Education.

Ans : ৩৬ হইতে ৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

13. 'A complete and generous education is that which fits a man to perform justly, skilfully and magnanimously, all the offices, both public and private'—Critically examine the statement. (B. T., C. U. 60)

Ans : ২৪ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা ও দর্শন

Education and Philosophy

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষের মনকে একই প্রশ্ন আলোড়িত করেছে—কোথা থেকে এলাম, কেনই বা এলাম। মানুষের মনের প্রথম জিজ্ঞাসা থেকে শুরু হ'য়েছে দর্শন শাস্ত্রের (Philosophy)। দর্শন হ'ল বিশ্ব সম্বন্ধে সামগ্রিক জ্ঞান। ইংরাজী ফিলোজফি (Philosophy) কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল জ্ঞানের আসক্তি (Love for wisdom)। এর উদ্দেশ্য চিরন্তন সত্যের অনুসন্ধান। রেমণ্ট (Raymant) বলেছেন—"Philosophy is an unceasing effort to discover the general truth that lies behind the particular facts to discover also the reality that lies behind appearance." যে ব্যক্তির সকল রকম জ্ঞানের প্রতি আসক্তি আছে এবং যার জ্ঞান পিপাসা কোন দিনই পরিতৃপ্ত হয় না তিনি হলেন দার্শনিক (···who has taste for every short of Knowledge who is curious to learn and never satisfied is a philosopher)। দার্শনিকদের মূল জিজ্ঞাসা হ'ল—জীবন কি? মনুষ্য জীবনের উৎস কোথায়? জীবনের উদ্দেশ্য কি? এবং এ রকম আরো অনেক প্রাথমিক প্রশ্ন। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে এই সকল মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন, তাদের নিজস্ব পরিপক্ক চিন্তার মাধ্যমে। ফলে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। এদের কয়েকটি সম্পর্কে পরে পৃথক ভাবে আলোচনা করা যাবে।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি শিক্ষা হ'ল উদ্দেশ্যমুখী এবং তার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তার উন্নতি সাধন করা। শিশুকে তার বৃহত্তর জীবনের উপযোগী ক'রে তৈরী ক'রে দেওয়াই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষক নিজে যে শুধু কতকগুলো গুণ বা আদর্শের অধিকারী তাই নয়, তিনি তাঁর কাজের ভিতর দিয়ে শিশুদের মধ্যে সেই সব গুণ ও জীবনাদর্শের সঞ্চার করাতে চান। এটাই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষকের কর্তব্য।

শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Education and Philosophy): দর্শন শাস্ত্র এবং শিক্ষা বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে

অনেক মতভেদ আছে। অনেকে বলেন দর্শনশাস্ত্র হ'ল কলা বিভাগের (Art) অন্তর্গত আর শিক্ষা হ'ল বৈজ্ঞানিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও দর্শনের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে দর্শন শাস্ত্রের ভূমিকাই প্রধান। ব্যক্তি-জীবনের কোন মূল্যবোধ জাগ্রত করার দরকার তা দর্শনই নির্ধারণ ক'রে দেবে। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হবে ঐ সব মূল্যবোধ ব্যক্তি-জীবনে কিভাবে জাগ্রত করা যায় তার উপায় ও কৌশল উদ্ভাবন করা। সুতরাং শিক্ষা বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। তাদের সেই সম্পর্ক আছে বিভিন্ন দিক থেকে। যেমন—

[এক] শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হবে দর্শন নির্ধারিত পথে অগ্রসর হওয়া। পূর্বেই বলা হ'য়েছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর জন্মগত আচরণ-ধারার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা। কিন্তু এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের গতি কোন দিকে পরিচালিত হবে, তা নির্ণয় করার জন্য দর্শনের উপর নির্ভর করতে হবে আমাদের। শিক্ষক কোন্ কোন্ জীবনাদর্শের অনুশীলন করবেন, কি পদ্ধতি গ্রহণ করবেন, এই বিকাশের সীমা কতদূর হবে, এ সব কিছু নির্ণয় করবে দর্শনশাস্ত্র। সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে বলা যায় দর্শনশাস্ত্র, শিক্ষা বা বৃহত্তর অর্থে জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে। আর শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হ'ল সেই উদ্দেশ্যে কিভাবে পৌঁছানো যাবে তা নিয়ে আলোচনা করা। শিক্ষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'ল দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা।

[দুই] দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারের একমাত্র মাধ্যমই হ'ল শিক্ষা। দার্শনিকের কাজ হ'ল জীবনের কয়েকটি মূল প্রশ্নের সমাধান করা। তিনি নানা তর্ক-বিতর্কের পর যে সিদ্ধান্তে আসেন, সেই অনুযায়ী জীবনাদর্শ স্থির করেন এবং সেই ভাবে জীবন-যাপনের কথাও চিন্তা করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চান তাঁর নির্বাচিত পথে সমাজের অন্যেরাও জীবন ধারণ করুক। অন্য ব্যক্তির মধ্যে ঐ সব জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধ জাগাতে হ'লে চাই শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারাই তা অন্যের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, শিক্ষা এবং দর্শনের মধ্যে, বিশেষ কোন তফাৎ নেই। একই বিষয়ের দু'টো দিক মাত্র—একটা তাত্ত্বিক দিক অপরটা ব্যবহারিক দিক। রস (Ross) এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"Philosophy and Education are two sides of

a coin : the former is contemplative while the later is the active side."

[তিন] আবার শিক্ষা বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় পৃথিবীর সকল শিক্ষাবিদ্‌রাই দার্শনিক। প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকই শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে তাদের নিজেদের অভিমত প্রকাশ ক'রে গেছেন বা করছেন। শিক্ষার আদর্শ, পদ্ধতি এবং বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উপর তাঁদের দার্শনিক চিন্তার প্রভাব পড়েছে। এর একমাত্র কারণ হ'ল তারা বিশেষ সম্পর্কযুক্ত; একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি চলতে পারে না। দার্শনিকদের আলোচনা তারই প্রমাণ। লক্ (Locke), জন ডিউই (John Dewey), রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই তাঁদের দার্শনিক চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব যে কত তা উপলব্ধি করেছিলেন। এবং তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। যেমন রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার প্রকাশ দেখি তাঁর আশ্রমিক শিক্ষারীতির মধ্যে। জন ডিউই-র দর্শনের প্রকাশ দেখা যায় তাঁর প্রবর্তিত প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project method)-এর মধ্যে।

[চার] সবশেষে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায়, দর্শন শিক্ষার সকল অঙ্গকেই প্রভাবিত করে। দর্শনশাস্ত্র যোগায় শিক্ষার উদ্দেশ্য, দর্শন নির্ধারণ করে পাঠ্যক্রম রচনার রীতি ; দর্শনশাস্ত্র নির্ধারণ করে শিক্ষকের কর্তব্য, দর্শনশাস্ত্র নির্ধারণ করে শিক্ষাদানের পদ্ধতি। এক কথায় শিক্ষাবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের উভয়েরই বিষয়বস্তু এক। তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই। শিক্ষা যতদিন উদ্দেশ্যমুখী বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হবে, ততদিনই তাকে দর্শনশাস্ত্রের উপর নির্ভর করতে হবে সেই উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, দর্শন এবং শিক্ষার মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আরো পরিষ্কার হবে, যদি আমরা শিক্ষার বিভিন্ন দিক এবং শিক্ষার বিভিন্ন দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করি। দর্শনশাস্ত্র জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করে, আর শিক্ষা হ'ল জীবন বিকাশের মাধ্যম, সুতরাং তাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকা খুবই স্বাভাবিক।

শিক্ষার বিভিন্ন দিকে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব (Influence of Philosophy on different aspects of Education)

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি শিক্ষা এবং দর্শন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

দর্শনশাস্ত্র বিশেষ ভাবে শিক্ষাকে নানাদিক থেকে প্রভাবিত করেছে। দর্শনশাস্ত্রের এই প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করলে তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আরো পরিষ্কার হবে। এখানে আমরা সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো।

(১) **শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব (Influence of Philosophy and Aims of Education):** উদ্দেশ্য ছাড়া শিক্ষা কার্য চলতে পারে না। এই উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে না পারলে শিশুকে যথাযথ ভাবে জীবন বিকাশের পথে সাহায্য করা সম্ভব নয়। আবার এটাও আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষার উদ্দেশ্যের দেশ-কাল ও ব্যক্তিভেদে পরিবর্তন হ'য়েছে। তবে এই সব উদ্দেশ্যের যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাদের প্রত্যেকের পেছনে একটা ক'রে জীবনাদর্শ আছে। তাদের প্রত্যেকে এক একটা জীবনাদর্শকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে। আরো পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে প্রত্যেক শিক্ষার উদ্দেশ্যই সমকালীন দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত এবং সেটাই স্বাভাবিক। নান্ (Nunn) বলেছেন—Every scheme of education being, at bottom, a practical philosophy necessarily touches life at every point." দার্শনিকরা তাদের পরিপক্ক চিন্তাধারার দ্বারা জীবনের রহস্যের সমাধানের পথে অগ্রসর হন। পরে তিনি তাঁর চিন্তার ফল হিসেবে জীবনের চরম কতকগুলি মূল্যবোধ স্থির করেন। তিনি চান সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ সকল উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাক। আর এ সব চরম মূল্যবোধ (ultimate values)-গুলোই তখন হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার উদ্দেশ্য (aim of education)—সেই কালের, সেই সমাজের। এমনি ভাবে দার্শনিকদের তত্ত্বচিন্তার দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণীত হয়। শিক্ষার ভিত্তি রচিত হয় আদর্শ জীবন দর্শনের উপর।

(২) **পাঠ্যক্রম নির্ণয়ে দর্শনশাস্ত্রের প্রভাব (Influence of philosoply on Curriculum):** দর্শনশাস্ত্র নির্ধারণ করে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হবে ; আর পাঠ্যক্রম নির্ণয় করে, কিভাবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌছানো যাবে। সাধারণ ভাবে বলা যায় পাঠ্যক্রম হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌছানোর উপায় মাত্র। কিন্তু যেহেতু শিক্ষার আদর্শ দার্শনিক চিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সুতরাং বলা যেতে পারে সেই আদর্শ লাভের উপায়ও তার দ্বারা প্রভাবিত। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা একথা স্বীকার করেন যে, শিক্ষার আদর্শের মত পাঠ্যক্রমও স্থির নয়। দেশ-কাল ও ব্যক্তিভেদে তারও পরিবর্তন হয়, সমকালীন দার্শনিক

চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। ভাববাদী দার্শনিকরা শিক্ষার যেমন আদর্শ নির্ণয় করবেন, সেই অনুযায়ী তাদের পাঠ্যক্রমও হবে। আবার প্রয়োগবাদী দার্শনিকরা তাঁদের শিক্ষাদর্শানুযায়ী পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করবেন। এমনি ভাবে দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা একই সঙ্গে প্রভাবিত হবে শিক্ষার আদর্শ এবং পাঠ্যক্রমে কি কি বিষয় থাকবে তাও নির্ধারিত হবে জীবনের যে মূল্যবোধের উপর শিক্ষাদর্শ প্রতিষ্ঠিত তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার দার্শনিক দিকের গুরুত্বের কথা শিক্ষাবিদ্ ব্রিগস্ (Briggs) বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—"It is here that education seriously needs leaders—leaders who hold a sound comprehensive philosophy of which they can convince others and who can direct its consistent application to the formulation of appropriate curricula."

(৩) **পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণে দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব (Influence of philosophy on Text-book) :** পাঠ্য পুস্তককে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন করতে গেলেও তার পেছনে একটা আদর্শ এবং নীতি থাকার দরকার। পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের সময়, শিক্ষার উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং পাঠ্যক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে একটা মান স্থির করা প্রয়োজন। দর্শনশাস্ত্র এই মান (Standard) নির্ণয়ে সহায়তা করে। ভাল পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে তৎকালীন আদর্শ জীবনদর্শনের (life ideal)। তা যদি না হয় তবে তার দ্বারা আমরা শিক্ষার যে উদ্দেশ্য তা লাভ করতে পারবো না। বিভিন্ন দার্শনিক পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কেও বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে। যেমন প্রকৃতিবাদীদের (Naturalist) মতে পাঠ্য পুস্তকে যথেষ্ট ছবি ও উদাহরণ থাকা উচিত শিশুদের অনুরাগ সৃষ্টির জন্য। ভাববাদীরা (Idealist) পাঠ্য পুস্তকে গ্রন্থকারের নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীর উপর জোর দিয়েছেন। আবার প্রয়োগবাদীরা বিষয়বস্তুর উপর বিশেষ ভাবে জোর দিতে বলেছেন। সুতরাং পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের প্রভাব যথেষ্ট আছে।

(৪) **শিক্ষাপদ্ধতির উপর দর্শন শাস্ত্রের প্রভাব (Influence of Philosophly on method of Teaching) :** শিক্ষাপদ্ধতি বলতে আমরা

বুঝি, যে উপায়ে শিক্ষার লক্ষ্যে পেঁছানো যায়। এই পদ্ধতি বা উপায়, শিক্ষা দর্শন দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত। বর্তমান কালে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির (Methodology) কথা বলি, তার প্রত্যেকটিই দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক দার্শনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতির কথাও বলেছেন। তাই আমরা প্রকৃতিবাদী দার্শনিকদের কাছ থেকে পেয়েছি ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি এবং শিক্ষা-সহায়ক বস্তুর (Teaching aids) ব্যবহার। ভাববাদীদের মতে শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা হ'ল শিশুর উপর শিক্ষকের আদর্শ প্রভাব। এর জন্য তাঁরা বিশেষ ভাবে, আলোচনা, আবৃত্তি ইত্যাদির উপর জোর দিয়েছেন। প্রয়োগবাদীদের মতে পদ্ধতি হওয়া উচিত শিশুর জীবনকেন্দ্রিক। তাই তাঁরা বিশেষ ভাবে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির কথা বলেছেন। এইভাবে বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতি প্রভাবিত হ'য়েছে।

(৫) শিক্ষক ও শিক্ষাদর্শন (Philosophy and Teacher): শিক্ষক হ'লেন শিক্ষাক্ষেত্রের মেরুদণ্ড। সুতরাং তাঁর নিজস্ব জীবনশিক্ষা যে আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই জীবনাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার দরকার। তিনি নিজে যে জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন, তাই শিশুদের অনুপ্রাণিত করবে। শিশুদের মধ্যে যে জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে চাই, সেই জীবনাদর্শকে শিক্ষক নিজে যদি না গ্রহণ করতে পারেন তবে পাঠ্য পুস্তক, পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি কোন কিছু দিয়েই তা সম্ভব হবে না। সুতরাং শিক্ষকের কি কি গুণ থাকবে, তা নির্ধারিত হবে, শিক্ষকাদর্শ বা দর্শন দ্বারা। তাছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব কতটুকু থাকবে তাও নির্ভর করবে, শিক্ষা দর্শনের প্রকৃতির উপর। যেমন ভাববাদীরা বলেছেন শিক্ষক হবেন পরিবারের অভিভাবক স্বরূপ। শিশুরা তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে। প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষক শুধু ছাত্রদের সহায়তা করবেন, বিভিন্ন সমস্যামূলক পরিস্থিতি উপস্থাপন ক'রে। এমনি ভাবে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিত এবং তার দায়িত্ব কি হবে তা স্থিরীকৃত হ'য়েছে দার্শনিকদের দ্বারা।

(৬) দর্শন শাস্ত্র ও শিক্ষাগত মূল্যায়ন (Philosophy and Educational evaluation): শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হ'ল পরিমাপ ক'রে দেখা কতটা আমরা পেয়েছি। অর্থাৎ, বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষকের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে আমরা শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে কতটা অগ্রসর হ'য়েছি। শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই যে সামগ্রিক

পরিমাপ তাকেই আজকাল বলা হ'চ্ছে মূল্যায়ন (Evaluation); পরীক্ষার (Examination) বদলে। এই মূল্যায়ন যেহেতু উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়, সেজন্য তার উপরেও দার্শনিক প্রভাব আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হিসেবে যা স্থির করা হবে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই মূল্যায়ন করার দরকার। এই মূল্যায়নের প্রথম সোপানই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা ও সেই অনুযায়ী প্রশ্নাবলী নির্বাচন করা দরকার। সুতরাং এই পদ্ধতিও দর্শনশাস্ত্র দ্বারা পরোক্ষ-ভাবে প্রভাবিত।

শিক্ষার এই সব দিক ছাড়া আরো নানা দিকে দর্শনের প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এক কথায় বলতে গেলে বলা যেতে পারে, দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার তাত্ত্বিক (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Practical) উভয় দিককেই প্রভাবিত করেছে। দর্শন, জীবন এবং শিক্ষা তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির ও সমাজের উন্নতি সাধন করতে হ'লে সর্ব প্রথম চাই একটা স্থির লক্ষ্য; যে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। দর্শন শাস্ত্র সেই লক্ষ্যের সন্ধান দেয়। ব্যক্তির জীবন বিকাশের গতির দিক নির্ণয় ক'রে দেয় দর্শন। তাই শিক্ষাদর্শন, শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। রাস্ক (Rusk) বলেছেন, জীবনের দর্শন ও শিক্ষার দর্শনকে আজকে আর পৃথক ক'রে ভাবা যায় না। কারণ শিক্ষা এবং জীবন এক সূত্রে গাঁথা।

শিক্ষা দর্শন
Educational Philosophy

শিক্ষা দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ (Schools of Educational Philosophy):

হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের চিন্তাধারার অভিব্যক্তির মাধ্যমে যে বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টি হয়েছে তার সবগুলোর আলোচনা বা উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। জীবন-সংক্রান্ত ও শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক দর্শনই উদ্ভব হ'য়েছে বিভিন্ন যুগে। তবে সাধারণ ভাবে তাদের আলোচনা আমরা কয়েকটা বিশেষ শ্রেণীতে করতে পারি। সাধারণ ভাবে দর্শনে দু'টো পরস্পর বিরোধী মতবাদের উল্লেখ পাই—একটা হ'ল **বস্তুবাদ** বা **প্রকৃতিবাদ** (Naturalism) অপরটা হ'ল **ভাববাদ** বা **আদর্শবাদ** (Idealism), এছাড়া আর এক ধরনের মতবাদও আধুনিক কালে দেখা দিয়েছে। এই মতবাদ উপরোক্ত দু' মতবাদের সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যাকে বলা হয় **প্রয়োগবাদ**

(Pragmatism)। এই তিন ধরনের জীবনদর্শনের সমান্তর ভাবে বিকাশ লাভ করেছে তিন ধরনের শিক্ষাদর্শন (Educational philosophy), একই নামে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা তাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

॥ এক ॥ **ভাববাদী শিক্ষা দর্শন (Idealistic philosophy of Education) :** দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে সব চেয়ে প্রাচীন হ'ল ভাববাদ (idealism)। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা মানুষ এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে এক ভাবমূলক সত্তার (spiritual) অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই মতানুযায়ী, জড় জগৎ ছাড়াও আরও একটা জগৎ আছে, যাকে বলা যেতে পারে ভাব জগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ। এই জগতের অধীশ্বর হ'লেন সর্বজনীন মনের অধিকারী ভগবান। মানুষের মন হ'ল এই সর্বজনীন মনের অংশ মাত্র। মানুষের লক্ষ্য হ'ল এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যেমন চিরন্তন সত্য, তেমনি জীবনের মূল্যবোধ (value of life)-গুলোও চিরন্তন সত্য। তাদের যেমন নতুন ক'রে সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি সময়ের ব্যবধানে তারা মলিন হয় না। তাই ভারতীয় দর্শনে উল্লেখ আছে—'সত্যম্ শিবং সুন্দরম্।'

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের যাঁরা প্রয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে প্লেটো (Plato), কমিনিয়াস্ (Cominius), কাণ্ট (Kant), পেস্টালাৎসী (Pestalozzi), ফ্রয়বেল (Froebel), রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath), গান্ধীজি (Gandhiji)-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায়। ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকরা (Educational idealist) মনে করেন, মানুষ একটা আধ্যাত্মিক সত্তা নিয়ে জন্মায়। শিক্ষার মধ্য দিয়েই হবে তার প্রকৃত আত্মোপলব্ধি যার ফলে সে চিরন্তন সত্য যে ব্রহ্ম তাকে পাওয়ার পথে এগিয়ে যাবে। রাস্ক (Rusk) তাই বলেছেন, শিক্ষার কাজ হবে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সত্তার প্রসার করা (Education is expected to enlarge the boundaries of the spiritual realm)। ভাববাদী দার্শনিকরা শিক্ষার শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দিকের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছেন তা নয়, তার সমস্ত অঙ্গকেই নিজেদের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে ঢেলে সাজিয়েছেন।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে তাঁরা আত্মপোলব্ধির (Self realization) উপর বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছেন। যেহেতু মানুষ আধ্যাত্মিক জীব; তার একটা ভাবমূলক জীবন আছে, সেহেতু শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে তাকে সেই ভাবময় জীবন সম্বন্ধে সচেতন ক'রে দেওয়া। এঁদের মতে শিক্ষা শিশুকে নতুন কিছু দেবে না;

তার মধ্যে অন্তর্নিহিত যে সব সম্ভাবনা আছে, তাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলে ধরতে সহায়তা করবে। যেমন বিবেকানন্দ বলেছেন—"Education is the manifestation of perfection already in man." বিভিন্ন ভাববাদী শিক্ষাবিদের দ্বারা স্থিরীকৃত শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁদের মূল বক্তব্য হ'ল—শিক্ষার লক্ষ্য কোন বাহ্যিক বস্তুকেন্দ্রিক নয়; তা হ'ল আত্মকেন্দ্রিক বা সর্বজনীন যে সত্তা, সর্বজনীন যে মূল্য ও নীতিবোধ, তার অভিমুখী।

শিক্ষার উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাববাদীদের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে ধারণাও অনুরূপ। তাঁরা মনে করেন আধ্যাত্মিক সত্তার (spirit) তিন ধরনের ক্রিয়া আছে—নৈতিক (moral), বৌদ্ধিক (intellectual) এবং নান্দনিক (aesthetic)। মানুষের জীবনপ্রবাহও এই তিন ধারায় প্রবাহিত হয়। এই তিনি ধরনের ক্রিয়ার পেছনে আছে তিন ধরনের চাহিদা। তাহ'ল—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম। ভাববাদীদের মতানুযায়ী পাঠ্যক্রমের সংগঠন হবে ব্যক্তির এই তিন দিকের পরিপন্থী। অর্থাৎ, পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে তার নৈতিক, বৌদ্ধিক এবং ভাবময় জীবনের উন্নতি সাধন করতে হবে।

শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকরা বিশেষ কিছু নতুন কথা বলেননি, যদিও পোস্টলাৎসী এবং ফ্রয়বেল-এর চিন্তাধারার মধ্যে অনেক নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তবুও দার্শনিক বিচারে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই। তার কারণ, তাঁরা পদ্ধতি (Methodology) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ ভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর জোর দিয়েছেন, দর্শনের উপর নয়। দু'জনেই আত্মপ্রচেষ্টাকে (self-activity) শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং খেলার মাধ্যমে শিক্ষার কথা বলেছেন। তাঁদের এই চিন্তাধারা তাঁদের দার্শনিক মতবাদের চেয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত। তাই বলা যেতে পারে ভাববাদী দার্শনিকরা শিক্ষার আদর্শ নির্ণয়ে স্বকীয়তা প্রকাশ করলেও পদ্ধতির ক্ষেত্রে তা পারেননি।

ভাববাদীদের মতে আদর্শ শিক্ষক হবেন তিনি যাঁর পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি হ'য়েছে। প্রাচীন ভারতীয় 'গুরুদের' মতই হবেন তাঁরা আদর্শবাদী। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ছাত্রদের প্রভাবিত করবেন। তাঁর কাজ হবে জ্ঞান বিতরণ করা নয়, ছাত্রদের সহায়ক ও নির্দেশক। তাদের আত্মোপলব্ধিতে তাঁর অভিজ্ঞতা দিয়ে সহায়তা করবেন। এ সম্পর্কে অরবিন্দ যা বলেছেন তার উল্লেখ করলে ভাববাদীদের চিন্তাধারা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যাবে। তিনি বলেছেন—

"The first principle of true teaching is that nothing can be taught. The teacher is not an instructor or task-master, he is a helper and guide.......He does not call forth the knowledge that is within, he only shows him where it lies and how it can be habituated to the surface."

সবশেষে বলা যেতে পারে, ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকরা শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে তাঁদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত করেছেন এবং তাঁদের স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা-ক্ষেত্রে গড়ে তুলেছেন। তাঁদের তত্ত্বকে শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে, শিক্ষা হবে সর্বাঙ্গসুন্দর এবং তা মানুষকে আদর্শ জীবনবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কি আদর্শ, কি পাঠ্যক্রম, কি পদ্ধতি সব দিক থেকেই ভাববাদ (idealism) শিক্ষাকে সংকীর্ণতা মুক্ত ক'রে এক সর্বজনীন আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষা যদি ভাববাদীদের পথে পরিচালিত হয়, তবে তা বিশ্বমানবাত্মা সৃজনে সক্ষম হবে।

॥ দুই ॥ **শিক্ষায় প্রকৃতিবাদ (Naturalism in Education):** ভাববাদী দর্শনের (idealism) বিকল্প হিসেবে আর এক দার্শনিক মতবাদের প্রভাব শিক্ষার উপর দেখা যায় তা হ'ল প্রকৃতিবাদ (naturalism)। এই দার্শনিক মতবাদকে ভাববাদী দর্শনের বিপরীত হিসেবেও বিবেচনা করা যায়। এই চিন্তাধারা অনুযায়ী বিশ্বপ্রকৃতি যা আমরা দেখতে পাই তাই হ'ল বাস্তব আর সবই মিথ্যা। বস্তু জগতের বাইরে আর কিছু নেই। এই মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা দর্শন শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছেন (Naturalism is a philosophical position adopted by those who approach philosophy from purely scientific point of view—Rusk.) এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষ হ'ল বস্তু জগতেরই অংশ বিশেষ। প্রকৃতিবাদের প্রবক্তারা তিন দিক থেকে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেছেন, ফলে তিন ধরনের প্রকৃতিবাদের সৃষ্টি হয়েছে, একদল দার্শনিক বিশেষ ভাবে জড় প্রকৃতির (physical nature) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁরা মনে করেন মানুষের জীবন ঠিক জড় প্রকৃতির নিয়মেই পরিচালিত হয়। একেই বলা হয় জড় প্রকৃতিবাদ বা বস্তুবাদ (physical naturalism or materialism)। অপর একদল দার্শনিক মানুষকে যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেছেন। আত্মা বলতে কিছু নেই। মন হ'ল জড় জগতেরই অংশ। জড় জগত যেমন যান্ত্রিক নিয়ম দ্বারা

নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের মন ও তার বিকাশ যান্ত্রিক নিয়ম মেনে চলে। এই মতবাদকে বলা হয় যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদ (mechanical naturalism)। আর এক ধরনের প্রকৃতিবাদ আছে যেখানে মানুষকে জৈবিক সত্তা হিসেবে কল্পনা করা হ'য়েছে। এরা মানুষকে ইতর প্রাণীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। এঁরা মনে করেন ইতর প্রাণীদের মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য আছে মানুষের মধ্যেও সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। সুতরাং তাকে বুঝতে হ'লে অভিব্যক্তির নিম্নস্তরের সমজাতীয় প্রাণীর প্রকৃতি অনুশীলন করতে হবে। এই মতবাদকে বলা হয় জৈবিক প্রকৃতিবাদ (priological naturalism)।

এই প্রকৃতিবাদও শিক্ষাক্ষেত্রকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই দার্শনিক চিন্তার প্রয়োগ প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শন (Educational naturalism) নামে পরিচিত। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অ্যারিস্টটল (Aristotle), হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer), ফ্রয়বেল (Froebel), পেস্টালাৎসী (Pestalozzi) বিভিন্ন সময়ে তাদের শিক্ষা চিন্তায় এই মতবাদের আংশিক প্রয়োগ করেছেন। তবে রুশো হ'লেন এ বিষয়ে চরমপন্থী। তিনি মতবাদকে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেন এবং পরবর্তী যুগে তার মতবাদ অনুসরণ ক'রে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করেন। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বিভিন্ন প্রকৃতিবাদী শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে বিভিন্ন আদর্শের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে তাঁদের মূল কথা হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য হবে আত্ম-প্রকাশনা (self-expression) ও আত্ম-সংরক্ষণে (self-preservation) সহায়তা করা। শিশু তার নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে—এটাই হ'ল শিক্ষার বড় কথা। সমাজের কোন ছাপ বা প্রভাব তার উপর থাকবে না। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্ নান্‌ও বলেছেন জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণতা আনা। আর তাই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য (the proper goal of human life is perfection of the individual)। প্রকৃতিবাদীদের এই মতবাদ খুবই স্থূল। এঁরা জীবনের উন্নততর মূল্যবোধ বা ভাবমূলক দিকের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেননি। মানুষকে জড় প্রকৃতি, বা অন্যান্য যে-কোন জীবের সমপর্যায়ে বিবেচনা করেছেন। শিশুর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের দিককে এঁরা একেবারে অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে মানুষকে যান্ত্রিক এবং ইতর পশুর সমপর্যায়ে বিবেচনা করেছেন।

প্রকৃতিবাদীরা কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের পক্ষপাতী নন। প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব দাবী ও ক্ষমতা আছে, তার পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার। সে তার প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রম ঠিক করে নেবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে প্রকৃতির (Physical environment) কাছ থেকে শিখবে। তারা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের কথাই বিশেষ ভাবে বলেছেন, যেমন প্রকৃতি পরিচয় (Nature study), কৃষি বিজ্ঞান (Agriculture), উদ্যান বিদ্যা (Gardening) ইত্যাদি। এই মতানুযায়ী শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে বিষয় নির্বাচন করার জন্য। কোন নির্দিষ্ট ধরাবাঁধা পাঠ্যক্রম ও বিষয়ের গণ্ডীর মধ্যে তাদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না।

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁরা বলেন, শিক্ষক বা পাঠ্য পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন নেই। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কার্যের (Direct method of teaching) কোন প্রয়োজন নেই। শিশুকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখতে দিতে হবে। তাঁরা হাতে কলমে শিক্ষার (Learning by doing) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রুশো বলেছেন—"Give your pupil no verbal lesson"। এছাড়া কোন কোন প্রকৃতিবাদী শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষা (play-way) দানের কথা বলেছেন। বিদ্যালয় পরিবেশকেও তাঁরা যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করার কথা বলেছেন এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন।

শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কেও প্রকৃতিবাদীরা নতুন কথা বলেছেন। তাঁদের মতে শিক্ষকের ভূমিকা হবে দর্শকের। তিনি পেছনে থেকে পর্যবেক্ষণ করবেন মাত্র। তিনি কোন বিতরণ করবেন না, বা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিশুকে প্রভাবিত করবেন না; শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবেন মাত্র। শিক্ষক যথাযোগ্য সুযোগ ক'রে, পরিস্থিতির উদ্ভব ক'রে এমন এক পরিবেশ রচনা করবেন যার মধ্যে শিশু স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা লাভ করবে।

এই আলোচনা থেকে বলা যায় প্রকৃতিবাদীরা শিশুকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। বিদ্যালয়, শিক্ষক, পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম—এদের গুরুত্ব অনেক কম তার কাছে। এক কথায় বলা যেতে পারে শিক্ষাক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিক ধারা এনেছেন প্রকৃতিবাদীরা। শিশুর নিজস্ব চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতা তাঁদের কাছে প্রধান। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতি, পাঠ্যক্রম ইত্যাদির কোন দাম নেই এই শিক্ষাদর্শনে। আধুনিক শিক্ষায় যে নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার অনেক কিছুই আমরা পেয়েছি প্রকৃতিবাদী দর্শন থেকে।

॥ তিন ॥ **প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শন (Pragmatic Philosophy of Education) :** প্রয়োগবাদকে আমরা আধুনিকতম দর্শন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আমেরিকার নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ক্ষমতা রক্ষা করেই এই চিন্তাধারার উদ্ভব হ'য়েছে। প্রয়োগবাদের মূল কথা হ'ল উপযোগিতা (Utility)। প্রয়োগবাদীরা মনে করেন মানুষ নিজেই নিজের জীবনাদর্শ গড়ে তোলে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে। জীবনের কোন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থির এমন মান নেই যা সকল কালের জন্য প্রযোজ্য। মানুষই সত্যের স্রষ্টা। যে অভিজ্ঞতা বা ধারণা ব্যবহারিক প্রয়োগে ভাল, তাই সত্য, তাই গ্রহণযোগ্য। প্রয়োগবাদে পরীক্ষণের (Experimentation) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। জন ডিউই (John Dewey), কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrik), উইলিয়ম জেমস্ (William James) প্রভৃতি দার্শনিক এই মতমাদের সমর্থক। জন ডিউই প্রয়োগবাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—"Philosophy in order to be philosophy, should have meaning and utility in the solution of human problems. It should be practical and useful in influencing the conduct of life and not a passive enqniry or contemplation." প্রয়োগবাদী আরো বিশ্বাস করেন যে, মানুষের জীবনের বিকাশ, পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় অভিযোজনের মাধ্যমে সাধিত হয়। ব্যক্তিত্ব (Personality) বিকাশের এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর তাঁরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রয়োগবাদের গণতান্ত্রিক জীবনধারার (Democratic way of life) উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। প্রয়োগবাদীরা গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিশ্বাসী।

প্রয়োগবাদের মূল কথা হ'ল এই দর্শনে মানুষের জীবনকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হ'য়েছে। এখন, বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার একটা ব্যবহারিক দিক বা প্রয়োজনের দিক আছে। সুতরাং লক্ষ্য করা যায়, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিশেষ ভাবে প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত। প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কথা বলেননি। তাঁদের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জীবনের নতুন মূল্যবোধ (values) সৃষ্টি করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুকে সেই সব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক কর্মে নিয়োগ করা যার মাধ্যমে তার জীবনের মূল্যবোধ জাগ্রত হবে। পাঠ্যক্রম সম্পর্কেও তাঁরা সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম নির্ধারণ করেননি। তাঁরা পাঠ্যক্রমের কয়েকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের

কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—(১) পাঠ্যক্রম হবে সুসামঞ্জস একটি একক (intregated unit), অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়কে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। জ্ঞানের বিষয়গুলোকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করতে হবে। (২) পাঠ্যক্রম হবে পরিবর্তনশীল (flexible); অর্থাৎ শিশুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, সমাজের চাহিদা সমস্ত কিছু বিবেচনা করে পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে। কোন পাঠ্যক্রম বিশেষ কাল বা সমাজের জন্য স্থির নয়। শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা নূতন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষা হবে প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে। তাঁরা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার (Activity-centred Education) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ব্যক্তির সক্রিয়তার মাধ্যমেই তার শিক্ষা হবে। আধুনিক কালে আমরা যে প্রোজেক্ট মেথড (Project method)-এর কথা বলি তা প্রয়োগবাদীদের দান। শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রয়োগবাদীরা বলছেন তাঁর কাজ হবে শিক্ষার্থীর জন্য আদর্শ জীবন পরিবেশ সৃষ্টি করা। তিনি ঐ আদর্শ জীবন পারবেশের মধ্যে শিশুকে স্থাপন করবেন; এবং শিশু প্রত্যক্ষ অভিযোজনের মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো আয়ত্ত করবে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে, প্রয়োগবাদী দর্শন শিক্ষাক্ষেত্রকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। শিশুর নিজস্ব চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতা ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক'রে প্রকৃতিবাদীক আরো দৃঢ়তর করেছে এই দার্শনিক মতবাদ। একই সঙ্গে গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়ে প্রয়োগবাদ সমাজের প্রয়োজনকে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছে। তাহাড়া শিক্ষা পদ্ধতির (Teaching method) ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক ভাবধারার প্রবর্তন ক'রে, প্রয়োগবাদ এক নতুন এবং সার্থক আন্দোলন গড়ে তুলেছে। কিন্তু প্রয়োগবাদের মূলক্রটি হ'ল এখানে। বিশেষ ভাবে জীবনের ব্যবহারিক দিকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন ও জীবনের যে কৃষ্টিগত দিক একটা আছে তার কথা প্রয়োগবাদীরা একেবারে অস্বীকার ক'রে গেছেন।

আধুনিক শিক্ষা ও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয় (Modern Education and the Eclectic Philosophy):

এ পর্যন্ত আমরা পৃথক পৃথক ভাবে বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এদের বিশেষ কোন একটির দ্বারা সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাবিত নয়। আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে সকল রকম শিক্ষাদর্শনই

প্রভাবিত করেছে। অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে আমরা বিভিন্ন শিক্ষাদর্শনের এক সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। বর্তমানে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে ভাববাদী শিক্ষা দর্শনের দ্বারা ; শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ এসেছে প্রকৃতিবাদ থেকে ; আর তার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে বিশেষ ভাবে প্রয়োগবাদ। এক কথায় বলতে গেলে বলা যায়—আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—তার সমন্বয়িত শিক্ষাদর্শন। এ সম্পর্কে আমরা "শিক্ষায় আধুনিক ভাবধারা", অংশে বিশদ ভাবে আলোচনা করবো।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the relation between philosophy and education and explain how different philosophies has influence education from different points.

Ans : ৫০ হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Explain the idealistic philosophy of Education and its contribution to modern educational concept.

Ans : ৫৬ হইতে ৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Explain naturalism. Discuss the effects of this philosophy on education .

Ans : ৫৯ হইতে ৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. 'Education is life.'—Discuss the statement with special reference to pragmatic philosophy.

Ans : ৬২ হইতে ৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. Justify the statement that Education and Philosophy are intimately related.

Ans : ৫০ হইতে ৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। [B T., N. B. U. '6৭]

শিক্ষার সংস্থা (১)

Agencies of Education

সমাজ জীবনের বিকাশ, উন্নয়ন এবং ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে ব্যক্তি সত্তার নিয়ন্ত্রণের উপর। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু না কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আছে যা প্রত্যেক ব্যক্তিকে মেনে চলতে হয়। সমাজ জীবনের নিয়ম আদর্শ মেনে চলার মাধ্যমেই ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের বিকাশ হয়। সমাজ জীবনের নিয়ম আদর্শে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সমাজের মধ্যেই কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution)। এই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তি আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে সমাজ নির্ণীত পথে পরিচালিত করা। শিক্ষা (Education) সমাজে এমনি এক দায়িত্ব পালন করে। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু না কিছু রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা আছে, যা সে তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চায়। তাছাড়া যে সব অভিজ্ঞতা সে দুঃসাধ্য পথে অর্জন করেছে তাও তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য সহজলভ্য করতে চায়। এই সব দিক থেকেই শিক্ষার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আর এই সব কারণেই প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় তার সৃষ্টির ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে হয়। এই ধরনের সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social institution) যারা সমাজের উন্নত সংস্কার ও কৃষ্টির পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারণের দায়িত্ব নিচ্ছে তাদের আমরা বলছি **শিক্ষার সংস্থা** (Agencies of Education)।

এই ধরনের শিক্ষার সংস্থাকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ ক'রে বিচার করতে পারি। সমাজের মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যারা প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ, তাদের উদ্দেশ্য, উপযোগিতা এবং কর্মপরিকল্পনা সব দিক থেকে তারা পূর্ব পরিকল্পিত বিশেষ রীতিতে শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হ'ল শিক্ষাদান। এদের বলা হয় শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা (Formal Agencies of Education)। কখন, কোথায় কি পদ্ধতিতে, কাকে, শিক্ষা দেওয়া হ'বে এই সব প্রতিষ্ঠানে তা সবই নিয়ন্ত্রণ করা এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়মিত তদারকও করা হয়। এই ধরনের

সংস্থার নাম করতে গেলে বিশেষ ভাবে, শিক্ষালয় (School) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institutions), রাষ্ট্র (State), বিভিন্ন আমোদ প্রমোদের কেন্দ্র (Organised recreational centres), সংগ্রহশালা (Museum), গ্রন্থাগার (Libraries) এবং চিত্র-সংগ্রহশালা (Art gallaries) ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

এছাড়া কিছু কিছু সংস্থা আছে যেগুলো স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমাজের মধ্যে গড়ে উঠেছে এবং আবার কোন ক্ষেত্রে তারা আবার স্বাভাবিক ভাবে চলে গেছে। তাদের কোন নিয়ম শৃঙ্খলার বন্ধন নেই। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাদান নয়। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে তারা সমাজের ব্যক্তিদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিশুরা জীবন ধারণের স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই একান্ত অবচেতনে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় কৌশলই এই সব প্রতিষ্ঠানের কাছে আয়ত্ত করে। এদের বলা যেতে পারে শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা (Informal agencies of Education)। যেমন—বৃহত্তর সমাজ জীবন, পরিবার এবং অন্যান্য যুব সংস্থা।

শিক্ষার বিভিন্ন সংস্থাকে আমরা অন্য একদিক থেকেও শিক্ষার সংস্থার (Educational Agencies) শ্রেণী বিভাগ করতে পারি। এই শ্রেণী বিভাগ ব্যক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার (interaction of persons) উপর নির্ভরশীল। যে সব সংস্থায় শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে হ'য়ে থাকে তাকে আমরা সক্রিয় সংস্থা (Active Agencies of Education) বলতে পারি। এই সব সংস্থায় শিক্ষা দ্বিমুখী। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ে পরস্পরকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ এই সব সংস্থায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। একজন আর এক জনের চেয়ে বেশী কি কম, তারতম্যের তফাৎ মাত্র। পরিবার (Family), রাষ্ট্র (State), ধর্মীয় সংস্থা (Religious Organisation) এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্থা (Social organisation)-কে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

কিন্তু বর্তমান জগতে এমন অনেক সংস্থা শিক্ষার কাজে ব্যাপৃত আছে যেখানে পারস্পরিক ক্রিয়া একমুখী মাত্র। অর্থাৎ সেখানে একপক্ষ অপর পক্ষকে প্রভাবিত করে মাত্র, তার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ এক পক্ষের সঙ্গে অপর পক্ষের আন্তরিক কোন যোগাযোগ নেই। যদিও এই সব প্রতিষ্ঠান সমাজের নিয়ন্ত্রাধীন তবুও ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তাদের কোন সুযোগ নেই। যেমন, বেতার সূচী, সংবাদপত্র, সিনেমা ইত্যাদি।

এই সব শিক্ষা সংস্থা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, যে-কোন ধরনের সংস্থা তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তা কোন সময়ে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যক্তির শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্থার প্রভাব বিশেষ ভাবে ব্যক্তির উপর আসে এবং এদের প্রত্যেকের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। যেমন, শৈশবের শিক্ষা বিশেষ ভাবে পরিবার দ্বারা প্রভাবিত হয়, শৈশবের শিক্ষার দায়িত্ব বিশেষ ভাবে শিক্ষালয়ের উপর ন্যস্ত থাকে। আবার কৈশোর এবং যৌবনকালে ব্যক্তির শিক্ষা হয় বিভিন্ন সামাজিক সঙ্ঘের (Social organisation group) প্রভাবে। প্রাপ্তবয়স কালে শিক্ষা বিশেষ ভাবে সংবাদপত্র এবং রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর শেষ বয়সের শিক্ষা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক ধরনের সংস্থাই তার নিজস্ব ধারায় ব্যক্তির জন্মগ্রহণের পর থেকে জীবনব্যাপী শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং যে কোন শিক্ষা তা যদি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি চায় তবে তাকে সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Educational Agencies) সাহায্য নেওয়ার দরকার। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ ভাবে কয়েকটার সম্পর্কে আমরা এখানে অলোচনা করবো। যেমন—শিক্ষালয় (School), পরিবার বা গৃহ (Family or Home), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution) ইত্যাদি।

শিক্ষালয় (School) :

প্রত্যক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষালয়ের স্থান সর্বপ্রথম। বর্তমানে যে-কোন সভ্য সমাজেই শিক্ষালয়ের অস্তিত্বের কথাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা যদি সভ্য মানব সমাজের বিবর্তনের ধারা অনুশীলন এবং যদি মানব সভ্যতার বিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করি তাহ'লে দেখবো যে শিক্ষালয় শ্রেণীভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকল সমাজব্যবস্থার মধ্যে বর্তমান ছিল না। মানব সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে জীবনযাত্রার কলা কৌশল যখন ছিল খুবই সহজ এবং সাধারণ, তখন শিক্ষালয়ের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই না। জীবনের প্রয়োজন ছিল তখন খুব সাধারণ কয়েকটি চাহিদা (Basic need)-কেন্দ্রিক। তার এই চাহিদা হ'ল—খাদ্য এবং আশ্রয় সংরক্ষণকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। আর শিশুদের যেটুকু কৌশল আয়ত্ত করতে হ'ত তা সাধারণতঃ এই খাদ্যসংগ্রহ ও আশ্রয়ের সংস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। আর এই উভয় দিক থেকে প্রকৃতিও ছিলেন অফুরন্ত এবং পর্যাপ্ত। ফলে এই সব কৌশল ছোট ছোট শিশুদের

শিক্ষা দেওয়ার জন্য গতানুগতিক কোন শিক্ষালয় প্রয়োজন ছিল না। 'কলা-কৌশল বর্জিত' সেই জীবনের প্রয়োজনীয় আচরণ-ধারা আয়ত্তের জন্য পারিবারিক জীবন যাপনই ছিল শিশুর কাছে যথেষ্ট। শিশুদের শিক্ষা হ'ত পরিবারের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাধ্যমে। সে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে থাকতে থাকতে অনুকরণের দ্বারা (imitation) জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কৌশল শিক্ষা করতো। সুতরাং প্রাথমিক এই সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষাদান বা শিক্ষাগ্রহণের রীতি ছিল, কিন্তু শিক্ষালয়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এটাই হ'ল তার বড় বৈশিষ্ট্য। সমগ্র পরিবার জীবনই ছিল শিক্ষালয়।

কিন্তু ধীরে ধীরে জীবনযাত্রার মান উন্নত এবং জটিল হ'তে লাগলো। সমাজ জীবনেও জটিলতা দেখা দিল। এই জীবনের জটিলতর পরিস্থিতির যথাযথ ভাবে মোকাবিলার জন্য নতুন নতুন কৌশলের উদ্ভাবন প্রয়োজন হ'ল। আর সেই সব জটিল কষ্টার্জিত কৌশলকে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চারিত করবার জন্য চাই যথেষ্ট শিক্ষা; প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা। ফলে ধীরে ধীরে সমাজের মধ্যেই এই ব্যবস্থার সূত্রপাত হ'ল। শিশুরা যখন বিশেষ একটা বয়ক্রমে উপনীত হ'ত তখন তাদের সমাজ জীবনের বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করার আগে কিছু দিনের প্রশিক্ষণ (Training) বা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ত। একে বলা হ'ত উপনয়ন (Initiation ceremony)। এই ধরনের প্রথা এখনও আমাদের দেশে বিশেষ এক শ্রেণীতে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ, এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য হ'ল শিশুকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী করে তৈরী ক'রে দেওয়া এবং তাকে সকল দায়িত্ব অর্পণ করা। কিন্তু এই অনুষ্ঠান হ'ল সমাজ বা পরিবারের মধ্যে। এরজন্য কোন পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে এই অনুষ্ঠানের ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনা করার জন্য এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজের মধ্যে তাদের বলা হ'ত পুরোহিত (Priest)। এমনি ভাবে সমাজ বিবর্তনের ধারায় শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানের ও শিক্ষারীতির কিছু বিবর্তন হ'ল। অর্থাৎ, এই পর্যায়ের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিক্ষাদানের জন্য কোন পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল না। গৃহ পরিবেশ বা কোন ধর্মীয় সংস্থাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু শিক্ষা দানের জন্য একশ্রেণীর বিশেষজ্ঞ লোকের সৃষ্টি হ'য়েছিল। অর্থাৎ শিক্ষা পূর্ব স্তরের মত আর informal রইল না। শিক্ষক বা পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টির ফলে formal হ'ল।

ক্রমে বিকাশের ধারায় ঐ সব পুরোহিত শ্রেণীকে কেন্দ্র ক'রে ছোট ছোট

প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হ'তে লাগলো। মানুষ যখন উপলব্ধি করলো যে, জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাকে এত সহজ ভাবে স্বল্পব্যাপী উপনয়ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবীনদের মধ্যে সঞ্চার করা সম্ভব নয় তখন যে আরও দীর্ঘতর সময়ের শিক্ষার কথা চিন্তা করলো। অন্য একদিক থেকে ভাষা ও লিপির আবিষ্কার—তাকে এই পথে অনেক সাহায্য করলো। ধীরে ধীরে বিশেষজ্ঞ পুরোহিতকে কেন্দ্র ক'রে সমাজ অঙ্গের বাইরে পৃথক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো এবং এমনি ভাবেই ক্রমে ক্রমে শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হ'ল। আর পুরোহিতরা ক্রমে শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হ'তে লাগলেন।

প্রত্যেক প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই শিক্ষালয়ের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। চীন, ভারত, মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস এবং রোম প্রত্যেকের প্রাচীনতর সভ্যতায় শিক্ষালয়ের অস্তিত্ব। কিন্তু এই সব বিদ্যালয়ে ভাষা, দর্শন ইত্যাদি কৃষ্টিমূলক দিকেরই আলোচনা হ'ত। ফলে এই শিক্ষা বিশেষ ভাবে যাজকশ্রেণী *এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে শিক্ষালয়ের শিক্ষার এমন কোন বিধি নিষেধ নেই। ফলে অতীতের শিক্ষা॰য়ে যে রীতি তার সঙ্গে বর্তমানের কোন মিল নেই। যেমন মিল নেই তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের। ইংরেজীতে (School) কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ Skhole থেকে, যার অর্থ হ'ল—অবসর-বিনোদনের সময়কালীন তত্ত্বমূলক আলোচনা। ক্রমে এই শব্দকে ব্যবহার করা হ'তে লাগলো যে স্থানে বসে আলোচনা করা হ'ত সেই স্থানকে বুঝানোর জন্য। আর এই অর্থেই বর্তমানে এই শব্দটি ইংরজীতে ব্যবহার করা হ'লেও অবসর-কালীন আলোচনার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ততা আছে তা বর্তমান শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। বরং বর্তমান শিক্ষালয়ে শৃঙ্খলা ও অন্যান্য বিধি-নিষেধের উপর বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হয়। তাই বর্তমানে শিক্ষালয় কি তা বলতে গেলে ক্যাটার গুড-এর শিক্ষা অভিধানের সংজ্ঞা উল্লেখ করতে হয়—শিক্ষালয় হ'ল এক নির্দিষ্ট আসবাব-পত্রযুক্ত গৃহে, বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে বিশেষ নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠরত শিক্ষার্থীর দল, যেখানে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক দ্বারা পাঠ গ্রহণ করেন এবং এছাড়া কিছু সাধারণ সাহায্যকারী কর্মচারীও থাকেন। [School is an organised group of pupil persuing defined studies at defined levels and receiving instruction from one or more teachers frequently with the addition of other employers and such as principal, various supervisors of instruction and a staff of maintanance workers usually

housed in a simple building or a group of building]. তাহ'লে বর্তমানে শিক্ষালয়ের এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে থাকার প্রয়োজন—(১) নির্দিষ্ট গৃহ, (২) নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী, (৩) ছাত্র বা ছাত্রী, (৪) শিক্ষক, (৫) আসবাব পত্র ও (৬) অন্যান্য সহকারী কর্মচারী।

শিক্ষালয়ের কাজ (Functions of Schools)

শিক্ষালয়ের বিকাশের ধারা অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই সমাজ জীবনের গতিকে সক্রিয় রাখার যে সব সামাজিক শর্ত বা অনুশাসন করছে, সেগুলো একই ভাবে শিক্ষালয় সৃষ্টির পেছনেও ক্রিয়াশীল। মনুষ্য সমাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পেছনে দুটো নীতি সর্বদা ক্রিয়াশীল। তার প্রথমটি হ'ল—মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের প্রয়াস (Preservation of cultural heritage), এবং দ্বিতীয়টি হ'ল অভিজ্ঞতার সঞ্চালন (Transferance of cultural heritage)। দীর্ঘদিনের সাধনায় অনেক ওঠা নামার মধ্য দিয়ে সে যে সব অভিজ্ঞতা এবং আচরণ-ধারা অর্জন করেছে এবং সঞ্চয় করছে যা সে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছে এবং যা কিছু সে নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছে, সবই সে দিয়ে যেতে চায় তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। এই প্রক্রিয়াকে সমাজবিদ্‌রা (Sociologists) নাম দিয়েছেন সংস্কারের সঞ্চরণ (Transmission of cultural heritage)। এই উভয় প্রক্রিয়া মানুষকে সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে চিরদিন। এই উভয় প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মানব সমাজ শিক্ষালয়রূপ শিক্ষা সংস্থা গড়ে তুলতে বাধ্য হ'য়েছে। তাই শিক্ষালয়ের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে, প্রথমেই এই দুই শ্রেণীর কাজের উল্লেখ করতে হয়।

[এক] শিক্ষালয়ের কাজ : অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ (Function of School : Preservation of cultural heritage) : প্রাচীনকালে শিক্ষালয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল সমাজের আচার আচরণ ও রীতিনীতির সংরক্ষণ। অনুশীলনের দ্বারা শিক্ষালয়ের মাধ্যমে, আমরা চাই সমাজ জীবনের যা কিছু ভাল তাকে ধরে রাখতে ; আর তা সমাজ জীবনের অবিচ্ছিন্নতাকে বজায় রাখার জন্যই। সমাজে বয়স্ক লোকেরা জীবনের প্রত্যক্ষ পরিস্থিতিতে যে সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, বা যে সব অভিজ্ঞতা তারা পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছে, শিক্ষালয়ের প্রধান কর্তব্য হবে তা

সংরক্ষণ করা। এই সংরক্ষণ পুঁথির মাধ্যমেই হ'তে পারে, শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার মাধ্যমে হ'তে পারে বা শিক্ষকদের আচরণের মধ্যেও হ'তে পারে। এই সব অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যবস্থা যদি সমাজ না করতে পারে, তাহ'লে প্রত্যেক মানুষকেই তার জীবন প্রস্তর যুগ থেকে শুরু করতে হবে। মানব সভ্যতার যে অগ্রগতি হ'য়েছে তার কোন মূল্যই থাকবে না। তাই জীবনের পথে সহজ ভাবে এগিয়ে চলার জন্য, মানব সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, ব্যক্তি জীবনকে সমৃদ্ধশালী ক'রে, সমাজ জীবনের সার্থক উত্তরসূরী ক'রে গড়ে তোলার জন্য চাই অতীত সংস্কারের সংরক্ষণ। শিক্ষালয় সমাজের এই দায়িত্ব বিশেষ ভাবে নিজের উপর নিয়েছে। তাই শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হ'ল—অতীত সংস্কারের সংরক্ষণ (Preservation of Cultural Heritage)। ব্রাউন (Brown) ঐ সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে বলেছেন—"The pıeservation of cultural heritage is the primary function of education carried through the informal agencies of primitive society ; it still is and must remain a major function of modern school."

[দুই] শিক্ষালয়ের কাজ : অতীত সংস্কারের সঞ্চালন (Function of Education : Transmission of cultural heritage) : পূর্বোক্ত কাজের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত বা তার ব্যবহারিক দিক হিসেবে শিক্ষালয়ের দ্বিতীয় কাজের কথা উল্লেখ করা যায়। শিক্ষালয় যে শুধুমাত্র অতীত সংস্কার বা কৃষ্টির ধারক হবে তাই নয়, ঐ সব অভিজ্ঞতার যথাযথ সঞ্চালনের ভার-ও তাকে নিতে হবে। সমাজ জীবনের অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে হ'লে শিক্ষালয়ের অন্তর্গত শিশুদের মধ্যে অনুশীলনের দ্বারা সমাজের অভিজ্ঞতাকে যথাযথ ভাবে সঞ্চালিত করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিক থেকে সমাজ জীবনে যেমন আসবে সমতা, অন্যদিক থেকে বৈচিত্র্যও দেখা দেবে সমাজ জীবনে। শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় দেখেছি শিক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাই। শিক্ষালয় এই দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে পালন করে। এই কাজকে বলা হয় অতীত সংস্কারের সঞ্চালন (Transmission of cultural heritage)।

[তিন] শিক্ষালয়ের কাজ : গৃহ ও সমাজ পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন (Function of school : to develop relation between

home-life and social-life): পূর্বোক্ত দু'টো কাজ ছাড়াও শিক্ষালয়কে একটা দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে, সমাজ-জীবনে তার নিজের অবস্থানের কথা বিচার করে। শিশুরা গৃহ-পরিবেশ (Home environment) থেকে শিক্ষালয়ে আসে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের স্নেহময় আশ্রয়ে তারা বড় হ'তে থাকে। তারপর একদিন তারা আসে শিক্ষালয়ে। সেখানের পাঠ ও প্রশিক্ষণ (Training) শেষ করে তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করে। অর্থাৎ, জীবন পরিক্রমার পথে তিনটে ধাপ—(১) দায়িত্বহীন, পরনির্ভরশীল, স্নেহময় গৃহপরিবেশ, (২) শিক্ষালয়ে বাস, ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী প্রশিক্ষণ লাভ এবং সমাজ জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে গভীর পরিচিতি এবং (৩) কঠোর দায়িত্বপূর্ণ কর্মময় সমাজ জীবন। সুতরাং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালয় মানুষের জীবনের এমন পর্যায়ে অবস্থিত যে, তাকে জীবনের দুই পরস্পরবিরোধী পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। শৈশবের দায়িত্বহীন জীবনকে বয়স্ক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণের উপযোগী ক'রে দেওয়ার দায়িত্বও যেমন তাকে নিতে হবে, তেমনি, এই দুই ভিন্নমুখী জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানও তাকে করতে হবে। মানুষ, প্রাণী হিসেবে যতই অভিযোজনক্ষম (Adjustable) হোক না কেন, জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে সার্থক অভিযোজনের জন্য তার কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হয়ই। শিশুর যাতে ক্রমে বয়স্ক জীবনের পথে সহজ ভাবে এগিয়ে যেতে পারে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিদ্যালয়কে নিতে হবে। তার জীবন পরিক্রমার পথকে সহজ ও সরল ক'রে তুলতে হবে ; জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যে সীমারেখা বর্তমান তাকে মুছে ফেলে জীবন বিকাশের ধারাকে সহজ ক'রে তোলাই হবে শিক্ষালয়ের কাজ।

[চার] **বিদ্যালয়ের কাজ : সমাজ উন্নয়ন (Function of School : Development of Society):** শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অর্জিত আচরণধারা বা অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন করা নয়। শিক্ষার বা শিক্ষালয়ের দায়িত্ব যদি অতীত অভিজ্ঞতার বা সংস্কারের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহ'লে সমাজ জীবনের অগ্রগতি বা বিকাশ সম্ভব হ'ত না। এইজন্য শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন সমাজ কৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ লাভ করবে, তেমনি অন্যদিকে কৃষ্টির ধারাকে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে নতুন নতুন কৃষ্টির উপাদান গড়ে তোলার সুযোগও সেখানে পাবে। শিক্ষালয়ে যদি সে সুযোগ না থাকে তবে সভ্যতার অগ্রগতি থেমে যাবে। তাই শিক্ষালয়ের

উদ্দেশ্য হবে সভ্যতার অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখা, সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করা। ক্যানন (D. J. O. Cannon) এই সম্পর্কে যে বাস্তব মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"If a generation had to learn of itself what has been learned by its predecessors, so sort of intellectual or social development would be possible and the present state of society would be little different from the society of the old stone age" সুতরাং, শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হবে মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার সুসংগঠনের মাধ্যমে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিকাশে সহায়তা করা।

[পাঁচ] শিক্ষালয়ের কাজ : ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন (Function of the school : Development of individuality) : শিক্ষালয়গুলো শুধু সমাজ কল্যাণের দিকই দেখবে তা ঠিক নয়। ব্যক্তি মনের পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্বও তাকে নিতে হবে। বর্তমানে কোন শিক্ষাবিদ্ বিশ্বাস করেন না যে সমাজ-কল্যাণ ও ব্যক্তি-কল্যাণ পরস্পর নিরপেক্ষ। ব্যক্তির কল্যাণের দ্বারাই সাধিত হবে ব্যষ্টির উন্নয়ন, এবং সমাজের কল্যাণের মাধ্যমে আনবে ব্যক্তির কল্যাণ। তাই শিক্ষালয়ের কাজ হবে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়ন করা। স্যার পার্শিনান এ সম্পর্কে বলেছেন—"....While the school must never fail to, from its pupil in the tradition of brotherly kindness and social service, it must recognise that the true training for service is one that favours individual growth, and that the highest form of society would be one in which every person would be free to draw form the common medium what his nature needs, and to enrich the common medium with what is most characteristic of himself." শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচী ও সহপাঠক্রমিক বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষালয়ের প্রধান কাজ হবে প্রত্যেক শিশুকে তার নিজের যোগ্যতানুযায়ী পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দেওয়া। শিক্ষালয়ের জীবন পরিসরের মধ্যে সে দৈহিক, আত্মিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত দিক দিয়েই শিক্ষার্থী বিকাশ লাভ করবে। শিক্ষালয়কে এই সব দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যত্নশীল হ'তে হবে।

[ছয়] **শিক্ষালয়ের পরোক্ষ কাজ (Indirect function of the School) :** উপরোক্ত বিভিন্ন দায়িত্ব ছাড়াও শিক্ষালয়ের উপর আরো অনেক ছোট খাটো দায়িত্ব এসে পড়ে। বিশেষ ভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এদের উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। যেমন আমাদের দেশের বেশীর ভাগ পিতামাতাই অশিক্ষিত, ফলে আমাদের দেশের শিশুরা যে গৃহ পরিবেশ থেকে শিক্ষালয়ে আসে, তাকে সবদিক থেকে ক্রটিহীন বলা যায় না। অনেক আচরণ এবং অভ্যাস তারা আয়ত্ত করে যা ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের অনুকূল নয়। এই সব শিশুরা যখন শিক্ষালয়ে আসে, তখন শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হবে, সেই সব আচরণধারার সংশোধন করা। অর্থাৎ শিক্ষালয়কে শিশুদের অবাঞ্ছিত আচরণ ও অভিজ্ঞতার সংশোধন করার দায়িত্বও নিতে হয়। একে আমরা শিক্ষালয়ের **সংশোধনী দায়িত্ব** (Connective function) বলতে পারি। এরই সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক ধরনের দায়িত্ব শিক্ষালয়গুলোর উপর এসে পড়ে তা হ'ল **সমাজ শিক্ষণের দায়িত্ব** (Social Educative function)। শিক্ষালয়ের কাজের দ্বারা শিশুর এবং সমাজ উভয়ের কল্যাণ করতে হ'লে, অভিভাবক এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন হওয়ার দরকার। শিক্ষালয়ের কার্যসূচীর মধ্য দিয়ে আচরণ-ধারার যে পরিবর্তন ও পরিবর্তন সাধন করার প্রচেষ্টা চলছে, গৃহ পরিবেশে অভিভাবকরা যদি সেই সব আচরণ-বিধির যথার্থ মূল্য না দেন, তাহ'লে শিক্ষালয়ের একক চেষ্টার দ্বারা শিশুর উন্নতি বা বিকাশ কখনই সম্ভব হবে না। তাই প্রয়োজন মত অভিভাবক তথা বয়স্কদের কিছুটা শিক্ষার ভার শিক্ষালয়কে নিতে হবে। ব্রাউন (Brown) বলেছেন—"the role of community is that it sets the climate in which the school function," শিক্ষালয়কে পরোক্ষ ভাবে এই আবহাওয়া সৃষ্টি করানোর দায়িত্ব নিতে হবে। তা নাহ'লে শিশুর জীবন বিকাশের চেষ্টাই শুধু ব্যর্থ হবে না, শিক্ষালয়ের নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাও মুস্কিল হবে। সবশেষে বর্তমান সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের আর একটা দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা যাক্। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সার্থক নাগরিক হ'তে হ'লে চাই ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ। এই সমাজব্যবস্থার মূল কথা হ'ল এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ থাকবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের যোগ্যতানুযায়ী সমাজকে সেবা করার সুযোগ পাবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিক্ষার তথা শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা।

আর এই ধরনের বিকাশ সম্ভব যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতা, রুচি আগ্রহ অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায়। এই উদ্দেশ্যে বহুমুখী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষালয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনার (Educational and vocational guidance) প্রয়োজন। শিক্ষালয়কে সেই দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষালয়ের এই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমদপ্তর তাদের এক বুলেটিনে, [The school's responsibility for counselling extend far beyond the classroom or campus. In co-operation with community agencies it should assist young people in procuring and retaining employment—*U. S. Dept. of Labour Bulletin—150*]. ব্যক্তি যদি পরবর্তী জীবনেপরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে না পারে তবে শিক্ষালয়ের গুরুত্ব সমাজ ব্যবস্থায় কমে যাবে। সেই কারণে তাকে এই ব্যক্তি জীবনের নির্দেশনার দায়িত্ব (Guidance function) নিতে হবে।

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষালয়ের বিভিন্ন দায়িত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হ'ল তার মধ্যে কোনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা বলা খুবই মুস্কিল, বা, তার চেষ্টা করাও ভুল। কারণ এদের প্রত্যেকটাই পরস্পর নির্ভরশীল। প্রত্যেকের পেছনে একই উদ্দেশ্য কাজ করছে। তা হ'ল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সমাজ-নির্দিষ্ট পথে, সমাজ-জীবনের ধারার শুধুমাত্র অনুশীলনে নয় তার পরিবর্ধনের মাধ্যমেও বটে। আর সেই পথে ব্যক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে, অন্যান্য বিশেষ দায়িত্বগুলো শিক্ষালয়কে পরোক্ষ ভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাই আমরা বলতে পারি—অর্বাচীন শিশুদের নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা, সমাজের অতীত সংস্কৃতির সার্থক উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা, অভিজ্ঞতার ও প্রচেষ্টার দ্বারা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ধারাকে পরিবর্ধন করার ক্ষমতা সংযোজন করা, এ সব কিছুই হ'ল শিক্ষালয়ের দায়িত্ব। দেহ-মনে, চিন্তায়, রুচিতে, নৈতিক ও আত্মিক মানে নিজ ক্ষমতার পরিপন্থী বিকাশ সাধন করাই হ'ল শিক্ষালয়ের কাজ, বা আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মত সহজে বলা যায়, ব্যক্তির বিকাশের ধারাকে ব্যক্তকে না ক'রে তাকে সমাজমুখী করাই হ'ল শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য।

শিক্ষালয় ও সমাজ
School and Society

শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between School and Society) :

শিক্ষালয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনার সময় আমরা লক্ষ্য করেছি, সমাজের বিশেষ এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের (institution) সৃষ্টি হয়েছে। তাই শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড় হওয়াই স্বাভাবিক। সমাজের অতীত সংস্কার সংরক্ষণের জন্যই শিক্ষালয়ের সৃষ্টি ; এর মাধ্যমেই ভাবী কালের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ হয়। তবে শুধু এইটুকু বললেই সমাজ ও শিক্ষালয়ের সম্পর্ক পরিষ্কার ক'রে বলা হয় না। তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক। সমাজ যে শুধু শিক্ষালয়ের উপর নির্ভর করে তা নয়, শিক্ষালয় ও তার কার্যসূচী স্থির করার জন্য সমাজের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকে। তাদের এই পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি হয়। আমরা এ সম্পর্কে এখন আলোচনা করবো।

শিক্ষালয়ের উপর সমাজের নির্ভরশীলতা সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বলতে হয়—

(এক) সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশ নির্ভর করে অতীত সংস্কারের ধারণ ও সঞ্চালনের উপর। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যদি আমরা সমাজের প্রচলিত রীতিতে শিক্ষিত করতে না পারি তা হ'লে সমাজ জীবনের যে ধারাবাহিকতা তা বন্ধ হ'য়ে যাবে। সম্পূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে। তাই সমাজকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে প্রত্যেক শিশুকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। শিক্ষালয়ের উপর সেই দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে সমাজ শিক্ষালয়ের উপর নির্ভরশীল এবং শিক্ষালয়ও অতীত সমাজ সংস্কারের সংরক্ষণ ও সঞ্চালনের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালন করে।

(দুই) আবার সমাজ-দেহেরও জৈবিক দেহের মত অভিব্যক্তি হয়। সমাজ স্থিতিশীল নয়। জীব জগতে অভিব্যক্তির ধারায় অনেক প্রাণী চলে গেছে, আবার অনেক প্রাণীর সৃষ্টি হ'য়ে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। সমাজ-জীবনের মূলেও একই নিয়ম কাজ করছে। সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কত সমাজ পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আবার কত নতুন সমাজের আবির্ভাব হয়েছে। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে

অভিযোজন করার নতুন কৌশল আয়ত্তের মাধ্যমে, সমাজ যদি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে না পারে, তবে সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে। তাই সমাজকে বজায় রাখার জন্য যে শুধুমাত্র সংস্কারের সংরক্ষণ এবং সঞ্চালন প্রয়োজন তা নয়, নতুন কৃষ্টি রচনাও করার দরকার। শিক্ষালয় একমাত্র স্থান যেখানে কর্মসূচীর মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা শিশুরা নতুন তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে এবং জীবন ধারণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে পারবে। তাই সমাজ-জীবনের অগ্রগতির জন্য সমাজকে বিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয়।

(তিন) শিক্ষালয় অন্ধ-যান্ত্রিক কোন সংস্থা নয়, যে সমাজের যা কিছু আচার-আচরণ আছে তা সবই শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত করবে, বিচার বিবেচনা না করে। আদর্শ সংস্থা হিসেবে তার দায়িত্ব হবে সমাজের যা ভাল তারই শুধুমাত্র অনুশীলন করা। সমাজের মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে যা খুবই ত্রুটিপূর্ণ। শিশুরা শিক্ষালয়ে সমাজের ভাল মন্দ সবকিছুর সঙ্গে পরিচিত হ'লেও শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে তারা যাতে ক'রে মন্দগুলোকে ত্যাগ ক'রে ভাল বৈশিষ্ট্যগুলোকে গ্রহণ করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা। তার দ্বারা সমাজের শোধন সম্ভব হবে। যুগে যুগে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনেরও শোধন প্রয়োজন। সমাজ বিকাশের প্রত্যেক পর্যায়ে যদি তাকে শুদ্ধ ক'রে নেওয়া না হয়, তা হ'লে অনাচার দেখা দেবে। শিক্ষালয়ের দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হ'য়ে থাকে। সুতরাং এদিক থেকে সমাজ শিক্ষালয়ের উপর নির্ভরশীল।

(চার) সমাজ-জীবনের গতি ও মান নির্ণয়ে শিক্ষালয়ের দান বর্তমানে কম নয়। সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হ'লেও শিক্ষালয়ের সুষ্ঠু সংগঠন প্রয়োজন। সমাজ-জীবনে অনেক সময় অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়, যা সমাধানের জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, সমাজ-জীবন যখন সমস্যা জর্জরিত হ'য়ে পড়ে তখন শিক্ষালয়ই তাকে মুক্তির প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে। আবার সমাজের নৈতিক মান এবং মৌলিক অন্যান্য নীতি নির্ণয়ে শিক্ষালয়ের দায়িত্ব নিতে হবে। তাকে মানব কল্যাণময় পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে একমাত্র শিক্ষালয়, শিক্ষালয় শুধু সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি হবে না, সমাজ-জীবনের পরীক্ষাগার হবে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ ক'রে তার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয় উন্নততর সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

অন্যদিকে আমরা যদি শিক্ষালয়ের সমাজ নির্ভরতার কথা বিবেচনা করি, তাহ'লে একই কথাই বলতে হয়, শিক্ষালয় যেহেতু সমাজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হ'য়ে

ছিল, সেহেতু তার সমাজের উপর নির্ভরতা থাকা স্বাভাবিক। সমাজ-জীবনের সংরক্ষণের জন্ত তাকে যে সব কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে, তা অবশ্যই সামাজের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষালয়ের দায়িত্ব সমাজ সংরক্ষণ করা, সুতরাং শিক্ষালয়ে এমন আচরণের অনুশীলন করতে হবে, যা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই শিক্ষালয়কে তার কর্মসূচী নির্ধারণ করতে হ'লে সমাজের মুখাপেক্ষী হ'তে হবে। সমাজের সংগঠন, রীতি-নীতি, সব কিছু বিচার ক'রে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করতে হবে, পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করার জন্য ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের চাহিদার কথা বিবেচনা করতে হবে। তাই শিক্ষালয়ের যে-কোন কার্যসূচী সমাজব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে শিক্ষালয়ের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কে. জি. সৈয়িদিয়ান (K. G. Saiyidian) বলেছেন—"A peoples' school must obviously be based on the peoples' needs and problems. Its curriculum should be an epitome of their life.···· It should reflect all that is significant and characteristic in the life of the community, in its natural setting."

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়। উভয়ে উভয়ের উপর নির্ভরশীল। সমাজ ছাড়া শিক্ষালয়ের যেমন অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না তেমনি শিক্ষালয় ছাড়া সমাজ-জীবনের অগ্রগতির কথাও ভাবা যায় না। তাদের এই সম্পর্কের কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই সম্পর্ককে দৃঢ়তর করতে হ'লে কতকগুলো বিশেষ ধরনের কার্যসূচীর কথা উল্লেখ করা যায়।

সমাজ ও শিক্ষালয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বিভিন্ন পন্থা (Means to cultivate relation between School and Society):

[এক] পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সমাজ-জীবনের প্রচলিত রীতি-নীতির দ্বারা শিক্ষালয়ের কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। সুতরাং শিক্ষালয়ের কাজ হবে স্থানীয় সমাজের আচার-আচরণ, রীতি-নীতির অনুশীলন ক'রে পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা; সমাজের প্রয়োজনীয়তা কি তাও বিচার ক'রে দেখতে হবে। শুধু মাত্র পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়; কেবলমাত্র নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুশীলন করলেই শিক্ষালয়ের দায়িত্ব পালন করা হবে না। প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষার কোন মূল্য নেই। তাই শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন

করতে হ'লে শিক্ষার্থীদের এমন সব অভিজ্ঞতা দিতে হবে যা তাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত, যা তাদের সমাজিক জীবনের যে বিভিন্ন চাহিদা তা মেটাতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টে বলা হ'য়েছে—"....It (শিক্ষালয়) will give full room for the expression of pupils' social impulses. It will train them, through practical experience in co-operation, in subordinating personal interests to group purposes, in working in a disciplined manner and in fitting means to ends."

[**দুই**] শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপন করতে হলে, শিক্ষালয়কে বিশেষ ভাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষালয়ের সক্রিয়তার মাধ্যমেই সমাজকে সক্রিয় ক'রে তোলা যায়। শিক্ষালয়কে দুদিক থেকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। প্রথমতঃ, সমাজের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আছে। প্রাচীনকালের নিদর্শন স্বরূপ যে সব মন্দির ও গৃহাদি আছে বা আধুনিক কালের যে সব সামাজিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা শিশুদের জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। শিক্ষালয় থেকে ছাত্রদের নিয়ে মাঝে মাঝে ঐ সব জায়গায় নিয়ে গিয়ে সমাজের অতীত এবং বর্তমান কৃষ্টির ধারার সঙ্গে পরিচিত করা যায়। এতে ক'রে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সমাজ-জীবনের গভীর সংযোগ স্থাপিত হয়। শিক্ষালয় যদি এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করে তাহ'লে তার দ্বারা শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের আদর্শ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সঙ্গে শিক্ষালয়ের সম্পর্ক স্থাপন করতে হ'লে শিক্ষালয় থেকে সমাজের বিভিন্ন সংস্থাকে আমন্ত্রণ ক'রে বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে; অভিভাবক ও অন্যান্যদের শিক্ষালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করলে এবং তাদের অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ দিলে, এই সম্পর্ক অনেক সহজ হয়। শিক্ষালয়কে সব সময় মনে রাখতে হবে, সমাজের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া কোন কর্মসূচীরই সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। আর এই দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

[**তিন**] সমাজ চির পরিবর্তনশীল সত্তা। আজকে সমাজ জীবনে যে একান্ত প্রয়োজন আগামীকাল তার প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। সমাজ-জীবনের সকল রকম ব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়, সঙ্গে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন হয়। শিক্ষালয়কে এই পরিবর্তনশীল সংস্থার সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, তার

পাঠ্যক্রম ও কর্মধারার মধ্যে পরিবর্তনশীলতার ধর্ম সংযোজন করতে হবে। অর্থাৎ, পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের পূর্ণ বিন্যাস করতে হবে। স্থির, নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের দ্বারা সমাজের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। তাই শিক্ষালয়ের কাজ হবে কিছু দিন অন্তর সমাজের চাহিদার বিশ্লেষণ করা এবং সেই অনুযায়ী কর্মসূচী নির্ধারণ করা।

[চার] সবশেষে একথা মনে রাখতে হবে, শিক্ষালয় শুধু মাত্র সমাজ নির্ধারিত পথে অগ্রসর হবে না, তার কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধনও করতে হবে। এই উন্নতি সাধন করতে হ'লে শিক্ষালয়কে যেমন একদিকে সমাজের রীতি-নীতির বিশ্লেষণ ক'রে দেখবে তেমনি শিক্ষালয়ের জীবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সব নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তা যাতে সমাজ দেহে সঞ্চারিত হয় তার চেষ্টাও করতে হবে। সমাজের যে সব খারাপ আচরণ আছে সেগুলোকে ত্যাগ করতে শেখাতে হবে। ভালগুলোকে গ্রহণ করার উপযোগী পরিবেশে সৃষ্টি করতে হবে। এতে ক'রে সমাজ-জীবনের মান উন্নত হবে এবং সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনও নির্দিষ্ট আদর্শে পথে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষালয় সমাজ জীবনেরই প্রতিচ্ছবি
School is a Society

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষালয়ের অভিব্যক্তির কথা স্মরণ করলে আমরা দেখতে পাই শিক্ষালয় সমাজের প্রয়োজনেই সৃষ্টি হ'য়েছে। ইংরেজী School কথার ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই শিক্ষালয় সমাজের বিশেষ এক ধরনের প্রয়োজন মেটানোর জন্ত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তিকালে আমরা লক্ষ্য করি সমাজ এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে আর সে স্বাভাবিক সম্পর্ক নেই। ক্রমে শিক্ষালয়কে সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। গত কয়েক শতাব্দী ধ'রে সেই প্রচেষ্টাই চলে এসেছিল। সমাজ এবং শিক্ষালয়ের মধ্যে কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে সমাজ এবং শিক্ষালয় উভয়ের বিকাশকে যেন চেপে রাখা হ'য়েছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন শিক্ষালয় হবে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। কিছু কিছু শিক্ষবিদ্‌ তাকে সমাজ হিসেবে বিচার করতে চান, অর্থাৎ, তাকে সমাজের সমপর্যায়ে ফেলেন। যেমন জন্‌ ডিউই (John Dewey)-এর মতে শিক্ষালয় হ'ল এক ধরনের আদর্শ সমাজ, মার্জিত, সুন্দর ও সুষম সমাজ। তিনি বলেছেন—

School is a simplified, purified and better balanced society. ফ্রয়বেল (Froebel) শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন (miniature society)। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষালয়ের জীবন এবং সমাজ-জীবনের মধ্যে পার্থক্যের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "মানুষের ছেলে কাঁদতে কাঁদতে পাঠশালায় যায়। সেই কান্নায় এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা নিরন্তর প্রতিবাদ রয়েছে।" এমনি ভাবে আধুনিক কালে প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্ শিক্ষালয় ও সমাজ জীবনের বিচ্ছিন্নতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং শিক্ষালয়কে সমাজেরই অংশ বা ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আবার অন্যদিকে অনেক চিন্তাবিদ এই মতবাদের প্রতিবাদও করেছেন। সুতরাং বিচার ক'রে দেখার দরকার কেন আমরা শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বিবেচনা করবো। কেন আমরা শিক্ষালয়কে সমাজের সমতুল্য বলব। সমাজ ও শিক্ষালয়ের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে আমরা তাদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাবো।

[এক] প্রথম বিচার ক'রে দেখা যাক্, সমাজ ও শিক্ষালয়ের সাংগঠনিক কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি না। আমরা দলবদ্ধ মানুষ-গোষ্ঠীকে বলি সমাজ, সাধারণ অর্থে। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তির সমষ্টিকে সমাজ বলতে পারি না। এছাড়া তার আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। সমাজবিদ্‌রা অনেক রকম দলের (group) কথা বলেছেন, তাদের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিবেচনা ক'রে। সমাজের মধ্যে মানুষ শুধু দলবদ্ধ ভাবে বাস করে না, তাদের একটা নির্দিষ্ট জীবন-মান বা লক্ষ্য আছে—যে লক্ষ্যের পথে তারা এগিয়ে যায়। এছাড়া তাদের মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক সক্রিয় মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। এই পারস্পরিক মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাদের সমাজের মধ্যে বন্ধনের সৃষ্টি করে। [**A society is a group of individuals living together with conscious mental interaction and persuing a universal goal**]. তাহ'লে প্রত্যেক সমাজের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে তিনটি—(১) দলবদ্ধ মানুষ, (২) একটি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং (৩) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে মানসিক প্রতিক্রিয়া। এখন শিক্ষালয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সবই বর্তমান। শিক্ষালয়ে একদল শিক্ষার্থী দলবদ্ধ ভাবে বাস করে। তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্যই এক—জ্ঞানার্জন করা, বা ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী প্রশিক্ষণ লাভ করা। সুতরাং সমাজের প্রথম দুটো বৈশিষ্ট্য শিক্ষালয়ের

মধ্যে বর্তমান। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ, পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমাজবিদরা (Sociologist) বলেছেন—শিক্ষালয়েও বিভিন্ন ধরনের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষালয়ে যে বিভিন্ন ধরনের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তা সাধারণতঃ চার শ্রেণীর—(১) ছাত্রে-ছাত্রে সম্পর্ক (Pupil-pupil relation), (২) ছাত্র-দল সম্পর্ক (Pupil-group relation), (৩) দল-ছাত্র সম্পর্ক (Group-pupil relation) এবং (৪) সম্পূর্ণদলীয় সম্পর্ক (Total group relation)। সমাজ-জীবনের মুখ্য বৈশিষ্ট্য যেমন পারস্পরিক মানসিক প্রতিক্রিয়া, তেমনি শিক্ষালয়-জীবনেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক স্থাপন। এই মানসিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমেই শিক্ষালয়ের অগ্রগতি সম্ভব হয় এবং পরোক্ষ ভাবে তা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই সমাজবিদ্‌রা এই বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশুরা অন্যের সঙ্গে মিশতে শেখে, সমাজের সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত হয়; অন্যের অনুভূতি সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেখা যাচ্ছে, স্বাভাবিক সমাজের যে সব বৈশিষ্ট্য আছে শিক্ষালয়ের মধ্যেও সেগুলো বর্তমান। সুতরাং বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমাজ ও শিক্ষালয় সমগুণসম্পন্ন।

[দুই] দ্বিতীয়তঃ, আমরা শিক্ষালয়ের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছি, সমাজ-জীবনের প্রথম স্তরে শিক্ষালয়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সমাজ-জীবনের মধ্যে এমন এক শক্তি কাজ করতো যা ছোটদের বাধ্য করতো জীবন ধারণের কৌশল আয়ত্ত করতে অনুকরণের মাধ্যমে। পরবর্তী যুগে এলো শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, কিন্তু তাও কোন শিক্ষালয়ের মাধ্যমে নয়। তারও পরে এলো শিক্ষালয়। শিক্ষালয়ের এই ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, সমাজ-জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষালয়েরও অভিব্যক্তি হয়েছে। শিক্ষালয় সমাজের অঙ্গ হিসেবেই গড়ে উঠেছে, তার থেকে পৃথক কিছু সত্তা নয়। শিক্ষালয় ও সমাজকে যদি আমরা জৈবিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করি, তাহ'লে বলতে হয় শিক্ষালয় হ'ল সমাজের একটা অঙ্গ মাত্র। তাদের দেহের শিরায় একই রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, একই হৃদ্‌পিণ্ড তাদের জীবনী-শক্তি যোগাচ্ছে। অধ্যাপক কে. কে. মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'It is an organic growth of society no less than a particular limb in the organic growth of an animal body'. সুতরাং সংগঠনের দিক থেকে শিক্ষালয় এবং সমাজের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। এই কারণে শিক্ষালয়কে আমরা সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলতে পারি।

[তিন] তৃতীয়তঃ, সমাজবিদ্‌দের মতে সমাজ সৃষ্টির পেছনে দু'ধরনের মানসিক চাহিদা কাজ করছে। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। একটা হ'ল অতীত-সংস্কার সংরক্ষণের (preservation of cultural heritage) চাহিদা এবং দ্বিতীয়টা হ'ল অতীত সংস্কারের সার্থক সঞ্চালনের (Transmission of cultural heritage) চাহিদা। এই দুই চাহিদা মানুষের সমাজ গড়তে যেমন সাহায্য করছে এবং বিভিন্ন সময়ে সমাজ অগ্রগতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তেমনি শিক্ষালয় সৃষ্টির পেছনেও তারা কাজ করেছে। মানুষের বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত প্রবণতা (instinctive urge) যা সমাজ সৃষ্টির পেছনে কাজ করেছে, তা শিক্ষালয় সৃষ্টির পেছনেও একই ভাবে কাজ করেছে। তাই একই শক্তির দ্বারা নির্ণীত বা একই ধরনের চাহিদার ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন সংস্থা সমাজ এবং শিক্ষালয় এক ধর্মীয় হওয়া স্বাভাবিক।

[চার] চতুর্থতঃ, আমরা জানি যে, কোন সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য হ'ল যে গোষ্ঠী তার মনোভাব সব সময় ব্যক্তির উপর আরোপ করে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে এক পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক বর্তমান। ব্যক্তি গোষ্ঠীর প্রতি প্রতিক্রিয়া করে এবং গোষ্ঠীও ব্যক্তির উপর সচেতন প্রতিক্রিয়া করে। এর ফলে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলো বিশেষ ধরনের আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এদের বলা হয় সামাজিক আনুগত্যমূলক আচরণ (Social inclination) বা সামাজিক সংস্কার (Social instincts)। যেমন—যূথচারিতা (Gragariousness), মাতৃসুলভ আচরণ (Motherly behaviour), আত্মপ্রকাশ (Display), প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব (Rivalry), অনুকরণ (Imitation), যৌন আচরণ (Sex behaviour) ইত্যাদি। এটাই হ'ল, যে কোন সামাজিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। শিক্ষালয়ে ছাত্রদের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যেও এই ধরনের আচরণ-ধারার উদ্ভব হয়। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধ ভাবে থাকতে ভালবাসে। বিশেষ ভাবে বড় বড় দলের মধ্যে তারা আবার ছোট ছোট দল গড়ে তোলে। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সহানুভূতিমূলক আচরণও দেখা যায়, তারা নিজেদের জিনিস অন্যকে দেখাতে ভালবাসে, তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবও তীব্র থাকে। অনুকরণ-স্পৃহা ও যৌন আচরণও তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোন সামাজিক গোষ্ঠীর মত শিক্ষালয়েরও ক্ষমতা আছে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আনুগত্যমূলক প্রবণতা সৃষ্টি করার। এই দিক বিচার করলে বলা যেতে পারে, তাদের মধ্যে কোন অমিল নেই।

সুতরাং পূর্বোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। আধুনিক শিক্ষাবিদ-গণ এই কারণেই শিক্ষালয়কে সমাজের সমগুণসম্পন্ন ব'লে বিবেচনা করেছেন এবং তাকে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ বা সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার—শিক্ষালয়কে সমাজ হিসেবে বিবেচনা করলেও তাঁরা একেবারে সমাজের পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি মনে করেন না। ডিউই (Dewey) বলেছেন School is a simplified, purified and better balanced society. তিনি শিক্ষালয়কে সমাজ বললেও সরল (simplified), সুমার্জিত (purified) এবং সুষম (better balanced)—এই তিনটে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, এবং এর ফলে, শিক্ষালয় সমাজের সঙ্গে স্বাভাবিক সমাজের থেকে অনেক পার্থক্য হ'য়ে যায়। অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন, শিক্ষালয়ে আমরা সমাজের যেটুকু ভাল সেটুকু পরিবেশন করবো। খারাপ অংশটুকু সযত্নে বাদ দেবো, তাঁরা মনে করেন শিক্ষালয় একদিক থেকে যেমন স্বাভাবিক তেমনি কৃত্রিমও বটে। কৃত্রিম, তার কারণ আমরা সমাজের ভালটুকু নির্বাচন ক'রেই শিক্ষালয়ে নিয়ে আসি। সুতরাং যেহেতু আমরা নির্বাচন করছি, সেহেতু তার মধ্যে কোন স্বাভাবিকতা নেই। নান্ (Nunn) এই দুই মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষালয়ের সমাজকে একই সঙ্গে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম বলতে পারি। শিক্ষালয়ের জীবন স্বাভাবিক হবে তার কারণ শিক্ষালয় এবং বহির্জীবনের সঙ্গে কোন ব্যবধান থাকবে না। কিন্তু অন্যদিক থেকে শিক্ষালয় কৃত্রিম সমাজ হবে তার কারণ, শিক্ষালয়ে অনুশীলনের দ্বারা আমরা শুধু সমাজের ভাল জিনিসগুলো আনবো। নান্ (Nunn) বলেছেন—It must be a natural society in the sense that there should be no violent break between the conditions of life within and without it……On the otherhand a school must be an artificial society in the sense that while it should reflect the outer world truely, it should reflect only what is best and most vital there.' তবে যাঁরা নির্বাচনের কথা বিবেচনা করে শিক্ষালয়কে কৃত্রিম মনে করেন, তাঁদের বিপক্ষে বক্তব্য হ'ল শিক্ষালয়ে নির্বাচন হ'লেও তা একবারে সার্থক এবং সম্পূর্ণ একথা বলতে পারি না। আর তাছাড়া তা হওয়াও উচিৎ নয়। শিক্ষালয়ে আমরা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন করি তা শুধু যে ভাল

হবে এমন কোন কথা নেই। শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে মন্দের পরিপ্রেক্ষিতে ভালকে উপলব্ধি করতে শেখানো। তা নাহ'লে শিক্ষা সার্থক হবে না। তাছাড়া যে কোন ভাল সামাজিক বৈশিষ্ট্য আমরা অনুশীলনের জন্য নির্বাচন করি না কেন তার সঙ্গে কিছু মন্দ এবং গৌণ বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত থাকবেই। যেমন, চারাগাছ রোপণ করার জন্য আমরা কিছুটা মাটি সঙ্গে নিয়ে যাই তেমনি সমাজের কোন বৈশিষ্ট্যকে অনুশীলন করার জন্য যখন আমরা নির্বাচন করি তখন তার সঙ্গেও কিছু কিছু গৌণ বৈশিষ্ট্য চলে যাওয়া স্বাভাবিক এবং এগুলো ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করে না যদি শিক্ষালয় তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে পালন করে। তাই নির্বাচন হ'লেও সে নির্বাচন একেবারে সঠিক নয়। সুতরাং শিক্ষালয়কে আমরা স্বাভাবিক সমাজ হিসেবেই বিবেচনা করতে পারি। কারণ অনুকরণ করলেও আমরা একটা স্বাভাবিক জিনিসকেই অনুকরণ করছি।

শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমাজের আদর্শ সম্পর্ক স্থাপনের উপায় (Means of establishing ideal relation between School and Society) :

শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা আমরা আলোচনা করলাম তা কখনই স্বাভাবিক নিয়মে স্থাপিত হ'তে পারে না। এর জন্য দরকার সক্রিয় প্রচেষ্টা এবং এই প্রচেষ্টার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষালয়ের উপর এসে পড়ে। শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ হিসেবে গড়ে না তুলতে পারলে শিক্ষা সার্থক হবে না, তাই শিক্ষালয়কে এদিক দিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। শিক্ষালয়ের কার্যসূচী এমন ভাবে নিতে হবে যাতে ক'রে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, সমাজ-জীবন এবং শিক্ষালয়-জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষালয়-জীবন থেকে কর্মজীবন বা সমাজ-জীবনে প্রবেশের পথ যাতে স্বাভাবিক ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয় সে দিকে শিক্ষালয়কে নজর দিতে হ'বে। এইজন্য শিক্ষালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই সব কার্যসূচী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

[এক] শিক্ষালয়কে সমাজ-জীবনের প্রতিরূপ করার প্রধান উপকরণ হ'ল **যৌথ কর্ম প্রচেষ্টা গ্রহণ করা**। সমাজ-জীবনের বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল সেখানে মানুষ দলবদ্ধ-ভাবে কাজ ক'রে বিশেষ এক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। শিক্ষালয়ে এই আদর্শ গড়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে, শিক্ষালয়ে বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠক্রমিক (Co-Curricular) কাজের মাধ্যমে, ছাত্রদের দলবদ্ধ ক'রে

কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি ইত্যাদি কতকগুলো বিকাশ করা যায়। খেলাধূলা, অভিনয় ও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ভাব তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা যায়।

[দুই] সমাজিক মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে অন্যান্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল। সমাজের মানুষের মধ্যে যদি এই সহমর্মিতার বোধ জাগ্রত না ক'রা যায় তাহ'লে সমাজ ভেঙে পড়বে। তাই শিক্ষালয়কে সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে এই সহানুভূতির ভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করাতে হবে। সহানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসবে একাত্মবোধ যা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। শিক্ষালয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে একদল হিসেবে কাজ করে, যাতে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী নিতে হবে। যেমন শিক্ষালয়ের ব্যাজ ব্যবহার, শিক্ষালয়ের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ পোশাক ব্যবহার, সমবেত সংগীতের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

[তিন] শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগাতে না পারলে শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। এই সমাজ চেতনা আসবে যদি শিক্ষার্থীরা সমাজ ব্যবস্থা এবং শিক্ষালয়ের জীবনের মধ্যে পার্থক্য না দেখে। তাই শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ করতে হ'লে তার পরিচালনা সমাজের মতই হওয়ার দরকার। জন ডিউই প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষবিদ্ মনে করেন শিক্ষালয়ের পরিচালনা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়ার দরকার। শিক্ষার্থীরা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মত শিক্ষালয়েও ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিষদ তৈরী করতে হবে। এতে ক'রে ছাত্ররা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হবে এবং সমাজ ও শিক্ষালয়ের মধ্যে ব্যবধানও কমে আসবে।

[চার] সবশেষে শিক্ষালয়ে আদর্শ সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ের জীবনের মাধ্যমেই জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো আয়ত্ত করবে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষালয়ের মধ্যে আদর্শ জীবন গড়ে তোলা। যে সব সামাজিক গুণ—সহানুভূতি, যৌথ প্রচেষ্টার মনোভাব আমরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনতে চাই তা শিক্ষকদের শিক্ষালয়ের জীবনের মাধ্যমে পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার এই শিক্ষক বা গুরুর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক না হয় তা'হলে শিক্ষাদানের কাজ সম্পন্ন হবে না। তিনি বলেছেন—"শ্রদ্ধার সঙ্গে দান

করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই, সেখানে আদান প্রদানের সম্পর্ক কলুষিত হ'য়ে উঠে।" তাই শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক করতে হ'লে শিক্ষককে ছাত্রদের সঙ্গে শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপন ক'রে প্রাচীন সেই মন্ত্রে আহ্বান ক'রে বলতে হবে—"সহবীর্যং করবাবহৈ।"

শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিরূপ হিসেবে গড়ে তুলতে গেলে সেখানে সকল রকম সামাজিক বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুটিত করতে হবে। সকল রকম সামাজিক কাজের অনুশীলনের সুযোগ দিতে হবে। প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ শিক্ষালয়ে গ্রহণ করতে হবে। যৌথভাবে সমস্যা সমাধানের সুযোগ ক'রে দিতে হবে। তাছাড়া সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রম কাজেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষালয় পরিচালনা করলে তা ব্যক্তির কল্যাণ যেমন আনবে অন্য দিকে ব্যক্তিকে সহজভাবে সমাজ-জীবনের সঙ্গে অভিযোজন করতেও সহায়তা করবে।

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষালয়, ব্যক্তি ও সমাজ (School, Individual and Society):

শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি জীবনের বিকাশ সাধন করা। শিক্ষালয়ের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি তার বিশেষ দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়তা করা। মানব শিশু জন্ম মুহূর্তে মাত্র কতকগুলো প্রবণতা নিয়ে জন্মায়; আর থাকে তার কতকগুলো পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা কিন্তু এই সামান্য কয়টি হাতিয়ার দিয়ে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকা খুবই মুস্কিল। তাই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করার জন্য দরকার আরো অনেক নতুন নতুন কৌশল। শিক্ষালয় ব্যক্তিকে এই সব কৌশল আয়ত্ত করতে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষালয়ের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানো ও তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা।

আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে দেখি, বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌ বলেছেন, শিক্ষালয় হবে সমাজেরই প্রতিচ্ছবি এবং শিক্ষালয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজীকরণ হবে। শিক্ষালয়ে সে সামাজের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ত করবে এবং সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হ'চ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন এবং সমাজের

প্রয়োজনের দিক থেকে শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হ'ল ব্যক্তির সমাজীকরণ। কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ মনে করেন, এই দু'ধরনের ক্রিয়া পরস্পরবিরোধী এবং শিক্ষালয়ের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন, সমাজ হ'ল মানব-গোষ্ঠী। সেই গোষ্ঠীভুক্ত হ'তে হ'লে অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সমতা রেখে আচরণ সম্পাদন করতে হবে এবং এতে ক'রে ব্যক্তির নিজস্বতার বিকাশ ব্যাহত হয়। কিন্তু আধুনিক কালের শিক্ষবিদ্ নান্ (Nunn) এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে দৃঢ় ভাষায় বলেছেন—
"the idea that a main function of the school is to socialize its pupils is no wise contradicts the view that its true aim is to cultivate the individuality."

মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তার কোন সামাজিক আচরণই আত্ম সুখ ছাড়া কিছু নয়; আবার তার সকল রকম আত্মসুখমূলক আচরণ সামাজিক প্রকার ছাড়া ঘটে না। নান্ (Nunn) বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আচরণের মধ্যেও আত্মতৃপ্তির চাহিদা থাকে। তিনি বলেছেন, মা তাঁর ছেলেকে স্নেহ করেন তার ভবিষ্যৎ জীবনের চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে। তাই ব্যক্তির নিজস্বতা বা অহং সত্তাকে তার সামাজিক আচরণ থেকে পৃথক করা যায় না। তাছাড়া মানুষের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মসুখের যে চাহিদা আছে তাকে প্রত্যক্ষভাবে জৈবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পরিতৃপ্ত করতে দেওয়া সামাজিক মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়। ফ্রয়েড্‌পন্থীরা মনে করেন তার সকলরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদারই উদ্গমন (Sublimation) হওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং এই উদ্গমন যাতে সমাজ নির্দিষ্ট পথে হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন। সুতরাং সব কিছু বিচার ক'রে বলা যায় ব্যক্তি, শিক্ষালয় এবং সমাজ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, শিক্ষালয়ের ব্যক্তির প্রতি যেমন একটা দায়িত্ব আছে, সমাজের অন্তর্গত সংস্থা হিসেবে সমাজের প্রতিও তার একটা দায়িত্ব আছে। আর সেই দু'ধরনের দায়িত্ব পরস্পরবিরোধী নয়। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্কে আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করেছি। ঐসব কার্যাবলী গ্রহণ করলে ব্যক্তিত্বেরও পরিপূর্ণ বিকাশ করা সম্ভব, তবে শিক্ষালয় যেন এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থেকে কাজ করে। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুই আপাতঃ পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারায় সার্থক সমন্বয় সবক্ষেত্রেই প্রয়োজন।

শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগ (Classification of School):

সমাজের কতকগুলো প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং ব্যক্তির চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন

যাত্রার মান অনেক জটিল হ'য়ে গেছে ; সমাজের চাহিদাও অনেক বেড়ে গেছে। ব্যক্তিকে এখন জীবন পরিবেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অভিযোজন ক'রে চলতে হয়। তাছাড়া যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় সমাজ পরিচালনার বিভিন্ন দিকে বিশেষজ্ঞ (specialized) ব্যক্তির প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। ফলে একই ধরনের শিক্ষালয় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সকল রকম চাহিদাকে মেটাতে পারে না। তাই আধুনিক কালে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের উৎপত্তি হয়েছে—ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চাহিদা মেটানোর জন্য। বর্তমানে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় দেখতে পাই, তাদের বিশেষ কোন মানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভাগ করা মুস্কিল। শিক্ষাবিদ ফিণ্ড্‌লে (Findlay) শিক্ষালয়গুলোকে বিভিন্ন দিক থেকে শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করেছেন আলোচনার সুবিধার জন্য। তিনি বিভিন্ন মানের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছেন। তিনি সাতটি মানের কথা বলেছেন যাদের দ্বারা আমরা শিক্ষালয়ের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি—(১) মালিকানা (Ownership), (২) দৈহিক অসামর্থ্য (Physical disabilities (৩) বয়স ও যোগ্যতা (Age and attainment), (৪) পাঠ্যক্রম (Curriculum), (৫) দায়িত্বের সীমা (Range of responsibility), (৫) সামাজিক মর্যাদা (Social upbringing or status) এবং (৭) শিক্ষার্থীর লিঙ্গ (Sex of the pupil)। এই সাতটি মানের পরিপ্রেক্ষিতে ফিণ্ড্‌লে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের কথা বলেছেন। তবে এই শ্রেণীবিভাগ যে সব সময় সম্পূর্ণ তা বলতে পারি না। আমাদের দেশে বর্তমানে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় দেখতে পাই, তার যে কোন একটিকে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে সঠিক ভাবে ফেলা যায় না। একই শিক্ষালয় শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত হ'তে পারে। সুতরাং এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ একেবারে চরম নয়। যাই হোক এই শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি ক'রে আমরা আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সম্পর্কে আলোচনা করবো।

(১) মালিকানার দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ (Classification on the basis of Ownership) : আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে তাদের মোটামুটি কয়েকটা ভাগে ভাগ করা যায়। মালিকানার দিক থেকে আমাদের দেশের শিক্ষালয়গুলোকে চারটে ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের শিক্ষালয় আছে যে গুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারের দ্বারা পরিচালিত, শিক্ষালয়ের সব ব্যয় এবং

সকল রকম পরিচালনার দায়িত্ব থাকে সরকারের। এই সব শিক্ষালয়কে বলা হয় **সরকারী শিক্ষালয়**। এদের সংখ্যা খুবই কম। এছাড়া কিছু শিক্ষালয় আছে যে গুলোকে আধা সরকারী বলা যেতে পারে। এদের কিছুটা ব্যয়ভার সরকার বহন করেন এবং পরোক্ষ ভাবে এদের পরিচালনার কিছুটা দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করেন। এই জাতীয় শিক্ষালয়ের সংখ্যা বর্তমানে আমাদের দেশে বেশী, এদের বলা হয় **সরকারী সাহায্যপুষ্ট শিক্ষালয়**। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষালয় আছে যেগুলো ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যক্তি বা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান এই ধরনের শিক্ষালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব নেন, এদের বলা হয় **ব্যক্তিগত মালিকানার শিক্ষালয়**। এছাড়া অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও কিছু শিক্ষালয় আছে যেগুলো কোন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। এরা বিশেষ ভাবে দান বা সাহায্যের উপর নির্ভর ক'রে চলে। সরকার থেকে কোন সাহায্য নেয় না। এদের বলা যায় **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষালয়**।

(২) দৈহিক অসামর্থ্যের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ (Classification on the basis ot Physical disabilities) : এই জাতীয় শিক্ষালয় আমাদের দেশে আগে বিশেষ ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের উদ্ভব হ'য়েছে, দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। দৈহিক ও মানসিক অসামর্থ্য অনুযায়ী, তাদের সেবা করার জন্য এবং যাতে ক'রে তা সমাজে পিছিয়ে না পড়ে তার জন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হ'য়েছে। যেমন, বর্তমানে আমাদের দেশে মূক ও বধিরদের জন্য পৃথক শিক্ষালয় আছে, খঞ্জ শিশুদের (Crippled children) শিক্ষালয় আছে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ ধরনের অসামর্থ্যের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের শিক্ষালয় আছে। এই শিক্ষালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল সেবামূলক কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠান সরকারী প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে; আবার কতকগুলো হয়ত সরকারী সাহায্যে গড়ে উঠেছে, আবার অনেকগুলো বিশেষ ভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

(৩) পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ (Classification on the basis of Curricula) : পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষালয়ের শ্রেণী বিভাগ প্রত্যেক দেশেই আছে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় বিশেষ বিশেষ পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। সমাজে বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত

(specialized) ব্যক্তির প্রয়োজনীয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সৃষ্টি হ'য়েছে। আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে—তাদের মোটামুটি কয়েকটা সাধারণ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, সাধারণ শিক্ষাদানের শিক্ষালয় (institution for general education)। এর ভেতর বিশেষ ভাবে বিদ্যালয় (School), কলেজ (College) এবং বিশ্ববিদ্যালয় (University) ইত্যাদি পড়ে। এরা বিশেষভাবে এক ধরনের বিমূর্ত জ্ঞান-সংক্রান্ত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে। এছাড়া আছে, টেকনিক্যাল শ্রেণীভুক্ত শিক্ষালয় (Technical institution)। এর ভেতর, বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ে। যেমন, পালিটেকনিক্ (জুনিয়ার ও সিনিয়ার) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও অন্যান্য কারিগরি কৌশল শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (School of technical trade)। এই সব শিক্ষালয়ের পাঠ্যক্রমে বিশেষ ভাবে কারিগরি দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আর এক শ্রেণীর শিক্ষালয় আছে যেখানে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। যেমন, মেডিক্যাল কলেজ ও ভেষজ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়া দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের গবেষণাগার আছে, যেখানে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের উপর উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(৪) **বয়স ও মানসিক যোগ্যতা অনুসারে শ্রেণীবিভাগ (Classification on the basis of age and attainment of the pupil) :** বর্তমান কালে মনোবিদ্‌রা মনে করেন শিক্ষার্থীর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক ক্ষমতারও বিকাশ হয় এবং তারা মনে করেন মানসিকতার দিক থেকে ব্যক্তির জীবনকে কয়েকটা বিশেষ পর্যায়ে ভাগ করা যায়। তাই আধুনিক কালে প্রায় সব দেশেই শিক্ষালয়গুলো শিক্ষার্থীর বয়সানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা আছে। আমাদের দেশেও এই ধরনের শ্রেণীবিভাগ বর্তমান। এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় সম্পর্কে আলোচনা করলে, প্রায় সকল রকম শিক্ষালয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তাই আমরা এখানে তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(ক) **নার্সারী বিদ্যালয় বা প্রাক্-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয় :** এই জাতীয় শিক্ষালয় দুই থেকে পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য। এই বয়সের শিশুদের স্বাভাবিক স্থান হ'ল গৃহ-পরিবেশ। কিন্তু, আধুনিক জীবনযাত্রার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে এই জাতীয় শিক্ষালয়ের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে অনুভূত হ'চ্ছে। পিতা-মাতা উভয়কে আজকাল অর্থ উপার্জনের জন্য বাড়ীর বাইরে যেতে হয়। তাই শিশুদের

লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই ধরনের শিক্ষালয়ের বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। তাই আজকাল বিশেষ ক'রে শহরাঞ্চলে এই ধরনের শিক্ষালয় গড়ে উঠেছে। এই সব শিক্ষালয়ে কোন গতানুগতিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় না। এখানে গৃহের মত স্নেহ পরিবেশে শিশুদের সাধারণ অভ্যাস গঠনের চেষ্টা করা হয়। নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি নানা রকম স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস এখানে গঠন করার চেষ্টা করা হয়। তাছাড়া শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিকাশের জন্য এবং ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী অনুশীলন করা হয়। খেলাধূলা, ছবি আঁকা, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের প্রচেষ্টা চলে এই সব শিক্ষালয়ে। এই শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর ইন্দ্রিয়গুলোকে সক্রিয় করা যাতে ক'রে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ম-মাফিক (formal) শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী হয়।

(খ) **প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়ঃ** প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষালয়ের দায়িত্ব হ'ল ছয় থেকে এগার বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাদান করা। এই পর্যায়ে আসলে নিয়ম-মাফিক শিক্ষা (formal education) শুরু হয়। এখানে পঠন, লিখন, এবং অঙ্ক শেখানোর ব্যবস্থা থাকে। তবে এই পর্যায়ে শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর মধ্যে যে সব অসামাজিক আচরণ আছে সেগুলোকে মার্জিত করা। আমাদের দেশে এই পর্যায়ের শিক্ষালয় দুই শ্রেণীর আছে। এক ধরনের হ'ল চার শ্রেণীযুক্ত সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় (Ordinary four class school) এবং অপরটি হ'ল পাঁচ শ্রেণীযুক্ত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Junior basic school)। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা ছয় বৎসর থেকে দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। আর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ছয় বৎসর থেকে এগার বৎসর বয়স পর্যন্ত থাকে। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লিখন-পঠন ও অঙ্কের সঙ্গে কিছু অন্যান্য বিষয়ও পড়ানো হয়। প্রকৃতি পরিচয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ও এখানে শেখানো হয়। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষ ভাবে কর্মকেন্দ্রিক। এখানে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিশুদের জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করা হয়। সুতা কাটা, বাগান করা, ইত্যাদি যৌথ কাজের মাধ্যমে শিশুর একদিকে যেমন সমাজ চেতনার বিকাশ সাধন করা হয়, তেমনি অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কৌশলাদি আয়ত্ত করতে সহায়তা করা হয়।

(গ) **মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালয়ঃ** প্রাথমিক স্তরের শিক্ষালয় থেকে

শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষালয়ে আসে। এই পর্যায়ে শিক্ষা সাধারণতঃ এগার বৎসর বয়স থেকে সতর বৎসর বয়স পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকে বহু প্রচেষ্টা করা হ'য়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রচলিত আছে তা আংশিক ভাবে মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী—পুনর্বিন্যাস করা হ'য়েছে। সমাজ-জীবনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বয়সের শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদার কথা চিন্তা ক'রে এই স্তরের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করা হ'য়েছে। এই পর্যায়ের শিক্ষাকে দু' পর্যায়ে ভাগ করা হ'য়ে থাকে এবং উভয় স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে। এর প্রথম স্তরকে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর বলা যেতে পারে। এই পর্যায়ে দু'ধরনের শিক্ষালয় দেখা যায়—(১) জুনিয়ার হাইস্কুল (Junior-School) এবং (২) উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় (Senior-basic School)। এখানে শিক্ষার্থীদের বয়স সীমা হ'ল চৌদ্দ বৎসর। জুনিয়ার হাইস্কুলের পাঠ্যক্রম সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমতা রেখে রচনা করা হয়। আর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষালয়ের সঙ্গে সমতা রেখে রচনা করা হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রধান অসুবিধা হ'ল এর পরবর্তী স্তরে শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই! এই বয়স কাল পর্যন্ত শিক্ষাকে ভারতীয় সংবিধানে সাধারণের জন্য বিবেচনা ক'রে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হ'য়েছে। সুতরাং এর পাঠ্যক্রম স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরকার ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। এই পর্যায়ের শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য হবে শিশুকে সমাজ-জীবনের উপযোগী সকল রকম জ্ঞানই দিতে হবে যাতে ক'রে সে সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

এর পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষাকে বলা হয় উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা। পূর্বে আমাদের দেশে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এক ধরনের শিক্ষালয় ছিল। সেখানে শিক্ষার্থীদের বয়ঃক্রম ছিল ষোল বৎসর পর্যন্ত। এই স্তর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—নবম ও দশম শ্রেণী। এই সব বিদ্যালয়েও পুঁথিগত গতানুগতিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং সব ছাত্রের জন্য একই রকম পাঠ্যক্রম ছিল। কিন্তু মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বর্তমানে আর এক শ্রেণীর শিক্ষালয়ের সৃষ্টি হ'য়েছে এতে বয়স সীমা বাড়িয়ে সতর বৎসর স্থির করা হ'য়েছে। এই জাতীয় শিক্ষালয়কে বলা হয় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই সব বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ব্যক্তির চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী যাতে নিজ নিজ আগ্রহ

এবং ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তাছাড়া সামাজিক চাহিদার কথা মনে রেখে একটা অবশ্য পঠনীয় পাঠ্যক্রমেরও (Core-Curriculum) ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই আধুনিক চিন্তাধারার উপর ভিত্তি ক'রে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও বর্তমানে এই জাতীয় পাঠ্যক্রম চালু করা হ'য়েছে।

(ঘ) **বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষালয়ঃ** মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা শেষ ক'রে ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী বৃত্তি নির্বাচন করবে বা কোন বৃত্তি-মূলক শিক্ষালয়ের পাঠ গ্রহণ করবে। বাকী যারা থাকবে তারা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সাধারণ শিক্ষালাভ করবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিশেষ ভাবে মহাবিদ্যালয় (College) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ বিভাগ (Teaching Departments of the University)-গুলির মাধ্যমে হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণ ভাবে স্নাতক স্তর তিন বৎসরের। তবে যে সব ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পর মহাবিদ্যালয়ে আসে তাদের জন্য প্রাক্ স্নাতক শ্রেণীও আছে। এর পরের স্তর হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত স্নাতোকত্তর স্তর দু' বৎসরের।

এমনি ভাবে বয়ঃক্রমের দিক থেকে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হ'য়েছে এবং প্রত্যেক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয়েরও সৃষ্টি হ'য়েছে। কোটারী কমিশনের রিপোর্টে অবশ্য সমস্ত শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে এবং এই রিপোর্টে বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয় সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। রিপোর্টে প্রাথমিক স্তরকে দু'ভাগে ভাগ করে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরকে বলা হ'য়েছে নিম্ন প্রাথমিক স্তর (Lower primary stage) এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরকে বলা হ'য়েছে উচ্চ প্রাথমিক স্তর (Upper primary stage); পরে মাধ্যমিক স্তরকেও দু'পর্যায়ে ভাগ করার কথা বলা হ'য়েছে—৯ম ও ১০ম শ্রেণী নিম্ন মাধ্যমিক স্তর এবং ১১শ ও ১২শ (অতিরিক্ত) শ্রেণীকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বলা হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হ'লে আশা করা যায় আমাদের দেশের শিক্ষালয়ের সংগঠনেরও যথাযোগ্য পুনর্বিন্যাস হবে।

(৫) **দায়িত্ব গ্রহণের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ (Classification on the basis of responsibility):** শিক্ষালয় সমাজেরই গড়া এক প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীরা শিক্ষালয়ে আসে কিছু সময়ের জন্য সমবেত হ'য়ে শিক্ষা

গ্রহণ করে, আবার চলে যায়। স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজ তার ভবিষ্যৎ বংশ-ধরদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব শিক্ষালয়ের উপর দিয়েছে। শিক্ষালয় সেই দায়িত্ব কিভাবে পালন করছে তার উপর নির্ভর করছে শিক্ষালয়ের যোগ্যতা। আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষালয় আছে তারা সবাই সমান দায়িত্ব নেয় না। কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে যেখানে শিক্ষার্থীরা স্থায়ী ভাবে বসবাস করে, এবং নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুশীলনের পর বাড়ী যায়। এই ধরনের শিক্ষালয়কে বলা হয় আবাসিক বিদ্যালয় (Residential School)। স্বাভাবিক ভাবে শিশুর বিকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্বই এই সব বিদ্যালয়ের উপর থাকে। কারণ শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ দিন সমাজ পরিবেশ বা গৃহ পরিবেশ থেকে দূরে থাকে। এই ভাবে শিক্ষালয়কে আমরা শ্রেণী বিভাগ করতে পারি—আবাসিক বিদ্যালয়, যাদের দায়িত্ব খুব বেশী, আর দিবা বিদ্যালয় (Day School)—যার দায়িত্ব খুবই কম। তার কারণ ছাত্ররা বেশীর ভাগ সময় পিতামাতার সঙ্গে বাড়ীতে থাকে। এমনি ভাবে বলা যেতে পারে ছাত্রাবাসযুক্ত বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি।

(৬) **সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগ (Classification on the basis of social status) :** এই ধরনের শিক্ষালয়ের শ্রেণী বিভাগ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ বিরুদ্ধ। তবু প্রচলিত রীতি বা সংস্কারকে আমরা আজও মুছে ফেলতে পারিনি। তাই দেখা যায়, কিছু শিক্ষালয় আছে যেগুলো বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের স্বার্থ রক্ষা করে। এবং সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে স্বাভাবিক আভিজাত্যের মনোভাব সৃষ্টি হয় যা তাদের অন্যান্য শিক্ষালয়ের ছাত্র থেকে পৃথক ক'রে রাখে। পূর্বে এই সব বিদ্যালয়ে অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের সন্তানদের পাঠের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সে রকম কোন বিধিনিষেধ না থাকলেও ঐ সব শিক্ষালয়ের বিশেষ ধরনের শিক্ষাদানের রীতি ও পাঠ্যক্রম তাদের ছাত্রদের অন্যান্য শিক্ষালয়ের ছাত্রদের থেকে পৃথক ক'রে গড়ে তোলে। এ জাতীয় শিক্ষালয় গুলোকে ইংলণ্ডের পাবলিক স্কুলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বর্তমানে অভিজাত শ্রেণীর জন্য না হোক শিক্ষালয় হিসেবে তাদের আভিজাত্য আছে।

(৭) **লিঙ্গ ভেদে শ্রেণী বিভাগ (Classification on the basis of Sex) :** সব দেশেই শিক্ষালয়কে শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ ভেদে শ্রেণী বিভাগ করা হয়। আমাদের দেশের শিক্ষালয়গুলোকে আমরা এদিক থেকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। পুরুষদের জন্য শিক্ষালয়, মহিলাদের জন্য শিক্ষালয় এবং মিশ্র শিক্ষালয়। এই শ্রেণীবিভাগ যে-কোন ধরনের শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হ'লেও, একথা মনে রাখতে হবে দুই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোন স্ত্রী-শিক্ষালয়েই তাদের উপযোগী পৃথক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয় না।

শিক্ষার সংস্থা (২)
Agencies of Education

শিক্ষা সংস্থা সম্পর্কে আলোচনার সূচনায় আমরা উল্লেখ করেছি শিক্ষার সংস্থাকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্থা। প্রত্যক্ষ সংস্থা হিসেবে আমরা শিক্ষালয় (School) সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন কয়েকটি পরোক্ষ সংস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। এখানে আমরা গৃহ (Home) বা পরিবার (Family), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious institution), রাষ্ট্র (State), সমাজ সংগঠন (Social organisation) এবং অন্যান্য গণ-সংযোগের প্রতিষ্ঠান (Other mass communication arrangements) উল্লেখ করবো। এই সব পরোক্ষ প্রতিষ্ঠান, সমাজের বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে। কিন্তু তারা কোন-না কোন ভাবে ব্যক্তির শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই কারণে তাদের শিক্ষার সংস্থা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

গৃহ বা পরিবার (Home or Family)

সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হ'ল পরিবার। যে-কোন সমাজ ব্যবস্থায়ই গৃহ বা পরিবারের স্থান ছিল। পরিবারই সমাজের একমাত্র প্রতিষ্ঠান (Social institution) যার থেকে অন্যান্য সমাজ প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হ'য়েছে। বলার্ড (Ballard) বলেছেন—"family is the original social institution, from which all other institutions developed." সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৃহ বা পরিবারের উপর নানা রকম দায়িত্ব এসে পড়ে। পরিবারের মধ্যে বা গৃহ পরিবেশেই শিশু প্রথম জন্মলাভ করে। আর এই গৃহ পরিবেশেই শিশুরা প্রথম বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কের (Social relations) সঙ্গে পরিচিত হয় এবং সমাজ-জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সে লাভ করে। গৃহ পরিবেশের মধ্যেই শিশু বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক আচরণ শেখে। কথা বলা, হাঁটা, কাপড় পড়া ইত্যাদি নানারকম অভ্যাস এখানে গঠন করে, তাই গৃহের দায়িত্ব হবে, শিশু যাতে যথার্থভাবে এই সব কৌশল আয়ত্ত করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়া, এছাড়া গৃহ পরিবেশের মধ্যেই শিশুর নানা ধরনের সামাজিক সত্তার বিকাশ লাভ করে, সহানুভূতির সঙ্গে কি ভাবে অন্যের

সঙ্গে মিশতে হয় তা শেখে। শিক্ষাবিদ্ রেমণ্ট (Raymont) বলেছেন "The home is the social unit in which spring up those virtues of which sympathy is the common characteristic. রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"It represents the truth of human relationship, it reveals loyality and love for the personality of man," এছাড়া পরিবার বা গৃহের অর্থনৈতিক দায়িত্বও আছে। গৃহ পরিবেশেই শিশুদের বৃত্তি শিক্ষা হ'য়ে থাকে। প্রাচীনকালে বৃত্তিমূলক শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিবারের উপরই ছিল। এই দায়িত্ব পরিবার আজকাল সম্পূর্ণভাবে পালন না করলেও আংশিক ভাবে পালন করে। শিশুদের অবচেতন মনে পিতামাতার প্রভাব নানা দিক থেকে ক্রিয়া করে। অনেক সময় বৃত্তি নির্বাচন পিতা-মাতার প্রভাবেই হ'য়ে থাকে। এ ছাড়া গৃহ পরিবেশে শিশুরা কিছু সামাজিক গুণ (social virtues) আয়ত্ত করে। গৃহ এদিক থেকে সামাজিক দায়িত্বও পালন করে। শিশুর নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও শিক্ষালয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পিতামাতার সঙ্গে থাকতে থাকতে তাদের জীবনের নৈতিক মান উন্নত হয় এবং তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই সকল দায়িত্ব ছাড়া গৃহ শিক্ষার দায়িত্ব পরোক্ষভাবে পালন করে। আর শিক্ষার সংস্থা হিসেবে তার উপযোগিতা মোটে কম নয় বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিশু শিক্ষালয়ে আসার আগে পর্যন্ত গৃহই তার শিক্ষার দায়িত্ব নেয় এবং শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন গৃহই শিশুর প্রাক্ শিক্ষালয় পর্যায়ে শিক্ষার আদর্শ স্থান। এর কারণ হ'ল—

[এক] আমরা জানি শিক্ষা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষা পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সংঘটিত হয়। গৃহ হ'ল এমন ধরনের সংস্থা যেখানে এই পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক খুব সহজ এবং স্বাভাবিক। শিশু পিতামাতার সঙ্গে বাস করতে করতে খুব সহজ ভাবে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস খুব সহজে শিখতে পারে।

[দুই] দ্বিতীয়তঃ, শৈশবই অভ্যাস গঠনের সময়। গৃহের জীবনে শিশু নানা ধরনের সুঅভ্যাস গঠন করতে পারে। এই বয়সে শিশুর মন অনেক বেশী নমনীয় থাকে তাই তাকে খুব সহজেই অনেক কিছু শেখানো যায়। তাছাড়া তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও তখন থাকে অনেক কম। তাই শেখা অনেক সহজ হয়।

[তিন] তৃতীয়তঃ, যে সব শিশুরা বেশীদূর পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষাগ্রহণ করতে

ইচ্ছুক নয়, যে সব পিতামাতার শিশুকে শিক্ষালয়ে পাঠানোর সংগতি নেই তাদের পক্ষে শিশুকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া গৃহেই সম্ভব হয়। ছেলেরা পিতার কাছ থেকে তারই বৃত্তিতে শিক্ষালাভ করে এবং মেয়েরা খুব সহজ ভাবে মায়ের কাছ থেকে গৃহ পরিচালনার কাজ শিখতে পারে।

[চার] পরিবারের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন হয়। শিশু পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন সভ্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণের অধিকারী হয়। গৃহ পরিবেশ থেকে সে যে সব সামাজিক আচরণ শিক্ষা করে তাই সে ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগায়। এ কারণে শিক্ষাসংস্থা হিসেবে গৃহের গুরুত্ব সকলে স্বীকার করেন।

[পাঁচ] সমাজের মধ্যেই শিশুর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়। সে পরিবারের অন্যান্য বয়স্ক লোকদের সঙ্গে সামাজিক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এর ফলে তার আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হয়। শিক্ষার একটা লক্ষ্য হ'ল—ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা। সুতরাং আমরা বলতে পারি গৃহ এদিক থেকে শিক্ষা-সংস্থার কাজ অনেকটা এগিয়ে দেয়।

সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, গৃহ পরিবেশ অন্যান্য আদর্শ ছাড়াও শিক্ষার সংস্থা হিসেবে শিশুর প্রথম কয়েক বছরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। বর্তমান কালে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সংগঠনেরও অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে, তা সত্ত্বেও পরিবার অনেকাংশে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিশুর শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে জর্জ হার্বার্ট (George Herbert) বলেছেন—"One good mother is worth a hundred school master। কারণ শিশু পিতা বা মাতার আদর্শ বা বাক্য যত সহজভাবে মেনে নেয় অন্য কারুর কথা অত সহজে গ্রহণ করে না। গৃহ পরিবেশ মানুষের একান্ত আপন পরিবেশ এবং সেই জন্য তা শিশুকে সহজভাবে বিকশিত করতে সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর Creative unity-তে বলেছেন—"The permanent significance of home in not in the narrowness of its enclosure, but in an eternal moral idea. তবে সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা দরকার শিক্ষা সংস্থা হিসেবে সার্থকতা লাভ করতে হ'লে গৃহকে আদর্শ পরিবেশ রচনা করতে হবে। ভাল গৃহ পরিবেশের জন্য যেমন আমরা অনেক সময় ভাল ফল পাই, তেমনি আবার খারাপ গৃহ পরিবেশের জন্য মন্দ ফলের অভাব নেই। বিশেষ ক'রে আমাদের মত দেশে

সংগ্রহ করতে পারবেন। এই শিক্ষকদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে। শিক্ষকদের এই পরিদর্শনের ফলে শিক্ষালয় যেমন অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে অন্যদিকে অভিভাবকদের সঙ্গেও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

[চার] **নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা :** শিক্ষালয় থেকে গৃহে রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। তবে বর্তমান প্রচলিত রিপোর্ট দানের পদ্ধতি খুবই গতানুগতিক এবং তার দ্বারা অভিভাবকদের সক্রিয় করা যায় না। এইজন্য কম সময়ের ব্যবধানে শিক্ষার্থী সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা করলে, এবং ঐ রিপোর্টের উপর অভিভাবকের বক্তব্য লেখার সুযোগ থাকলে শিক্ষালয়ের সঙ্গে গৃহের সহযোগিতা সম্পর্ক স্থাপন হয়।

॥ আলোচনা ॥

মনে রাখা দরকার শিক্ষালয়, সমাজ ও গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সম্পর্ক স্থাপিত না হ'লে কোন শিক্ষা পরিকল্পনারই সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ গৃহ পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষা যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর হ'তে পারে না, তেমনি গৃহ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষালয়ের শিক্ষাও সার্থক হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণভাবে গৃহ পরিবেশের উপর নির্ভর করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি তাই বলেছেন "....বালকেরা সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরী হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণময় নয়।" আবার অন্যত্র সম্পূর্ণ শিক্ষালয়ের উপর নির্ভরশীল শিক্ষা ব্যবস্থাকেও সমালোচনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন গৃহ ও শিক্ষালয়ের মধ্যে সার্থক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা। তাই তিনি চেয়েছেন এমন এক পরিবেশ যেখানে গৃহের স্বাভাবিক স্নেহময় পরিবেশ থাকবে এবং শিক্ষালয়ের সকল বৈশিষ্ট্যও থাকবে। তিনি তাঁর আশ্রমে এই আদর্শ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি তাই বলেছেন..."ছেলেদের এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।"

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (Religious Institution)

সার্থক সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনে শিক্ষালয়, পরিবার এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান সমাজ-ব্যবস্থার তিনটি স্তম্ভ। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের

প্রধান কাজ হ'ল সামাজিক মানুষের নৈতিক ও অধ্যাত্মিক জীবনকে জাগ্রত করা। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ। সমাজ-বিদ্‌রা মনে করেন ধর্ম (Religious) সমাজ বন্ধনের (Social control) একটি বিশেষ উপযোগী কৌশল। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা সুতরাং শিক্ষার লক্ষ্যের সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজ ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে আমরা শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, প্রত্যেক দেশেই শিক্ষা শুরু হ'য়েছিল ধর্ম প্রচারের আনুসঙ্গিক হিসেবে। ভারতবর্ষে দেখতে পাই প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা মন্দির, বৌদ্ধ মঠ, এবং মজসিদ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রসারও আমাদের দেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল। যদিও বর্তমান সমাজবিদ্‌রা মনে করেন, মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব অনেক কমে আসছে যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, তবুও ধর্মের মূল আদর্শগুলো মানুষের জীবন থেকে একেবারে মুছে যায়নি। বিশেষ ক'রে ভারতবাসীরা এখন, অন্তরে ধর্মভাবাপন্ন। তবুই শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে এবং ব্যাপক করতে হ'লে ধর্মীয় আচার-আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা দান পদ্ধতির প্রসার করতে হবে। আমদের দেশে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। তাদের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। যেমন, যাত্রাগান, পালাগান, পাঁচালী, কীর্তন, কথকথা ইত্যাদির দ্বারা জনশিক্ষার প্রসার সহজ হবে। তাছাড়া ধর্মের মূলনীতি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মান উন্নত করে, আধ্যাত্মিক ভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত করবে। ধর্মের সংকীর্ণতাকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যেকার সর্বজনীন মূলভাবকে শিশুদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারলে শিশুকে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হবে। এই কারণে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

॥ রাষ্ট্র (State) ॥

রাষ্ট্র ব্যক্তি-জীবনের আদর্শের রক্ষক। গার্ণার (Garner)-এর মতে রাষ্ট্র হ'ল একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী এক দল ব্যক্তির সমষ্টি যা একটি স্বাধীন সার্বভৌম সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। [The state is a community of persons, more or less numerous, permanently occupying

a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organised Government to which the great body of inhabitants render habited obedience. রাষ্ট্রের কাজ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ বিভিন্ন ধরনের মতবাদ পোষণ করেন। রুশোর সামাজিক তত্ত্ব (Social contact theory) অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ হবে. বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করা এবং রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তির সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করা। কিন্তু আধুনিক কালে রাষ্ট্রের তাৎপর্যের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার নীতি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ফলে তার দায়িত্বেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের দু'ধরনের দায়িত্বের কথা বলেছেন বিখ্যাত দার্শনিক রাশেল (B. Russel)। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রের দায়িত্বকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—

(১) আভ্যন্তরীণ কাজ (Internal function) এবং

(২) বাহ্যিক কাজ (External function)। আভ্যন্তরীন দায়িত্বের মধ্যে সাধারণভাবে পড়ে যাতায়াত-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ডাক-ব্যবস্থা, শিক্ষা ইত্যাদি। আর বাহ্যিক কাজের মধ্যে আসে অন্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ইত্যাদি। সুতরাং আধুনিক কালে শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্গত করা হ'য়েছে। এর প্রধান কারণ হ'ল, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল কথা হ'ল—প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী কাজে নিয়োগ করতে হবে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া এই ধরনের আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই আধুনিক কালে প্রত্যেক চিন্তাবিদ্ মনে করেন, রাষ্ট্রকে শিক্ষার দায়িত্ব অবশ্যই নিতে হবে। লাস্কি (H. Laski) বলেছেন—"Education of the citizen is the heart of the modern state." ভারতবর্ষে এই দায়িত্বকে যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাই সংবিধানে ছয় থেকে চোদ্দ বৎসর পর্যন্ত শিশুদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক রাজ্য সরকারকে বলা হ'য়েছে। এই সব দিক বিবেচনা ক'রে আধুনিক কালে আমরা রাষ্ট্রকে শিক্ষার সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

রাষ্ট্রের শিক্ষামূলক দায়িত্ব (Educational function of the State) :

রাষ্ট্রের হাতেই সব রকম নিয়ন্ত্রণ কৌশল আছে। তার তাই নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্র

দিয়ে রাষ্ট্র শিক্ষাকে সহজভাবে সমাজ নির্ধারিত পথে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ ক'রে, অর্থ সাহায্য ক'রে এবং যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রাষ্ট্র শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে পারে। এখন আলোচনা করা যাক রাষ্ট্র কি কি ভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনায় সহায়তা করতে পারে।

[এক] শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ের দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের উপর। রাষ্ট্র শিক্ষালয়গুলোকে পথ দেখিয়ে দেবে। সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হবে, শিক্ষার্থীর কোন্ কোন্ গুণের আমরা বিকাশ করতে চাই, এই সব কিছু শিক্ষালয়কে নির্দেশ ক'রে দেবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র তার অন্যান্য সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করবে ; যে শিক্ষাদর্শ সমাজের আদর্শেরই প্রতীক হবে। রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন—"Our educational system must find the guiding principle in the aim of the social order for which it prepares and in the nature of the civilization, it hopes to build up."

[দুই] রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্ণয়ে শেষ হ'য়ে যাবে না। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ব্যবস্থাও করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষালয় স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষালয়কে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, যাতে ক'রে তারা লক্ষ্যানুযায়ী শিক্ষা পরিচালনা করতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্য যদি ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তবে তার জন্য বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজন মত শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করতে হবে, সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী। কারিগরি ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের আয়োজন রাষ্ট্রকে করতে হবে।

[তিন] রাষ্ট্রের সংহতি বজায় রাখতে হ'লে নাগরিকদের সমাজ আদর্শে শিক্ষা দিতে হবে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য সমান হওয়ার দরকার। সেইজন্য বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে হবে। আজকাল জাতীয় শিক্ষানীতি ও পাঠ্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কোঠারী কমিশনের রিপোর্টেও এই আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। অবশ্য পাঠ্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় অবস্থার প্রভাব ঠিকই থাকবে তবে তা এক নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ ক'রে না চললে রাষ্ট্রে শিক্ষাব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

[চার] শিক্ষাকে জাতীয় সংহতির ও জাতীয় জীবনের বিকাশের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করলে, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রকের মাধ্যমে সমগ্র দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। রাষ্ট্র যেমন একদিক থেকে শিক্ষালয়ের অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেবে, অন্যদিকে শিক্ষালয়গুলো নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হ'চ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বন্দোবস্ত রাখতে হবে রাষ্ট্রকে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে (কোঠারী কমিশন, ১৯৬৬) স্নাতক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার তদারকের জন্য জেলা স্কুলবোর্ড (District School Board) গঠনের কথা বলা হ'য়েছে।

[পাঁচ] সমাজের গতিশীলতার সঙ্গে তাল রাখার জন্য রাষ্ট্রকে শিক্ষা-সংক্রান্ত গবেষণার কাজ হাতে নিতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষালয়কে সহায়তা করার জন্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। জাতীয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (National Council of Educational Research and Training) এই বিষয়ে বর্তমানে যথেষ্ট সাহায্য করছে। এই ধরনের গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান আরো আমাদের দেশে প্রয়োজন, যারা শিক্ষা নিয়ে নতুন গবেষণা করবে। এই কাজকে সুপরিকল্পিত আকারে রূপ দেওয়ার জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন রাজ্য শিক্ষা সংস্থা (State Institute of Education) প্রতিষ্ঠা করার সুপারিশ করেছেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষামূলক গবেষণা করা এবং শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।

[ছয়] সবশেষে রাষ্ট্রকে আরো অনেক ছোট খাটো দায়িত্ব নিতে হবে শিক্ষার ব্যাপারে। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে প্রসার করার জন্য আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমীক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে কমিটি ও কমিশন নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের নির্ধারিত পথে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

সুতরাং, আধুনিক রাষ্ট্রের শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব অনেকখানি। যদিও রাষ্ট্রকে আমরা শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করেছি, তাহ'লেও আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবেই কাজ করতে হয়। রাষ্ট্র যদি শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় না হয় তবে কল্যাণময় রাষ্ট্র (Welfare State) স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না। রাষ্ট্র ব্যক্তি জীবনের সকল রকম নিরাপত্তায় যত্নবান হবে। জনগণের বৌদ্ধিক, নৈতিক ও দৈহিক বিকাশ যদি না করা যায়, তবে তাকে কোন রকমেই নিরাপত্তা দেওয়া যাবে

না। তাই রাষ্ট্রকে শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি-জীবনের বিভিন্ন দিকের উন্নয়ন করতে হবে। ব্যক্তি যদি পিছিয়ে থাকে, সে যদি অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ থাকে, তাহ'লে রাষ্ট্রের কোন রকম কল্যাণকামী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হবে শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ। এর মধ্য দিয়েই সমাজাদর্শ পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে যাবে।

সামাজিক সংগঠন (Social Organisation)

সংগঠন বলতে আমরা বুঝি—সংঘ, যেখানে একদল ব্যক্তি বিশেষ এক চাহিদা মেটানোর জন্য একত্রিত হয়। এই ধরনের সংগঠন প্রত্যেক সমাজের মধ্যেই আছে। এদের মধ্যে কোন কোন সংগঠন খুবই অস্থায়ী। অর্থাৎ, এরা মানুষের বিশেষ কোন সাময়িক চাহিদা মেটায়, আবার কোন সংগঠন আছে যারা স্থায়ী এবং মানুষের কোন বিশেষ স্থায়ী চাহিদা মেটাতে সহায়তা করে। যেমন, খেলাধূলার জন্য সংগঠন বা ক্লাব, আমোদ প্রমোদের সংগঠন (Recreation Club) ইত্যাদি। এই সব সংগঠন শিক্ষাকে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে। এদের মাধ্যমে মানুষ মেলামেশার সুযোগ পায় এবং ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ পায়। পারস্পরিক প্রতি-ক্রিয়ার মাধ্যমে এক ব্যক্তির প্রভাব অপর ব্যক্তির উপর এসে পড়ে। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করতে পারি, সমাজ-শিক্ষণ শিবির (Social Education centre)-এর কথা। ভারতবর্ষে বয়স্ক শিক্ষার প্রসারের জন্য এই ধরনের সমাজ-শিক্ষণ সংস্থা গড়ে উঠেছে। এখানে সামান্য লেখাপড়ার সঙ্গে নানা ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার হয়। এছাড়া আর এক ধরনের সংগঠন লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাহ'ল যুব আন্দোলন। এই যুব আন্দোলনকে প্রসার করার জন্য নানা রকম অনুষ্ঠান করা হয় যেমন যুব উৎসব, যুবসম্মেলন, শিক্ষামূলক ভ্রমণ ইত্যাদি। এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও শিক্ষার প্রসার হয়। এই ধরনের সামাজিক সংগঠন গুলোকে আমরা শিক্ষার পরোক্ষ সংস্থা বলতে পরি।

গণ সংযোগ ব্যবস্থা (Mass Communication Arrangements)

আধুনিক কালে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিসন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের যে গণ সংযোগের মাধ্যম আছে, তারাও পরোক্ষ ভাবে শিক্ষার কাজকে সহায়তা করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সকল রকম তথ্যই এদের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। এদের মধ্যে শিক্ষামূলক সম্ভাবনা প্রচুর আছে বলেই বিশেষ ভাবে এই সংস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়। আজকাল আমাদের দেশে বেতারের

মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বিদ্যার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান যেমন, বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যও অনুষ্ঠান আকাশবাণী থেকে প্রচার করা হয়। আবার কৃষিকথার আসরের মাধ্যমে কৃষকদের শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার অনেক দ্রুত হয় তার কারণ, এরা গণমনকে খুব সহজেই প্রভাবিত করতে পারে।

॥ আলোচনা ॥

শিক্ষার সংস্থা (Agencies of Education)

শিক্ষার সংস্থা প্রসঙ্গে আমরা বিভিন্ন সংস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমরা বিভিন্ন ধরনের সংস্থা সম্বন্ধে যে আলোচনা করলাম তার ভেতর কোন বিশেষ একটাকে একক ভাবে বেছে নিয়ে বলতে পারি না যে, তার কাজই প্রধান যদিও শিক্ষালয়, শিক্ষার প্রত্যক্ষ সংস্থা, তাহ'লে অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া সে একক ভাবে নিজস্ব দায়িত্ব পালন করতে পারে না। শিক্ষার অন্যান্য সংস্থা সমাজের অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি হ'য়েছে কিন্তু তাহ'লেও শিক্ষাজীবনে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে তাকে বাদ দিয়ে কিছু চলতে পারে না। তাই এই সব সমাজ প্রতিষ্ঠান (Social institution) তাদের বিশেষ দায়িত্বের বাইরে পরোক্ষ ভাবে শিক্ষাকে প্রভাবিত করেছে। তাদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের প্রত্যেকের সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমেই ব্যক্তি-জীবনের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করবে।

পাঠ্যক্রম
The Curriculum

পাঠ্যক্রম কি ? (What is Curriculum ?)

পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করার পর আমাদের প্রথম যা ভাবতে হবে শিক্ষার্থীদের আমরা কি শেখাবো। কি শেখাবো ঠিক না ক'রে, কোথায় শেখাবো, কখন শেখাবো এবং কিভাবে শেখাবো তা ভাবা যায় না। সুতরাং শিক্ষাতত্ত্বে লক্ষ্যের (aim) পর পাঠ্যক্রমের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা পাঠ্যক্রম কথাটি ইংরাজী ক্যারিকুলাম (curriculum) কথার সমর্থক। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইংরেজী Curriculum কথাটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ ক্যুরিয়ার (Currere) থেকে। এর অর্থ হ'ল দৌড়। সুতরাং এই কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য দৌড়ের পথ (Course to be run for reaching a certain goal) অর্থাৎ শিক্ষাকে দৌড়ের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে যার লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার নির্ধারিত উদ্দেশ্য। শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীকে বিশেষ নির্ধারিত পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার লক্ষ্যে পৌছে দেওয়া। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হ'য়েছে—পাঠ্যক্রম হ'ল বিভিন্ন স্তরের শিক্ষালয়ে যে পাঠ্যবিষয় অনুশীলন করা হয় তার সমবায় মাত্র। "(A course of study laid down for the students of a university or school. or in a wider sense, for schools of certain standard ..). সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুকে সার্থক হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়েছে।

কিন্তু আধুনিক কালে, পাঠ্যক্রমের ধারণার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। শিক্ষাকে আমরা যদি গতিধর্মী প্রক্রিয়া (Dynamic Process) হিসেবে বিবেচনা করি তাহ'লে পাঠ্যক্রম, এই গতানুগতিক অর্থে সেই শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌছাতে সহায়তা করবে না। আধুনিক তাৎপর্য অনুযায়ী বিষয়বস্তু, পাঠ্যক্রমের অংশ মাত্র। ছাত্ররা শিক্ষালয়ে এবং সমাজে যা কিছু শেখে শিক্ষকের পরিচালনায় তাই হ'ল তার পাঠ্যক্রম। শিক্ষক এবং ছাত্রদের পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যা কিছু শেখে তাই পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত। শিক্ষাবিদ্‌ পেনি (Payne)

বলেছেন—"Curriculum consists of all the situations that the school may select and consciously organise for the purpose of developing the personality of its pupils and for making behaviour changes in them." শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সব কর্মসূচী বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হয় তারই সমবায়কে আমরা আধুনিক অর্থে পাঠ্যক্রম বলছি। মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টেও পাঠ্যক্রমের এই ধরনের ব্যাপক তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কমিশন বলেছেন—'According to the best modern educational thoughts curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in schools but it includes the sum total of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom. library, laboratory, workshop, play-grounds and in the numerous informal contacts between teachers and pupils." অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে বলা যায় শিক্ষা দু'ধরনের প্রক্রিয়ার সমন্বয়। একটা হ'ল ব্যক্তিগত-প্রক্রিয়া যাকে আমরা ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে পারি। দ্বিতীয়টা হ'ল সামাজীকরণ-প্রক্রিয়া যাকে আমরা বলতে পারি সমাজ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের প্রক্রিয়া। শিক্ষা দুই ধরনের প্রক্রিয়ারই সমন্বয়, কারণ, শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা এই দু'ধরনের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখতে চাই। এই দুই প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আসে। পাঠ্যক্রম হ'ল এই সব অভিজ্ঞতার সমবায়। অর্থাৎ শিক্ষা যদি হয় একটি প্রক্রিয়া তাহ'লে পাঠ্যক্রম হ'ল সেই প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করার পন্থা।

পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা (Need for Curriculum) :

শিক্ষার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলেই পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা স্বাভাবিক ভাবে উপলব্ধি করা যায়। পাঠ্যক্রম হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌছানোর উপায়। উপায় যদি আমাদের জানা না থাকে তবে কোন উচ্চ শিক্ষাদর্শ দিয়েই ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে পারি না। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য (aims) নির্ণয়ের পরই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হ'ল পাঠ্যক্রম নির্ধারণ। পাঠ্যক্রম ঠিক না করলে পদ্ধতি ও মাধ্যম কিছুই নির্দিষ্ট করা যাবে না। কি শিক্ষা দেওয়া হবে, তা ঠিক না করলে কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে, বা কোথায় শিক্ষা দেওয়া হবে এই জাতীয় সমস্যা

আসতে পারে না। পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হয়। তাই পাঠ্যক্রম শিক্ষাদর্শনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এক কথায় বলা যেতে পারে পাঠ্যক্রম ছাড়া শিক্ষা প্রক্রিয়ার অন্যান্য সকল অঙ্গই নিষ্ক্রিয়। পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রকে সক্রিয় ক'রে তোলে। সমস্ত রকম শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার মূলে আছে এই পাঠ্যক্রম। তাই পাঠ্যক্রম শিক্ষা বিজ্ঞানে এবং বিশেষভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিক্ষালয়-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যক্রম (Different types of Curriculum):

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। মানুষের জীবনাদর্শও যুগে যুগে পরিবর্তিত হ'চ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য। বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারাও বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন অংশ বিশেষ-ভাবে তার লক্ষ্যকে প্রভাবিত করছে। সঙ্গে দেখতে পাই মানুষের এই চিন্তা-ধারার অভিব্যক্তি আমাদের যেমন নতুন নতুন শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করেছে, তেমনি পাঠ্যক্রমের তাৎপর্যকে আমাদের সামনে নতুনভাবে তুলে ধরেছে। শিক্ষার লক্ষ্য যেমন বিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'তে হ'তে বর্তমানে সমন্বয়ের মধ্যে নতুনরূপ লাভ করছে, তেমনি পাঠ্যক্রমও বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রে আধুনিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। আমরা এখানে বিশেষ কয়েক ধরনের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করবো যারা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন—(১) গতানুগতিক পাঠ্যক্রম বা বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Traditional or subject-centred curriculum), (২) কর্ম কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity curriculum), (৩) অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience curriculum), (৪) অবিচ্ছিন্ন পাঠ্যক্রম (Undifferentiated curriculum), এবং (৫) জীবন-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Life-centred curriculum)। এদের প্রত্যেকের সম্পর্কে আমরা পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

॥ এক ॥ গতানুগতিক বা বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (The traditional or Subject-centred Curriculum):

গতানুগতিক পাঠ্যক্রম বলতে আমরা আমাদের দেশে বহুদিন ধরে প্রচলিত যে পাঠ্যক্রম ছিল বা এখনও আছে তার কথাই বলছি। এই পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। শিক্ষালয়ের কাজ হবে শিক্ষার্থীকে ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, ইংরেজী, ইত্যাদি—এরকম কতকগুলো

বিষয়ে জ্ঞান দান করা। এই জাতীয় পাঠ্যক্রম নির্ধারণের দু'টো হেতু ছিল। প্রথমতঃ তখন শিক্ষার লক্ষ্য ছিল খুবই সংকীর্ণ। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে সাধারণের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বৃত্তি সংগ্রহ করার পন্থা মাত্র। দু' এক কলম লিখতে পারলে এবং কিছু পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু আওড়াতে পারলে একটা চাকরি কোন রকমে পাওয়া যেতো। তাই শিক্ষার এই সংকীর্ণ লক্ষ্য পাঠ্যক্রমের প্রসারতাকে কমিয়ে ফেলেছিল। দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের পাঠ্যক্রম মনোবিদ্যার এক ভুল তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছিল। এই তত্ত্ব হ'ল মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of formal discipline)। এই তত্ত্বে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌রা মনে করতেন, মানুষের মন কতকগুলো প্রাথমিক বৃত্তি (faculty) বা ক্ষমতা দিয়ে তৈরী। আবার এমন কতকগুলো পাঠ্য বিষয় আছে যে গুলো মনের কোন বিশেষ ক্ষমতা বা বৃত্তিকে বিকাশ করতে পারে। যেমন, তারা মনে করতেন মনের এই ক্ষমতার মধ্যে আছে বিচার-শক্তি, যুক্তি-শক্তি, স্মৃতি-শক্তি ইত্যাদি এবং তাঁরা আরো মনে করতেন বিশেষ কোন বিষয়, ধরা যাক্ গণিত পাঠের মাধ্যমে যুক্তি-শক্তির উৎকর্ষ হয় এবং কোন বিশেষ বিষয় পাঠের মাধ্যমে মনের কোন ক্ষমতার যে বিকাশ হয় তা সমপরিমাণে যে কোন পরিস্থিতিতে কাজ করে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিকে জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করিয়ে তার যুক্তি-শক্তিকে বৃদ্ধি করলে সেই যুক্তি-শক্তি জীবনের যে-কোন পরিস্থিতিতে কাজে লাগাতে পারবে, বা ব্যবসার ক্ষেত্রেও সে কৃতকার্য হবে। এই ধরনের মনের তত্ত্ব যাকে বলা হয় মানসিক শক্তিবাদ (Facutly Psychology) এবং মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব কোনটাকেই আর আধুনিক মনোবিদ্‌রা মেনে নেন না এবং এগুলো ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত হ'য়েছে। এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা থেকে গতানুগতিক পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উদ্ভব, তাছাড়া, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ ও তার আধুনিক তাৎপর্য শিক্ষার ইতিহাসে অনেক পরে এসেছে। প্রাচীন কালে পাঠ্যক্রমকে পাঠ্য বিষয়ের সমষ্টির সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত। পাঠ্যক্রম সম্পর্কে এই সংকীর্ণ ধারণা গতানুগতিক পাঠ্যক্রম নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের ত্রুটি (Defects of Traditional Curriculum):

গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের যে সব ত্রুটি আছে তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা তো করেই না বরং তাকে ব্যাহত করে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা যে সব ত্রুটির কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো।

[এক] পূর্বেই বলা হ'য়েছে, এই ধরনের পাঠ্যক্রমে বিষয়ের জ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এই সব বিষয় আয়ত্ত করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ও স্থির ক'রে দেওয়া হয়। শিক্ষালয়ের সময় তালিকার মধ্যে সময় ও বিষয়বস্তুর পরিমাণ নির্দেশ ক'রে দেওয়া থাকে। ফলে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন হয় না। পাঠ্য বিষয়গুলোকে পৃথক পৃথক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জ্ঞানের সামগ্রিকতা আসে না।

[দুই] এই ধরনের পাঠ্যক্রম পূর্বপরিকল্পিত নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করে; ফলে তার মধ্যে পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই তাদের রুচি, আগ্রহ, মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একই ধরনের বিষয় পড়তে হবে। তাই এর দ্বারা ব্যক্তিরও উন্নতি হয় না, সমাজেরও না। সুতরাং উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এর মধ্যে ত্রুটি আছে।

[তিন] এই ধরনের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার সময় শিশুদের মানসিক অবস্থার কথা বিচার করা হয় না। বয়স্ক মনের প্রভাবই এর ওপর বেশী। তাঁরা যেভাবে চান ঠিক সেইভাবেই পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করেন। প্রকৃত ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায় এই ধরনের পাঠ্যক্রম যাঁরা স্থির করেন, অনেক সময় তাঁদের শিশু মনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকে না। ফলে এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিশুমনের গ্রহণযোগ্য হয় না।

[চার] এই ধরনের পাঠ্যক্রমে বিষয়ের জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় ব'লে শিক্ষকরা তাদের পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। মুখস্থের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। ফলে শিক্ষার ব্যবহারিক দিককে অবহেলা করা হয়। মুখস্থ ক'রে শেখা বিষয়ের জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার্থীরা জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যা সমাধান করতে পারে না। কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশের জন্য তারা মুখস্থ করে। ফলে এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিক্ষার প্রকৃত আদর্শের দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে না।

[পাঁচ] এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে আমরা যে বিভিন্ন ধরনের বিষয় নির্বাচন করি তার মাধ্যমে আমাদের প্রকৃত সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের পুনরুত্থাপন সম্ভব হয় না। এই পাঠ্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। তাই এই পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা হ'তে পারে না।

[ছয়] এই পাঠ্যক্রমের তাৎপর্য খুবই সংকীর্ণ। শিক্ষালয়ে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের অধ্যয়নের মাধ্যমে যে জ্ঞান আহরণ করা হয়, তাই শিক্ষা। গতানুগতিক

পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তই করতে হয়। কিন্তু শিক্ষালয় ছাড়াও যে শিক্ষার অন্যান্য সংস্থা আছে, এই অর্থ এর দ্বারা প্রকাশ হয় না। এই সব শিক্ষা সংস্থা, যেমন—গৃহ, রাষ্ট্র, বেতার, চলচ্চিত্র ইত্যাদি এরা কোন বিশেষ পাঠ্য বিষয়ের মাধ্যমে পাঠদান না ক'রেও এদেরও যে গুরুত্ব আছে শিক্ষাক্ষেত্রে তা স্বীকার করা হয় না।

[সাত] এই ধরনের পাঠ্যক্রমে যা আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল এবং লক্ষ্য করা গেছে এই ধরনের পাঠ্যক্রমে বিশেষ ভাবে ইংরেজী শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'ল, মাতৃভাষা বা স্থানীয় ভাষার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হ'ত না। অবশ্য স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হ'চ্ছে।

এই ধরনের সাধারণ কতকগুলো দোষত্রুটি ছাড়াও মুদালিয়ার কমিশন (মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, ১৯৫২) আরো কতকগুলো দোষত্রুটির কথা বলেছেন। এই কমিশন যদিও কোন বিশেষ ভাবে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং তার উন্নতির জন্য সুপারিশ করেছেন তবু তাদের নির্ণীত ত্রুটিগুলোকেও আমরা গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের ত্রুটি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

[আট] গতানুগতিক পাঠ্যক্রমে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়েছে। ফলে এই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুর সঙ্গে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে এই পাঠ্যক্রম অনুসরণ করলে জীবনের বিকাশের পথ সংকীর্ণ হবে।

[নয়] কমিশন বলেছেন, এই জাতীয় পাঠ্যক্রমে বিশেষভাবে পাঠ্যবিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এই পাঠ্যক্রমের দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে আনন্দময় পরিবেশ গড়ে তোলা যায় না। ফলে শিক্ষার কাজ চলে কৃত্রিম এক পরিবেশের ভেতর যেখানে শিশুদের হৃদয়বৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি কোনটারই স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা নেই।

[দশ] এই ধরনের পাঠ্যক্রমে ব্যক্তির নিজস্ব জন্মগত ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের কোন সুযোগ নেই। সকল শিশুকেই এই পথ অনুসরণ করতে হবে, যা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ ভাবে ভুল।

[এগারো] এই পাঠ্যক্রমে কোন রকম বৃত্তিমূলক বা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। কোন রকম ব্যবহারিক বিষয়ই এই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কিন্তু সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বিষয়ের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে।

[বারো] এই পাঠ্যক্রম পরীক্ষা পাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোন্ বিষয় ছাত্রদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা নির্ভর করছে, তার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে স্থান পাওয়ার সম্ভাব্যতার উপর।

সুতরাং এই সকল দিক বিবেচনা ক'রে বলা যায়, গতানুগতিক পাঠ্যক্রম একেবারেই মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। এই পাঠ্যক্রম ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক কোন জীবনের বিকাশে সহায়তা করে না। কেবলমাত্র আংশিক ভাবে বৌদ্ধিক (intellectual) বিকাশে সহায়তা করে মাত্র।

॥ দুই ॥ কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum) :

জীবনের সঙ্গে যে শিক্ষার যোগ নেই তা মূল্যহীন। গতানুগতিক বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে অক্ষম। তাই গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে গড়ে উঠেছে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের আন্দোলন। রুশো (Rousseau), মন্তেস্বরী (Mantessori), ডিউই (Dewey), গান্ধীজি (Gandhij) প্রভৃতি চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ এ বিষয়ে একমত যে, শিক্ষাকে যদি শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত না করা যায়, সে শিক্ষা ফলপ্রসূ হবে না। যে শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক উন্নয়ন করতে পারে না, তা শিক্ষা নামের যোগ্য নয়। রুশো বলেছেন—"Instead of making the child stick to his books I keep him busy in the workshop, where his hands will work to the profit of his mind" গান্ধীজি হরিজন পত্রিকায় তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যা বলেছেন তা উল্লেখ করলে এই চিন্তাধারার মূলতত্ত্ব আরো পরিষ্কার হবে। তিনি বলেছেন—'In my scheme of things, the hand will handle tools before it draws or trace the writing. The eyes will read the pictures of letters and words as they will know other things in life, the ears will catch the name and meanings and sentences" এই সকল চিন্তাবিদ্‌দের আন্দোলনের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে কর্মকেন্দ্রিক তত্ত্বের (Activity principle) উদ্ভব হ'য়েছে। এই তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করবো। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum),

কর্মকেন্দ্রিক তত্ত্বের (Activity principle) উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মূল কথা হ'ল—এখানে সব বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়, শিশুরা প্রত্যক্ষ কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে। জ্ঞান যদিও মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু তা আসে পরোক্ষভাবে। পাঠ্যক্রমে কর্মের নির্দেশ করা হয়, এবং কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। কর্ম এখানে মাধ্যম (Medium)।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উপযোগিতা (Importance of Activity Curriculum): মনোবিদ্‌রা বলেছেন শিশুরা স্বাভাবিক ভাবেই কর্মপ্রবণ। সে তার সংস্কারগত চাহিদা (instinctive need)-কে চরিতার্থ করার জন্য আশে পাশের সমস্ত জিনিসকে হাতে কলমে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চায়। শিশুমন স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যক্ষ বস্তু থেকে জ্ঞান আহরণে সক্ষম। বিমূর্ত জ্ঞান তার কাছে অর্থহীন বোঝা ছাড়া কিছু নয়। তার মধ্যে আছে সৃজনী স্পৃহা, কৌতূহল, এবং এগুলো যদি প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না হ'তে পারে, তাহ'লে সেগুলো সমাজবিরুদ্ধ রূপ নেবে। তাই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা শিশুর মানসিক সংগঠনেরই অনুকূল। কর্মের দ্বারা শিশুর সংস্কারগত প্রবণতার চরিতার্থ যে হয় শুধু তাই নয়, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করলে শিশুর মনে নতুন নতুন চাহিদারও সৃষ্টি হয়, অনুসন্ধিৎসা-স্পৃহা বাড়ে, ফলে তা তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। ডিউই (Dewey) বলেছেন—"Activity curriculum is a continuous stream of child's activities unbroken by systematic subjects and springing from the interests and personally feltneeds of the child." জন ডিউই তার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে (Project method) এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করেছেন। গান্ধীজি তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রেও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অনুসরণ করেছেন। জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে বলা হ'য়েছে "We have attempted to draft an activity curriculum which implies that our school must be the place of work, experimentation and discovery and not of passive absorption of information, imparted as second hand." সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা সকলেই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিশুর মনোধর্মী এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত। মাধ্যমিক শিক্ষা

কমিশনের (মুদালিয়ার) রিপোর্টেও কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের কথা বলা হ'য়েছে। গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করতে গিয়ে কমিশন বলেছেন "These (Activity Curriculum) should replace the formal lessons which lack proper motivation and therefore, fail to arouse real interest."

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম যে শুধু ব্যক্তির মানসিক বিকাশে সহায়তা করে তাই নয়, সামাজিক জীবন বিকাশেও সহায়তা করে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম ছাত্রদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা এনে দেয়; তাদের সবকিছুর জন্য শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না। সমস্যা সমাধান বা কর্মসম্পাদনের জন্য যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব শিক্ষক এবং ছাত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে তা শিশুর সামাজিক বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করে। এর ফলে, দলগত জীবনযাপনের রীতির সঙ্গে পরিচিত হয়, সহযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। সুতরাং শিশুর মানসিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম এক সার্থক সংযোজন।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন কর্মের প্রকৃতি (Nature of Activities in Activity Curriculum):

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম মানে এই যে, এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে শুধুমাত্র দৈহিক পরিশ্রম হয় সেই ধরনের কাজ থাকবে। এই পাঠ্যক্রমে কাজগুলো এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যার মাধ্যমে দেহ-মন উভয়ের বিকাশ হয়। কর্মের মাধ্যমে দৈহিক পেশী, মস্তিষ্ক এবং অন্তরের (Hand, head and heart) অর্থাৎ বলা হয় তিন H-এর বিকাশ সাধন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা বা পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র কর্মদক্ষতার বিকাশ নয়, এর উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর মানসিক তৃপ্তির মাধ্যমে বৌদ্ধিক বিকাশ করা। ব্রান্‌ফোর্ড (Barnford) বলেছেন, আমরা তিন ধরনের কর্মকেন্দ্রকে সক্রিয় করার চেষ্টা করবো কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে। সুতরাং এই ধরনের কর্মের উপর ভিত্তি ক'রে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের বিষয় সংযোজন করতে হবে। যেমন —কলা (Arts), হস্তশিল্প (Craft), বিজ্ঞান (Science), ভাষা (Language) ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয় গতানুগতিক ভাবে পাঠ্যক্রমের ভিতর সংযোজিত হবে না। যথাযোগ্য কর্মের মাধ্যমে ঐ সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে। আনন্দদায়ক, জ্ঞানমূলক এবং সমাজ শিক্ষামূলক সব রকম কাজকেই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এবং কর্ম নির্বাচনের সময় বিশেষ ভাবে

শিক্ষার্থী এবং সমাজ উভয়ের বর্তমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে সমতা রেখে কর্ম নির্বাচন করার দরকার। তাহ'লে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন কর্মের এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে—(১) কর্মগুলো এমন হবে যা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশে (দেহ-মন) সহায়তা করে; (২) এমন কর্মনির্বাচন করতে হবে যার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হয়; (৩) নির্বাচিত কর্ম শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের স্তর অনুযায়ী হওয়া চাই, যা তারা নিজেরা বা শিক্ষকের স্বল্প সাহায্যে সমাধান করতে পারে এবং (৪) কর্ম যাতে শিক্ষামূলক হয় এবং প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ত্রুটি (Limitation of Activity Curriculum):

যদিও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাতত্ত্ব এবং কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রতীক, তাহ'লে একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় না যে, তা একেবারে ত্রুটিহীন। অনেকে এই ধরনের পাঠ্যক্রমের সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেন, জীবন যাপনের জন্য সর্বাঙ্গীন শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের দ্বারা সার্থক-ভাবে দেওয়া যায় না। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে শিক্ষাকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হ'য়েছে, অতীতের কথা বিবেচনা করা হয়নি। মানুষের অতীত অভিজ্ঞতা তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় শিক্ষাক্ষেত্র থেকে, যেহেতু তাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই; সেহেতু তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের সম্পর্ক নেই। শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে শিশুকে তার সামাজিক ঐতিহ্যের মধ্যেই শিক্ষা দিতে হবে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে এই বিষয়কে বিশেষ ভাবে অবহেলা করা হ'য়েছে। দ্বিতীয়তঃ, অত্যধিক পরিমাণে কর্মের প্রতি ঝোঁক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারে। তৃতীয়তঃ, এই পাঠ্যক্রমকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন, যার অভাব আমাদের দেশে খুবই আছে। চতুর্থতঃ, কর্ম-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমকে ঠিকমত পরিচালনা না করতে পারলে এবং মধ্যে মধ্যে অন্যান্য ভাবে ছাত্রদের জ্ঞানের সামঞ্জস্যতা না আনতে পারলে তাদের জ্ঞান হবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। এই সব কারণে সম্পূর্ণভাবে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম অনুশীলন করা আমাদের দেশের শিক্ষালয়ে অসুবিধা আছে। বিশেষ ভাবে উপরের স্তরে এই পাঠ্যক্রম খুব বেশী কার্যকরী হয় না।

॥তিন॥ অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম (Experience Curriculum) :

আদর্শগত দিক থেকে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যে পাঠ্যক্রমের ভিতর বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সংযোজন করা হয়, তাকেই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম বলা হয়। এই সব অভিজ্ঞতা, জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক (skill), মানসিক এবং অভিজ্ঞতামূলক হ'তে পারে। অভিজ্ঞতা বিশেষ ভাবে কর্ম সম্পাদনের ফল হিসেবে আসে। যে-কোন শিক্ষামূলক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক এবং কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের বিশেষ কিছু তফাৎ নেই। একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন স্তরের উপর গুরুত্বের ব্যবধান মাত্র। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে কর্ম সম্পাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, আর অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে কর্মসম্পাদনের ফলের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তারা প্রত্যেক শিক্ষাস্তরেই 'work experience'-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সব স্তরেই প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম তৈরী করার সুপারিশ করেছেন।

অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উপযোগিতা (Importance of Experience Curriculum) :

শিক্ষকের দায়িত্ব শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণ করা নয়, বা শিক্ষার্থীর দায়িত্ব শুধু মাত্র বইয়ের জ্ঞান মুখস্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা হ'ল দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই শিক্ষাক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকবে। একে অন্যের অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হবে। শিক্ষাদানের আধুনিক তাৎপর্য হ'ল অন্যকে শিখতে সহায়তা করার কাজ; আর শিক্ষণের আধুনিক সংব্যাখ্যান হ'ল—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা।' আধুনিক মনোবিদ্যার সংব্যাখ্যানে শিক্ষণ হ'ল **profiting from experience.** যে সব অভিজ্ঞতা শিশুর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, যে সব অভিজ্ঞতার প্রতি সে স্বাভাবিক ভাবে অনুরক্ত সেই সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সে শিক্ষা লাভ করে। সুতরাং পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতার জোগান দিতে হবে। শিক্ষালয়ের কাজ হবে শিশুকে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দান করা। এই সব অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিশুরা যে শুধুমাত্র বিষয়-কেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ

করবে বা তার জীবনের উন্নতি সাধন করবে তা নয়, সামাজিক জীবনেরও বিকাশ হবে। শিক্ষালয়ের সমাজ-জীবনে একত্রে কাজ করে তারা এই অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। একের অভিজ্ঞতা অন্য সকলে ভাগ করে নেবে। এই ভাবে সহযোগিতা-মূলক কাজের মধ্য দিয়ে তাদের সমাজ চেতনার বিকাশ হবে। বুনিয়াদী পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হিসেবে তাই বলা হয়েছে, এই ধরনের পাঠ্যক্রম শিশুকে তার পরিবেশের প্রতি উন্নত ধরনের প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম করবে। সব শেষে বলা যেতে পারে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম মনোবিজ্ঞানসম্মত ও শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থের অনুকূল। শিক্ষার উদ্দেশ্যের একটা বড় দিক হ'ল শিশুর মধ্যে যে সব আদিম প্রবৃত্তি আছে তাকে মানবীয় রূপ দেওয়া। শিশুর এই আদিম প্রবৃত্তিগুলোর উদ্গমন সম্ভব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ এই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমে কি ধরনের অভিজ্ঞতা নির্বাচন করতে হবে (What types of Experiences are to be included in Experience Curriculum) :

মানুষের অভিজ্ঞতা, যে ভাবে অর্জন করা হয়, তার বিচারে অভিজ্ঞতাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (direct experience) কর্মের সঙ্গে যুক্ত এবং সে সব অভিজ্ঞতা প্রাথমিক জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে। আর পরোক্ষ অভিজ্ঞতা (indirect experience) তাকে বলে, যখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। এই দু'ধরনের অভিজ্ঞতাকেই পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা যেগুলোকে বলছি সেগুলো বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। যেমন, ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ, শিক্ষামুলক ভ্রমণ, কোন প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদন, ইত্যাদি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনের পেছনে দৈহিক এবং মানসিক-ক্রিয়া কাজ করে। এই সব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান আহরণ করে তার মূল্য বাস্তব জগতে আছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম শিক্ষালয়ে কাজে লাগাতে হ'লে পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় সেদিকে যত্নবান হ'তে হবে। কিন্তু একথাও ঠিক যে, শিশুদের সব রকম অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। কিছু পরোক্ষ মাধ্যমের সাহায্যও নেওয়ার প্রয়োজন। পরোক্ষ অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তক, বেতার, চলচ্চিত্র ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অতীত কৃষ্টিমূলক

অভিজ্ঞতাকে বিশেষ ভাবে পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্তমান বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত করতে হবে। তার এই ধরনের পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকেও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে পাঠ্যক্রমের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় ধরনের অভিজ্ঞতাকেই গ্রহণ করতে হবে। এই দু' ধরনের অভিজ্ঞতার সার্থক সমন্বয়ে গঠিত হবে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম।

আবার, মনোবিদ্যার তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বলা যেতে পারে, মানুষের অভিজ্ঞতার তিনটে স্তর আছে—(১) জ্ঞানমূলক (Cognitive), (২) অনুভূতিমূলক (Affective) এবং কর্মমূলক (Conative)। এই প্রত্যেক অভিজ্ঞতামূলক স্তরের জন্য যোগ্য বিষয় কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষালয়ে। যেমন—জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞান (Language, literature and science) শিখবে। অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে—দর্শন, নৈতিক ও ধর্মীয় আচরণ (Philosophy, religion and morality) এবং কর্মমূলক অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা কলা, হস্তশিল্প, সংগীত (Arts, crafts and music) ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হবে। এক কথায় এই ধরনের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সব দিকেরই বিকাশ সম্ভব হবে।

অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের ত্রুটি (Limitations of Experience Curriculum) :

অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই পাঠ্যক্রমকে পূর্বে থেকে ঠিক করা যায় না। শিক্ষার্থী বিশেষ পরিস্থিতিতে কি ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, বা তার বিশেষ কি চাহিদা আছে তা শিক্ষকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই এই অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম বাইরের কেউ রচনা করেন না, এর রচয়িতা হ'লেন শিক্ষালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষক। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই পাঠ্যক্রমের সৃষ্টি এবং তাদের সক্রিয়তায় এর সজীবতা। কিন্তু এত স্বাধীনতা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করে। শিক্ষা বাধাধরা একটা নিয়মে এগোতে পারে না ব'লে জ্ঞানের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে এত বেশী সময় লাগে যে, তা শিক্ষার অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। পাঠ্যক্রম যদি সুনিয়ন্ত্রিত পথে না চলে তাহ'লে ব্যবহারিক দিক থেকে তার মূল্য অনেক কম। শিশুদের নির্বাচন করার অবাধ স্বাধীনতা রেখেও পাঠ্যক্রমকে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায়। আর তাই হবে আদর্শগত দিক থেকে সঠিক পথ।

॥ চার ॥ অবিচ্ছিন্ন বা সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম (Undifferentiated Curriculum) :

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম এবং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম, গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের একটা বিশেষ ত্রুটির সংশোধন করার জন্য সৃষ্টি হ'য়েছে। গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিষয়-কেন্দ্রিকতা এবং তার অমনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এই ধরনের পাঠ্যক্রমের সৃষ্টি, ঠিক এমনি ভাবে, গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিষয়ের বিচ্ছিন্নতাকে (Compartmentalization) দূর করার জন্য সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম (Undifferentiated Curriculum) বা কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রম (Core-Curriculum)-এর সৃষ্টি। অর্থাৎ এই ধরনের পাঠ্যক্রমে কোন বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শিক্ষার প্রথম স্তরে বিষয়-কেন্দ্রিক জ্ঞানের কোন প্রয়োজন নেই, বিশেষ দক্ষতা (Specialization) আসবে উচ্চ স্তরে। বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য সামগ্রিক ভাবে জ্ঞান পরিবেশন করা, যার মাধ্যমে আদর্শ অভ্যাস, দক্ষতা এবং জীবনাদর্শ গড়ে উঠবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা, আর এই বিকাশ সাধন সম্ভব সমন্বয়িত বা কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে। পাঠ্যক্রমকে কেন্দ্রায়িত করার জন্য বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌ ও শিক্ষাবিদ্‌ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম মতবাদ প্রকাশ করেছেন। জার্মান দার্শনিক হার্বার্টের (Herbert) শিক্ষাদর্শনে আমরা সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের ইঙ্গিত পাই। তার তত্ত্বে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে অনুবন্ধের (Correlation of studies) কথা বলেছেন তাতে কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রমের সমর্থন মেলে। তার শিক্ষাদর্শনের মূল বক্তব্য হ'ল জ্ঞানের উৎস হ'ল এক এবং মানুষের মনও ঐক্যধর্মী। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আমরা যে তফাৎ করি তা একেবারে কৃত্রিম এবং জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে না। হার্বার্ট তাই বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে এবং একই বিষয়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। পরবর্তিকালে জিলার (Ziller) তার কনসেনট্রেশানের (Concentration) তত্ত্বে অন্য রকম সমন্বয়ের কথা বললেন। তিনি বললেন, যে কোন একটা বিষয় (Subject)-কে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য বিষয়কে সমন্বয়িত করতে হবে, তিনি বিশেষ ভাবে ইতিহাসকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। পরবর্তিকালে ফ্রয়েবেল (Froebel) খেলাকে (Play) কেন্দ্র ক'রে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। জন ডিউই (Dewey) তার শিক্ষাদর্শনে কর্মকেন্দ্রিক (activity centred) শিক্ষার কথা বলেছেন। গান্ধীজি তাঁর

শিক্ষাদর্শনে বিশেষ একটি হস্তশিল্পকে (Craft) কেন্দ্র ক'রে সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। এমনি ভাবে বিভিন্ন শিক্ষবিদের শিক্ষাদর্শনের মাধ্যমে আধুনিক কালের কেন্দ্রায়িত বা সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের ধারণা এসেছে।

সমন্বয়িত বা কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রমের উপযোগিতা (Importance of Undifferentiated or Core-Curriculum) :

পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে, গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন পূর্ব নির্বাচিত বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলো অভ্যাস এবং দক্ষতা আনতে চাই। এর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল কতকগুলো বিষয়-কেন্দ্রিক জ্ঞান ছাত্রদের দেওয়া। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক সুদূরপ্রসারী। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তাই শিক্ষা। এই ধরনের শিক্ষার জন্য এমন এক পন্থা গ্রহণ করার দরকার যাতে ক'রে শিক্ষকেরও অসুবিধা না হয় এবং শিক্ষার্থীর কাজও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়। আধুনিক যে সব পাঠ্যক্রমের উল্লেখ করা হ'য়েছে যেমন, অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রম, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম, তাদের সুপরিচালনার জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। আমাদের মত বিশাল দেশের পক্ষে সে ব্যবস্থা করা খুবই মুস্কিল। সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম এদিক থেকে আমাদের সহায়তা করে, গতানুগতিক ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ক'রে। আমরা শিশুর আদর্শ জীবন বিকাশের উপযোগী শিক্ষা পরিচালনা করতে পারি। এই কারণেই বর্তমানে সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করা হ'চ্ছে।

সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমে সমন্বয়ের রীতি (Types of Integration in Undifferentiated Curriculum) :

সমন্বয়িত বা কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রম অনুবন্ধনীতির (Principle of Correlation) উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। এই অনুবন্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন ধরনের মতবাদ প্রকাশ করেছেন। তবে অনেকে এই ধরনের অনুবন্ধের অনেক অসুবিধার কথাও বলেছেন। তাঁরা মনে করেন বিশেষ একটা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে অনেক সময় দেখা যাবে কোন বিষয়ের জ্ঞানই সম্পূর্ণ হয়নি। চরম কেন্দ্রীকরণ অভিজ্ঞতার অর্জনের দিক থেকে একেবারে ত্রুটিহীন একথা বলা যায় না। অনেক সময় দেখা গেছে অনুবন্ধ খুব কষ্টকল্পিত হ'য়ে পড়ে। যেমন, জিলার (Ziller) বলেছেন ইতিহাসের (History) মধ্য দিয়ে সব বিষয় পড়ানো যাবে, পার্কার (Parker) বলেছেন, বিজ্ঞানের (Science) মধ্য দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ করা

যাবে—এটা বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা কার্যকরী হবে বলা মুস্কিল। তাই আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা সমন্বয়ের প্রকৃতিকে আরো একটু বিস্তৃত করেছেন। তাঁদের মতে মানুষের অভিজ্ঞতা যদিও অবিচ্ছিন্ন এবং একক সত্ত্বা তবুও তার প্রকৃতির দিক থেকে তাকে ব্যাপক ভাবে তিন ভাগ করা যেতে পারে—প্রথম হ'ল মানুষ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ; এই অভিজ্ঞতার অন্তর্গত জ্ঞানকে আমরা মানবীয় বিজ্ঞান (Humanities) নাম দিতে পারি। সাহিত্য, কলা, দর্শন, ইত্যাদি বিষয় এর অন্তর্গত। এই বিভাগের কেন্দ্রে আছেন ব্যক্তি নিজে। মানুষের ভাব, চিন্তাধারা, আদর্শ, অনুভূতি ইত্যাদির প্রকাশ এই সব বিষয়ের মাধ্যমে হয়। সুতরাং এই সব বিষয়কে মনুষ্য জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সমন্বয়িত করা যায়। দ্বিতীয় হ'ল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Natural science)-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা। প্রাকৃতিক ঘটনা হ'চ্ছে এই অভিজ্ঞতা সমষ্টির কেন্দ্র। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের শাখা এর ভেতর পড়ে। যেমন, রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, সামাজিক অভিজ্ঞতা। ভূগোল, অর্থনীতি, ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় এই বিভাগের অন্তর্গত। এর কেন্দ্রে আছে মানুষের সামাজিক প্রতিক্রিয়া। তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে এই সব বিষয়গুলো শেখাতে হবে। এমনি ভাবে তিন স্তরে মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের কথা বলেছেন আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা। সুতরাং বলা যেতে পারে সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন বিষয়কে শ্রেণী বিভাগ ক'রে তাদের সমন্বয় করার চেষ্টা করা হবে। এর মাধ্যমে ছাত্ররা একক এবং অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে, জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে। তার তিন শ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে বিষয়ের সমন্বয় করাই হ'ল আধুনিক সমন্বয়িত পাঠ্যক্রমের মূল বক্তব্য। ব্যক্তির অন্ত্যজ অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক অভিযোজন-লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়ামূলক অভিজ্ঞতা—এদের পৃথক পৃথক ভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে। তবে সে পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে যাবে।

সমন্বয়িত বা কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রমের ত্রুটি (Limitations of Undifferentiated or Core-Curriculum) :

সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম বা কেন্দ্রায়িত পাঠ্যক্রম যতই আধুনিক হোক না কেন সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিহীন নয়। এই পাঠ্যক্রম মনোবিদ্যার তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় এই পাঠ্যক্রমের ত্রুটিও আছে। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করা হয়েছে। আদর্শগত দিক থেকে জ্ঞানের উৎস যে এক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শাখায় এত উন্নতি হ'য়েছে যে, বর্তমান স্তরে তাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। আজকে যদি দর্শনের সঙ্গে পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন বিদ্যায় অনুবন্ধ স্থাপন করতে চাই তা আদৌ সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; আর হ'লেও তা ছাত্রদের কাছে বোধগম্য হবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আধুনিক মনোবিদ্যার তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি, মনের এমন এক গভীর ধর্ম (Dynamic Property) আছে যার সাহায্যে সে বহির্জগতের সকল অভিজ্ঞতাকে সমন্বয়িত আকারে ধরে রাখতে পারে। আমরা এই পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি যে, এই পাঠ্যক্রম মানুষের মনের প্রকৃতিধর্মী। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল মানুষের মন যদি গভীর সত্তা হয় এবং সে যদি স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে আভ্যন্তরীন সমন্বয় আনতে পারে, তবে আমরা জোর করে বাইরে থেকে সমন্বয়ের চেষ্টা করবো কেন? আর সে চেষ্টা করলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অকৃতকার্য হ'তে হবে।

এই সব দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে সমন্বয়িত পাঠ্যক্রম বা কেন্দ্রান্বিত পাঠ্যক্রমের ধারণা গতানুগতিক পদ্ধতির বন্ধন থেকে অনেকটা মুক্ত করেছে। এই পাঠ্যক্রমে অনেক আধুনিক তত্ত্বকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এই ধরনের পাঠ্যক্রম প্রাথমিক স্তরে বিশেষ ভাবে কার্যকরী। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান প্রয়োজন। তাই আধুনিক শিক্ষবিদ্‌রা যারা এই পাঠ্যক্রমের উপর আস্থাবান তাঁরাও স্বীকার করেন যে, শিক্ষার উচ্চস্তরে বিষয়-কেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

॥ আলোচনা ॥

॥ পাঁচ ॥ জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Life-Centred Curriculum):

বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রম আলোচনা করতে গিয়ে একটা জিনিস স্পষ্টতঃ ধরা পড়েছে যে, আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা পাঠ্যক্রমের গতানুগতিক ধারার মধ্যে পরিবর্তন আনতে চাইছেন। তাঁদের এই আগ্রহ থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের (Activity curriculum), অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমের (Experience curriculum) এবং সমন্বয়িত বা কেন্দ্রান্বিত পাঠ্যক্রমের (Undifferentiated or core-curriculum)। কিন্তু এই সব সর্বাধুনিক পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি তাদের প্রত্যেকেরই কিছু

ত্রুটি আছে। তাই তাদেরও সংস্কার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রম নির্ধারণের সমস্তাকে পুনর্বিচার ক'রে দেখার প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। পাঠ্যক্রম শিক্ষা পদ্ধতির গতি নির্ণয় ক'রে দেবে। শিক্ষার লক্ষ্যে (Aim of Education) সঠিক ভাবে পৌছানোর পথ তৈরী ক'রে দেবে। তাই পাঠ্যক্রম নির্ভুল ভাবে নির্ণয় করতে হ'লে শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা স্থির করতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল, ব্যক্তি-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কল্যাণে সহায়তা করা। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি কল্যাণ। ব্যক্তি-জীবনের উন্নতি নির্ভর করে, ব্যক্তি-জীবনের আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, চাহিদা ইত্যাদি গুলো কি ভাবে চরিতার্থ হচ্ছে এবং তার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবন বিকাশ কি ভাবে সংঘটিত হচ্ছে তার উপর। এই উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য আধুনিক কালে শিক্ষাবিদরা বলেছেন শিক্ষা হবে শিশুর বর্তমান জীবন-কেন্দ্রিক। তাই আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য যেমন শিশুকেন্দ্রিকতা (Child centricism), তেমনি অপর দিকে তা জীবন কেন্দ্রিক (Life-centred)-ও বটে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন শিক্ষা সংঘটিত হবে ব্যক্তি-জীবনের জন্য, ব্যক্তি-জীবনের মাধ্যমে। এই জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির কোন বিশেষ মানসিক উন্নয়ন নয়, অফুরন্ত জীবনের অধিকার করাই এর লক্ষ্য। জন ডিউই বলেছেন—শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নয়, জীবনের সঙ্গে একাত্ম সম্পর্কে আবদ্ধ।

এখন প্রশ্ন হ'ল—এই ধরনের শিক্ষাদর্শের জন্য পাঠ্যক্রম কিরূপ হবে। আধুনিক কালে, আদর্শ হিসেবে যখন এটাকে মেনে নিয়েছি, তখন তার জন্য সার্থক পাঠ্যক্রমও আমাদের রচনা করতে হবে। গতানুগতিক পাঠ্যক্রম এই ধরনের শিক্ষাদর্শের পথে পরিচালিত করতে পারে না। জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে শিশুর জীবন-প্রক্রিয়া (Life process) এবং জীবন-পদ্ধতি উভয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শিশুর প্রকৃতিকে গুরুত্ব দিতে এবং ঐ প্রকৃতির ধারা অনুশীলন ক'রে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। সুতরাং আধুনিক জীবন-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম স্থির করতে হ'লে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

আদর্শ জীবন-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম নির্ণয়ের মূল নীতি (Principles of Life-centric Curriculum):

[এক] **শিশুর চাহিদা-ভিত্তিক (Need centred):** পাঠ্যক্রমে শিশুর নিজস্ব চাহিদাকে যোগ্যস্থান দিতে হবে। শিশুর চাহিদা শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ

মূল্যবান। শিশুর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে তার বিকাশ হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে।) শিশুর আগ্রহ, তার বর্তমান চাহিদা ইত্যাদিকে জীবন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ক'রে তার অনুকূল পাঠ্যক্রম রচনা না করলে ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ সম্ভব হবে না। তাই শিশুর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তার উপর বাইরে থেকে কিছু বোঝা চাপিয়ে দিলে, তা সহজে গ্রহণ করবে না। (পাঠ্যক্রমকে তার স্বাভাবিক জীবনীশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রচনা করতে হবে।)

[দুই] সমাজের চাহিদা ভিত্তিক (Community centred) :

(আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে একক ব্যক্তির বিশেষ কোন মূল্য নেই। তাকে সমাজ জীবনের মধ্যে বাস করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য একদিকে যেমন ব্যক্তি-জীবনের উন্নতি করা, অন্যদিকে তেমনি সমাজ-জীবনের উন্নতি করা। ব্যক্তি-জীবনের উন্নতির কোন পরিকল্পনাই সার্থক হবে না যদি না তা সমাজ জীবনের চাহিদার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।) কারণ ব্যক্তিকে সমাজে বাস করতে হবে। তাই পাঠ্যক্রমকে সমাজের চাহিদা-ভিত্তিকও করতে হবে। সমাজের কথাকে অস্বীকার ক'রে পাঠ্যক্রম রচনা করলে, সে পাঠ্য ক্রমের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে জীবন বিকাশ হবে, তা তাকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে সাহায্য করবে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে বিফল।

সুতরাং (যে কোন আদর্শ পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে ব্যক্তির চাহিদা এবং সমাজের চাহিদার সুষ্ঠু সমন্বয়।) এই দুই চাহিদাকে যদি পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে চরিতার্থ করাতে না পারা যায় তাহ'লে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হবে। জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ এবং সমাজ-জীবনের বিকাশ উভয়ে সমান গুরুত্বপূর্ণ, তখন পাঠ্যক্রমের ভিতরও এই দুই উপাদানকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজাদর্শের যুগে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ একান্ত কাম্য। ব্যক্তি যদি তার নিজস্ব যোগ্যতা, আগ্রহ, অনুরাগ অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করার সুযোগ না পায় তাহ'লে গণতন্ত্রের আদর্শ নষ্ট হবে। আবার অন্য দিকে ব্যক্তি যদি তার নিজের যোগ্যতানুযায়ী সমাজকে সেবা না করতে পারে তাহ'লে সমাজ-জীবনের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে। গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ তখনই সম্ভব হবে যখন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী রাষ্ট্র বা সমাজকে সেবা করতে পারবে। আর তা করতে হ'লে শিক্ষার মাধ্যমে পরিকল্পিত

পদ্ধতিতে ব্যক্তি-জীবনকে প্রস্তুত করতে হবে, তবে তা ব্যক্তির নিজস্বতার বিনিময়ে নয়, তার পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা ক'রে। তাই মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে—"A rationally conceived curriculum must be the resultant of two forces....the nature of the child and the requirements of the community." শিক্ষা সামাজিক প্রক্রিয়া (social process) হিসেবে এমনি সমাজের সেবা করবে, তা নাহ'লে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজব্যবস্থায় তার নিজের গুরুত্ব হারাবে।

[তিন] **সমন্বয়-ভিত্তিক (Principle of Integration):** পাঠ্যক্রমের মধ্যে একদিকে যেমন শিশুর চাহিদা এবং সমাজের চাহিদাকে সমন্বয় করতে হবে, অন্যদিকে তার ব্যক্তিত্ব, চাহিদা এবং অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় আনবে। মানব-মন স্বাভাবিক ভাবে সমন্বয়ধর্মী, কোন পরস্পরবিরোধী ভাব-ধারা সে আত্মস্থ করতে পারে না। তাই পাঠ্যক্রমের যদি পরস্পরবিরোধী বিচ্ছিন্ন বিষয় থাকে বা বিচ্ছিন্ন কর্ম (activity) সংযোজন করা হয়, তা ব্যক্তিমনের বিকাশের প্রক্রিয়াকে সহায়তা করবে না। তাই আদর্শ পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে সমস্ত রকম দিক থেকে বিবেচনা ক'রে সমন্বয় আনার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'তে হবে।

[চার] **সংরক্ষণের নীতি (Principle of Conservation):** পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন বিষয় ও কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যার দ্বারা সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কার সংরক্ষিত হয় এবং যার মাধ্যমে সংস্কারকে যথাযথ ভাবে ব্যক্তি জীবনে সঞ্চালিত করা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐ প্রধান দুই কর্তব্য হ'ল—অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ এবং তার পরিচালন। পাঠ্যক্রম যদি সেই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তা'হলে শিক্ষালয়ের সেই উদেশ্য সফল হবে না। তাই পাঠ্যক্রম আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বা কৃষ্টি থেকে সেই সব উপাদান বেছে নিতে হবে যার মাধ্যমে এই দুই প্রক্রিয়া সহজ ভাবে চলতে পারে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারে।

[পাঁচ] **রচনাত্মক নীতি (Principle of Creativeness):** পাঠ্যক্রমে শুধুমাত্র সমাজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে তাই নয়, মানুষের রচনাত্মক (creative) প্রতিভার বিকাশের সুযোগও ক'রে দেবে। শিক্ষা যেমন এক দিকে, সমাজ সংরক্ষণের দায়িত্ব নেবে তাই নয়, ব্যক্তির নিজস্ব সম্ভাবনার বিকাশের দায়িত্বও গ্রহণ করবে। তা না হ'লে সমাজ-জীবনের উন্নতি কোনক্রমেই

সম্ভব হবে না। তাই রেমণ্ট (Raymont) বলেছেন—"In a curriculum that is suited to the needs of to-day and of future, there must be a definite bias towards definitely creative subject." সুতরাং পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, এমন সব কর্ম নির্বাচন করতে হবে, যার মধ্যে শিশু তার নিজস্ব রচনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করতে পারে।

[ছয়] কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি (Principle of Activity) : শিশুর পাঠ্যক্রম গতানুগতিক বিষয়কেন্দ্রিক হবে না। বিষয়কেন্দ্রিক বিমূর্ত জ্ঞান শিশুমনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তার ফলে শিক্ষাও সার্থক হয় না। তাই শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে এমন পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে, যার প্রতি শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয়। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হ'লে পাঠ্যক্রমকেও কর্মভিত্তিক করতে হবে। পাঠ্যক্রমকে কর্মকেন্দ্রিক করলে একদিক থেকে তা যেমন শিশুর মনোধর্মী হবে, অন্যদিক থেকে তা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল হবে। এই নীতির মূল বক্তব্য হ'ল বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। জন ডিউই (John Dewey) বলেছেন—"Study in the sense of inquiry and it's outcome in gattering and retention of information was to be an outgrowth of the persuit of certain continuing or conscentive occupational ativities." কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর আগ্রহও সৃষ্টি করা যায়। আগ্রহের তাড়নায় সে যেমন কোন কাজ করতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হবে তেমনি কাজ করার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হবে।

[সাত] অগ্রমুখীতা (Principle of forward looking) : জীবন কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের একটা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য থাকবে। সেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনের অধিকারী হবে, সেহেতু পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য হবে তাকে সমাজ-জীবনের উপযোগী অভিজ্ঞতা দেওয়া। তার ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। অর্থাৎ পাঠ্যক্রমে শুধুমাত্র বর্তমান চাহিদার কথা বিচার করলে চলবে না, তার ভবিষ্যৎ চাহিদার কথাও বিবেচনা করতে হবে। যে জীবন পরিবেশের ভেতর সে বাস করবে, সে পরিবেশের সঙ্গে যাতে সে সার্থক

ভাবে অভিযোজন করতে পারে, এবং তার প্রয়োজনে সেই পরিবেশকে যাতে ক'রে সে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে সক্ষম হয়, তারই উপযোগী পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। অর্থাৎ পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র বর্তমানের চাহিদা মেটানোর প্রয়াস থাকবে না, অতীতের পুনরুত্থাপন করা হবে না। ভবিষ্যতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা চলবে তার মধ্য দিয়ে।

৭) [আট] **পরিবর্তনশীলতার নীতি (Principle of Variability) :** যে পাঠ্যক্রমের মধ্যে পরিবর্তনশীলতার উপাদান নেই তার দ্বারা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার আদর্শ সফল হ'তে পারে না। জীবন কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল কথা হ'ল— শিশুর চাহিদা ও আগ্রহ এবং সমাজের চাহিদা। ব্যক্তির চাহিদা পরিবর্তনশীল আবার সমাজের চাহিদাও তাই। তাই দু'ধরনের পরিবর্তনশীল সত্তাকে সার্থক ভাবে পরিচালনা করার জন্য পরিবর্তনশীল পাঠ্যক্রমের একান্ত প্রয়োজন। শিশুর চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে। অন্য দিকে সমাজ-জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে পুনর্বিন্যাস করার দরকার। সুতরাং গতানুগতিক নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের বদলে পাঠ্যক্রমের মধ্যে গতিশীলতার ধর্ম সংযোজন করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে (রাধাকৃষ্ণন, ১৯৪৮) এই বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কমিশন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন—

"A curriculum which has vitality in the vedic period or the reniassance cannot continue unaltered in the twentieth century. Realizing that the vision of freeman in a free society is the living faith and inspiring guide of democratic institutions, we must move towards the goal adapting wisely and well to changing conditions."

এই সব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (মুদালিয়ার, ১৯৫২) পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আদর্শ পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য এবং পাঠ্যক্রম রচনার কয়েকটি মূল নীতির উল্লেখ করেছেন—

প্রথমতঃ, (তাঁরা বলেছেন আদর্শ পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে পাঠ্যক্রমকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে) তাঁরা পাঠ্যক্রম বলতে গতানুগতিক বিষয় কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের ধারণাকে ত্যাগ ক'রে পাঠ্যক্রম ও বিদ্যালয়-জীবনের সঙ্গে সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। (শিক্ষালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীর সমষ্টি হ'ল

পাঠ্যক্রম। এই আদর্শের উপর ভিত্তি ক'রে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। বিদ্যালয়ের সকল কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে একই প্রচেষ্টা চলবে এবং তার সুপরিকল্পিত রূপই হ'ল পাঠ্যক্রম।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠ্যক্রমের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হ'লে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে পরিবর্তনশীল করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বতা যাতে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ হয়, তার জন্য তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রত্যেক শিশুর জন্য এই রকম পাঠ্যক্রম চলবে না। পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন করতে হবে, এবং শিশুরা যাতে নিজেদের আগ্রহ ও অনুরাগ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে পারে তার সুযোগ রাখতে হবে। এই নীতির উপর ভিত্তি ক'রে তাঁরা বহুমুখী পাঠ্যক্রমের প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পাঠ্যক্রমকে সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম রচনার সুপারিশ করেছেন। যেহেতু শিশুরা সামাজিক জীবনে কোন-না-কোন বৃত্তি গ্রহণ করবে, সেহেতু সমাজ কল্যাণের কথা বিবেচনা ক'রে, মাধ্যমিক স্তর থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

চতুর্থতঃ পাঠ্যক্রম রচনার সময় অবসর জীবন যাপনের প্রশিক্ষণের দিকেও লক্ষ্য রাখার দরকার। আধুনিক বৈজ্ঞানিক অগ্রসরতার যুগে, মানুষের কর্মময় জীবনে অনেক অবসর সময়ের সংস্থান হ'য়েছে। এই অবসর সে যাতে সুস্থভাবে যাপন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে ক'রে, তার অবসর যাপনের প্রশিক্ষণ হয়। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অবসর যাপনের উপর এতই গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে যে, শিক্ষাবিদ্‌রা পৃথকভাবে অবসর যাপনের শিক্ষার (Education for Leisure) কথা চিন্তা করেন।

সবশেষে কমিশন বলেছেন, পাঠ্যক্রমের ভিতর কোন কৃত্রিম বিভাগ রাখা চলবে না। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাতে সামগ্রিক ভাবে তার কাছে উপস্থাপন করা যায় সেদিকে দৃষ্টি রেখে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। বিষয়গুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য রেখে বিষয় নির্বাচন করতে হবে পাঠ্যক্রমে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, কোন আদর্শ পাঠ্যক্রম বিভিন্ন ধরনের পাঠ্যক্রমের মূল অংশ গুলো নিয়ে গঠিত হবে। আদর্শ পাঠ্যক্রমে

একদিকে যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ থাকবে অপর দিকে সমাজের চাহিদা যেন তার মধ্য দিয়ে মেটে। আবার পাঠ্যক্রম শুধুমাত্র বিষয় কেন্দ্রিক হ'লে চলবে না। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান, প্রত্যক্ষ কর্ম এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। এই ধরনের জীবনকেন্দ্রিক সমন্বয়পূর্ণ পাঠ্যক্রমকে সুষম পাঠ্যক্রম (Balanced) বলা যেতে পারে। এই পাঠ্যক্রমে একদিকে যেমন ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ থাকবে অন্যদিকে তেমনি, সামাজিক জীবনের উপযোগী আবশ্যিক বিষয়ও থাকবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রত্যেক পাঠ্যক্রমে দুই ধরনের বিষয়ের কথা বলেছেন। কতকগুলো বিষয় থাকবে, যেগুলো সর্বজনীন ভাবে সকলের জন্য প্রয়োজন হবে, একে তাঁরা বলছেন কেন্দ্রীয় বিষয় (Core subjects); আর অন্যান্য কতকগুলো বিষয় থাকবে, যেগুলো শিক্ষার্থী তার নিজস্ব চাহিদা এবং আগ্রহ ও মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বেছে নেবে। এই সব বিষয়কে বলা হয় উপান্ত বিষয় (Peripherial subject)। শিশুর প্রথম স্তরের শিক্ষার পাঠ্যক্রমে কেন্দ্রীয় বিষয়গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, এবং যতই শিক্ষাস্তরে এগিয়ে যাবে এই বিষয়ের গুরুত্ব কমতে থাকবে এবং উপান্ত বিষয়গুলোর গুরুত্ব বাড়তে থাকবে। এমনি ভাবে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে শিশুর জীবন বিকাশের পথ সুগম হবে। এমনি এক সুষম পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা হ'য়েছে মাধ্যমিক স্তরে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি ক'রে। ঐ পাঠ্যক্রমের বিষয়গুলো সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলে, আদর্শ পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা খুবই স্পষ্ট হবে।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রম (Curriculum of Secondary Level):

মাধ্যমিক স্তরে আমাদের দেশে যে পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা হ'য়েছে তা একদিকে যেমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তেমনি অপরদিকে গণ-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চাহিদার পূর্ণ মর্যাদার ভিত্তিতে গঠিত। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম স্তরে যে পাঠ্যক্রমের কথা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন, তার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুকে মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিত করা, তার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটানো এবং সহানুভূতি, সহযোগিতা ইত্যাদি সামাজিক গুণ গুলো জাগ্রত করা। এই স্তরে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার (Specialization) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। প্রাথমিক স্তরের

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা রেখে মাধ্যমিক কমিশন বলেছেন, এখানে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলো পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—

(১) ভাষা শিক্ষা (মাতৃভাষা, হিন্দি এবং ইংরাজী) [Language]
(২) সমাজবিদ্যা [Social Studies]
(৩) সাধারণ বিজ্ঞান [General Science]
(৪) অঙ্ক [Mathematics]
(৫) কারুশিল্প ও সংগীত [Art and Music]
(৬) হস্তশিল্প [Craft]
(৭) দৈহিক শিক্ষা [Physical Education]

সাধারণ বিদ্যালয়েই হোক আর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হোক এই সব বিষয় পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশেষ বিশেষ কাজের মধ্যেমে শিশুর আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে হবে, এবং তার মধ্য দিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে শিশুর সামনে তুলে ধরতে হবে। এর ফলে এক দিকে শিশু যেমন আত্মসচেতনার মাধ্যমে নিজেকে বিকাশ করার সুযোগ পাবে অপর দিকে তার সমাজ চেতনার বিকাশ হবে।

উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তবে ব্যক্তির সাধারণ বিকাশের দিকও অবহেলা করা হয়নি। এখানে পাঠ্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। স্বাভাবিক জীবন-যাপনের জন্য যেটুকু দরকার তা কেন্দ্রীয় বিষয়ের (Core Curriculum) মাধ্যমে পরিবেশন করার ব্যবস্থা থাকবে এবং সব ছাত্রকেই তা গ্রহণ করতে হবে এবং যোগ্যতানুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রথম সোপান হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার দরকার। এর পরবর্তী স্তরের শিক্ষা বিষয়কেন্দ্রিক এবং বিশেষ বিশেষ বৃত্তি-কেন্দ্রিক হবে। এই ভাবে পাঠ্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে শিক্ষা দেওয়ার ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয় বিষয়গুলোর মাধ্যমে এক দিকে যেমন সমাজজীবন যাপনের উপযোগী সাধারণ জ্ঞান লাভ করবে, অপর দিকে বিশেষ বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে, বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রাথমিক স্তরের প্রশিক্ষণও হবে। এই কারণে একে আমরা ব্যক্তির সুষম জীবন গঠনের উপযোগী পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে এই পাঠ্যক্রমের ভিতর তার তালিকা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হ'ল—

(১) কেন্দ্রিয় বিষয় বা আবশ্যিক বিষয় (Core Subject) :

ভাষা : (ক) মাতৃভাষা, (খ) ইংরেজী অথবা যে-কোন ভারতীয় ভাষা, বা বিদেশী ভাষা, বা সংস্কৃত।

(গ) সমাজবিদ্যা (দু'বছরের জন্য), (ঘ) সাধারণ বিজ্ঞান (দু'বছরের জন্য)

(ঙ) যে কোন এক ধরনের হস্ত শিল্প, (চ) গণিত।

(২) বিশেষ বিষয় সমূহ (যে-কোন শ্রেণী থেকে তিনটি বিষয় পড়তে হবে)—

(ক) মানবীয় বিজ্ঞান (Humanities) :

(১) সংস্কৃত,
(২) ইতিহাস,
(৩) ভূগোল,
(৪) অর্থবিদ্যা ও রাষ্ট্রবিদ্যা,
(৫) মনোবিদ্যা ও তর্কবিদ্যা,
(৬) অঙ্ক,
(৭) সংগীত।

(খ) বিজ্ঞান বিভাগ (Science) :

(১) পদার্থ বিদ্যা,
(২) রসায়ন বিদ্যা,
(৩) জীববিদ্যা,
(৪) অঙ্ক
(৫) ভূগোল,
(৬) দেহ-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।

(গ) কারিগরি বিভাগ (Technical) :

(১) ফলিত গণিত,
(২) অঙ্কন,
(৩) ফলিত বিজ্ঞান (পদার্থ ও রসায়ণ বিদ্যা)
(৪) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,
(৫) ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং :

(ঘ) বাণিজ্য বিভাগ (Commerce) :

(১) বাণিজ্যিক তত্ত্ব,
(২) বুক কিপিং,
(৩) বাণিজ্যিক ভূগোল ও অর্থনীতি,
(৪) সর্টহ্যাণ্ড এবং টাইপ রাইটিং।

(ঙ) কৃষি বিভাগ (Agriculture) :

(১) সাধারণ কৃষিতত্ত্ব,
(২) পশু পালন,
(৩) উদ্যান বিদ্যা,
(৪) কৃষিমূলক রসায়ন ও উদ্ভিদ্ বিদ্যা।

(চ) কারুকলা বিভাগ (Fine Arts) :

(১) চারু কলার বিকাশের ইতিহাস,
(২) নক্সা ও অঙ্কন,
(৩) মূর্তি নির্মাণ,
(৪) চিত্রাঙ্কন,
(৫) সংগীত,
(৬) নৃত্য।

(ছ) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Home Science) :

(১) গৃহস্থালীর অর্থনীতি, (৩) মাতৃ সেবা ও শিশুপালন-বিষয়ক বিষয়,

(২) পুষ্টি ও রন্ধন, (৪) গৃহস্থালী পরিচালনা ও সেবা।

আলোচ্য পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, আধুনিক শিক্ষা চিন্তার যা কিছু ভাল তা এর ভিতর সংযোজিত হ'য়েছে। এই পাঠ্যক্রমে জীবনের আদর্শ তথা শিক্ষার আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয় সংযোজন করা হ'য়েছে। জীবনের আদর্শ—সুস্থ, শান্তিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হওয়া, বৃত্তিজীবনে সার্থকতা লাভ করা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সার্থকভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা, নিজস্ব সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির সকল রকম চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ দান করা এবং তাকে সমাজ জীবনের তথা বৃত্তি-জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা। এই পাঠ্যক্রমের মধ্যে এই দুই ধরনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই অর্থে এই ধরনের পাঠ্যক্রমকে আমরা আদর্শ পাঠ্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

॥ আলোচনা ॥

পাঠ্যক্রমের সংস্কার সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মত (Indian Education Commission on Reformatiom of Curriculum) :

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে (কোঠারী, ১৯৬৬) পাঠ্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করেছেন এই ব'লে—"The school curriculum is in a state of flux all over the world to-day." পৃথিবীর সমস্ত দেশেই প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠছে সে অনুন্নত দেশই হোক বা উন্নত দেশই হোক। পাঠ্যক্রম যেন শিক্ষাবিদের কাছে চিরন্তন এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আর সেই বিদ্রোহের স্বাভাবিক প্রকাশও যেন এই কমিশনের মধ্যে দেখা যায়। তবে যতই সৎ প্রচেষ্টা নিয়ে এই কমিশন সুপারিশ করুন না কেন পাঠ্যক্রমের সংগঠনের দিক থেকে মাধ্যমিক কমিশনের অতিরিক্ত বিশেষ কিছুই তাঁরা বলেননি। তারা বিদ্যালয়ের শিক্ষা-কাল ও শিক্ষাস্তরের পুনর্বিন্যাস করেছেন, তার ফলে পাঠ্যক্রমের কিছু পুনর্বিন্যাস করেছেন মাত্র। তবে পাঠ্যক্রমকে সুপরিচালনা করার জন্য বিশেষ কতকগুলো জিনিসের সুপারিশ করেছেন, সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখানে বিশেষভাবে সেগুলোর

উল্লেখ করবো। পাঠ্যক্রমের বিষয়াদির সম্বন্ধে আর বিশদ আলোচনা করবো না। পাঠ্যক্রমের বিষয়ের ভেতর কয়েকটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বা কাজের উল্লেখ করেছেন, যেমন—নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা, কর্ম ভিত্তিক অভিজ্ঞতা (Work experience)।

উচ্চতর প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত তাঁরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন—

(১) মাতৃভাষা,

(২) হিন্দি অথবা ইংরেজী (প্রয়োজন বোধে তৃতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী)

(৩) অঙ্ক,

(৪) বিজ্ঞান

(৫) সমাজবিদ্যা,

(৬) কারু-শিল্প,

(৭) কর্মভিত্তিকে অভিজ্ঞতা এবং সমাজ সেবা (Work experience and Social service),

(৮) দৈহিক শিক্ষা, এবং

(৯) আধাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ও (৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত) অনুরূপ ভাবে, পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন। এই স্তরে তিনটে ভাষা শিক্ষার জন্য এবং সমাজ-বিদ্যাকে পৃথকভাবে ইতিহাস, ভূগোল ও রাষ্ট্রনীতি পড়ার সুপারিশ করেছেন, পরবর্তী স্তরে তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে বিশেষ শিক্ষার কথা বলেছেন। তবে এস্তরেও তাঁরা কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা, সমাজ সেবা এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষার কথা বলেছেন। তাঁদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সুপারিশের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল যে, তারা ভাল ভাল বিদ্যালয়ের জন্য উন্নত ধরনের (advance study) পাঠ্যক্রম রচনার কথাও বলেছেন।

পাঠ্যক্রমের সংস্কারের জন্য এবং তার সার্থক সংগঠনের জন্য কমিশন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। এই সব সুপারিশ যথাযথভাবে কার্যকরী হ'লে, পাঠ্যক্রম নির্বাচনের অনেক সমস্যাই সমাধান হবে এবং তার সার্থক রূপায়ণও সম্ভব হবে।

[এক] কমিশন মনে করেন, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অতৃপ্তির একমাত্র কারণ হ'ল—পাঠ্যক্রম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রে রচনা করা হয় না।

১০

তাই তাঁরা বলেছেন পাঠ্যক্রমের যে-কোন ধরনের পুনর্বিন্যাস গবেষণামূলক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয়-শিক্ষা সংস্থার যে সব গবেষণামূলক কাজ হবে তারই ভিত্তিতে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন হবে, শুধুমাত্র তাত্ত্বিক যুক্তি দিয়ে নয়। এর জন্য যথেষ্ট গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

[দুই] পাঠ্যক্রম কার্যকরী না হওয়ার প্রধান কারন হ'ল শিক্ষকরা এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন না। তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠ্যক্রমাভি-মুখী মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

[তিন] দরকার হ'লে ভাল ভাল বিদ্যালয়ে উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে।

[চার] বিদ্যালয়গুলো যাতে নিজেরা নতুন পাঠ্যক্রম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে পারে তার সুযোগ তাদের দিতে হবে। বিভিন্ন উচ্চতর সংস্থা এ বিষয়ে তাদের সাহায্য করবেন।

[পাঁচ] দশম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষার (General Education) ব্যবস্থা করতে হবে, এবং পরবর্তী স্তরে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) বিশেষ কর্মভিত্তিক বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

[ছয়] প্রত্যেক পর্যায়ে যোগত্যা অর্জনের জন্য কতটুকু জ্ঞান থাকার দরকার তা নির্দিষ্ট ক'রে দিতে হবে। এতে ক'রে মূল্যায়নের সমতা আসবে।

[সাত] বিজ্ঞান শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে এবং অঙ্ককেও। কমিশন বলেছেন, বিজ্ঞান ও গণিত শিক্ষা দশম শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক হবে। [Science and mathematics should be compulsory in the first ten years of school], তাঁরা মনে করেন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুই বিষয়ের উপর যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহ'লে আমাদের দেশ পিছিয়ে পড়বে।

[আট] সমাজবিদ্যা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কারণ তাঁরা মনে করেন এর মাধ্যমে নাগরিকতার শিক্ষা হবে এবং জাতীয় সংহতি আসবে।

[নয়] কমিশন প্রত্যেক শিক্ষাস্তরেই দৈহিক কাজের কথা বলেছেন। এই কাজ শিশুর দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতানুযায়ী বিভিন্ন স্তরে নির্বাচন করতে হবে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে যা সুপারিশ করেছেন, তার মধ্যে আধুনিক ভাবধারার সকল গুণই বর্তমান। বিশেষতঃ গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার সঙ্গে এর যথেষ্ট মিল আছে। প্রত্যেক স্তরের শিক্ষাকেই কর্মভিত্তিক করার কথা বলা হ'য়েছে এবং ব্যক্তির মধ্যে জাতীয়তা বোধ জাগ্রত করার জন্য সকল রকম প্রচেষ্টা করতে বলা হ'য়েছে। তবে কমিশন বলেছেন যে, একে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম বলবো না। এই পাঠ্যক্রমের সার্থকতা নির্ভর করবে শিক্ষা ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করছেন—শিক্ষক, ছাত্র, গবেষক, সহায়ক সকলের সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

শিক্ষক, তাঁর কাজ ও গুণাবলী

The Teacher—his Functions and Qualifications

শিক্ষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে শিক্ষক (Teacher) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। একজন আদর্শ শিক্ষক সমস্ত রকম অসুবিধার মধ্যেও শিক্ষার কাজ এমন সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন যে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সার্থকতা আসে। আবার সকল রকম সুবিধা সুযোগ পেয়েও শিক্ষকের যোগ্যতা না থাকার জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (কেঠারী, ১৯৬৬) তাঁদের রিপোর্টে শিক্ষকদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের গুরুত্বের কথা বিশেষ ভাবে আলোচনা করেছেন। শিক্ষকদের মর্যাদা (Teacher status)-শীর্ষক অধ্যায়ে কমিশন এই বলে শুরু করেছেন—"of all the different factors which influence the quality of education and its contribution to national development, the quality, competence and character of teachers are undoubtedly the most significant," শিক্ষকের এই গুরুত্বের কথা চিন্তা ক'রে তাঁর কাজ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা এখানে বিশেষ ভাবে আলোচনা করবো।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান (The place of Teacher in the old scheme of Education) :

শিক্ষার তিনটে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ করেছি—শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠ্যবস্তু বা পাঠ্যক্রম। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ছিলেন শিক্ষার কেন্দ্র। শিক্ষাকে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত। এর এক প্রান্তে থাকতেন শিক্ষক অপর প্রান্তে শিক্ষার্থী। জ্ঞান বা বিষয়বস্তু ছিল তাদের মধ্যে সংযোজনের মাধ্যম। অর্থাৎ, জ্ঞান শিক্ষকের দিক থেকে ছাত্রাভিমুখে প্রবাহিত হ'ত। অর্থাৎ এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকই ছিলেন সক্রিয় উপাদান, আর শিক্ষার্থী ছিল নিষ্ক্রিয় গ্রহণাত্মক (receptive) উপাদান মাত্র। শিক্ষক ছিলেন জ্ঞানের আধার আর সেই আধার থেকে তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন। শিক্ষক যা বলবেন তা শিক্ষার্থী বিনা

বিচারে, কোন রকম বিশ্লেষণ না করেই গ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীর কি শেখার যোগ্যতা আছে, কি কি জিনিস সে শিখতে চায়, এ নিয়ে শিক্ষককে ভাবতে হোতো না। তিনি পূর্ব পরিকল্পিত গতানুগতিক রীতিতে শিক্ষার্থীর জীবন ধারণের জন্য যে সব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অপরিহার্য মনে করতেন, তাই তাকে দিতেন। শিক্ষকের উদ্দেশ্য ছিল, আদর্শ জীবন গঠনে সাহায্য করা। হয়তো তাঁর পদ্ধতি ভুল হ'তে পারে। তার যে তত্ত্বমূলক দিক আছে তা ভ্রান্ত হ'তে পারে। তবে তিনি ছিলেন শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শিক্ষার্থীর জীবনকে গড়িয়ে পিটিয়ে তৈরী করার দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। তাই একজন বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ বলেছেন—"It is the teacher about whom the whole educational system rotates." কিন্তু এই ধারণার পরিবর্তন হ'য়েছে আধুনিক কালে। শিক্ষার তাৎপর্য আধুনিক কালে নতুন সংব্যাখ্যান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। গতানুগতিক রীতিতে শিক্ষকের যে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছিল এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে যে আদান প্রদান বা দাতা গ্রহিতার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছিল তাকে ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণ করা হ'য়েছে। সুতরাং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক তাঁর স্থান পরিবর্তন করেছেন, শিক্ষার তাৎপর্যের সঙ্গে সমতা রেখে।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের স্থান (The place of teacher in Modern Education):

শিক্ষাবিদরা আধুনিক শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'শিশুকেন্দ্রিক' কথার তাৎপর্যই সহজে প্রকাশ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের স্থান কোথায়। শিক্ষাদর্শনের ক্ষেত্রে, প্রাচীনর চিন্তাধারার বিরুদ্ধে একদিন যে ঝড় উঠেছিল, তারই প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ আজকে আমরা এই পর্যায়ে এসে পড়েছি। ব্যাপক মনোবিদ্যার তত্ত্বের প্রয়োগ, এবং শিক্ষা দার্শনিকদের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে এই আন্দোলনকে স্থায়ীভাবে স্থান ক'রে দিয়েছে।

সুতরাং আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল শিক্ষার্থী—শিক্ষক নয়, পাঠ্যক্রম নয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা, অনুরাগ', ক্ষমতা ইত্যাদি প্রধান।—সে তার নিজস্ব মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করবে। শিক্ষকের কাজ হবে তাকে সহায়তা করা। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক এখন পেছনে। তিনি শিক্ষার্থীর উপর জোর ক'রে তার

নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব চাপিয়ে দেবেন না। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে থাকবেন শিক্ষার্থীর পাশে তার সহায়ক হিসেবে।

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক ছিলেন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে তাঁর এই অবস্থিতি জ্ঞান আহরণে সহায়তার চেয়ে বাধা হ'য়েই দাঁড়োতো। বর্তমানে তিনি শিক্ষার্থীকে সুযোগ দিবেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে। শুধু প্রয়োজন বোধে তিনি তাকে নির্দেশনা (Guidance) দেবেন। তার পরিপক্ক মন শিশুকে প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে না, পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই অর্থে আধুনিক শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর নির্দেশক (guide) মাত্র।

আবার শিক্ষকের এই নতুন দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক সম্বন্ধে আমাদের নতুন ক'রে চিন্তা করতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষক জ্ঞান দান করতেন এবং শিক্ষার্থীরা তা গ্রহণ করতো এবং ধারণা এই ছিল যে, এই আদান প্রদানের পরিবেশ হবে খুব গাম্ভীর্যপূর্ণ। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এমন হবে যাতে ক'রে তার অবস্থিতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করতে পারে। এই ধারণা অনুযায়ী "ফোনগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরী করা যাইতে পারে" কিন্তু আধুনিক শিক্ষার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষক হবেন শিশুর নির্দেশক। আদর্শ নির্দেশক তিনি হ'তে পারেন যিনি তার সঙ্গীকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারেন এবং আদর্শ নির্দেশনা তখনই সম্ভব যখন গ্রহীতা নির্দেশকের সঙ্গে সহজ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হবে। তাই আধুনিক শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। তিনি সব সময় শিক্ষার্থীর পাশে বন্ধুর মত থাকবেন। তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক গড়ে না উঠলে শিক্ষা সার্থক হ'তে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন—"গুরুর অন্তরের ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায় তা হ'লে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই।.... আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান...। তাই পাকাশাখায় কচিশাখায় ফুল ফোটাবার, ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হ'য়ে থাকে।" সুতরাং আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু (Friend)।

বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে তুলতে না পারলে শিক্ষার কাজ সার্থক হবে না।

সবশেষে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। বিশেষ ক'রে তার চারিত্রিক গুণের গুরুত্ব বেড়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান শিক্ষার্থীর পাশে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর বন্ধুত্ব সুলভ সম্পর্কের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। শিক্ষক কোন কিছু কৃত্রিম উপায়ে শিক্ষার্থীর উপর চাপিয়ে দেবেন না। শিক্ষার্থী পারস্পরিক সহযোগিতার ও বসবাসের মাধ্যমে শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করবে। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর জীবনের আদর্শ। শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রেই শিশু তার জীবনাদর্শ গড়ে তুলবে। তাই তিনি হবেন, শিক্ষার্থীর কাছে আদর্শ পুরুষ। তিনি শিক্ষার্থীর মনে জীবনাদর্শ জাগিয়ে তুলবেন, তিনি তার মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবেন।

সুতরাং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের অবস্থানের যেমন পরিবর্তন হ'য়েছে, তেমনি তার দায়িত্বেরও অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি সব সময় শিশুর পাশে থেকে তাঁর আদর্শ জীবনের প্রভাবের দ্বারা তাকে প্রভাবিত ক'রে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে তার জীবন বিকাশের সহায়তা করবেন।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রেন (P. Wren) বলেছেন—"The teacher is not merely the fountain of facts, the working encyclopaedia, and the universal provider of useful and useless information to the young but their guide, philosopher, and friend, the skilled builder of their character, trainer of their bodies and developer of their intellect."

সার্থক শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Competant Teacher) :

প্রাচীন চিন্তাধারায়ই হোক কি আধুনিক চিন্তাধারায়ই হোক শিক্ষক শিক্ষা ক্ষেত্রেই এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য যেমন চাই পাঠ্যক্রম, পদ্ধতি, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ তেমনি চাই সুশিক্ষক। আদর্শ শিক্ষক ছাড়া যে কোন আদর্শই ব্যর্থ হবে। আদর্শ শিক্ষক যে-কোন পরিস্থিতির ভিতর নিজের কুশলতায়, শিক্ষার্থীকে সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। আবার শিক্ষক যদি ভাল না হন তাহ'লে যতই পরিবেশ ও পদ্ধতি ভাল হোক না কেন,

শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হ'লে চাই যোগ্য শিক্ষক।

আবার মনোবিদ্যার জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে বলা যায়, প্রত্যেক মানুষের তার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য (দৈহিক এবং মানসিক) আছে এবং সেই বৈশিষ্ট্য বা গুণ দিয়ে সে একটা বিশেষ বৃত্তির চাহিদা সার্থক ভাবে মেটাতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সংলক্ষণ (Traits) আছে তার ভিত্তিতেই বৃত্তি নির্বাচন করা উচিত। তাহ'লে জীবনে সফলতা আসবে, সমাজও উপকৃত হবে। শিক্ষকতাকে যদি আমরা বৃত্তি হিসেবে ধরি, তাঁরও নিশ্চয়ই ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু চাহিদা থাকা স্বাভাবিক। কোন্ কোন্ বিশেষ গুণ থাকলে এই বৃত্তির চাহিদা সার্থকভাবে মেটানো যায়, বা শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা আদর্শগত দিক থেকে দরকার, সে সম্পর্কে আলোচনা করবো।

কি কি বৈশিষ্ট্য থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায় এ নিয়ে মনোবিদ্, শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাবিদ্‌রা বহুদিন ধরে আলোচনা ক'রে আসছেন। তার বিশেষ কয়েকটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। আলোচনার সুবিধার জন্য এই বৈশিষ্ট্য-গুলোকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

[ক] ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (Subjective Characteristics) এবং

[খ] বস্তুগত বা পেশাগত বৈশিষ্ট্য (Objective or Professional Characteristics)।

অনেকে অবশ্য এই শ্রেণী বিভাগ অন্যভাবে করেছেন। যেমন, কেউ বলেছেন —অর্জিত ও অনর্জিত গুণ; আবার কেউ বলেছেন ব্যক্তিগত গুণ ও বৃত্তিগত গুণ ইত্যাদি। যে কোন ধরনের শ্রেণীবিভাগই হোক না কেন শিক্ষকের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকার প্রয়োজন সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত।

(ক) ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (Personal or Subjective Characteristics) :

যে সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য শিক্ষার সহায়ক, তাকে বলা হ'চ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য। এই গুণগুলোর মধ্যে কতকগুলো আছে দৈহিক, কতকগুলো মানসিক, আবার কতকগুলো জন্মগত ভাবে পাওয়া, কতকগুলো অর্জন করা। অর্জিত এবং অনর্জিত এই দু'ধরনের শ্রেণীবিভাগের অসুবিধা আছে। অনর্জিত গুণের উপর ভিত্তি ক'রেই অর্জিত গুণ বিকাশ লাভ করে। আবার অনেক অনর্জিত

বৈশিষ্ট্য পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবর্ধন হয়। তাই সেই ধরনের শ্রেণী বিভাগ আমরা এখানে করার চেষ্টা করবো না।

[এক] সুশিক্ষক আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন। ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি তা নয়। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা আমাদের বদলে ফেলতে হবে। আমাদের ধারণা ছিল শিক্ষক সব সময় গম্ভীর থাকবেন, ছাত্রদের সঙ্গে অবাধ মেলা মেশা করা বারণ। তার বিভিন্ন ধরনের আবেগমূলক প্রতিক্রিয়া (Emotional Reaction) যাতে প্রকাশ না পায় সে দিকে লক্ষ্য রাখবেন। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্বের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। তিনি হবেন শিক্ষকের বন্ধু এবং সমাজেরও বন্ধু। তাই বন্ধু ভাবাপন্ন হওয়ার জন্য ব্যক্তিত্বের যে সব সংরক্ষণ (Personality traits) থাকা উচিত তা তাঁর মধ্যে থাকবে। তার ব্যক্তিত্ব এমন ভাবে সংগঠিত হবে যাতে ক'রে তিনি স্বাভাবিক ভাবে ছাত্রদের আকর্ষণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পারেন, সে রকম ব্যক্তিত্ব যেন তাঁর থাকে।

[দুই] সুশিক্ষকের বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি সাধারণ যে কোন বৃত্তিকে নিযুক্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশী হওয়ার দরকার। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষাকে কর্মকেন্দ্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে। শিশুর আচরণকে মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং আধুনিক কালে শিক্ষা পরিস্থিতি একেবারে পূর্বনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত ধারায় চলবে, একথা বলা যায় না। 'শ্রেণী কক্ষে নানা রকম সমস্যার উদ্ভব হ'তে পারে, সেই সমস্যাকে সার্থক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য শিক্ষকের মানসিক যোগ্যতা থাকার দরকার তিনি যাতে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন তার জন্য তাঁর বুদ্ধি বৃত্তি বেশী হওয়ার দরকার। আধুনিক পরিমাপের ভিত্তিতে ঠিক কত বুদ্ধাঙ্ক (I. Q,) হ'লে সুশিক্ষক হ'তে পারবেন, তা মনোবিদ্‌রা সঠিক ক'রে বলতে পারেন নি। তবে তাঁরা মনে করেন সুশিক্ষকের বুদ্ধাঙ্ক 120 এর বেশী হওয়ার দরকার।

[তিন] সুশিক্ষকের যথেষ্ট দায়িত্ব বোধ থাকবে। তিনি সব সময় সচেতন থাকবেন ; ব্যক্তি হিসেবে সমাজ তার উপর গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সমাজ তার উপর ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলার ভার দিয়েছে। তাঁর আচরণের দ্বারাই

শিক্ষার্থীরা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়। আদর্শ শিক্ষক শিশুর মনে এমন এক ছাপ রেখে যান যা তার পরবর্তী জীবনে সব রকম আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষক যদি তাঁর এই গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন না থাকেন তবে তিনি কোন দিনই সুশিক্ষক হ'তে পারবেন না। সুশিক্ষক তিনিই যিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার গঠনে সাহায্য করবেন, তার নিজস্ব আচরণ, চিন্তা-ধারা, মন্তব্য ইত্যাদির দ্বারা।

[চার] সুশিক্ষক তার চিন্তায় এবং আচরণে প্রগতিশীল হবেন। গতি প্রবণতা হ'ল আধুনিক যুগের ধর্ম। যে মানুষ এই গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না সে জীবন সংগ্রামেও পিছিয়ে পড়বে। তাই মানুষকে বাঁচতে হ'লে যুগের সঙ্গে তাল রেখে বাঁচতে হবে। যুগ ধর্মের সমস্ত গুণ ও মানকে ব্যক্তি জীবনে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ ক'রে শিক্ষকের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত প্রয়োজন। তিনি যদি আধুনিক ধারার সঙ্গে পরিচিত না হন, তিনি যদি আধুনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী না হন, তাহ'লে তিনি আধুনিক জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার অযোগ্য ব'লে প্রমাণিত হবেন। জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনিই প্রথম সারিতে প্রথম পা বাড়াবেন। তবেই শিক্ষার্থীরা তাল মেলাতে পারবে। তিনি আধুনিকতার সৃষ্টিকর্তা হবেন, তিনিই তার রক্ষক হবেন। এডওয়ার্ড থ্রিং (Edward Thring) বলেছেন—"**The work of the teacher is two fold, producing thought and training it.**"

[পাঁচ] সুশিক্ষকের আর একটা লক্ষণ হ'ল তাঁর আবেগমূলক জীবন পরিপক্ক হবে (Emotional maturity), তিনি অল্পে নিরাশ হবেন না। কোন ব্যর্থতা যেমন সহজ ভাবে নেবেন, তেমনি আবার কোন সাফল্যকে সংযমের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। অত্যধিক আবেগের বহিঃপ্রকাশ মানুষকে বিচলিত করে। তাই আত্মসংযম, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাওয়ার মত মানসিক স্থৈর্য শিক্ষকের থাকা উচিত।

[ছয়] সুশিক্ষকের আর একটা বড় গুণ হ'ল যে তিনি উন্নত জীবনাদর্শ গ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাকে দেখেই অনুকরণ করতে শিখবে। তিনি উন্নত ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। দয়া, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি বিমূর্ত নৈতিক ধারণা (Moral Concept) শিশুকে পাঠ্য পুস্তকের মাধ্যমে

দেওয়া যায় না। জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মাধ্যমেই এদের অনুশীলন সম্ভব। মনের সঙ্গে মনের, জীবনের সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ সম্মেলন না হ'লে শিশুদের মধ্যে জীবনাদর্শ গড়ে তোলা যায় না। তাই সঠিক জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে হ'লে, শিক্ষককে তার অধিকারী হ'তে হবে।

[সাত] সুশিক্ষকের আর এক বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা। আধুনিক সমাজব্যবস্থায় আদর্শ নাগরিক হ'তে হ'লে, প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা থাকার দরকার। শিশুদের মধ্যে এই ক্ষমতাকে জাগাতে হ'লে শিক্ষককেও সেই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরকার। তিনি যে কোন সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে যেন তার স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যের চিন্তার দ্বারা ভারাক্রান্ত হ'লে, তিনি সেই ধারণাই শিক্ষার্থীদের উপর জোর ক'রে চাপানোর চেষ্টা করবেন। এতে ক'রে ব্যক্তির স্বাভাবিক চিন্তার বিকাশ ব্যাহত হবে; সে ক্রমে মানসিক দিকে থেকে পঙ্গু হ'য়ে যাবে।

[আট] শিক্ষকতা হ'ল মহান বৃত্তি (Teaching in a noble profession)। এই মহান বৃত্তি মানুষকে তার যোগ্যতা ও সেবার গুরুত্বের উপযোগী ফল সব সময় দেয় না। অর্থের চেয়ে আদর্শই এই বৃত্তি নির্বাচনের মূল কথা। তাই সুশিক্ষককে সেবাধর্মী মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেবার মনোবৃত্তি যদি না থাকে, তিনি যদি মনে না করেন যে, তিনি কর্মের দ্বারা মানুষের সেবা করছেন, তাহ'লে তিনি শিক্ষকতা কাজে তৃপ্তি পাবেন না এবং তাঁর দ্বারা শিক্ষার আদর্শেরও বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হবে না। অর্থের বা কোন স্বার্থের বিনিময়ে বিদ্যাদান শিক্ষকতা বৃত্তির পক্ষে কাম্য নয়। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুর মধ্যে আমরা এই আদর্শ দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথও এই আদর্শকে বড় করে দেখেছেন। তিনি বলেছেন—"একদিন বুদ্ধদেব বলেছেলেন—আমি সমস্ত মানুষের দুঃখকে দূর করিব; দুঃখ তিনি সত্যি দূর করতে পেরেছিলেন কিনা সেটি বড় কথা নয়; বড় কথা হ'চ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন।" এই ধরনের আদর্শ না থাকলে সুশিক্ষক হওয়া যায় না।

[নয়] সুশিক্ষকের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল তার জ্ঞান পিপাসা। শিক্ষক জ্ঞান পিপাসু হবেন জ্ঞানের শেষ নেই। সেই জ্ঞানকে জীবন পরিসরের মধ্যে অর্জন করা খুব সহজ কাজ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পড়া শেষ করলেই সব-

জানা হয় না। শিক্ষক জ্ঞানের জন্য তপস্যা করবেন। আজীবন জ্ঞান আহরণে ব্যাপ্ত থাকবেন, তবেই তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সেই তৃষ্ণা জাগ্রত করতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর Creative Unityতে বলেছেন "A most important truth which we are apt to forget, is that a teacher can never truely teacher unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame." সুতরাং, শিক্ষকের মধ্যে যদি জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা প্রবল ভাবে জ্বলতে না থাকে তিনি ছাত্রদের জ্ঞান দান করতে পারবেন না।

[দশ] শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার কাজকে সুন্দর ভাবে পরিচালনা করার জন্য শিক্ষকের আর যে গুণ থাকার দরকার তা হ'ল রসজ্ঞান (Sense of humour) রস সৃষ্টি (Humour) বলতে একজন আধুনিক মনোবিদ বলেছেন, "To laugh at a thing one loves and still to love"। যে জিনিসকে আমরা ভালবাসি তার প্রতি কোন রকম মানসিক বিকার না এনে, তাকে উপহাস করার ক্ষমতা, এই ধরনের সূক্ষ্ম রসজ্ঞান শিক্ষকের না থাকলে তিনি শ্রেণীকক্ষে রসসৃষ্টি করতে পারবেন না। শ্রেণীকক্ষের ভাব গম্ভীর বিষয়বস্তুকে সরস করার জন্য এই ধরনের রসজ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তা না হ'লে গতানুগতিক আলোচনা শিশুদের কাছে নিরস হ'য়ে পড়ে এবং তাদের মনযোগ আকর্ষণ করতে পারে না।

[এগার] ছাত্রপ্রীতি সুশিক্ষকের আর একটি গুণ। অনেক শিক্ষক আছেন, যাঁরা ছাত্রদের এড়িয়ে চলেন। তাঁরা শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশা করা পছন্দ করেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্‌রা মনে করেন, যে সব ব্যক্তি খুব সহজ ভাবে ছাত্রদের বা শিশুদের সঙ্গে মিশতে না পারে, তারা শিক্ষকতা কাজের অযোগ্য। শিক্ষা পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও ছাত্রের সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন। এখন তারা পরস্পর যদি পরস্পরকে সহ্য করতে না পারেন তাহ'লে শিক্ষা কাজ চলতে পারে না। তাই যে শিক্ষক ছাত্রদের সাহচর্যে আনন্দ পান না তাঁর দ্বারাও শিক্ষার কাজ চলতে পারে না।

[বারো] সবশেষে, সুশিক্ষকের কয়েকটা বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের কথা

উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য যে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ যে কথা স্পষ্ট ক'রে বলা যায় না। তবে শিক্ষকদের মধ্যে এই গুণগুলো থাকলে ভাল হয়। যেমন—

(ক) স্বাস্থ্য—শিক্ষক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবেন। বিশেষ ভাবে তাকে বিদ্যালয়ে অনেক সময় থাকতে হয়। তার শারীরিক পরিশ্রমের কথা বিবেচনা ক'রে বলা যায়, তিনি যদি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হন তাহ'লে তার পক্ষে এই বৃত্তিতে থাকা মুস্কিল হ'য়ে পড়ে।

(খ) দৈহিক সুশ্রীতা থাকলে ভাল হয়, তার কারণ, ছাত্ররা এতে তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। যাঁদের এই গুণ নেই, তাঁদের অন্য কৌশলে ছাত্রদের আয়ত্তে আনার প্রয়োজন হয়। তবে শুধুমাত্র দৈহিক সুশ্রীতা থাকলেই যে ছাত্ররা আকৃষ্ট হবে তার কোন স্থিরতা নেই। শিক্ষকের অন্যান্য গুণের সঙ্গে তার যদি সার্থক সমন্বয় হয়, তবেই তা কার্যকরী হয়।

(গ) শিক্ষকের গলার স্বর ও বাচনভঙ্গী ভাল হওয়ার দরকার। এতেও ছাত্ররা শিক্ষকের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এই সব দৈহিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের থাকলে ভাল হয়।

(খ) বস্তুগত বা পেশাগত বৈশিষ্ট্য (Objective or Professional Characteristics) :

শিক্ষকের ব্যক্তিগত—চারিত্রিক, দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়া আরো কতকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো বিশেষ ভাবে তার বৃত্তিকেন্দ্রিক। এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা বলছি পেশাগত বৈশিষ্ট্য। এগুলো সব বাহ্যিক। তবে শিক্ষকতা বৃত্তিতে এই বৈশিষ্টগুলির গুরুত্ব কম নয়।

[এক] সুশিক্ষক যিনি হবেন, তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকবে। শিক্ষক যদি অগাধ জ্ঞানবান না হন তাহ'লে তিনি শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসাকে তৃপ্ত করতে পারবেন না। তাঁর জ্ঞান যে কেবলমাত্র শিক্ষণীয় বিষয়টিতে থাকবে তা নয়, জ্ঞানের সমস্ত শাখার সঙ্গে তার পরিচিতি থাকার দরকার। ছাত্রদের স্পৃহা বা কৌতুহলকে তৃপ্ত করার জন্য তার সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও জ্ঞান প্রয়োজন। সীমিত জ্ঞান নিয়ে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করলে, শিক্ষক কোনদিন তার বৃত্তিতে সফল হ'তে পারবেন না এবং ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাবেন না।

[দুই] শুধুমাত্র বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান থাকলেই সুশিক্ষক হ'তে পারবেন না, সেই জ্ঞানকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার মত দক্ষতা তাঁর থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ আধুনিক মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা থাকা চাই এবং সেগুলোকে কি ভাবে কার্যকরী করা যায় সে সম্বন্ধে তার প্রশিক্ষণ পাওয়া একান্ত দরকার। এই কারণেই ভারতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষক প্রশিক্ষণের (Teacher Education) উপর বিশেষ .গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন "A sound programme of professional education of teachers is essential for the qualitative improvement of education. Investments in teacher education can yeild very rich dividends because the financial resource required are small when measured against the resulting improvement in the education of millions."

[তিন] সুশিক্ষকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল পরীক্ষণমূলক মনোভাব। তিনি যে শুধু গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তা নয়, বিশেষ শিক্ষা পরিস্থিতিতে শিক্ষা পদ্ধতিকে পরিবর্ধন করাও তাঁর কাজ। কারণ কোন পদ্ধতিই সর্বজনীন ভাবে সব রকম পরিস্থিতির জন্য স্থির নয়। আবার বিশেষ বিশেষ শিক্ষালয়ের বিশেষ বিশেষ শিক্ষণ ও আচরণমূলক সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেই সমস্যাকে পরীক্ষণমূলক ভিত্তিতে বিশ্লেষণ ক'রে, সমাধান খুঁজে বের করার মত স্পৃহা সুশিক্ষকের থাকার দরকার। জাতীয় শিক্ষামূলক শিক্ষণ ও গবেষণা সংস্থা (National Council of Educational Research and Training ; N. C. E. R. T.) শিক্ষকের এ বিষয়ে উৎসাহ দানের জন্য, এক ধরনের কার্যসূচী পরিচালনা করেন যাকে বলা হয় Experimental Project in School. এই ধরনের ছোট খাটো গবেষণা করার জন্য শিক্ষকদের অর্থ সাহায্য করা হয়।

[চার] সুশিক্ষকের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার জন্য শিশু মনোবিদ্যার (Child Psychology) জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি শিশুদের মানসিকতা সম্বন্ধে যদি কিছু না জানেন তবে তাদের পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। এছাড়া সামাজিক মনোবিদ্যা (Social Psychology) সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকার প্রয়োজন। দলগত মন (Group mind)

কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা না থাকলে শিক্ষার্থীদের দলগত আচরণকে যথাযথ ভাবে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারবেন না।

[পাঁচ] আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হ'লে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের প্রদীপনের (aids) ব্যবহার সম্পর্কে জানার দরকার। কিভাবে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন (audio-visual aids) তৈরী করতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা থাকার দরকার। কারণ আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির একটা বড় কথা হ'ল—"teach through the senses". ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাই শিশুদের কাছে একমাত্র অভিজ্ঞতা, সুতরাং শিক্ষাদানের জন্য ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাতে হ'লে বিমূর্ত জ্ঞানকে প্রদীপনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। সুশিক্ষকের যেমন এই সব প্রদীপন ব্যবহার করার মত মানসিক প্রস্তুতি থাকবে, তেমনি তাদের প্রস্তুতিকরণ ও ব্যবহারবিধি সম্পর্কেও ধারণা থাকার দরকার।

[ছয়] আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে পরীক্ষা বা পরিমাপের (Examination or Measurement) ধারার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। গতানুগতিক পরীক্ষার বদলে আমরা নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাকে (Objective test) বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। সাধারণ ধরনের পরিমাপের (Measurement) পরিবর্তে আমরা ব্যক্তির পরিপূর্ণ মূল্যায়নের (Evaluation) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। সুশিক্ষক এই দুই আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হবেন। কিভাবে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা (Objective test) তৈরী করতে হয়, কিভাবে ব্যক্তির মূল্যায়ন করা হয় এ সম্পর্কে তার ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিশুদের বিকাশের ক্রমিক ধারা অনুশীলন করার জন্য কিভাবে সর্বাত্মক পরিচয় লিপি (Cumulative Record Card) রাখতে হয়, সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা থাকা দরকার।

[সাত] শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য সহ পাঠ্যক্রমিক কাজের গুরুত্ব আধুনিক কালে সকল শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেন। বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ কিভাবে পরিচালনা করতে হয়, এবং তাদের কিভাবে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কেও সুশিক্ষকের ধারণা থাকা একান্ত কর্তব্য।

। আলোচনা ।

শিক্ষকের গুণাবলী বিশ্লেষণ করলে, একটা প্রশ্নই স্বভাবতঃ মনে আসে, সেটা হ'ল শিক্ষকের এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনটি প্রধান এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষকের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটাকে সঠিক করে বেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্দেশ করা খুবই মুস্কিল। তাই এ প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া খুব মুস্কিল। শিক্ষণ পরিস্থিতি খুবই জটিল। সেই জটিল পরিস্থিতিতে শিক্ষকই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারেন। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে যে বৈশিষ্ট্যকে গৌণ মনে হ'চ্ছে, আবার অন্য পরিস্থিতিতে তাকেই বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হ'তে পারে। তাই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় গুণের সমবায়ে একক এক মনুষ্য সত্তা। গুণের তাৎপর্য এবং পরিমাণকে পৃথকভাবে ওজন ক'রে দেখতে গেলে তাঁর ক্ষেত্রে ভুল করা হবে। সুশিক্ষক তিনিই হবেন, যার মধ্যে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো সমন্বয়িত আকার নিয়েছে, যিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে তাদের সার্বিক প্রয়োগ করতে সক্ষম।

আবার অনেকে প্রশ্ন করেন, এই বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা শিক্ষকতাকে জন্মগত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল বলবো না অর্জিত দক্ষতা বলবো। খুব সাধারণভাবেই উত্তর দিতে গেলে বলতে হয় এধরনের চিন্তা খুবই অপ্রাসঙ্গিক। তার কারণ সুশিক্ষকের কতকগুলো গুণের কথা আমরা বলেছি, যেগুলো জন্মগত ভাবে পাওয়া। আবার কতকগুলোর কথা বলেছি যে গুলো তিনি পরবর্তী কালে অর্জন করেন। এখন এদের কারো গুরুত্বই কম নয়। জন্মগত যতই বৈশিষ্ট্য থাক না কেন, তাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছু কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। তা না হ'লে তিনি তার জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগাতে পারবেন না। আবার, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, আমরা যতই তাকে আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞান দিই না কেন, তাঁর মধ্যে যদি জন্মগত কোন অনুপ্রেরণা না থাকে, তিনি আদর্শ শিক্ষক হ'তে পারবেন না। সুতরাং জন্মগত এবং অর্জিত উভয় প্রকার গুণই তাঁর কাজের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয়। তাই সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, শিক্ষক একদিকে যেমন জন্মানও বটে তেমনি তাকে তৈরীও করা হয়। জন্মগত সম্ভাবনাকে যথার্থ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি বিকশিত করা না যেতো, তাহ'লে শিক্ষারই প্রয়োজন থাকতো না। তাই তাঁর কর্মক্ষেত্রের যে মূল-সূত্র তার দ্বারা তিনিও পরিচালিত।

শিক্ষকের কাজ (Function of a Teacher):

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিক্ষকের একমাত্র কাজ হ'ল বিদ্যা দান করা। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি হবেন জ্ঞানের ভাণ্ডার (Store house of

knowledge) এবং তাঁর সেই ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান ছাত্রদের বিতরণ করাই হবে তার প্রধান কাজ। কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন হওয়ায়, তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যের পরিবর্তন হ'য়েছে। এখন শিক্ষকের কাজ শুধু জ্ঞান বিতরণ করা নয়। আধুনিক শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক (child centric)। অর্থাৎ, শিশুকে মুখ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা ক'রে, তার চাহিদা, আগ্রহ, ক্ষমতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা রচিত হবে। তাই এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপর আধিপত্য বিস্তার করবেন না। শিক্ষা যার জন্য তাকে আধিপত্য করতে দিতে হবে। সে তার ইচ্ছা, অনুরাগ ও মানসিক ক্ষমতানুযায়ী নিজের কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখবে। শিক্ষক তার উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। শিক্ষাদানের মূল কথা হ'ল—কিছুই শেখানো যায় না, সব কিছু শিখতে হয় (The essence of true teaching is that nothing can he taught ; everything is to be learnt).

আধুনিক এই চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের কোন দায়িত্ব নেই বা তাঁর দায়িত্ব অনেক কমে গেছে, তাহ'লে খুবই ভুল করা হবে এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তাঁর দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শুদ্ধ জ্ঞানার্জন নয়, পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ করা। সুতরাং এই ব্যক্তিত্ব বিকাশের গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপর এসে পড়েছে। পরিপূর্ণ বিকাশে শিশুকে সহায়তা করার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে কাজ করতে হয়। তাঁর কাজ আজকে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে বা পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার কাজ জীবনের সর্বস্তরে। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কি কি দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা যাক—

[এক] আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক কোন জ্ঞানের বোঝা শিশুর উপর চাপিয়ে দেবেন না। কিন্তু তাই বলে তিনি নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকবেন না। শিশুর কর্মকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে জ্ঞান অর্জন করবে। (শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব হ'বে শিক্ষণ পরিস্থিতির পরিকল্পনা রচনা করা, কর্মপদ্ধতি নির্বাচন করা, যার মাধ্যমে শিশুরা জ্ঞান আহরণ করবে। তাঁর দায়িত্ব হবে সুযোগ ক'রে দেওয়া যায় মাধ্যমে তারা জ্ঞান আহরণ করবে; এর জন্য দরকার হ'লে পাঠ্যক্রম রচনায় তাদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।)

[দুই] (বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তি সত্তার বিকাশ শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে হ'তে পারে না। ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব শিক্ষককে নিতে হ'লে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের চেষ্টা করতে হবে। বৌদ্ধিক বিকাশ (Intellectual development), দৈহিক বিকাশ (Physical development), অনুভূতি ও প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশ (Emotional development), আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual development), সৌন্দর্য বোধের বিকাশ (Aesthetic development)—এ সবই ব্যক্তিসত্তা বিকাশের অন্তর্গত। এই সমস্ত দিকের বিকাশের জন্য যোগ্য কর্মসূচী শিক্ষককে নির্বাচন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের ভেতর তাদের সুপরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে)

[তিন] (শিক্ষালয়, আধুনিক ধারণা অনুযায়ী সমাজেরই প্রতিরূপ হবে। সমাজ জীবনের সব রকম আঙ্গিকই তার মধ্যে থাকবে। সুতরাং শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষালয়কে সেই রূপে সাজানো। বিদ্যালয়ের জীবনকে সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ হাতে নিতে হবে।

[চার] (আধুনিক বিদ্যালয়ের কাজ সব সময় পরিবার বা গৃহ পরিবেশের (Family or Home) সঙ্গে সম্পর্ক রেখে পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন। বাবা, মা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা হবে তার দায়িত্ব। তিনি বাবা-মা বা অভিবাবকের আস্থাভাজন যদি না হন, তবে কখনই আদর্শ শিক্ষক হ'তে পারবেন না। তাছাড়া প্রয়োজন হ'লে সমাজ-শিক্ষামূলক পরিকল্পনাও তাঁকে হাতে নিতে হবে।)

[পাঁচ] (শিশুদের জীবনাদর্শ গঠন করাও তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। শিক্ষকই প্রত্যক্ষ প্রভাবের দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নৈতিক আদর্শ গঠনে সহায়তা করতে পারেন এবং এই সব নৈতিক আদর্শ ধীরে ধীরে আরো সংগঠনের মাধ্যমে সমন্বিত জীবনাদর্শ (Unifying Philosophy of Life) গঠনের পথে এগিয়ে যাবে। এই ধরনের নৈতিক আদর্শ এবং জীবনাদর্শ গঠন করা শুধুমাত্র মৌখিক উপদেশ দ্বারা কোনক্রমের সম্ভব হবে না। এর জন্য প্রয়োজন জীবনের উপর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এই প্রভাবিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের উপর।)

[ছয়] এছাড়া আধুনিক শিক্ষককে শিক্ষার ও জীবনের সঙ্গে জড়িত অনেক ব্যবহারিক সমস্যার সমাধানের দায়িত্বও নিতে হয়। শিশুদের বৃত্তিমূলক ও শিক্ষা-মূলক নির্দেশনা (Educational and vocational guidance), আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা গ্রহণ বা মূল্যায়ন (Evaluation) এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য সংগঠনমূলক কাজের ভারও শিক্ষকে নিতে হয় এখন।)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক ধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের দায়িত্ব কিছু কমেনি বরং অনেক বেড়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের ভিত্তিতে জ্ঞান বিতরণ করা তার কাজ নয়। তার দায়িত্ব আরো গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সম্পূর্ণ জীবন দিয়ে তাঁর বৃত্তিকে সেবা করবেন এবং তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধুমাত্র শিক্ষালয় নয়, সমস্ত সমাজ পরিবেশই তাঁর কর্মক্ষেত্র। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিষ্ক্রিয়তার নয়। তিনি ছাত্রদের অনুশীলন করবেন, তাদের কর্ম পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন বোধেই তাদের সাহায্য করবেন। তাছাড়া তা জীবনের প্রভাব দিয়ে তিনি শিক্ষার্থীর জীবনকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করবেন। সেইটাই হবে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষকের এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে বলেছেন—"আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিবান করিবেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধমুক্ত করিবেন।"

প্রধান শিক্ষক ও তাঁর কাজ (Headmaster and his function) :

বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষকদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। অন্যান্য শিক্ষকের তুলনায় তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য অনেক বেশী। তিনিই বিদ্যালয়ের কেন্দ্র বিন্দু। প্রধান শিক্ষকের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে রেন (Wren) বলেছেন, "What the mainspring is to the watch, the fly wheel to the machine or the engine to the steamship, the headmaster is to the school," শিক্ষকরা বিশেষভাবে ছাত্র বা শিক্ষার্থীদের নিয়েই কাজ করেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষককে শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তার কর্তব্যের সীমা অনেক বেশী। সুতরাং তার কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

প্রধান শিক্ষক প্রথমতঃ শিক্ষক, একথা তাকে মনে রাখতে হবে। সাধারণ

শিক্ষকের মত সমস্ত দায়িত্বই তাকে পালন করতে হবে। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে সহজভাবে মিশবেন। তাদের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করবেন এবং তাদের সমস্ত রকম জীবন বিকাশে সহায়তা করবেন। তিনি যদি শিক্ষার্থীর প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে পরিচিত না হ'তে পারেন তাহ'লে বিদ্যালয়ের সুপরিচালনা করতে পারবেন না। তিনি বন্ধুত্বপূর্ণভাব নিয়ে শিক্ষার্থীদের জীবন বিকাশে সহায়তা করবেন। সুতরাং এক কথায় বলা যায় সুশিক্ষকের যা গুণ থাকা উচিত তার সব কয়টি তাঁর থাকবে। তবে সেটা গুণাবলীর প্রয়োগ হবে অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্রে। সাধারণ শিক্ষক যেমন বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর দিকে নজর রাখবেন, প্রধান শিক্ষককে কিন্তু বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের উপর নজর রাখতে হবে। তিনি সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হবেন এবং তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহিত বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবেন।

এ ছাড়াও, প্রধান শিক্ষকের উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভারও এসে পড়ে। সেই বিষয়ে তাঁর ব্যবহারিক বুদ্ধি ও দক্ষতা থাকার একান্ত দরকার। বিভিন্ন ধরনের হিসেব রাখা এবং অন্যান্য রেকর্ড রাখা তাঁর পরিচালনা মূলক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মহীউদ্দীন প্রধান শিক্ষকের তিন রকম দায়িত্বের কথা বলেছেন—

(১) বিদ্যালয়ের মধ্যে এবং বাহিরে ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা দেখা,

(২) শিক্ষকের সব রকম কাজ পর্যবেক্ষণ করা,

(৩) বিদ্যালয় গৃহ, আসবাব-পত্র, রেকর্ড ইত্যাদি তত্ত্বাবধান করা।

প্রধান শিক্ষক যদি শক্ত হাতে হাল না ধরেন তাহ'লে বিদ্যালয়ের সব রকম উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তিনি যদি বিদ্যালয়ের সব বিভাগের উপর ঠিক নজর রাখতে না পারেন, তাহ'লে এখন অনেক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, যার জন্য দায়ী হবেন তিনি। তাই প্রধান শিক্ষকের আর একটা বড় গুণ হবে, তিনি সুপরিচালক হবেন। সুপরিচালক হওয়ার জন্য যে সব মানসিক বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার তার সব কয়টিই থাকবে। বিশেষ ভাবে, ধৈর্য, সহনশীলতা, অমায়িক ভাব, সমবেদনামূলক মনোবৃত্তি, তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এ ছাড়া, তাঁর প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার মত দৈহিক স্বাস্থ্যও থাকার দরকার।

প্রধান শিক্ষকের কর্তব্যের ভেতর আর একটা বিশেষ কাজ এসে পড়ে,

তাহ'লো অভিভাবকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। বর্তমান শিক্ষার মূল কথা হ'ল কোন একটি বিশেষ সংস্থার (institution) একক প্রচেষ্টায় শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সংস্থার সমবেত চেষ্টায়ই ভাবী কালের নাগরিকতার শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'তে পারে। তাই বিদ্যালয়ের সকল রকম প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হ'লে অভিভাবকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষককে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তিনি বিভিন্ন রকম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে অভিভাবকদের মধ্যে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অভিমুখী মনোভাব গড়ে তুলবেন এবং যাতে তাঁর প্রতি আস্থা প্রকাশ করেন তার চেষ্টা করবেন। তিনি যদি অভিভাবকদের আস্থাভাজন না হন, তাহ'লে তাকে বিদ্যালয়ের পরিচালনা সংক্রান্ত নানারকম অসুবিধার এবং সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে।

সবশেষে, প্রধান শিক্ষকের আর একটা দায়িত্ব হ'ল বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করা। বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ের ভার নিয়ে থাকেন, বিভিন্ন শ্রেণীর ভার নিয়ে থাকেন; বিভিন্ন অফিসের কর্মচারী বিভিন্ন ধরনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। এ সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এই সব বিভাগের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। তাছাড়া বিদ্যালয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্য-সূচীর মাধ্যমে আমরা একই উদ্দেশ্যের দিকেই এগিয়ে যেতে চাই। তাই বিভিন্ন কার্যসূচীর মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে তবে, যে উদ্দেশ্যে আমরা পৌঁছুতে পারবো না। অনেক সময় অনেক কাজ হয়তো এমনও হ'তে পারে যা আমাদের শিক্ষার লক্ষ্যের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। সুতরাং প্রধান শিক্ষকের কাজ হবে, এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ, এদের পারস্পরিক চাহিদা এবং ক্রিয়ার মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করবেন। এক কথায় আমরা বলতে পারি প্রধান শিক্ষক হবেন—বিদ্যালয়ের ভরকেন্দ্র (centre of gravity)।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রধান শিক্ষকের, সাধারণ শিক্ষকের বিভিন্ন গুণাবলী ছাড়াও আরো কিছু বিশেষ গুণ থাকবে যার দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক শিক্ষাদানের কাজও পরিচালনা করবেন এবং তাছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করবেন। অনেক মনে করেন প্রধান শিক্ষকের কাজ পরিচালনা করার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বিশেষ প্রয়োজন। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রেই

দক্ষতা আসে অভিজ্ঞতা থেকে। তবে সে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক দক্ষতা, কাজের মাধ্যমেই আসবে। শিক্ষক হিসেবে তার অভিজ্ঞতা থাকলেই চলবে। সেই অভিজ্ঞতাকেই সম্বল করে, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তার আগ্রহ ও অনুরাগ নিয়ে যদি একাগ্রতার সঙ্গে কাজ করেন, তাহ'লেই তিনি প্রধান শিক্ষকরূপে তার দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

9. It is the teacher about whom the whole educational system rotates"—Elucidate. (C. U., B. T, '65).

Ans : ১৪২ হইতে ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

10 Discuss—"The teacher is the arificer of mind and noble life." (C. U., B. T. '66)

Ans : ১৪১ হইতে ১৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

11. "The teacher must not be a passive on looker but an active observer one who stands by, refraining from fussy interference, but ready to lend a hand when help is called for"—Do you agree? Give reasons for your answer (C. U., B. T. '63)

Ans : ১৪২ হইতে ১৪৪ পৃষ্ঠা ; ১৫৩ হইতে ১৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

12. What is mainspring is to the watch, the fly wheel to the machine or the engine to the steamship, the Headmaster is to the school. Discuss. (C. U., B. T. '59)

Ans : ১৫৬পৃষ্ঠা হইতে ১৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা

Discipline and Freedom

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পরস্পরবিরোধী ধারণা প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষানায়কদের চিন্তার রসদ জুগিয়ে আসছে। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষা, পাঠ্যক্রম-কেন্দ্রিক শিক্ষা, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শ, সমাজ-কেন্দ্রিক শিক্ষাদর্শ ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা শিক্ষাবিদ্‌রা ক'রে আসছেন। ঠিক এমনি ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা (Discipline) এবং স্বাধীনতার মধ্যে পরস্পর বিরোধের মনোভাব এবং তাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আধুনিক কালে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার যেমন সামঞ্জস্যমূলক সমাধান হ'য়েছে, তেমনি শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্যমূলক প্রয়োগবিধিও নির্ধারিত হ'য়েছে। আধুনিক চিন্তাধারার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে আমরা তাদের প্রাচীন অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

শৃঙ্খলা কথার প্রাচীন তাৎপর্য (Old significance of the term Discipline): প্রাচীন ধারণানুযায়ী শৃঙ্খলা বলতে আমরা শাসন বা দমনকে বুঝি। সমাজের পক্ষে যা প্রয়োজনীয়, অভিভাবক বা শিক্ষকদের বিচারে যা কাম্য, তাকে যে-কোন কৌশলে প্রকাশ করা এবং যা অপ্রয়োজনীয় তাকে দমন করাই হ'ল শৃঙ্খলার প্রকৃত তাৎপর্য। মানুষের মনে অনেক আদিম প্রবৃত্তি আছে, যার স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তি-জীবন এবং সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকারক, সুতরাং যে-কোন প্রকারে তাকে দমন করতে হবে। এই ধরনের মনোভাব ভাববাদী দার্শনিকদের (idealistic philosopher) সমর্থন পেয়েছে। ফলে আমরা যে-কোন দেশের প্রাচীন ধর্মীয় সংস্থা-কেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে এই ধরনের শৃঙ্খলার অনুশীলন লক্ষ্য করি। বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত বিদ্যালয়ে আমরা এই ধরনের শৃঙ্খলার অনুশীলন দেখতে পাই। আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতেও

গুরুদের কঠোর বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ঐ সব বিধি-নিষেধের দ্বারা গুরু বা শিক্ষক ছাত্রদের চারিত্রিক শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করতেন। ব্রহ্মচর্যের যে কঠোর বিধিনিষেধ, তা এই ধরনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার পন্থা মাত্র। অর্থাৎ, প্রাচীন মতানুযায়ী শৃঙ্খলা হ'ল বাইরের বস্তু, জোর ক'রে শিক্ষক তার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং বিভিন্ন বিধিনিষেধের বা নিয়মের দ্বারা শিক্ষার্থীর উপর জোর ক'রে চাপিয়ে দেবেন। তবে তার পিছনে উদ্দেশ্য মহৎ; ছাত্রকে উন্নত জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারী ক'রে গড়ে তোলা। এই ধারণা অনুযায়ী শৃঙ্খলা আনতে হ'লে তার মধ্যেকার সমস্ত রকম অসামাজিক প্রবণতা-গুলোকে দমন (Repress) করতে হবে। সুতরাং শৃঙ্খলা কথার প্রাচীন তাৎপর্য spare the rod and spoil the child—এই প্রবাদ-বাক্যের সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শৃঙ্খলা কথার আধুনিক তাৎপর্য (Modern significance of the term Discipline): আধুনিক চিন্তাবিদদের কাছে শৃঙ্খলার এই তাৎপর্য বদলেছে। তাঁরা বলেন, শৃঙ্খলা অন্তরের জিনিস; বাইরে থেকে তাকে কারোর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যক্তির অন্তর থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার যে স্পৃহা আসে তাই হ'ল শৃঙ্খলা। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা প্রাচীন চিন্তাধারাকে যান্ত্রিক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে অবদমনের দ্বারা বা শাসনের দ্বারা যে শৃঙ্খলা আসে তা খুবই সাময়িক এবং তাকে আমরা শৃঙ্খলা (Discipline) না ব'লে শাসন (Order) বলতে পারি। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা বলেন—স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিক্ষার্থীর অন্তর থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার স্পৃহা থেকে যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ তাই হ'ল শৃঙ্খলা। নান্ (Nunn) বলেছেন—"It (discipline) consists in the submission of one's impulses and powers to a regulation which imposes from upon their chaos, and brings efficiency and economy where there would otherwise be ineffectiveness and waste"। আপনা থেকেই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করার যে স্পৃহা জাগে তাই হ'ল শৃঙ্খলা। এই সংব্যাখ্যানকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শৃঙ্খলার দু'টো পর্যায় আছে। প্রথমতঃ, যা অসৎ, যা মন্দ, তাকে স্বাভাবিক ভাবে ত্যাগ করার প্রচেষ্টা; দ্বিতীয়তঃ, যা কিছু ভাল, যা কিছু গ্রহণযোগ্য, তাকে সহজ ভাবে গ্রহণ করার

স্পৃহা। শিক্ষার্থীরা, জীবনকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যা কিছু ভাল তা গ্রহণ করবে এবং যা মন্দ তাকে ত্যাগ করতে শিখবে। এর মাধ্যমেই আসবে শৃঙ্খলা। এর প্রথম পর্যায়কে ধনাত্মক পর্যায় (Positive phase) এবং পরবর্তী পর্যায়কে বলা যায় ঋণাত্মক পর্যায় (Negative phase)। সুতরাং, বলা যেতে পারে আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শৃঙ্খলা হ'ল মানুষের চিন্তাধারা, আচরণ ও স্বভাব এবং অনুভূতির আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই অর্থে তাঁরা গতানুগতিক শৃঙ্খলার সঙ্গে পার্থক্য করবার জন্য শৃঙ্খলার পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার (Spontaneous discipline) কথাটা ব্যবহার করেছেন।

শৃঙ্খলা ও শাসন (Discipline and Order) ঃ শৃঙ্খলার আধুনিক এবং প্রাচীন তাৎপর্য থেকে একটা কথাই স্পষ্ট হ'য়েছে যে, দু' যুগের ধারণার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা শৃঙ্খলার গতানুগতিক সংব্যাখ্যানকে বা, বহিরাগত শৃঙ্খলাকে শাসন (Order) নামে অবিহিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন, বাইরে থেকে জোর করে অনুশাসনের দ্বারা যা চাপিয়ে দেওয়া যায় তাকে শৃঙ্খলা বলা যায় না। তাকে শাসন (order)-ই বলতে হয়। এই পদ্ধতিতে কোন স্থায়ী ফল পাওয়া যায় না। শৃঙ্খলার দ্বারা আমরা ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে চাই। সুতরাং, ব্যক্তিত্বকে প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে যে শক্তির প্রয়োজন তা যদি আত্মজ না হয়, তার দ্বারা কোন ভাল ফল পাওয়া যাবে না। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, বাইরে থেকে জোর ক'রে নানা রকম কৌশলের দ্বারা আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করার যে প্রক্রিয়া তাকেই বলবো শাসন (order) এবং স্বতঃস্ফূর্ত :ভাবে শিক্ষার্থীরা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আচরণের মধ্যে সংহতি আনার যে প্রক্রিয়া, তাই হ'ল শৃঙ্খলা (Discipline)। সুতরাং, আধুনিক অর্থে, শৃঙ্খলার গতানুগতিক ব্যবহারের মধ্যে শৃঙ্খলা শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য নেই। শাসন (order) সব সময় নেতিবাচক। ফলে জীবনের উপর তার প্রভাব খুবই নগণ্য। অপর দিকে শৃলঙ্খার জন্য নেতিবাচক এবং অস্তিবাচক প্রতিক্রিয়ার ফল। নান্ শাসনের সঙ্গে শৃঙ্খলার তফাৎ করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের মনোভাব সুলভ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন—"Discipline is not an external thing like order, but something that touches the inmost springs of conduct. এ ছাড়া শৃঙ্খলার ভিত্তি হ'ল মানবতাবোধের, আর শাসনের

মূলে আছে অবজ্ঞা এবং হিংস্রতা। গতানুগতিক শাসনের ধারায় সমালোচনা করতে গিয়ে একজন শিক্ষাবিদ বলেছেন—"Countless men have I known who are rapidly making names for themselves as successful school masters, who under any save system of education would have been sacked after their first day. অপর দিকে শিক্ষায় আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তকদের একজন পূর্বসূরী পেস্টালাৎসী শৃঙ্খলা সম্পর্কে বলেছেন—"Discipline must be based on and controlled by love."

শিক্ষায় শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা (Importance of discipline in Education) : বিদ্যালয় এক ধরনের সামাজিক সংস্থা (Educational Institution)। শিক্ষার্থীরা এখানে গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বাস করে। শিক্ষার্থীর এই সমষ্টিকে আমরা সামাজিক গোষ্ঠী (Social group) হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। যে-কোন সামাজিক গোষ্ঠীকে কতকগুলো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয় ; বা, বিশেষ এক শৃঙ্খলার অধীনে থাকতে হয়। সাধারণ ভাবে যদি বিচার করা যায় একটা ফুটবল দলের বিভিন্ন খেলোয়াড় যথেচ্ছা ব্যবহার করতে পারে না। তাদের আচরণ সব সময় কতকগুলো নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঠিক এমনি ভাবে বিদ্যালয়ে শিশুদের আচরণকে যদি বিশেষ নিয়মের মধ্যে না রাখা যায়, তাহ'লে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেবে। শিক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করতে হ'লে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার একান্ত প্রয়োজন। শৃঙ্খলার মাধ্যমে মানুষের জীবনের ছন্দোময়তা উপলব্ধি করা যায়। তাই ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ সাধন করতে হ'লে, বিদ্যালয়-জীবনেও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের গোষ্ঠী জীবন, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর উভয়ের সমবায়ে গঠিত। সুতরাং তাদের প্রত্যেকের জন্য কিছু কিছু বিধিনিষেধ আছে। তারা যদি সেগুলো মেনে না চলেন, তাহ'লে বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করা মুস্কিল হবে। শিক্ষার্থী যদি পাঠে মনোনিবেশ না করে, কঠোর ভাবে অনুশীলন না করে, তাহ'লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শিক্ষার্থী যাতে এই ধরনের আচরণ করে তার জন্য বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা একান্ত প্রয়োজন। ইংরেজী Discipline কথাটাই শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে তার গুরুত্বের কথা কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্যের মধ্যে তাই কঠিন শৃঙ্খলার ব্যবস্থা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথও প্রাচীন ভারতীয়

শিক্ষার আশ্রমিক ব্রহ্মচর্যের আদর্শকে আধুনিক কালে প্রয়োগ করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন, "....বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলিয়া জানিয়া সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার পথ"। আধুনিক কালে শিক্ষা ব্যবস্থায় ও বিদ্যালয়ে যে নানা ধরনের উচ্ছৃঙ্খলতা সর্বদা দেখা যাচ্ছে, তা শিক্ষাকে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে দিন দিন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাকে জাতি গঠনের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করতে হ'লে বিদ্যালয় জীবনে শৃঙ্খলা আনার জন্য সচেষ্ট হ'তে হবে। বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে গোষ্ঠী জীবনের নিয়মকানুন মেনে চলার যে অভ্যাস শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করবে, তা সমাজ-জীবনেও সঞ্চারিত হবে। এর ফলে সমাজ-জীবনে অবশ্যই শান্তি আসবে।

শিক্ষায় স্বাধীনতা (Freedom in Education) : শিক্ষাপদ্ধতিকে সার্থক করার জন্য শৃঙ্খলা (Discipline) যেমন অপরিহার্য, তেমনি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য স্বাধীনতারও বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার গুরুত্ব প্রাচীন কাল থেকে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। তবে, আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার গুরুত্ব অনেক বেড়েছে এবং তার উপর নতুন তাৎপর্য আরোপ করা হয়েছে।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল্, ব্রিটিশ দার্শনিক কমিনিয়াস, রোমন শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ান এঁরা প্রত্যেকে শিক্ষায় স্বাধীনতার নীতি প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। প্রাচীন মনীষীদের এই চিন্তাধারাকে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করলেন প্রকৃতিবাদী রুশো তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে। প্রাচীন গতানুগতিক ধারণার মূলে তীব্রভাবে আঘাত করেন, রুশো তাঁর এমিলের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে। তিনি বলেছিলেন মানবশিশু স্বাভাবিক ভাবেই নির্মল এবং নিষ্পাপ, সমাজের বিধিনিষেধ বা শৃঙ্খলা তাকে কলুষিত করে। সে স্বভাবতঃই স্বাধীন ভাবে জন্মায়, কিন্তু সমাজ তাকে বিবিধ বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং এই বন্ধন বা শৃঙ্খলা তার জীবনের বিকাশের পক্ষে খুবই খারাপ। তাই রুশো শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলেছেন। রুশোর এই চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছে। বর্তমান কালে যে-কোন প্রগতিশীল শিক্ষক

অবাধ স্বাধীনতার নীতিতে বিশ্বাস করেন। আর এটাই হ'ল আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার নীতি শিক্ষাদর্শনের যুক্তির দ্বারাও সমর্থিত। শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে নানা ধরনের সম্ভাবনা। তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে তার আত্মার পূর্ণ পরিণতি। তার সেই অপ্রকাশিত আত্মাকে বিকশিত করতে হ'লে তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। ফ্রয়বেল, মন্তেসরী, পেস্টালাৎসী প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌রা শিশুর স্বাধীন ক্রিয়া-কলাপের উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষাপদ্ধতি রচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজি এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন যে, শিশুকে যদি তার স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে না দেওয়া হয়, তাহ'লে তার আত্মবিকাশ সম্ভব হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যে বিদ্যালাভ করা যায় তা' কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারে না।"

অন্য একদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, শিক্ষায় স্বাধীনতার নীতি মনোবিদ্যার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার প্রধান কাজ হ'ল শিশুর মধ্যে যে বিকাশের ক্রমাগত প্রচেষ্টা চলছে, তার পরিপূর্ণতা ঘটানো। জন্ম অবস্থায় তার মধ্যে থাকে কতকগুলো প্রবণতা ; সেই প্রবণতার পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে আসে জীবনের পরিপূর্ণতা। ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের মাধ্যমে, বক্তি নিজে যেমন তৃপ্ত হবে, অপর দিকে সমাজ-জীবনও সার্থক হবে। সুতরাং, তার মধ্যেকার চিরন্তন বিকাশের প্রয়াসকে কোন মতেই বাইরের কোন শক্তি বা শৃঙ্খলা দিয়ে চেপে রাখা উচিত হবে না। অর্থাৎ তাকে নিজ ধর্মে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ, অনুরাগ ইত্যাদিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে। কারণ এদের দ্বারাই তাকে সক্রিয় ক'রে তোলা সম্ভব। সুতরাং শিক্ষার গতি নির্ণয় বাইরে থেকে করা সম্ভব নয়। শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে শিশুর সক্রিয়তার ধর্মকে কাজে লাগাতে হবে, তাকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ তাই 'আশ্রম সম্মেলনী' গঠনের কথা বলেছেন। ডাল্টন প্ল্যান, প্রোজেক্ট মেথড, কিণ্ডারগার্টেন ইত্যাদি আধুনিক পদ্ধতিরও প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে স্বাধীনতার নীতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। তাহ'লে বলা যেতে পারে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ

করতে হ'লে বা শিক্ষার লক্ষ্যকে চরিতার্থ করতে হ'লে, স্বাধীনতার নীতিকে গ্রহণ করতে হবে।

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা (Discipline and Freedom) : উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা দুইই শিক্ষার ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সার্থক করতে হ'লে, বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে হ'লে শৃঙ্খলার একান্ত প্রয়োজন। আবার শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে, ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ সাধন করতে হ'লে ব্যক্তির স্বাধীনতার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা এই দুটি ধারনা সম্পূর্ণ ভাবে পরস্পরবিরোধী, একটার দ্বারা আমরা ব্যক্তি-জীবনের উপর কতকগুলো নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধের বাঁধন দিই; অপরটার দ্বারা ব্যক্তি-জীবনকে প্রকাশ করার অবাধ স্বাধীনতা ঘোষণা করি। এখন প্রশ্ন হ'ল কি ভাবে এই দু'ধরনের পরস্পরবিরোধী ধারাকে শিক্ষায় স্থান দিয়েছি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার মধ্যে এই ধরনের কোন দ্বন্দ্ব নেই। আপতঃভাবে আমরা যে পরস্পরবিরোধী ভাব লক্ষ্য করছি, তা সম্পূর্ণ ভাবে এই দুই শব্দ সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করে। শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য যদি বিশ্লেষণ করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

শিক্ষায় শৃঙ্খলা বলতে আমরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা (Spontaneous discipline) কথাই বুঝাই। যে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তির আন্তরিক তাগিদ এবং চাহিদা থেকে আসে তাকেই আমরা বলছি স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলা। এই ধরনের শৃঙ্খলা ব্যক্তির ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, আগ্রহ ইত্যাদিকে শৃঙ্খলিত করে না, বরং তাদের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমেই গড়ে উঠে। আত্মার আপন নিয়মে, আত্মার আপন তৃপ্তিতে তার সৃষ্টি। একে আমরা শুধু শৃঙ্খলা না ব'লে আত্মশৃঙ্খলা (self discipline) বলতে পারি। যে শিল্পী ছবি আঁকেন, তাকে কতকগুলো নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। কারণ ছবি আঁকার কতকগুলো নিয়ম আছে। কোন্ রেখা কোথায় দিলে ছবির গভীরতা (Depth) ঠিক বোঝা যাবে, কোন্ রঙ কোথায় ব্যবহার করলে আলো-ছায়ার (Light and Shade) প্রভাব ঠিক মত ছবিতে প্রকাশ পাবে, এ সবই তাকে নিয়মমাফিক করতে হয়। শিল্পী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই সব নিয়ম মেনে চলেন তার কারণ তার পেছনে সৃষ্টির প্রেরণা বা প্রয়াস কাজ ক'রে চলছে। সুতরাং যদিও তিনি

নিয়মে বাঁধা, সে নিয়ম তাকে পীড়া দেয় না। এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় শৃঙ্খলা তার সৃষ্টির প্রেরণাকে আদৌও ব্যাহত করেনি।

আবার, সেই শিল্পীর কথা যদি অন্যদিক থেকে বিচার করি তাহ'লে দেখবো, তার কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে, যদিও তিনি ছবির সংগঠনের নিয়মের দিক থেকে বাঁধা তবুও তার মধ্যে তার স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সম্পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। ছবির 'ফর্ম' কি রকম হ'বে সে ব্যাপারে চিন্তার করার অবাধ স্বাধীনতা তার রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, কোন ক্ষেত্রেই শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা উভয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ প্রয়োজন। স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে স্বাধীনতার কোন দ্বন্দ্ব নেই। শিল্পী তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ করছেন, ছবির মাধ্যমে; শিল্প তার স্বাধীন চিন্তাধারারই অভিব্যক্তি। সুতরাং যে-কোন সার্থক সৃষ্টির জন্য শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা উভয়েরই প্রয়োজন। তাদের মধ্যে কোন বৈপরীত্যের সম্পর্ক নেই। তবে শৃঙ্খলাকে যেমন আমরা আধুনিক অর্থে গ্রহণ করবো শিক্ষা ক্ষেত্রে, স্বাধীনতাকেও সেইভাবে গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখা দরকার স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলতা নয় বা স্বেচ্ছাচার নয়। উচ্ছৃঙ্খলতার কোন উদ্দেশ্য নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে যে স্বাধীনতার কথা বলছি, তা উদ্দেশ্যমূলক; এবং সে উদ্দেশ্য ব্যক্তি জীবনের কল্যাণের পথে নিয়োজিত। সুতরাং শিক্ষাকে সার্থক করতে হ'লে শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতার সমন্বিত প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে করতে হবে। বন্ধন এবং মুক্তি—এ দু'য়েরই প্রয়োজন মানুষের বিকাশের জন্য। তাই আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার মধ্যে স্বাধীনতার মৌলিক উপাদানের সংযোজনের পক্ষপাতী। বর্তমানে তাঁরা এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ করার জন্য শৃঙ্খলার পরিবর্তে যে শব্দ ব্যবহার করছেন, তাহ'ল—'মুক্ত-শৃঙ্খলা' (Free discipline), অর্থাৎ, শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা।

মুক্ত শৃঙ্খলা (Free discipline): শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার সম্পর্কে ধারণার অভিব্যক্তিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ধারণার অগ্রগতি মানুষের চিন্তাধারার অভিব্যক্তির সঙ্গে সমান তালে বিভিন্ন পর্যায়ে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়েছে। একেবারে প্রাচীন যুগে ছিল শারীরিক নির্যাতনমূলক শৃঙ্খলা ব্যবস্থা। অর্থাৎ, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শারীরিক নির্যাতন করা হ'ত। তারপরে, দ্বিতীয় স্তরে লক্ষ্য করা যায় অবদমনের সাহায্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা। শিশুর মধ্যে যে সব সুপ্ত অসামাজিক ইচ্ছা আছে, সেগুলোকে

দমন ক'রে রাখতে পারলে শৃঙ্খলার কোন সমস্যা থাকে না। তাই কিছু কিছু শিক্ষাবিদ্ বলেছেন, তাদের কাজ দিয়ে সব সময় ব্যস্ত রাখতে পারলে তাদের মনে অসামাজিক চিন্তা আসবে না। কিন্তু এ ধরনের অবদমনের কুফল সম্বন্ধে আজকে আমাদের সকলেরই ধারণা আছে। এই অবদমনের (Repression) ফলেই নানারকম মানসিক অসুস্থতা দেখা দেয়, এবং সেই সব মানসিক অসুস্থতা আবার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে প্ররোচিত করে। তৃতীয় পর্যায় হ'ল, **ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা শৃঙ্খলা** বজায় রাখা। এই মতবাদ অনেক প্রগতিশীল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিশু শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শৃঙ্খলা অনুশীলন করবে, তাঁদের অনুকরণ করবে, তাঁদের অনুভাবনের দ্বারা প্রভাবিত হবে। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলার একটা বড় অসুবিধা হ'ল এর কোন স্থিরতা নেই। তাছাড়া ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দ্বারা যে শৃঙ্খলা আসে তাকেও আমরা ঋণাত্মক শৃঙ্খলা (Negative discipline) বলতে পারি। তার মধ্যেও কিছু অবদমনের প্রচেষ্টা আছে।

আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন শৃঙ্খলা এবং স্বাধীনতা সম্পূর্ণ ভাবে সমন্বিত হবে। স্বাধীনতা ছাড়া শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। স্বাধীনতার উপাদান যে শৃঙ্খলার মধ্যে নেই, তার থেকে আমরা ঋণাত্মক শৃঙ্খলা (Negative discipline) পেতে পারি, যার কোন চিরস্থায়ী প্রভাব নেই ব্যক্তি-জীবনে। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন—"Negative discipline is powerless." এই কারণে আধুনিক কালে শিক্ষাবিদরা ধনাত্মক শৃঙ্খলার (Positive discipline) কথা বলেছেন এবং তাঁরা মনে করেন, প্রত্যক্ষ শিশু-স্বাধীনতার মাধ্যমে শৃঙ্খলা আনতে না পারলে, সে শৃঙ্খলা চিরস্থায়ী হবে না। শিক্ষাবিদ অ্যাডামস্ (Adams) বলেছেন—"The freedom of the pupil is to be positive not merely negative." ম্যাকনান্ (MacNunn) তাই এই ধরনের শৃঙ্খলাকে বললেন মুক্ত শৃঙ্খলা (Free discipline)। এই ধরনের শৃঙ্খলার মূল কথা হ'ল—শৃঙ্খলা আসবে শিশুর আত্মচেতনার মধ্য দিয়ে। কোন রকম আদর্শ তা যতই প্রয়োজনীয় হোক না কেন, আমরা জোর করে তা তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে গিয়ে শিক্ষককে একটা কথা মনে রাখতে হবে, আমরা প্রত্যেক শিশুকে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধী করতে চাই না, আর তাই যদি আমাদের প্রচেষ্টা হয়, তাহলে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যাহত হবে। আমরা চাই প্রত্যক

তাহ'লে এই সমস্যার সমাধান হবে না, আমরা এখানে সমস্যাগুলো কেবল তুলে ধরছি।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনে বর্তমানে, প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বিভিন্ন ধরনের পরিবেশগত কারণ। এই সব পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে কিছু আছে বিদ্যালয় পরিবেশ-সংক্রান্ত, কিছু আছে সমাজ পরিবেশ-সংক্রান্ত। যেমন—

[এক] বিদ্যালয়ের অবস্থান অনেক সময় শৃঙ্খলা রক্ষার কাজকে ব্যাহত করে। বিদ্যালয়কে যদি সমাজের কোলাহল থেকে দূরে সরিয়ে রাখা না যায়, তাহ'লে সমাজ-জীবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় তার প্রভাব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপর এসে পড়বে। বিদ্যাভ্যাসের সময় যদি তাদের মনোযোগের পরিবর্তন হয়, তাহ'লে সমস্ত দিক থেকে অসুবিধা হয়। তাই আধুনিক কালে, অনেক শিক্ষাবিদ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার আদর্শ পরিবেশকে বর্তমানে প্রতিস্থাপন করার পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই।" এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মনের যে উদারতা আসবে, তার থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা স্থাপন হবে এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের কোন সমস্যা থাকবে না।

[দুই] শ্রেণী কক্ষের বিভিন্ন পরিবেশ শৃঙ্খলা স্থাপনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। যেখানে বসে শিক্ষার্থীরা দিনের বেশ কিছু সময় কাটায়, তার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ যদি ভাল না হয়, তার প্রভাব শিক্ষার্থীদের মনে প্রভাব বিস্তার করবে, সেটাই স্বাভাবিক। এইজন্য শ্রেণীকক্ষ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকার। নোংরা দেওয়াল, ভাঙ্গা জানালা, দরজা, অস্বাস্থ্যকর অন্ধকার ও স্যাঁত-সেঁতে পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে এক বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং এর ফলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অনেক সময় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এছাড়া শ্রেণী কক্ষের আয়তনও শিক্ষার্থী অনুপাতে বড় হওয়ার দরকার। চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকার দরকার। শিক্ষার্থীর উচ্চতা অনুযায়ী ক্রমানুসারে বসার ব্যবস্থা করার দরকার। তা না হ'লে শিক্ষককে দেখার অসুবিধা হয়, বোর্ডে লেখা দেখার অসুবিধা হয়, এতে ক'রে শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। এই সব কারণে, শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন হ'তে হবে,

যদি বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়। শুধুমাত্র সমস্ত দোষ শিক্ষার্থীদের উপর আরোপ ক'রে, শাস্তির ব্যবস্থা করলে চলবে না। তাতে ক'রে শৃঙ্খলা তো আসবেই না, বরং তারা বিদ্যালয়ের প্রতি এবং শিক্ষকের প্রতি অসন্তোষমূলক মনোভাব পোষণ করবে এবং ক্রমে তা উচ্ছৃঙ্খল আচরণের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

[তিন] বিদ্যালয় পরিচালনার পদ্ধতি অনেক সময় শৃঙ্খলা স্থাপনের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। যেমন, বিদ্যালয়ের সময় তালিকা (Time-table) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচনা না হওয়ার জন্য শৃঙ্খলা স্থাপনের অসুবিধা হয়। যদি সময় তালিকায় কোন কঠিন বিষয় শেষের দিকে থাকে তাতে ক'রে ছাত্ররা অমনোযোগী হ'য়ে পড়ে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, সময় তালিকায় ঠিকমত বিষয় সংযোজন করতে না পেরে হালকা বিষয় দেওয়া হয়, তাতে ক'রে ছাত্রদের মানসিক প্রস্তুতি নষ্ট হ'য়ে যায় এবং শৃঙ্খলাহীন আচরণ করে। সুতরাং শিক্ষালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য সময় তালিকা মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে তৈরী করতে হয়।

[চার] বিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম রচনার ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মানসিক ক্ষমতার উপর গুরুত্ব না দিলে, শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব নয়। পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু যদি ছাত্রদের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী নির্ধারণ করা না হয়, তাহ'লে অনেক সময় সে সব বিষয় তার কাছে বোঝা স্বরূপ মনে হয়, এবং আলোচনা কালে অমনোযোগী হয় এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করার সুযোগ খোঁজে। আবার বিষয়বস্তু যদি খুব কঠিন বা খুব সোজা হয়, তাতেও তার বিরক্তি উৎপাদন করে। আমাদের বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পাঠ্যক্রম তাই অনেক সময় উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য দায়ী হ'য়ে পড়ে।

[পাঁচ] শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী না থাকার জন্য অনেক সময় ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের নায়ক। তিনি শ্রেণীকে পরিকল্পিত ধারায় পরিচালনা করেন। শ্রেণীকে আদর্শগত দিকে পরিচালনা করার মত মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য যদি তাঁর না থাকে, তিনি যদি আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত না হন, তাহলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা তাঁর পক্ষে খুবই মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। শিক্ষার্থীরা তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানারকম অন্যায় আচরণ করে। তাই শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলার জন্য অনেকাংশে দায়ী শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর শিক্ষণ পদ্ধতি।

এই সব বাহ্যিক কারণ বা বিদ্যালয়ের পরিবেশগত কারণ ছাড়াও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আরো নানারকম ব্যক্তিগত কারণও কাজ ক'রে। ব্যক্তিগত কারণ বলতে আমরা শিক্ষার্থীর নিজস্ব নানা রকম অসুবিধার কথাই বলছি।

[এক] বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের দৈহিক অসুস্থতা থেকে আসে। শরীর খারাপ থাকলে, কোন কাজ করার ইচ্ছা থাকে না। আবার অনেকের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগত অসুস্থতা আছে, সেগুলোও বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটায়। বিশেষ বিশেষ ছাত্রের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে যদি উপযুক্ত শ্রেণীবিন্যাস না করা যায়, তাহ'লে শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

[দুই] শিক্ষার্থীর মানসিক অসুস্থতা অনেক সময় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়। এমন অনেক অসামাজিক আচরণ আছে, যা শিক্ষার্থীরা বিশেষ মানসিক সংগঠনের জন্য সম্পাদন ক'রে থাকে, বাইরে থেকে আমরা তাদের সাধারণ শৃঙ্খলাগত সমস্যা ব'লে ভুল করি। কিন্তু তাদের আসল কারণ মনের অবচেতন স্তরে কোন সংগঠনের মধ্যে লুকিয়ে আছে। যেমন, কোন ছেলে সব সময় কলম মুখে দেয়, এটাকে আমরা সাধারণ সমস্যা হিসেবে নিয়ে উপদেশ বা তিরস্কারের দ্বারা দূর করতে চাই। কিন্তু তা ভুল, এই ধরনের চোষণের জন্য দায়ী তার বিশেষ এক মানসিক সংগঠন। এটা এক ধরনের মানসিক অসুস্থতাও বলা যেতে পারে। তাই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা স্থাপনে অনেক সময় এই ধরনের সাধারণ মানসিক অসুস্থতা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

[তিন] শিক্ষার্থীর আবেগমূলক নিরাপত্তার অভাব (Emotional insecurity) বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। শিশুরা গৃহ পরিবেশে বা সমাজ পরিবেশে যদি তাদের মানসিক অনুভূতিমূলক নিরাপত্তা না পায়; সব সময় যদি তাদের এই কোমল অনুভূতিগুলোকে বড়রা উপেক্ষা করেন, তাহ'লে তারা ক্রমশঃ নিজেদের অসহায় (insecured) মনে করতে থাকে এবং যেখানে সুযোগ পায়, সেখানে তারা তাদের অসহায় অবস্থার প্রতিবন্ধ স্বরূপ নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীর উপর কমে যাওয়ায় তাদের এই অবেগমূলক অসহায়তার প্রকাশ তারা বিদ্যালয়ে করেছে। ফলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে।

[চার] বিচার বিবেচনাহীন কাজ যা স্বাভাবিক ভাবে অপরিণত বুদ্ধির ফল, অনেক সময় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে বাধা দেয়। বালকসুলভ চাপল্য ও বুদ্ধিহীনতার জন্য শিক্ষার্থী এমন অনেক কাজ করে যে-গুলোকে আমরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বলতে পারি। এ ব্যাপারে শিক্ষক যদি সতর্ক না থাকেন এবং শিক্ষার্থীদের যদি ঠিকমত নির্দেশনা না দেন তাহ'লে শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ ব্যাহত হবে।

[পাঁচ] শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের অভাব, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়।

[ছয়] সবশেষে বলা যায়, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলার সমস্যা বিশেষ ভাবে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (Economic security) উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব বা দারিদ্র্য অনেক অসামাজিক আচরণের মূলে কাজ করে। অন্য অনেক ব্যক্তিগত কারণ, এর থেকে সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্র যদি ঠিক মত নজর না দেয়, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজ খুবই কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়বে।

উপরোক্ত কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে নানা রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয় এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ কি কি ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ দেখা যায়, তার তালিকা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ তৈরী করেছেন। ডেক্সটার এবং গার্লিক (Dexter and Garlick) আঠার ধরনের আচরণের উল্লেখ করেছেন যার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাহীনতার প্রকাশ পায়। অধ্যাপক অনাথনাথ বসু ও জ্ঞানচন্দ্র দাশগুপ্ত এক গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রায় পঁয়ত্রিশ রকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণের কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ে আমরা এই সব আচরণকে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে না পারি তাহ'লে ক্রমেই উচ্ছৃঙ্খলতার সমস্যা বেড়ে যাবে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের উপায় (Means of maintaining discipline in School) : আধুনিক কালে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের সমস্যা শিক্ষাক্ষেত্রে বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের দায়িত্ব সমবেত ভাবে সব শিক্ষা ও সমাজ-সংস্থাকে গ্রহণ করতে হবে, কারো একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হবে না। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা স্থাপনের যে সমস্যার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যার উপর বিদ্যালয়ের কোন কর্তৃত্ব নেই। তাই সেই সব পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার জন্য যথাযোগ্য

সংস্থাকে বিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে হবে। তাহ'লেও বিদ্যালয়ের নিজস্ব দিক থেকে যেটুকু করার আছে সে সম্পর্কে আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করবো।

[এক] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হ'লে, শিক্ষককে আদর্শ চরিত্রের অধিকারী হ'তে হবে। শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ভাবে তাঁর নেতৃত্বকে মেনে নেয়; তাঁকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, অনুকরণ করার চেষ্টা করে। সুতরাং তিনি নিজে যদি মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হন এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ না হন, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা কখনই তা হ'তে পারে না। সময় মত শ্রেণীতে যাওয়া এবং তার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করা ইত্যাদি কাজ তাঁকে সচেতন ভাবে সম্পন্ন করতে হবে। তবে ছাত্ররা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুকরণ ক'রে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

[দুই] বিদ্যালয় পরিচালনার কোন দোষত্রুটি যাতে না থাকে, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পক্ষপাতহীন আচরণ ছাত্রদের প্রতি করতে হবে। যথাযোগ্য উপকরণ শ্রেণীতে ব্যবহার করতে হবে, শিক্ষাদানের সময়। ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা আনতে হবে যে, বিদ্যালয় পরিবেশের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই নিষ্ঠাবান এবং বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য আগ্রহশীল।

[তিন] শিক্ষকরা ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবান হবেন, আত্মমর্যাদা বোধ জাগবে এতে ক'রে ছাত্রদের মধ্যে এবং তখনই তারা স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নেবে। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক শ্রদ্ধার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের প্রকৃত মর্যাদা দিয়ে তাদের উপর যদি দায়িত্ব দেওয়া যায় তবে তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে তা পালন করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ছাত্রদের ভক্তি না করলে তাদের নিকট হ'তে ভক্তি কেউ সহজে পায় না।"

[চার] বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ক'রে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় এবং এই কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তাদের সব সময় কাজে নিয়োজিত রাখতে হবে। অলসভাবে বসিয়ে রাখলে, অসৎ চিন্তা তাদের মাথায় আসবে। তাই বিদ্যালয়ে যতক্ষণ তারা থাকবে, তাদের স্বাধীনতাকে ব্যাহত না ক'রে যতদূর সম্ভব তাদের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। এতে ক'রে দ্বিমুখী ফল পাওয়া যাবে। শিক্ষাদানের কাজও হবে এবং একই সঙ্গে শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজও অনেক সহজ হবে।

[পাঁচ] শিক্ষকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হওয়ার দরকার এবং তারা পরস্পর সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে যাতে কাজ করেন সে দিকে প্রধান শিক্ষককে নজর দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাঁদের অনুকরণ ক'রে শিখবে। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক (Teacher-teacher relation), শিক্ষক-প্রধান শিক্ষক সম্পর্ক (Teacher-Headmaster relation) এবং সব শেষে শিক্ষক-শিক্ষার্থী-সম্পর্ক (Teacher-pupil relation) আদর্শ স্থানীয় না হ'লে আদর্শ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক (Pupil-pupil relaiton) গড়ে উঠতে পারে না। আর শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে না উঠলে শৃঙ্খলা রক্ষা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এই সম্পর্কের মাধ্যমেই বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগে এবং তা শৃঙ্খলা স্থাপনে অনেক সহায়তা করে।

[ছয়] বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা আনতে হ'লে, শিক্ষার্থীদের উপর তার দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে, সম্পূর্ণভাবে না হ'লেও আংশিক ভাবে। অর্থাৎ পরোক্ষ তত্ত্বাবধানমূলক স্বাধীনতা দিতে হবে। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের (School Self-government) ব্যবস্থা ক'রে, বিদ্যালয় পরিচালনার ভার তাদের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রবৃত্ত হবে। রবীন্দ্রনাথ তার রাশিয়ার চিঠিতে এই ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

[সাত] অনেক সময় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তি ও পুরস্কারের প্রয়োজন হয়। যদিও স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলায় এদের কোন স্থান নেই, তবু অনেক সময় বিদ্যালয়ের কাজকে সহজ করার জন্য এদের সাময়িক প্রয়োগের প্রয়োজন হয়।

[আট] সব শেষে, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে হ'লে বিদ্যালয়কে শিক্ষার অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। বিশেষ ভাবে গৃহ বা পরিবার (Home or family), রাষ্ট্র (State), বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা (Religious institution) এদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগাযোগ রাখতে হবে। এর ফলে তারাও বিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। কারণ, শিক্ষার্থীরা দিনের বেশীর ভাগ সময় বিদ্যালয়ের বাইরে থাকে, সেই অবসরে সে যদি অন্যান্য সংস্থার দ্বারা একই ভাবে প্রভাবিত হয়, তাহ'লে বিদ্যালয়ের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the causes of indiscipline amongst school children? Consider anyone serious case of indiscipline and suggest how you, as head of the institution, would deal with it. [C. U. B. T. '61]

Ans.: ১৭১ হইতে ১৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Discuss the modern concept of discipline and indicate the importance of the idea of 'free discipline'. [N. B. U., B. T. '67, C. U. B. A., '63]

Ans.: ১৬৭ হইতে ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. "Discipline is not an external thing like 'order' but something that touches the inmost spring of conduct." Explain and indicate the educational implication of this statement. [C. U. B. T., 59 & '63]

Ans.: ১৬১ হইতে ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. Write an essay on Free Discipline

[C. U., B. T., '68 ; N. B. U., B. T. '63]

Ans.: ১৬৮ হইতে ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. What is the place of discipline in child-centre education?

[C. U. B. A. '57]

Ans.: ১৬১ হইতে ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

6. What is freedom movement in Education? To what extent is it desirable and possible in school. [C. U. B. T., '64]

Ans.: ১৬৫ হইতে ১৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

7. "Do not govern too much is a good rule in Education as in politics". Elucidate the statement in the light of modern concept of school discipline

[C. U. B. A. '66]

Ans.: ১৬৪ হইতে ১৬৫ পৃ: ; ১৬৮ হইতে ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

শাস্তি ও পুরস্কার

Punishment and Reward

প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে, শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়ার প্রথা ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। শিক্ষাদানের পদ্ধতি যখন পরোক্ষ এবং অনিয়ন্ত্রিত ছিল তখনও এই প্রথার অস্তিত্ব ছিল। আবার শিক্ষাদান যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত রূপ নিল তখন দেখা গেল তাদের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। শিক্ষার্থীর পাঠে মনোযোগ আনার জন্য, শিক্ষক এবং পরিচালক-মণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য আনার জন্য, বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ক্রমে শাস্তিদান এবং পুরস্কার দান অপরিহার্য হ'য়ে পড়লো। যে সব শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে ভালভাবে পাঠ গ্রহণ করে, যারা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা মেনে চলে এবং শিক্ষকের আনুগত্য স্বীকার করে, তাদের পুরস্কার দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত হ'ল। আর যারা তা করে না, তাদের জন্য শাস্ত নির্ধারিত হ'ল।

- শিক্ষাক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার দানের রীতি আধুনিক মনোবিদ্যার তত্ত্ব থেকেও সমর্থন পায়। বিখ্যাত মনোবিদ্ তার ফললাভের সূত্রে (Law of effect) বলেছেন, কাজের ফল যদি ভাল হয়, তা হ'লে তা চিরস্থায়ী হয়, এবং ফল যদি বিরক্তিকর হয় তাহ'লে তার প্রভাব ব্যক্তির উপর থাকে না। তিনি শিক্ষণের এই নীতিতে বলেছেন—"When a modifiable connection between a situation and a response is made and is accompanied or followed by a satisfying state of affairs, that connection's strength is increased ; when made and accompanied or followed by an annoying state of affairs. its strength is decreased" শিশু কোন অন্যায় কাজ করলে, বা পাঠ অনুশীলন ঠিকমত না করলে, তাকে যদি শাস্তি দেওয়া যায়, তাহ'লে তার ফলে তার মনে যে বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা ঐ আচরণের পুনরাবৃত্তিকে বাধা দেয়। আবার যখন কোন আদর্শানুযায়ী কাজ করে, তখন তাকে যদি পুরস্কার দেওয়া হয়, তা'হলে ঐ কাজের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে, সুতরাং বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা

রক্ষার জন্য এবং অন্যান্য কাজ পরিচালনা করার জন্য শাস্তি এবং পুরস্কার উভয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রাচীনকালে শাস্তি দেওয়ার পদ্ধতি (Mode of Punishment in old system): প্রাচীন কালে শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর শাস্তিদানের পদ্ধতির সঙ্গে আমরা সকলেই কিছু পরিচিত। তখন শাস্তিকে শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিহার্য ব'লে মনে করা হ'ত। মহাকাব্যের যুগে আমরা দেখতে পাই শিষ্যের অল্প পদস্খলন হ'লেই গুরু তাদের কঠোর অভিশাপ দিতেন। প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষায়ও কঠোর শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালে, আমরা দৈহিক শাস্তিদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেখতে পাই। "Spare the rod and spoil the child,"—এই ছিল প্রচলিত চিন্তাধারা, ছাত্র কিছু অন্যায় করলে, তাকে দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমেই সঠিক পথে চালিত করতে হবে, এই ছিল প্রচলিত ধারণা। বর্তমানেও আমাদের দেশে কোন বিদ্যালয়ে এই ধরনের নীতি অনুসরণ করা হয় না। এ ধারণা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে বন্য পশুর সমধর্মী মনে করা, বন্য পশুকে বশে আনার জন্য, তার আদিম প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করার জন্য, যেমন তাদের নির্যাতন করা, তেমনি শিশুদের অসামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে, তাদের উপর বয়স্ক মনের প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে, দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে তা পরিবেশন করতে হবে। দৈহিক নির্যাতন-মূলক শাস্তি বিভিন্ন রকমের দেখা গেছে, সামান্য কানমলা থেকে আরম্ভ ক'রে চরম দৈহিক নির্যাতন পর্যন্ত। এই ধরনের শাস্তি শিক্ষার্থীদের মনে এক ধরনের ঋণাত্মক মনোভাব (Negative feeling) সৃষ্টি করে। যদিও তার প্রভাবে শিক্ষার্থীরা সেই কাজ থেকে বিরত থাকে, তবে তার ফল চিরস্থায়ী হয় না। শিশু মন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে থাকে। এর ফলে অনেক সময় নানা রকম অপসংহতি (Maladjusted)-মূলক আচরণ দেখা দেয়। অথবা, সুযোগ পেলেই তাদের আদিম বৃত্তির প্রকাশ পায়। তাই আধুনিক কালে শিক্ষাবিদ্‌রা এই ধরনের দৈহিক শাস্তির (Physical punishment) পক্ষপাতী নন।

মনোবিজ্ঞানসম্মত শাস্তি (Psychological Punishment): আধুনিক কালে কোন কোন শিক্ষাবিদ্‌ মনোবিজ্ঞানসম্মত শাস্তির কথা বলেছেন। তাঁরা মনে করেন, দৈহিক শাস্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে। শিক্ষক যদি মনে করেন, শাস্তির দ্বারা তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তাহ'লে কোন-না-কোন সময়ে তারাও রুখে দাঁড়াতে পারে।

তাই দৈহিক শাস্তির পরিবর্তে তাঁরা মানসিক শাস্তি দেওয়ার পক্ষপাতী এবং তাঁরা মনে করেন, এই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ছাত্রদের প্রেষণাকে (Motive) সহজভাবে জাগিয়ে তুলে, শিক্ষার কাজে লাগানো যায়। শিক্ষার্থী কোন অন্যায় করলে, তাকে দৈহিক শাস্তি না দিয়ে যদি শিক্ষক তার স্নেহ থেকে তাকে বঞ্চিত করেন, তাহ'লে তার যে মানসিক পীড়া হয় তার থেকে সে নিজেকে শুধরে নিতে পারে। অপরাধীকে দিয়ে সকলের সামনে অপরাধ ব্যক্ত করা, পড়া না করলে আট্‌কে রাখা—এই ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তার রাশিয়ার চিঠিতে এই ধরনের শাস্তি প্রদানের নীতিকে বিশেষ ভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেছেন "....কাউকে অপরাধী করাই শাস্তি, তার চেয়ে শাস্তি আর নেই।"

শাস্তিদানের অপকারিতা (Evil effect of Punishment) : আধুনিকালে মনোবিদ্ এবং শিক্ষাবিদ্‌রা শাস্তি দেওয়ার পক্ষপতী নন। তা সে দৈহিক শাস্তিই হউক বা মানসিক শাস্তিই হউক। যে-কোন ধরনের শাস্তিই আমাদের বিদ্যালয়কে সেই ডেভিড্ কপারফিল্ড-এর 'শ্যালেম হাউস'-এর পর্যায়ে নিয়ে যাবে। বিভিন্ন দিক থেকে শাস্তির নীতি সমালোচনা করা হ'য়েছে এবং বিভিন্ন দোষ-ত্রুটির কথা বলা হয়েছে।

[এক] শাস্তি শিক্ষার্থীদের মনে আত্মগ্লানি বোধ সৃষ্টি করে। যে শিক্ষার্থী শাস্তি পায় সে নিজেকে অন্যের চেয়ে নিম্নমানের মনে করে। যদি শিক্ষার্থীকে তার কোন দোষত্রুটির জন্য অবহেলা করা হয়, যা দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়, তাহ'লে তার মনে এইভাব জাগে এবং এঁর ফলে তার ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ সম্ভব হ'য়ে উঠে না। সে ভীরু এবং দুর্বল হ'য়ে পড়ে।

[দুই] অনেক সময় শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সঙ্গে অনুবর্তনের (Conditioning) ফলে, শিশুর পাঠ্য বিষয়ের প্রতি ভয় জন্মায় বা আগ্রহহীনতা আসে। যদি কোন বিশেষ বিষয় শিখতে গিয়ে সে ভুল করে এবং তার ফলে তাকে শাস্তি পেতে হয়, তাহ'লে পরে দেখা যায় সেই বিষয়ের প্রতি তার বিতৃষ্ণা আসে। মনোবিদ্ ওয়াট্‌সন (Watson) এ ধরনের আবেগমূলক অনুবর্তনের (Emotional Conditioning) উপর পরীক্ষা ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। প্যাভ্‌লভের অনুগামী ক্র্যাসনভস্কিও বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার উপর অনুবর্তনের প্রভাব কি রকম হয় তার উপর পরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের অনগ্রসরতা (Retardation) অনেকাংশে এই ধরনের অনুবর্তনের জন্য ঘটে থাকে।

[তিন] শাস্তির ফলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষক এবং বিদ্যালয় উভয়ের প্রতি বিতৃষ্ণার মনোভাব আসে। শিশুদের বিচার শক্তি অনেক কম। তাই তাদের বোধ আসে না যে, শিক্ষক তার মঙ্গলের জন্য শাস্তি দিচ্ছেন। তাই যখনই সে শাস্তি পায় তখনই তার শিক্ষকের প্রতি বিরূপ মনোভাব জেগে ওঠে। এর ফলে শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ নষ্ট হ'য়ে যায়।

[চার] দৈহিক বা মানসিক শাস্তির ফল চিরস্থায়ী হ'তে পারে না। কারণ শাস্তির যে ফল তা ভয় থেকে আসে। শাস্তিকে শিক্ষার্থী যতদিন ভয় পাবে, ততদিনই তার প্রভাব তার মধ্যে থাকবে। আবার সে ভয় যখন কেটে যাবে তখনই সে আবার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করবে। বিদ্যালয়ের কাজে এই ধরনের ভীতিপ্রদ অবস্থা থেকে আমরা কখনই স্থায়ী ভাল ফল পেতে পারি না। ম্যারিক (Marique, P. J.) বলেছেন—"Fear, however, is poor incentive to intellectual activity. It may induce the child to perform the task assigned to him, but the intellectual gain that may be realised through this method will be negligible."

[পাঁচ] শাস্তিদানের ফলে অনেক সময় শিশুর মধ্যে পলায়ন মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়। বার বার শাস্তি পাওয়ার ফলে যখন, তার পাঠ্য বিষয় বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির প্রতি বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি জন্মায়, তখন সে ঐ ধরনের পরিস্থিতিকে এড়িয়ে যেতে চায়। সুযোগ পেলে সে বিদ্যালয়ে আসে না বা কোন কাজ করতে দিলে, অন্যের দেখে তা করে। এভাবে নানা রকম অসামাজিক আচরণও তার মধ্যে দেখা দেয়। এর দ্বারা তার মানসিক স্বাস্থ্য নষ্ট নয়। সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পারে না।

[ছয়] দৈহিক শাস্তির ফলে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের অঙ্গের ক্ষতি হয়, বার বার কানমলার ফলে অনেক সময় কানের রোগ হয়। যেমন, মানসিক শাস্তি দিলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়।

[সাত] অনেকে বলেন শাস্তি দানের প্রথা থর্নডাইকের ফললাভের নীতির দ্বারা সমর্থিত, সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু থর্নডাইকের এই নীতিরও আজকাল কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আমরা আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতাই শুধু গ্রহণ করি আর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ভুলে যাই তা ঠিক নয়। এমন অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের মনে চিরস্থায়ী হয়, যা আমাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক। সুতরাং শাস্তির সঙ্গে যে সব অভিজ্ঞতা জড়িত তাদের আমরা

ভুলে যাবো এ ধারণা সব সময় ঠিক নয়। বরং বিপরীতও হ'তে পারে এবং বিপরীত হ'লে তার ফল খুবই খারাপ।

এই সব কারণে শাস্তি দেওয়ার নীতি বর্তমানে স্বীকার করা হয় না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির নিজস্বতার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা তাতে শাস্তির কোন স্থান নেই। এ সম্পর্কে আমরা আরো বিশদভাবে আলোচনা করবো। তবে কোন কোন শিক্ষাবিদ বলেন, শাস্তির অপকারিতাই বেশী তবু বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাস্তির অনেক সময় প্রয়োজন হয়। তাঁরা একে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কুপ্রথা (Necessary evil) ব'লে বর্ণনা করেছেন।

বিদ্যালয়ে শাস্তিদানের নিয়ম (Rules for punishment in School): বিদ্যালয়ে শাস্তিদানের প্রয়োজন যদি আদৌ থাকে, এবং যদি শাস্তিকে আমরা প্রয়োজনীয় কু-প্রথা ব'লে মেনে নিই, তাহ'লে শাস্তি দান সম্পর্কে শিক্ষককে সচেতন হ'তে হবে। তিনি অত্যন্ত প্রয়োজন বোধেই শাস্তি দেবেন এবং শাস্তি যদি একান্তই বিদ্যালয়ে রাখতে হয় তাহ'লে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলবেন। যেমন—

(১) শাস্তির প্রকৃতি সব সময় শিক্ষার্থীর অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ণয় করতে হবে। শাস্তির উদ্দেশ্য সব সময় সংশোধনমূলক হওয়ার দরকার। বিশেষ কোন অপরাধ বা আচরণকে সংশোধন করার জন্য যে উপযোগী ব্যবস্থা তাই শাস্তির মধ্যে প্রদান করতে হবে। যে-কোন অপরাধে একই শাস্তি দেওয়া ভুল। তাতে ক'রে শুধুমাত্র নির্যাতনই করা হয়। সংশোধনের কোন চেষ্টা থাকে না।

(২) শাস্তি সব সময় পরিমিত হওয়া দরকার। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী যেন শাস্তি দেওয়া হয়। লঘু পাপে যেন গুরু দণ্ড না দেওয়া হয় বা বিপরীত যেন না হয়।

(৩) কোন গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে এমন শাস্তি দেওয়া হয় তা যেন সবাইয়ের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়। এতে ক'রে অন্যেরা আর সেই ধরনের কাজ করবে না। একজনের উপর শাস্তি প্রয়োগ ক'রে তার প্রভাব অনেকের উপর আনা সম্ভব হবে। রেন্ (Wren) বলেছেন—"The end and object of all punishment is education and training. The sufferer is taught by pain and others are taught by his example".

(৪) শিক্ষক ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে যেন কখনও শাস্তি না দেন। তার

মনে যেন কখনও প্রতিশোধমূলক মনোবৃত্তি না আসে। তিনি পক্ষপাতশূন্য হ'য়ে যেন শাস্তি দেন।

(৫) শিক্ষক শাস্তি দেওয়ার পর অসন্তোষের মনোভাব যেন চিরদিন পোষণ না করেন। তিনি শাস্তিও যেমন দেবেন, আবার স্নেহের দ্বারা শিক্ষার্থীর মন জয় করার চেষ্টাও যেন করেন। ছাত্রকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁর নিজের মনে যদি ব্যথা না জাগে, অর্থাৎ, সে সম্পর্ক যদি তাঁর ছাত্রের সঙ্গে না থাকে, তবে সে শাস্তির ফল খুব ভাল হবে না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"দণ্ডিতের সাথে দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"। এই ধরনের সম্পর্ক যদি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে না থাকে, তবে শাস্তির ফল ভাল হবে না।

(৬) শাস্তি দেওয়ার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, শাস্তি যেন শিক্ষার্থীর অক্ষমতার জন্য না দেওয়া হয়। তার অপরাধের জন্য শাস্তি দিতে হবে, যদি কোন ছাত্র স্বল্পবুদ্ধির জন্য পড়া শিখতে না পারে, তাকে শাস্তি দিয়ে ভাল করা যাবে না। সমবেদনার সঙ্গে বিশেষ যত্ন না নিলে তার উন্নতি সম্ভব নয়।

(৭) শাস্তির পদ্ধতি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে, যাতে ক'রে তা শিক্ষার্থীর মনকে স্পর্শ করে, দৈহিক বিশেষ কোন ক্ষতি না ক'রে। শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি নিজেকে শুধরে নেওয়ার মনোভাব শাস্তির মধ্য দিয়ে জাগিয়ে না তোলা যায় তাহ'লে সে শাস্তির কোন মূল্য নেই।

॥ **আলোচনা** ॥

যদিও আমরা শাস্তি দানের কতকগুলো নীতির কথা উল্লেখ করলাম, তবু একথা স্পষ্ট ক'রে বলতে হয় যে, শিক্ষার আধুনিক ভাবধারায় শাস্তির কোন স্থান নেই। মনোবিদ্‌রা মনে করেন শাস্তির মাধ্যমে পাঠ্য বিষয় বা কোন বিশেষ আচরণের প্রতি যে অনুরাগ বা আকর্ষণ দেখা যায় তা ঋণাত্মক প্রকৃতির (Negative)। এই ধরনের ঋণাত্মক শক্তি দিয়ে বাইরের প্রভাবে হয়তো কিছুদিন শিক্ষার্থীকে আয়ত্তে রাখা যাবে। কিন্তু বাইরের চাপ যত শিথিল হ'তে থাকবে, ততই তার আকর্ষণ কমতে থাকবে। কোন বিশেষ অসামাজিক আচরণের প্রতি কোন শিক্ষার্থীর যদি অনুরাগ থাকে, শাস্তির দ্বারা তাকে সাময়িক ভাবে বাধা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যিনি শাস্তি দিচ্ছেন তার চাপ যত কমতে থাকবে অর্থাৎ, সে যখন বিদ্যালয় জীবনের বাইরে চলে আসবে, তখন সেই আচরণের প্রতি তার আকর্ষণ আরো বেড়ে যাবে এবং আরো প্রবল ভাবে সে

নিয়োজিত হবে। সুতরাং বাইরে থেকে চাপানো কোন বাধা (Restriction) দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। স্বাভাবিক ভাবে যদি কোন চাহিদা তার অন্তর থেকে আসে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা শাস্তি দানের বিরুদ্ধে। আধুনিক মত অনুযায়ী শিক্ষক ছাত্রদের এমন পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করবেন, এমন কর্মসূচীর মধ্যে তাদের রাখবেন, সেখানে তারা এই আত্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি আয়ত্ত করতে পারে, তবেই শিক্ষা দানের কাজ সার্থক হবে। শিক্ষককে শ্রেণী কক্ষে গিয়ে, ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য যদি শাস্তি দিতে হয়, বা কোন রকম অতিরিক্ত চেষ্টা করতে হয়, তাহ'লে সেখানে শিক্ষার কাজ চলতে পারে না। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা যদি স্বাভাবিক ভাবে তাঁর প্রতি মনোযোগী না হয়, তা'হলে শাস্তি দিয়ে তা করা সম্ভব হবে না। এই ধরনের শৃঙ্খলা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই আসে। এর জন্য বাইরের প্রচেষ্টার কাজ প্রয়োজন হয় না। শিশু তার নিজের কু-কাজের জন্য প্রকৃতির নিয়মেই (Natural consequence) শাস্তি পাবে। তবে সে শাস্তিকে সহজ ভাবে গ্রহণ করবে এবং তারই উপর ভিত্তি ক'রে পরবর্তী উন্নত আচরণ করবে।

বিদ্যালয়ে পুরস্কার দানের প্রথা (Reward in school) : শাস্তি দানের মত বিদ্যালয়ে পুরস্কার দানের প্রথাও বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। তবে শাস্তির চেয়ে তার ত্রুটি অনেক কম। মনোবিদ্‌রা মনে করেন যে-কোন কাজের জন্য দু'টো জিনিস দরকার হয়। একটা হ'ল উদ্‌বোধক (incentive), অপরটা হ'ল প্রেষণ (motive)। উদ্‌বোধন ব্যক্তির মধ্যে কর্মমুখী প্রেষণার সঞ্চার করে এবং এই প্রেষণা তখন ব্যক্তিকে কাজ করায়। পুরস্কার শিক্ষা ক্ষেত্রে উদ্‌বোধকের কাজ করে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষার উপযোগী প্রেষণার সৃষ্টি করে।

সাধারণতঃ পুরস্কার দু'ধরনের হ'তে পারে—(১) বস্তুগত এবং (২) মানসিক। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী কোন শিক্ষার্থী বিশেষ কোন দক্ষতা দেখালে, তাকে বই, খেলনা, টাকা বা পদক ইত্যাদি পুরস্কার দেওয়ার রীতি আছে। এদের বলা হয় বস্তুগত পুরস্কার (Objective reward)। এই ধরনের পুরস্কারের উপযোগিতা এদের ব্যবহারিক মূল্যের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এছাড়া অনেক সময় শিক্ষকরা শ্রেণী কক্ষে প্রশংসা, অভিনন্দন ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের কাজে উদ্বুদ্ধ করেন, এদের আমরা মানসিক পুরস্কার (Psychological

reward) বলতে পারি। এই ধরনের পুরস্কার ছাত্রদের আত্ম-সচেতন করে এবং তাদের মধ্যে আন্তরিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। তাই এই ধরনের পুরস্কার বস্তুগত পুরস্কারের চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

যদিও এই পুরস্কার দান পদ্ধতি মনোবিদ্যার বিভিন্ন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও এর অনেক ত্রুটি আছে। সেই ত্রুটিগুলোর উল্লেখ করছি—

[এক] পুরস্কার দানের প্রথা সম্বন্ধে ছাত্র সচেতন থাকায়, অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্যের চেয়ে পুরস্কারটাই বড় হ'য়ে দাঁড়ায়। পুরস্কার সাধারণতঃ পরীক্ষার ফলাফলের উপর দেওয়া হয়; তাই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল ভাল করার জন্য যত রকম উপায় আছে, তা গ্রহণ করে। হয়তো জ্ঞান লাভ তাদের সম্পূর্ণ হয় না।

[দুই] পুরস্কার শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-প্রতারণার ভাব (Self-deceiving tendency) সৃষ্টি করে। পুরস্কারের লোভে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অসৎ উপায় অবলম্বন করে।

[তিন] পুরস্কার লাভ করার জন্য, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেক সময় অহেতুক প্রতিযোগিতা এবং হিংসামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায় এবং বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনকে কলুষিত করে।

[চার] পুরস্কার লাভের ইচ্ছা থেকে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মনে লোভ আসে, যা তার ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

॥ আলোচনা ॥

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পুরস্কার দানের প্রথার অনেক ত্রুটি আছে। সুতরাং পুরস্কার যদি দিতে হয়, তার এই অসুবিধাগুলো দূর করার দরকার। তাই অনেক শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্ মনে করেন, পুরস্কার যখন উদ্‌বোধকের কাজ ক'রে শিক্ষার পেছনে প্রেষণা শক্তি জোগায়, তখন তা সবাই-কেই দেওয়া উচিৎ। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু না কিছু ভাল গুণ থাকা স্বাভাবিক। তার সেই ভাল গুণের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। এতে ক'রে সে বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরক্ত হবে। সে যদি পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়, তাহ'লে তার এই যে অনুরাগ এটাকে পরবর্তী কালে শিক্ষক কাজে লাগাতে পারেন। যে ছাত্র কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করতে

পারছে না, তাকে বাধা দিয়ে নিরাশ করলে ভাল ফল হবে না। তাকে যদি শিক্ষক সাহায্য করেন এবং মাঝে মাঝে প্রশংসা করেন তবে সে হয়তো সেটা সম্পূর্ণ করতে পারে। এমনি ভাবে বস্তুগত ও মনোগত পুরস্কার সকলের মধ্যে বিতরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে আধুনিক কালে মনোবিদ্ এবং শিক্ষা-বিদ্‌রা বস্তুগত পুরস্কারের একেবারে পক্ষপাতী নন। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে মনোগত পুরস্কারের যে গুরুত্ব আছে সে কথা তাঁরা স্বীকার করেন। শিক্ষককে এই ধরনের পুরস্কার দানের পদ্ধতিতে খুব দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতে হবে। কারণ মানসিক পুরস্কারের ভাল ফলও যত সহজে পাওয়া যায় খারাপ ফলও তত সহজে পাওয়া যেতে পারে। একজনকে প্রশংসা করার সময় অন্য শিক্ষার্থী যেন মনে না করে যে, তিনি তাদের অবজ্ঞা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক বন্ধুত্বের দায়িত্ব নিয়ে যদি সকলকে সমানভাবে উৎসাহিত করতে পারেন তবেই ভাল ফল পাওয়া যাবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী

Co-curricular Activities

প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর মানসিক বিকাশ বা জ্ঞান আহরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের মনে কিছু জ্ঞান সামগ্রী চাপিয়ে দেওয়া। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, ব্যক্তির চিন্তাশক্তি, যুক্তিশক্তি ইত্যাদির বিকাশ সাধন করা কয়েকটা নিয়ম-মাফিক পাঠ্যবিষয়ের মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারেও এই ধারণা পোষণ করা হ'ত। 'ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ'—এই ছিল মূল মন্ত্র। শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে সাধনা করতে হবে—'রুদ্ধ করি ইন্দ্রিয়ের দ্বার'। দৈহিক ক্রিয়া-কলাপকে সে যুগে শিক্ষার বিপরীতধর্মী বলে মনে করা হ'ত। খেলাধূলা, অভিনয় ইত্যাদি নানারকম চিত্তবিনোদনমূলক কাজকে (Recreational activities) মনে করা হ'ত শিক্ষার পথে অন্তরায়। তাই প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থায় তাদের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। মানসিক গুণের চর্চা ছাড়া বিদ্যালয়ে আর কোন কিছুকেই স্থান দেওয়া হ'ত না।

কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষার ভাবধারার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি, শিশুর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টাকে। ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ শুধুমাত্র মনের বিকাশের দ্বারা আসতে পারে না। দেহ মনে সে সম্পূর্ণ জীব। দেহের বিকাশকে বাদ দিয়ে বা দূরে সরিয়ে রেখে মনের বিকাশ করলে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ হবে না। তাই আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে, হেনরি ম্যাক্কন্ (Henrey Mckown) বলেছেন—"So passing on the noble heritage as the main end of education gives way to developing a noble individual". এই সর্বাঙ্গীন বিকাশের বিভিন্ন দিক হ'ল—(১) মানসিক বিকাশ (Mental development), (২) দৈহিক বিকাশ (Physical development), (৩) আধ্যাত্মিক বিকাশ (Spiritual development), (৪) কর্মজীবনের বিকাশ (Vocational development), (৫) অবসর

যাপনের ক্রিয়াকলাপের বিকাশ (Development of leisure-time activities) এবং সর্বোপরি, (৬) সামাজিক বিকাশ (Social development)। এই সমস্ত দিকের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে বিদ্যালয়ে সার্থক জীবন যাপনের মাধ্যমে। আধুনিক শিক্ষার এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে, বর্তমান কালে শিক্ষাবিদ্‌রা খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্ক-সভা, বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিকেন্দ্রিক কাজকে বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। এইভাবে বিভিন্ন শিক্ষাবিদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের কাজকে বিদ্যালয়ের কর্মসূচীর অন্তর্গত করা হ'ল। তবে শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ্‌রা এদের প্রথম সহজ ভাবে নিতে পারেননি। তাই পাঠ্যক্রমের বাইরে এদের অতিরিক্ত কার্যাবলী ব'লে বিবেচনা করা হ'ত, এবং এদের বলা হ'ত বহিঃপাঠ্যক্রমিক (Extra-Curricular activities)। ক্রমে দেখা গেল, নীতিগত ভাবে এই ধরনের পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত কাজগুলোর প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে মেনে নিলেও তাদের অনুশীলন ঠিকমত হ'ত না। ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে, এদের উপর আরো গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পাঠ্যক্রমের ধারণাও বদলালো। বর্তমানে পাঠ্যক্রম বলতে শুধুমাত্র পাঠ্য বিষয়ভুক্ত ধারণার সম্পর্ককে বুঝায় না। বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত কিছু কাজ, সমস্ত কিছু অভিজ্ঞতাকেই পাঠ্যক্রমের ব্যাপক অর্থের অন্তর্গত করা হ'য়েছে। ক্রমে এদের গুরুত্বের কথা বিবেচনা ক'রে নামেরও পরিবর্তন হ'ল। অনেক শিক্ষাবিদ বললেন, এদের সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular activities) বলাই ভাল। এর দ্বারা তাঁরা এ কথাই বলতে চাইলেন, মানসিক প্রক্রিয়ার চর্চার সঙ্গে এই ধরনের বিষয়গুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই পাঠ্যক্রমে এদের সমান মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু তারও পরিবর্তন হ'ল—প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ্‌দের এই নামও পছন্দ হ'ল না। তাঁরা মনে করেন, সহপাঠ্যক্রমিক বললেও এদের পাঠ্যক্রম থেকে পৃথক ক'রে দেখা হয়, এবং তাদের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়। পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তই যদি এই সব বিষয় হয়, তবে সহপাঠ্যক্রমিক বলা উচিত হবে না। বরং পাঠ্যক্রমের নির্ধারিত কার্যাবলীকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ; কিছু শ্রেণীকক্ষের অন্তর্গত বিষয়, আর কিছু শ্রেণীকক্ষের বাইরে চর্চার বিষয়। সুতরাং এদের বহিঃশ্রেণীগত কাজ বলার পক্ষপাতী।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর উদ্দেশ্য (Objectives of Co-curricular activities): সাধারণ নামকরণ নিয়ে যে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে দ্বন্দ্ব তা

খুবই বাঞ্ছিক। প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ এই সব কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। সুতরাং, এর থেকেই এদের গুরুত্বের কথা প্রমাণিত হয়। এই ধরনের কাজ শিশুর যে শুধু দৈহিক বিকাশে সহায়তা করে তা নয়, তার মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশেও সহায়তা ক'রে। সঙ্গে তার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ধরনের উপকারিতার কথা বলেছেন। তাঁদের এই আলোচনা থেকে, আমরা বলতে পারি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলির সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করে।

[এক] শিশুর মধ্যে জন্মগত কতকগুলো প্রবণতা থাকে। শিক্ষকের কাজ হ'ল তার সেই প্রবণতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে, তার মধ্যে যে সুপ্ত সম্ভাবনা আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ করা। রাধাকৃষ্ণন বলেছেন—"The function of the teacher is to draw out the inner splendour of the student and to prove his practical utility to the world." সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলো শিক্ষককে এই দিক থেকে সহায়তা করে। তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিকে স্বাভাবিক ও শিশুর আগ্রহানুযায়ী গড়ে তুলতে তাঁকে সহায়তা করে। তিনি শিশুর প্রবণতাগুলোকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।

[দুই] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুর গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের উপযোগী মনোভাব গড়ে তোলা যায়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হ'ল একদিকে যেমন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, অন্যদিকে তেমনি সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে ব্যক্তিকে প্রস্তুত ক'রে দেওয়া। বিদ্যালয়ের জীবনে যদি শিক্ষার্থীরা সমাজ জীবনের প্রচলিত ধারার সঙ্গে পরিচিত না হয়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের অভিযোজন করতে অসুবিধা হয়। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা হ'ল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে পারস্পরিক সহবাস। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের যৌথ কার্যাবলীর (Group activities) মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে এই ধরনের মনোভাব গড়ে ওঠে। খেলাধুলা, যৌথ প্রজেক্ট (Group-project), অভিনয়, ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা জাগিয়ে তোলা যায়। তাছাড়া এন. সি. সি., স্কাউট্ ইত্যাদির মাধ্যমেও সহযোগিতা ও সমবেদনামূলক মনোভাব গড়ে তোলা যায়।

[তিন] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে

তোলা যায়। আর এই আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আসে আত্মনির্ভরশীলতা। শিশু গৃহ পরিবেশে পিতামাতার উপর নির্ভরশীল থাকে। তার ভিন্ন কাজের জন্য বিদ্যালয়ে এসেও যদি সে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল জীবনযাপন করে, তাহ'লে ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনে সে সার্থক নাগরিক হিসেবে বাঁচতে পারবে না। তাই বিদ্যালয়ের মধ্যেই তাকে এমন কিছু কাজ দিতে হবে যে, সবের সমাধানের মধ্য দিয়ে তার আত্মবিশ্বাস আসে। সহপাঠ্যক্রমিক কাজ তাকে সেই সুযোগ দেয়। প্রত্যেক ছাত্র সব রকম কাজ যে করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু যেটাতে সে পারদর্শিতা দেখাবে, সেটাকে কেন্দ্র ক'রেই তার জীবন গড়ে উঠবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই তার জীবনের গতি নির্ণীত হবে।

[চার] বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিমূলক মনোভাবের বিকাশ হয়। এই সহযোগিতা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ছাত্রসংস্থার সভ্য হিসেবে, খেলার মাঠে, অভিনয়ে, সে অন্যান্যদের সঙ্গে সহযোগিতার সঙ্গে কাজ করে, এমনি ভাবে ধীরে ধীরে অন্যের সঙ্গে বাস করতে হ'লে যে ধরনের সহযোগিতামূলক মনোভাব দরকার তার মধ্যে তা বিকাশ লাভ করে।

[পাঁচ] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়-জীবনকে ছাত্রদের কাছে সরস এবং সজীব ক'রে তোলা যায়। গতানুগতিক শ্রেণী কক্ষের পাঠ দানের মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষার যে রীতি, তাতে ক'রে শিশুরা বিদ্যালয়কে একটা জেলখানাই মনে ক'রে ছুটির ঘণ্টা পড়ার অপেক্ষায়ই তারা সারাদিন কাটায়, কিন্তু সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বিদ্যালয়ে ঠিকমত চালনা করলে, বিদ্যালয়-জীবনে অনেক বৈচিত্র্য আসে; এবং তার প্রতি শিক্ষার্থীরা আকৃষ্ট হয়। এই সব কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রতি আনুগত্যও বাড়ে এবং বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ব বোধও (school spirit) জাগে।

[ছয়] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের সুপরিচালনা করতে পারলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যারও সমাধান হয়। পূর্বে ধারণা করা হ'ত, এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাকে ব্যাহত করে, ছাত্রদের অমনোযোগী করে, কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাবিদরা বিশ্বাস করেন শৃঙ্খলা হ'ল ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ন্ত্রণের প্রবৃত্তি, খেলার মাঠের নিয়ম-কানুন মেনে; বিতর্ক সভার নিয়ম কানুন অনুশীলন বা অন্য যে-কোন ধরনের স্বাধীন কাজের মধ্যে নিয়ম কানুন মেনে সম্পাদন ক'রে, শিশুরা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্বাধীন প্রচেষ্টা দিয়ে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে

শৃঙ্খলার যে শিক্ষা তাই চিরস্থায়ী হবে। ফলে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে স্বতঃস্ফুর্ত শৃঙ্খলা স্থাপন করা যায়।

[সাত] শিক্ষক যদি সচেতন হন তাহ'লে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোন বিষয়ে দক্ষতা আছে বা ঝোঁক আছে তা তিনি নির্ণয় করতে পারেন এই সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে। শিশুরা যখন এই সব কাজ করে, তখন তাদের কি ধরনের বৃত্তিমূলক আগ্রহ আছে, কি ধরনের বিশেষ ক্ষমতা আছে, তা যদি শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করেন, তাহ'লে তিনি সহজেই শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। এই সব তথ্য তার নিজের পাঠ পরিকল্পনা রচনায় যেমন সাহায্য করবে, অন্যদিকে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনায় (Educational and Vocational guidance) সহায়তা করবে।

[আট] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক বিকাশ ও মানসিক বিকাশ হয়। খেলাধূলা ইত্যাদির মাধ্যমে দৈহিক বিকাশ হয়। আবার বক্তৃতা, বিতর্ক-সভা ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক বিকাশও হয়, এছাড়া এই কর্মসম্পাদনের সময় অবাধ মেলামেশার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ভাবের আদানপ্রদান হয় তার মাধ্যমে মনের সংকীর্ণতা দূর হয়, দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ঘটে।

[নয়] সহপাঠ্যক্রমিক কাজের যে শিক্ষা শিশুরা বিদ্যালয়ে পায় তা তার ভবিষ্যৎ জীবনে সুষ্ঠুভাবে অবসর যাপনে সহায়তা করে। অবসর যাপনের শিক্ষা আধুনিক যান্ত্রিক যুগের এক বড় সমস্যা, সেই সমস্যার অনেকটা সমাধান হ'য়ে যায় বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা করলে।

[দশ] সবশেষে বিশেষ কয়েক ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ হয়। যেমন, স্কাউট্, সেণ্ট্ জন অ্যাম্বুলেন্স কোর ইত্যাদি চরিত্রের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকের বিকাশ খুব সহজেই এই সব কাজের মাধ্যমে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য লাভে সহায়তা করে, শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির এতগুলো গুণ সার্থক ভাবে বিকাশ করা সম্ভব নয়। নিয়ম-মাফিক, বিষয়-কেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে যদি এই ধরনের বহিঃশ্রেণীগত কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়, তাহ'লে শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক সকল গুণেরই বিকাশ করা সম্ভব হবে। ব্যক্তি-জীবনের সুষম বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টায় এদের গুরুত্বকে আর অবহেলা করা যায় না।

বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ (Different types of Co-Curricular activities) :

বিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনার একান্ত প্রয়োজন। এই ধরনের সার্থক পরিকল্পনার মধ্যে সহপাঠ্যক্রমিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সাধারণতঃ যে সব কাজ আমাদের বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানকে সহায়তা করতে পারে তাদের আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি উদ্দেশ্য অনুযায়ী। তবে এই শ্রেণীবিভাগ যে একেবারে স্থির এবং নির্দিষ্ট তা বলা যায় না। কারণ বিভিন্ন ধরনের কাজ বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই শুধুমাত্র আলোচনার জন্য এই শ্রেণী বিভাগ।

[এক] **শরীর চর্চামূলক কাজ :** বিভিন্ন ধরনের চর্চামূলক কাজ গ্রহণ করা যায় সহপাঠ্যক্রমিক কাজ হিসেবে। এই ধরনের কাজ নিয়ম-মাফিক বিভিন্ন ধরনের খেলাধূলা হ'তে পারে, যেমন—ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেট, বাডমিণ্টন, টেবিল টেনিশ ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে সুস্থ শরীর চর্চামূলক হ'তে পারে যেমন—দৌড়, ঝাঁপ, বক্সিং ইত্যাদি। এই সব কাজের মাধ্যমে শুধুমাত্র যে দৈহিক বিকাশ হয় তা নয়, অনেক সামাজিক গুণেরও বিকাশ লাভ করে। দলগত ভাবে খেলার মাধ্যমে শিশুরা নানা ধরনের সামাজিক গুণ, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সামাজিকতা ইত্যাদি অর্জন করে। অপর দিকে দেহচর্চার মাধ্যমে দেহের পুষ্টসাধন হয়, এবং তা আত্মরক্ষা এবং দলগত স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করে। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য দৈহিক বিকাশ সাধন বলে, এদের এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে।

[দুই] **শিক্ষামূলক কাজ :** শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের নির্দেশনার দ্বারা শিক্ষালাভ করা ছাড়াও শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা বিভিন্ন সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে পেতে পারে। সাহিত্য-সভা, বিতর্ক-সভা, আলোচনা-চক্র, প্রদর্শনী, শিক্ষামূলক-ভ্রমণ, ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। এই সব কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব সাধারণ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনেক নতুন জিনিস শিখতে পারে।

[তিন] **সামাজিক বা কৃষ্টিমূলক কাজ :** এই সব কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক সত্তার বিকাশ করা সহজ হয়। অভিনয়, আবৃত্তি, বিভিন্ন ধরনের যৌথপ্রচেষ্টা, স্বাস্থ্য সপ্তাহ পালন, গ্রামোন্নয়নে অংশ গ্রহণ, বিদ্যালয়ে

শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সমিতি গঠন ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক গুণের বিকাশ হয় এবং তার সাংস্কৃতিক জীবনের উৎকর্ষণ হয়।

এছাড়া, আরো নানারকম কাজ বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা যায়, এদের মধ্যে এন. সি সি, স্কাউট্, গার্লস্ গাইড ইত্যাদি আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয়। এই কাজের মাধ্যমে শিশুর সকল রকম গুণেরই বিকাশ হয়। সহপাঠ্যক্রমিক কাজের যে তালিকা দেওয়া হ'ল তাই যে সঠিক তার কোন স্থিরতা নেই। এই ধরনের কাজের প্রকৃতি এবং উপকারিতা শিক্ষকের তৎপরতা এবং কৌশলের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষক তার নিজের সুবিধা অনুযায়ী এবং সুযোগ অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ কাজ বেছে নেবেন এবং তাদের সার্থক রূপায়ণের আন্তরিক চেষ্টা করবেন। শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী সকলের আন্তরিক চেষ্টা ছাড়া এই ধরনের পরিকল্পনা থেকে ভাল ফল পাওয়া যায় না। সকলে যখন স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে নিজেদের নিয়োগ করবে, তখনই এদের সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে।

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনার মূলনীতি (Basic Principles in the Organisation of Co-curricular Activities):

বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করবার জন্য ভিন্ন নিয়ম পালন করতে হয়। এখানে আমরা তাদের পৃথক ভাবে আলোচনা করবো না। শুধুমাত্র এই ধরনের কাজ পরিচালনা করবার জন্য সাধারণ যে মূলনীতি-গুলো মেনে চলা উচিত তার উল্লেখ করবো। সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে ভাল ফল পেতে হ'লে, এই নীতিগুলো মেনে চলা উচিত—

[এক] শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনে বাস করে, সুতরাং সমাজ জীবনে নিজের কাজ বা বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তির যেমন স্বাধীনতা আছে, বিদ্যালয়েও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নির্ধারণ করবার জন্য ছাত্রদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। নির্দিষ্ট কোন কাজ যদি জোর ক'রে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহ'লে তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততার উপাদান নষ্ট হ'য়ে যাবে। ছাত্রদের গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে রেখে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী নির্বাচন করার দরকার।

[দুই] সহপাঠ্যক্রমিক কাজগুলোকে বিদ্যালয় কাজ চলাকালীন পরিচালনা করতে হবে। তা'না হ'লে সকলে এতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

বিদ্যালয়ের সময় তালিকার মধ্যে এই ধরনের কাজ করার জন্য সময় রাখার দরকার।

[তিন] একথাও শিক্ষকদের মনে রাখা দরকার, এই ধরনের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য নিয়মিত শ্রেণীর কাজ বাদ দেওয়া চলবে না বা ছাত্রদের ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। যদি নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ছাত্রদের শ্রেণীর বাইরের কাজে নিযুক্ত করা হয়, তাহ'লে ধীরে ধীরে ঐ সব কাজের প্রতি তাদের আগ্রহ এমন বেড়ে যাবে যে, নিয়মিত শ্রেণী পরিচালনা করা মুস্কিল হ'য়ে পড়বে।

[চার] অনেক সময় যে সব ছাত্ররা বিদ্যালয়ে পড়ে না বা যারা পাশ ক'রে চলে গেছে, তারাও এই ধরনের কাজে অংশ গ্রহণ করে। এই ধরনের ব্যবস্থা বন্ধ করার দরকার। এতে ক'রে এই সব কাজের উদ্দেশ্য নানা কারণে ব্যাহত হয়। তাছাড়া বর্তমান ছাত্ররা ঠিকমত সুযোগ পায় না।

[পাঁচ] সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করার জন্য যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে, বিভিন্ন ধরনের কাজের ভার ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের উপর দিতে হবে।

[ছয়] এই সব কাজের মধ্য দিয়ে কিছু কিছু ছাত্রের মধ্যে যে নেতৃত্বের বিকাশ লাভ করে, তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। বিভিন্ন কাজের জন্য নেতা নির্বাচন বিশেষ ভাবে যাদের পারদর্শিতা আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে করতে হবে।

[সাত] যে শিক্ষকের উপর সহপাঠ্যক্রমিক কাজ পরিচালনা করার ভার থাকবে তিনি যেন নিজের মতামত ছাত্রদের উপর জোর করে না চাপান। কর্ম নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবেন এবং কর্ম-পরিচালনার ব্যাপারে উপদেশক হিসেবে কাজ করবেন।

[আট] প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে বাধ্যতামূলক ভাবে সহপাঠ্যক্রমিক কাজে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারণ বর্তমানে এগুলোকে পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে ধরা হয়। এই অংশের শিক্ষা যদি তার না হয়, শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'য়েছে একথা বলা যায় না। অবশ্য প্রত্যেকে যে একই রকম কাজে যোগ দেবে, বা একই রকম পারদর্শিতা দেখাবে তা কখনও আশা করা যায় না। তবে তাদের যোগদানের মাধ্যমে নিজেদের বিকাশ করার অনেক সুযোগ পাবে। সেই সুযোগ থেকে কাউকে বঞ্চিত করা চলবে না।

[নয়] এই ধরনের কাজ বিদ্যালয়ে প্রচলন করার সময় একেবারে অনেক গুলো এক সঙ্গে হাতে নিলে অসুবিধা হবে। তাতে ক'রে শিক্ষকদের উপর

অনেক চাপ এসে পড়বে। কিন্তু প্রথম স্তরে যদি নির্বাচিত কয়েকটি নেওয়া যায় এবং তাদের সুষ্ঠু পরিচালনা করা যায় তাহ'লে অনেক ভাল ফল পাওয়া যাবে। অনেক কিছু এক সঙ্গে ক'রে যদি সুপরিচালনা না করা যায় তাহ'লে তার থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে না,। সুতরাং এই ধরনের কাজের প্রবর্তন করতে হ'লে প্রথম কম থেকে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়াতে হবে।

[দশ] প্রত্যেক ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় উপকরণ, অর্থ ইত্যাদি বরাদ্দ করতে হবে। প্রয়োজন হ'লে শিক্ষামূলক আসর বা ক্লাবের জন্য আলাদা ঘরও ছেড়ে দিতে হবে। এই ধরনের কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে ছাত্রেরা যদি প্রতি পদে বাধা পায় তাহ'লে তারা ক্রমে নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়বে।

[এগার] প্রত্যেক রকম কাজের জন্য আলাদা আলাদা রেকর্ড-কার্ড থাকবে, যার দ্বারা ছাত্রদের পারদর্শিতার মূল্যায়ন করা যায়। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কাজেরও মূল্যায়ন করার দরকার। কোন কাজ কতটা বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলছে তাও বিচার করে দেখার দরকার। কারণ, এর উপর নির্ভর করছে কোন্ কাজটা রাখা হবে, কোনটাকে বাদ দিতে হবে। যে সব কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীদের কোন রকম উন্নতিই হয় না সেগুলোর চর্চা করার কোন প্রয়োজন নেই।

[বার] সবশেষে বিদ্যালয়ে কি কি ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর অনুশীলন করা হয়, এবং ছাত্রছাত্রীরা কি ধরনের পারদর্শিতা সেখানে দেখাচ্ছে এ সম্পর্কে অভিভাবক এবং পিতামাদের অবগতি থাকার একান্ত প্রয়োজন। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে তাদের অবগতির ব্যবস্থাও করতে হবে।

যে সব মূলনীতিগুলোর উল্লেখ করা হ'ল, এই সব নয়। এছাড়া প্রত্যেক ধরনের কাজ সংগঠনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয় তবে একথা বলা যায়—এই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী যদি উপরোক্ত নিয়মের উপর ভিত্তি ক'রে রচনা করা যায়, তাহ'লে সাধারণ পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। একথা মনে রাখা দরকার কেবলমাত্র সহপাঠ্যক্রমিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে না। গতানুগতিক বিষয়-কেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমের পরিপূরক হিসেবে এগুলো কাজ করে। তাই ম্যার্কুন বলেছেন—"A school only with extra-curricular activities would be a absurd as a school without them."

॥ আলোচনা ॥

সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্তমানে কোন শিক্ষাবিদ্ই বিরূপ মত পোষণ করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের দেশে এদের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন আজও সংগঠিত হয়নি। যদিও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এদের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে, তা সত্ত্বেও এদের পরিপূর্ণ সংস্থান আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে হ'য়ে ওঠেনি। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ এদের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন, রবীন্দ্রনাথ শান্তি-নিকেতনের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞান চর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে, কেবল মাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য, শিল্পকলা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্য যে সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করবো। চিত্তের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে ব'লে আমি জানি।" কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমাদের দেশে এই চর্চার বহুল প্রসার হয়নি। এরজন্য অনেক কিছুই দায়ী।

প্রথমতঃ, বলা যেতে পারে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, সহপাঠ্যক্রমিক কাজের অনুশীলনকে ব্যাহত করছে। আমাদের সমাজ বিশেষভাবে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং এখানে সাধারণ ভাবে শিক্ষার বৃত্তিমূলক আদর্শকে বড় ক'রে দেখা হ'চ্ছে। তাই সকলের ঝোঁক কোন রকমে কয়েকটা ডিগ্রী জোগাড় করতে পারলে একটা ভাল চাকরী পাওয়া যাবে, এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আসবে। আমাদের বিদ্যালয়গুলোও এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় বলে, সহপাঠ্যক্রমিক কাজের গুরুত্ব সেখানে দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একান্তভাবে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক (Examination centred)। পাঠ্যক্রমও সেই ভিত্তিতে রচিত হ'য়েছে, আর তার অনুশীলনও সেই উদ্দেশ্যে। যদিও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার) বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের এবং অবসর বিনোদনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁরা যা সুপারিশ করেছেন তা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি থাকায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা পাশের উপযোগী ক'রে তৈরী করে দেওয়াই বিদ্যালয় তার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে। আর এই সব কাজের উপর যখন পরীক্ষা হয় না, তখন স্বাভাবিক ভাবে তাদের

গুরুত্ব কমে যায়। এখনও তাই আমাদের দেশে বিদ্যালয়ে দেখতে পাই পরীক্ষা যত এগিয়ে আসে খেলাধূলা কমানোর জন্য ততই চেষ্টা বাড়তে থাকে।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষামূলক পরিকল্পনা যাঁরা রচনা করেন এবং অর্থসাহায্য করেন, তাঁদের উদাসীনতার জন্য এই ধরনের পাঠ্যক্রম বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী পরিচালনা করতে হ'লে যে অর্থের দরকার তা বিদ্যালয়কে দেওয়ার মত বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। যে সব বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী খুব উৎসাহী তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় হয়তো কিছু করেন, বা কিছু অর্থ সাহায্য জোগাড় করেন। কিন্তু তা দিয়ে সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয় না।

চতুর্থতঃ, শিক্ষকের আর্থিক নিরাপত্তার অভাব এবং মনোভাবের অভাব আমাদের বিদ্যালয়ে এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণের পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকরা বিদ্যালয়ের সময় তালিকা অনুযায়ী কাজ করেন, তার বাইরে তাদের কাজ করার নানা রকম অসুবিধা আছে। হয়তো অবসর সময়ে তাঁকে অন্যভাবে অর্থের সন্ধানে যেতে হয়, তাই তাঁর পক্ষে এই ধরনের কাজের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হয় না।

তাই আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে সহপাঠ্যক্রমিক কাজের প্রবর্তন করতে হ'লে সকলের দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিবর্তন করার একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. If placed in the charge of a new school, how would you organise the Co-curricular activities in the school with a view to the training of character? [C. U. B. T. '69]

Ans. ১৯৪ হইতে ১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Describe the utility of co-curricular activities in schools. Why are these activities now-a days called co-curricular activities? [C. U. B. T '58]

Ans. ১৮৮ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Why are extra-curricular activities regarded as an integral part of the educational programme of the school, and why are they rather called co-curricular activities? Outline the different kinds of extra-curricular activities that can be taken up by a secondary school with suggestions for their effective organisation. [N. B. U.; B. T. '63]

Ans. ১৮৮ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. What are the functions of extra curricular activities in schools? Take any suitable extra-curricular activity and say how you would organise it in a school? [N. B. U, B. T. '67]

Ans. ১৯০ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. "A good school, besides the usual course of instruction, should seek by other means to be of service to the children who attend it". Name some such means and discuss at least one of them. [C. U. B. T. '62]

Ans. ১৮৮ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

6. Write an essay on the place of extra curricular activities in educational institutions. [C. U. B. A '55, '59 ; B. T. '51]

Ans. ১৮৮ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

7. Discuss the importance of co-curricular activities in schools. Discuss why their effective organisation is lagging in our schools.

Ans. ১৯০ হইতে ১৯৪ পৃষ্ঠা এবং ১৯৭—১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

8. What do you understand by co-curricular activities? Discuss the broad principles on which you will organise them in your school.

Ans. ১৮৮—১৮৯ পৃষ্ঠা এবং ১৯৪ হইতে ১৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খেলা ও খেলাভিত্তিক শিক্ষা

Play and Play-way Principles in Education

খেলা (play) শিক্ষাক্ষেত্রে আর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নানা ধরনের মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী খেলা এবং শিক্ষা পরস্পর-বিরোধী বিষয়। প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় খেলার কোন স্থান নেই। বরং খেলাকে ত্যাগ করে, যত কঠোর ভাবে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করা যাবে, ততই শিক্ষার কাজ ভাল হবে এই ছিল গতানুগতিক ধারণা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-বিদ্‌রা সকলে মনে করেন, খেলা ও শিক্ষা পরস্পরবিরোধী নয়। বরং খেলা শিক্ষাক্ষেত্রের গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। তাই আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বে খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা এই অংশে খেলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করবো এবং তার সঙ্গে কিভাবে তা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কেও আলোচনা করবো।

খেলার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Nature and definition of Play) : খেলার চল পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত শিশুর মধ্যে বর্তমান। তাছাড়া খেলা এমন এক ধরনের আচরণ যা মানুষ এবং ইতর প্রাণীর মধ্যে সমভাবে বর্তমান। খেলার মধ্যে সমতার উপাদান বা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য দেখে অনেক মনোবিদ্ তাকে অন্যান্য সংস্কারের (instinct) মত একটি সংস্কার হিসেবে কল্পনা করেছেন। কিন্তু খেলার যে বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় তার থেকে তাকে কোন বিশেষ মানসিক সংগঠনের ক্রিয়া বলে ভাবা যায় না। শিশুর খেলাকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত প্রবণতার প্রকাশ পায়। খেলার মধ্যে যখন সে বন্দী হয় তখন, তার মধ্যে বশ্যতার সংস্কার কাজ করে, যখন রাজা হয় বা দলের নেতা রূপে পরিচালনা করে তখন তার মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার (self-assertion) প্রবণতা কাজ করে। যখন টুকরো টুকরো জিনিস দিয়ে ঘর বাড়ী তৈরী করে, তখন নির্মাণের প্রবণতার (construction) প্রকাশ পায়, যখন, বিভিন্ন ধরনের জিনিস সংগ্রহ করে তখন সঞ্চয়ের

(acquisition) প্রবণতা কাজ করে, আবার সাথীদের সঙ্গে যখন নকল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন যুযুৎসা প্রবৃত্তির প্রকাশ পায়। এমনি ভাবে বিভিন্ন ধরনের খেলার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কার বা প্রবণতার প্রকাশ দেখা যায় খেলার মধ্য দিয়ে, সুতরাং খেলাকে বিশেষ কোন সংস্কারের ক্রিয়াশীল দিক বললে ভুল করা হবে। সংস্কার তত্ত্বের প্রবর্তক ম্যাক্‌ডুগালও (Mcdougall) এ বিষয়ে এক মত। তিনি বলেছেন—"No one of the many varieties of playful activity can properly be ascribed to an instinct of play."

আবার সাধারণ ধারণায় খেলাকে আবার দেহচর্চা বা সাধারণ খেলাধূলার (Sports and games) সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু মনোবিদ্যায় খেলাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ খেলা শুধু দেহ চর্চা নয়, তার মাধ্যমে অনেক মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যেরও বিকাশ হয়। খেলার সেই তাৎপর্যের কথা যদি উল্লেখ না করা হয়, তাহ'লে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ক'রে বলা হবে না। প্রাচীনপন্থী মনোবিদ্‌রা খেলাকে পেশীর স্বতঃস্ফূর্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সমতুল্য হিসেবে বিচার করেছেন। মনোবিদ্ এ্যাঞ্জেল (Angell) বলেছেন—"In little children the impulse to play is practically indentical with the impulse to use voluntary muscle. দেহের পেশীর স্বতশ্চল সঞ্চালনকেই যদি খেলা বলা হয়, তাহ'লে স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম, প্রতিক্রিয়া-জনিত কর্ম (Spontaneous action, Reflex action) ইত্যাদির সঙ্গে তার কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ ঐ ধরনের অনৈচ্ছিক কর্ম ও স্বতঃস্ফূর্ত পেশীর সঞ্চালনের মাধ্যমে সংগঠিত হয়। সেইজন্য এই ধরনের দৈহিক ক্রিয়া দিয়ে খেলার প্রকৃতিকে প্রকাশ করা যায় না।

ম্যাক্‌ডুগাল খেলার সংব্যাখ্যান ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, খেলার মধ্যে মানসিক শক্তির প্রবাহ হয়। খেলার সময় কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্নায়বিক শক্তির প্রবাহ হয়, এবং তার ফলে আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করি। তিনি খেলাকে একটা বিশেষ কোন প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত না ক'রে সাধারণ শক্তির প্রবাহ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, আমাদের মধ্যে যে সব জন্মগত প্রবণতা (instinct) আছে, সে গুলোর শক্তি তার স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত না হ'য়ে যদি সমাজসম্মত কোন পথ দিয়ে প্রকাশ পায় তখনই আমরা তাকে বলি খেলা। ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন—"Play is the out come of the Primal libido or vital energy flowing not in the channels of instinct,

but overflowing, generating a vague appetite for movement and finding outlet in any or all the motor mechanism in turn."সুতরাং ম্যাক্‌ডুগালের এই মতবাদ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি খেলা হ'ল জীবনী শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, এদিক থেকে ম্যাক্‌ডুগাল নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন, খেলাকে জীবনীশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে তার প্রধান একটা বৈশিষ্ট্যকে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এছাড়া খেলার আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমরা আধুনিক শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্দের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে পাই।

শিক্ষাবিদ্ নান্ (Nunn) সংস্কারগত প্রবণতার সঙ্গে খেলার তফাৎ করতে গিয়ে বলেছেন, সংস্কারগত কর্ম গতানুগতিক এবং পুনরাবৃত্তি-মূলক। তার ভেতর কোন নতুনত্বের বৈশিষ্ট্য নেই। কিন্তু খেলা হ'ল সৃজনীধর্মী। খেলার মধ্যে যে আনন্দ আমরা দেখতে পাই, তা সৃষ্টির আনন্দ। সুতরাং খেলার মধ্যে শিশু নতুনত্বের আস্বাদ পায় এবং তার সৃজনী-স্পৃহা চরিতার্থ হয়। খেলার মধ্যে আছে কল্পনা বিলাস। সে যখন খেলার মধ্যে বিশেষ [কোন বিশেষ ব্যক্তির অভিনয় করে তখন সে সত্যি সত্যি তা বিশ্বাস করে।

অধ্যাপক গালিক বলেছেন, (Gullick) খেলার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার প্রয়াস দেখা যায়। সে নিজে কল্পনা করে, নিজেই পরিকল্পনা করে এবং স্বাধীনভাবে তা সম্পাদন করে। গালিক বলেছেন—"Play is what we do, when we are free to do what we will."

ড্রিভার (Drever) বলেছেন, খেলার মধ্যে যে আনন্দ শিশু যে, আনন্দ পায় তা খেলার মধ্যেই নিহিত। বাইরের কোন বস্তুর মধ্যে খেলার আনন্দ পায় না। খেলে বলেই সে আনন্দ পায়। তিনি বলেছেন—"In play the value and significance of the activity are found in the activity itself."

সুতরাং, খেলার সংজ্ঞা দিতে হ'লে, তার মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্যগুলোর সংযোজন করার দরকার। তাই আমরা বলতে পারি খেলা হ'ল আমাদের এমন এক স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক এবং সৃজনাত্মক ক্রিয়া যার উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত। [Play is a spontaneous pleasurable activity, creative in nature and having some intrinsic end behind it.] খেলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরো পরিষ্কার হবে, যদি আমরা খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্যের কথা আলোচনা করি।

খেলা ও কাজ (Play and Work) : খেলা ও কাজের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করতে না পারলে, খেলার অপর একটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। খেলার প্রকৃতি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হ'লে কাজের সঙ্গে তার পার্থক্য করার দরকার। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে খেলা এবং কাজ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। তার নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা তাদের পৃথক করা যায়। খেলা এবং কাজ দু'টোই ব্যক্তির আচরণ। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রথমতঃ, কাজের মধ্যে বাধ্যবাধকতা আছে, খেলার মধ্যে সেই বাধ্যবাধকতা নেই। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত কাজ, বাধ্যবাধকতার গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ। শিক্ষবিদ্ নান্ (Nunn) বলেছেন—"An agent thinks of his activity as play if he can take it up or lay it down at choice...... ; he thinks of it as work if it is imposed on him by unavoidable necessity or if he is held to it by a sense of duty or vocation."

দ্বিতীয়তঃ, কাজের পেছনে একটা বিশেষ বাহ্যিক উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু খেলার পেছনে সে রকম বাহ্যিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়াস নেই। তবে খেলা যে একেবারে উদ্দেশ্যহীন তা নয়, তার উদ্দেশ্য তার নিজের অন্ত্যজ। বাইরের কোন বস্তুকে পাওয়ার, বা কোন পার্থিব আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা খেলি না। খেলার আনন্দেই আমরা খেলা করি। কিন্তু কাজের পেছনে সব সময় একটা উদ্দেশ্য থাকে এবং কাজের জন্য যে সব আচরণ আমরা করি তা সম্পূর্ণ ভাবে উদ্দেশ্যমুখী।

তৃতীয়তঃ, কাজ শাস্তি ও পুরস্কারের মনোভাব বা প্রত্যাশার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু খেলার জন্য এই ধরনের বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ বা উদ্‌বোধকের প্রয়োজন হয় না। খেলা স্বতঃস্ফূর্ত, বলে, শৃঙ্খলা ও খেলা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে তা হয় না। কাজ ঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে না পারলে নিন্দা ভয় থাকে, কিন্তু খেলার শেষে এ ধরনের মনোভাব আসে না।

চতুর্থতঃ, কাজের মধ্যে বাহ্যিক চাপ থাকে ব'লে, মানসিক অবসাদ খুব তাড়াতাড়ি আসে, কিন্তু খেলার ক্ষেত্রে তা হয় না। খেলার মাধ্যমে শারীরিক ক্লান্তি কোন কোন সময়ে আসে, কিন্তু মানসিক অবসাদ আসে না।

পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক হার্লি খেলা ও কাজের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যের কথা

বলেছেন। খেলার মধ্যে জীবিকা অর্জনের কোন স্পৃহা থাকে না। কিন্তু কাজ জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করি। হর্ণি (Horne) বলেছেন—"Economically, play does not aim at earning a living and work does."

খেলা ও কাজের মধ্যে এই ধরনের পার্থক্যের কথা বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্ উল্লেখ করলেও, তাদের মধ্যে বিভেদের সীমারেখা খুবই ক্ষীণ। যে কোন ধরনের আচরণ উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার জন্য কারো কাছে খেলা হ'তে পারে, কারো কাছে কাজ হ'তে পারে। ডাক পিয়ন যখন তার জীবিকা অর্জনের জন্য ঐ বৃত্তির অন্তর্গত বিভিন্ন আচরণ সম্পাদান করে, তখন আমরা তাকে বলি কাজ, আর ছোট ছেলেরা যখন, ডাক-পিয়নের ভূমিকায় অভিনয় করে, তখন আমরা তাকে বলি খেলা। অর্থাৎ, উদ্দেশ্যের পার্থক্যের জন্য আচরণের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তার বিচারেই খেলা এবং কাজকে পৃথক করা যায়। মনোবিদ্ ড্রিভার (Drever) বলেছেন—"In play, the value and significance of the activity are found in the activity itself ; where as in work, the value and significance of the activity are found in an end boyond the activity." সুতরাং বস্তুমুখী (Objective) আচরণকে আমরা বলি কাজ আর ব্যক্তিমুখী (Subjective) আচরণকে আমরা বলি খেলা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে খেলা ও কাজের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। তফাৎ স্বাধীনতা ও উদ্দেশ্যের মাত্রার তারতম্য (degree of freedom and purpose মাত্র। আধুনিক কালে সব শিক্ষাবিদই একথা স্বীকার করেন এবং তাঁরা মনে করেন, কাজ এবং খেলার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেই শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হবে। কাজের মধ্যে খেলার স্বতঃস্ফূর্ততা আনতে পারলে, খেলার একঘেয়েমিতা দূর হবে। জন ডিউই বলেছেন, জীবনের বহিঃ প্রকাশ হ'ল কাজের মাধ্যমে, আর শিক্ষা হ'ল সেই ধরনের কাজের ফল যার মধ্যে খেলার স্বতঃস্ফূর্ততা আছে। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদরা মনে করেন, খেলা, কাজ ও জীবনের মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হবে, জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে।

খেলা ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ কাজ (Play and Drudgery) : আধুনিক কালে কিছু শিক্ষাবিদ্ খেলা এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষ কাজের মধ্যে তফাৎ এ কথাও

বলেছেন। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা এবং কর্মের অকুলান (unemployment) এবং আংশিক ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাও ব্যক্তিকে তার নিজের ইচ্ছা, আগ্রহ, অনুরাগ এবং ক্ষমতানুযায়ী কাজ গ্রহণের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া বর্তমান অতি যান্ত্রিকতার যুগে এবং বিশেষ জ্ঞানভিত্তিক কর্ম বিশ্লেষণের (Specialization) যুগে ব্যক্তির সব সময় জানা সম্ভব হয় না, সে কি করছে, কেন করছে। ফলে সে কলুর বলদের মত ঘানি টেনেই চলেছে, জীবিকা অর্জনের জন্য। এই ধরনের কাজকে বলা হ'চ্ছে ইচ্ছা নিরপেক্ষ বা উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ কাজ (Drudgery)। এ সব কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যক্তি ওয়াকিহাল নয়, এর ভেতর স্বতঃস্ফূর্ততা বা আনন্দ নেই। একে আমরা চরম ভাবাপন্ন অমনোবৈজ্ঞানিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। কাজ ও খেলার সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি, তাদের মধ্যে বিভেদের সীমা রেখা খুবই অল্প। কিন্তু এই ধরনের কাজের সম্পূর্ণ বিপরীত হ'ল খেলা। অধ্যাপক কে. কে. মুখোপাধ্যায় বলেছেন—বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে খেলা ও ইচ্ছা নিরপেক্ষ কাজ দুই বিপরীত প্রান্ত বিন্দুতে অবস্থিত, আর কাজ আছে এই দুই প্রান্তীয় বিন্দুর মাঝখানে (play and drudgery are the two extremes between which comes work)। তাই খেলা এবং ইচ্ছানিরপেক্ষ কাজের মধ্যে গভীর ব্যবধানের সম্পর্ক বর্তমান।

খেলার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Play) : উপরোক্ত বিভিন্ন আলোচনায় খেলার যে যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একত্রিত করলে খেলা সম্বন্ধে আমাদের নিম্নবর্ণিত ধারণাগুলি স্পষ্ট হবে—

[এক] খেলা হ'ল মানুষের জন্মগত সাধারণ প্রবণতা। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শিশুই খেলা করে এবং খেলা করতে ভালবাসে। সেইজন্য আমরা খেলাকে মানুষের সর্বজনীন (Universal) বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

[দুই] খেলা স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। খেলার জন্য বাইরে থেকে কোন উদ্‌বোধকের (incentive) প্রয়োজন হয় না। শিশু নিজে থেকেই খেলায় মত্ত হয় এবং খেলার সময় আনুসঙ্গিক নানা রকম মানসিক অবস্থারও সৃষ্টি হয় স্বাভাবিক ভাবে।

[তিন] খেলার মধ্যে বস্তুধর্মী উদ্দেশ্য সাধনের কোন লিপ্সা থাকে না।

খেলার উদ্দেশ্য খেলার মধ্যেই অন্তর্নিহিত, বাইরের কোন লাভের কথা চিন্তা ক'রে শিশুরা খেলা করে না।

[চার] খেলা এক ধরনের স্বাধীন প্রক্রিয়া। খেলার সময় শিশু তার আপন জগতে বিচরণ করে। সকল রকম বাধা বন্ধনের বাইরে আপন যে মনের রাজ্য তার দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাইরের কোন বিশেষ বাধা তার খেলার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ালে সে বিরক্তি বোধ করে।

[পাঁচ] খেলার মধ্যে শৃঙ্খলা (discipline) স্বাভাবিক ভাবে আসে। খেলার জন্য যে নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়, তা শিশু নিজের থেকেই নিজের উপর আরোপ করে। কোন বাইরের ব্যক্তি তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেয় না। ফলে খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা বা মুক্ত শৃঙ্খলা (Free discipline) এই পরিস্থিতি বিকাশ লাভ করে।

[ছয়] প্রত্যেক খেলাই সৃজনীধর্মী। খেলার মাধ্যমে শিশু তার নির্মাণের প্রবণতাকে (instinct of construction) চরিতার্থ করে। খেলার মাধ্যমে শিশুরা যে সব জিনিস সৃষ্টি করে, বড়দের কাছে তার কোন মূল্য না থাকতে পারে কিন্তু তার জীবন বিকাশের দিক থেকে এই সব সৃজনাত্মক কাজের মূল্য অনেক।

[সাত] খেলার মাধ্যমে শিশুদের সুষম বিকাশ সাধন হয়। খেলার মাধ্যমে তার দেহ-মনের পুষ্টিসাধন হয়। তার কল্পনাশক্তির বিকাশ হয় খেলার মাধ্যমে। তার চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়। অর্থাৎ, খেলা শিশুর দেহ মনের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক।

[আট] খেলা শিশুর সামাজিক গুণ বিকাশেরও সহায়ক। খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে যৌথ প্রচেষ্টার সুযোগ পায় তার ফলে, তাদের মধ্যে নানা রকম সামাজিক গুণের বিকাশ হয়।

[নয়] সবশেষে খেলা এক ধরনের আনন্দদায়ক আচরণ এবং এই আনন্দের ও তৃপ্তির ভাব খেলার মধ্যে অন্তর্নিহিত।

খেলার বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Play) :

খেলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কেন শিশুরা খেলা করে। এই প্রশ্ন প্রাচীন চিন্তাবিদ্‌ ও দার্শনিকদের মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা বিভিন্ন ভাবে এই খেলার সংব্যাখ্যান

দিয়েছেন। ফলে আমরা দেখতে পাই খেলার বিভিন্ন তত্ত্ব। তাদের সম্পর্কে আলোচনা করলে, খেলার অনেক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পাবে।

॥ এক ॥ বাড়তি শক্তিক্ষয়ের তত্ত্ব (Surplus Energy Theory) :

এই তত্ত্ব প্রথম প্রস্তাব করেন প্রাচীন জার্মান কবি শিলার (Schiller)। পরে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) একে সমর্থন করেন এবং যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্বে খেলার দেহ-তত্ত্ব মূলক বা স্নায়বীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছে। এই মতানুযায়ী, খেলা হ'ল বাড়তি শক্তি-ক্ষয়ের পদ্ধতি ছাড়া কিছু নয়। শিশুরা খাদ্য সামগ্রী থেকে যে পুষ্টি গ্রহণ করে, তার সমস্তটা দেহের প্রয়োজনে লাগে না। তাছাড়া তাদের অতিরিক্ত কাজ করারও কোন সুযোগ নেই। তাই দেহ সঞ্চালনের মাধ্যমে তারা সেই শক্তিকে ক্ষয় ক'রে থাকে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর কোন সুযোগ নেই। তার কারণ, তাদের জীবনযাত্রার রসদ সংগ্রহের জন্য, সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং তাতেই তাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর অতিরিক্ত শক্তি যখন দেহ সঞ্চালনের মধ্যে প্রকাশ পায়, তাকেই আমরা খেলা বলে বিবেচনা করি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, শিশুকে রেলগাড়ীর ইঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করা হ'য়েছে। ইঞ্জিনে যেমন, বাষ্প থেকে যতটুকু শক্তি দরকার ততটুকু নেওয়ার পর বাকীটা ছেড়ে দেওয়া হয়, তেমনি শিশুরাও খাদ্য থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তার প্রয়োজন রেখে বাকীটুকু ছেড়ে দেয়।

খেলার এই তত্ত্বের ভিতর অনেক সত্যতা আছে। যেমন, খেলার মাধ্যমে দেহের পুষ্টি সাধন হয়, দেহ কর্মক্ষম হয়, এবং অত্যধিক মানসিক কাজ গ্রহণের উপযোগী হয়। কিন্তু তাহ'লেও এর অসুবিধা অনেক বেশী। আধুনিক মনোবিদ্‌রা খেলার এই ধরনের দেহতত্ত্বগত ব্যাখ্যাকে মেনে নেন না। তাঁরা মনে করেন, খেলার উপর এই ধরনের দেহতত্ত্বগত সংব্যাখ্যান আরোপ করলে, খেলার যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার মানসিক বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতাকে উপেক্ষা করে। এই তত্ত্বের বিভিন্ন ত্রুটি আমরা উল্লেখ করতে পারি—

(১) প্রথমতঃ, খেলাকে যদি বাড়তি শক্তির বহিঃপ্রকাশই বলি, তাহ'লে কেন সেই শক্তি বহিঃপ্রকাশের সময় বিশেষ আকার ধারণ করে, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। খেলা এবং স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম (Spontaneous action)

যে এক জিনিস নয়, তা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত দেহ সঞ্চালন আর খেলা এক জিনিস নয়। খেলার মধ্যে আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের ক্রমিক প্রকাশ দেখতে পাই। এই তত্ত্বে সন্তোষজনক কোন উত্তর পাওয়া যায় না।

(২) দ্বিতীয়তঃ, শিশুদের ক্ষয় করার মত বাড়তি শক্তি যখন না থাকে তখনও তারা কেন খেলা করে, এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে দেওয়া হয়নি। শিশুরা যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ে তখনও খেলা করে। তাকে খেলা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য তাগাদা দিতে হয়। কোন কাজ করার পর ক্লান্ত হ'য়ে এসেও দেখা যায় শিশুরা খেলা করতে দৌড়ে যাচ্ছে। এই ধরনের আচরণকে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

(৩) তৃতীয়তঃ, এমন অনেক প্রাণী আছে, যাদের আহার্যের সন্ধানে সারাদিন ঘুরে বেড়াতে হয়, তা সত্ত্বেও তারা খেলা করে।

(৪) চতুর্থতঃ, বয়স্ক ব্যক্তিদের খেলার কোন ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের মধ্যে দেওয়া হয়নি। তারা সারাদিনে পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসেও খেলার জন্য প্রস্তুত হয়।

এই সব ত্রুটি থাকার জন্য এই তত্ত্বকে খেলার উপযুক্ত সংব্যাখ্যান ব'লে গ্রহণ করা যায় না। শিশু ও ব্যক্তির মধ্যে খেলার প্রবণতাকে সার্থক ভাবে ব্যাখ্যা করতে হ'লে মনোবিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বের প্রয়োজন।

॥ দুই ॥ পুনরুজ্জীবনের তত্ত্ব (Recreation Theory) :

এই মতবাদের প্রবর্তক হলেন জার্মান দার্শনিক ল্যাজারস্ (Lazarus)। এই মতানুযায়ী, খেলা আমাদের ক্ষয়জাত শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে। প্রাণী খেলা করে, তার কারণ হ'ল খেলার মধ্য দিয়ে আমরা হৃত উৎসাহ ও শক্তি ফিরে পাই। মনোবিদ্‌রাও বিশ্বাস করেন যে, কাজের প্রকৃতি পতিবর্তন করলে মানসিক অবসাদ (Mental fatigue) কমানো যায়। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয়, এই তত্ত্বের মধ্যে সত্যতা আছে। আমরা কোন কাজের পর যখন খেলায় যোগ দিই, কাজের প্রকৃতির পরিবর্তন হওয়ার জন্য তা আমাদের অবসাদ ও বিরক্তিকর একঘেঁয়েমি ভাব দূর করে এবং আবার সেই কাজ করবার উপযোগী মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। যে শিশু অনেকটা পথ হেঁটে ক্লান্ত, সেও দৌড়ে খেলার মাঠে চলে যায়।

কিন্তু, খেলার এই ধরনের ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ নয়। এরও অনেক ত্রুটি আছে। কেন শিশুরা খেলতে ভালবাসে এবং কেন খেলার মধ্য দিয়ে শক্তির পুনরুজ্জীবন হয়, ঘুম বা বিশ্রামের দ্বারা হয় না, তার কোন সদুত্তর এই তত্ত্বে মেলে না। তাছাড়া এই তত্ত্বে অবসাদ দূরীকরণের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাও ঠিক নয়। তার কারণ অবসাদ এবং একঘেঁয়েমি তখনই কমবে যখন কাজের এবং দেহের অঙ্গের পরিবর্তন হবে। কিন্তু দেখা গেছে, যে অঙ্গের অবসাদ এসেছে, সেই অঙ্গই শিশুরা খেলার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারে। যে ছেলে হেঁটে ক্লান্ত, সেই দৌড়-ঝাপের খেলা খেলছে উৎসাহের সঙ্গে। শিক্ষাবিদ নান (Nunn) তাই বলেছেন—"......this explanation is quite insufficient. Under the influence of play, the child not only continues the activity which has wearied him, but actually puts twice as much vigour into it." সুতরাং, পুনরুজ্জীবনের তত্ত্বও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় না।

তিন ॥ প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব (Anticipatory Theory):

এই মতবাদের প্রথম প্রস্তাবক হ'লেন মেলেব্রান্স (Malebranche)। কিন্তু পরবর্তিকালে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ কার্ল গ্রুজ (Karl Groos) এই মতবাদকে সমর্থন করেন এবং পরিবর্ধন করেন। গ্রুজ প্রাণীর খেলা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তার পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, নিচু স্তরের প্রাণীদের আচরণ বিশেষ ভাবে সংস্কার (Instinct) দ্বারা পরিচালিত হয় এবং তাদের আচরণের মধ্যে খেলার কোন অস্তিত্বই দেখা যায় না। খেলা উন্নততর প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য। বিশেষ ভাবে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আচরণের মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি আরো বলেছেন, উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর জীবন-পরিস্থিতি অনেক জটিল। অভিব্যক্তির স্তরে যে প্রাণী যত উন্নত তার জীবন-পরিবেশ ততই জটিল। সুতরাং, এই জটিল পরিস্থিতিতে সার্থক অভিযোজনের জন্য সে অবিরত সংগ্রাম ক'রে চলেছে।

গ্রুজ মনে করেন, শৈশবে, আমরা প্রত্যক্ষভাবে এই ধরনের জীবন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই না। তখন আমাদের জীবন থাকে অনেকটা দায়িত্ব ভারহীন। কিন্তু ঐ অবস্থায়ই আমরা ভাবী সংগ্রামবহুল জীবনের মহড়া দিই এবং তা খেলার মাধ্যমে। অর্থাৎ, এই মতবাদ অনুযায়ী খেলা হ'ল ভবিষ্যৎ জীবনের মহড়া। তাই অনেক সময় এই তত্ত্বকে ভাবীজীবনের

মহড়ার তত্ত্ব (Rehearsal theory) বলা হয়। শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রত্যাশা করে বলেই তারা খেলা করে এবং খেলার মাধ্যমে তারা প্রশিক্ষণ লাভ করে। বিড়াল-ছানা বলের উপর ঝাঁপ দেয়, তার কারণ, ভবিষ্যতে তাকে ইঁদুর ধরার জন্য ঐ ভাবে লাফাতে হবে। ছোট মেয়েরা পুতুল নিয়ে তাকে স্নান করায়, খাওয়ায়, যত্ন করে, তার কারণ হ'ল ভবিষ্যতে মাতৃজীবনের অভিনয় করে সে এই খেলার মাধ্যমে। চার্চিল (Winston Churchill) তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন—"My choice of a military career was entirely due to my collection of toy soldiers." শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে প্রত্যাশা নিয়েই খেলা করে। এই ধরনের আচরণের মধ্যে কল্পনা বিলাস (Make-believe) আছে। সে বিশ্বাস করে যে, বড় হ'য়ে সে সৈনিক হবে, বা ডাক পিয়ন হবে, এবং খেলার মধ্যে সেই ধরনের আচরণ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কার্ল গ্রুজ-এর মতানুযায়ী খেলা শিক্ষাধর্মী, খেলা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি ; খেলার মাধ্যমে শিশু অবচেতন মনে প্রকৃতির কাজ থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী শিক্ষা পায়। ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) এই মতবাদ সম্পর্কে বলেছেন—"....it is not that young animals play because they are young and have surplus energy ; we must believe rather that the higher animals have this period of youthful immaturity in order that they may play."

কার্ল গ্রুজের এই তত্ত্বের অনেক সত্যতা থাকলেও, এবং তার পেছনে, অনেক বাস্তব যুক্তি থাকলেও, সব রকম খেলার বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করতে পারে না। বিশেষ ভাবে বয়স্ক জীবনের খেলার ব্যাখ্যা এর থেকে পাওয়া যায় না।

চার ॥ পুনরাবৃত্তির তত্ত্ব (Recapitulation Theory) :

এই তত্ত্বে কার্ল গ্রুজের তত্ত্বের বিপরীত মতবাদ প্রকাশ করা হ'য়েছে। স্ট্যানলী হল (Stanley Hall) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বলেছেন, খেলার মাধ্যমে আমরা পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করি। হল, কার্ল গ্রুজের তত্ত্বকে সমালোচনা ক'রে বলেছেন, প্রত্যাশামূলক তত্ত্ব একান্ত ভাবে আংশিক এবং ব্যাহ্যিক সংব্যাখ্যান। যে তত্ত্বের মধ্যে সমাজের অতীত সংস্কারের ধারাকে গ্রহণ করা হয়নি, এবং যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়নি, তাকে কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না। মানুষের সভ্যতার বিবর্তন যে সব পর্যায়ের মধ্য দিয়ে হ'য়েছে

শিশুরা খেলার মাধ্যমে সেই সব স্তরের পুনরাবৃত্তি ক'রে ভাবী জীবনের সার্থক উত্তরাধিকারী হয়। শিশুরা তীর ধনুকের খেলার মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষদের জীবন ধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এক কাজের পুনরাবৃত্তি করে। এই মত অনুযায়ী, সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় আমরা অনেক আচরণ পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার সার্থক অধিকারী হ'তে হ'লে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সেই সব স্তরের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। তাই খেলার মাধ্যমে শিশু অবস্থায় অতীত সভ্যতার বিভিন্ন ধরনের পরিত্যক্ত কাজেরই আমরা পুনরাবৃত্তি করি। কোন বিশেষ শ্রেণীর কৃষ্টির পুনরাবৃত্তি হয় খেলার মাধ্যমে। লুকোচুরি খেলা, মাছ ধরার খেলা, শিকারের খেলা, যা সাধারণ শিশুরা অভ্যাস করে, তা সবই আদিম যুগের লোকদের জীবন ধারণের উপযোগী গুরুত্বপূর্ণ আচরণ ছিল।

এই তত্ত্বের মধ্যে অনেক কিছুই সত্য বলে মনে হয়। তাছাড়া এই তত্ত্বকে গ্রহণ করলে বিভিন্ন দেশের শিশুদের খেলার মধ্যে যে সমতা দেখা যায় তার ব্যাখ্যাও সহজে করা যায়। কিন্তু এর ত্রুটিও আছে অনেক, যার জন্য একে একক ভাবে খেলার তত্ত্ব হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। যদিও এই তত্ত্ব বিভিন্ন দেশের শিশুর খেলার সমতার সংব্যাখ্যান দিতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্যের কোন যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কেন যে শিশুরা খেলার মধ্যে অতীত কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি করতে চায়, তার কারণ কোথাও ব্যাখ্যা করা হয়নি এই তত্ত্বে। তাছাড়া এই তত্ত্বকে গ্রহণ করলে খেলার মধ্যে যে প্রধান বৈশিষ্ট্য 'স্বাধীনতা' তা আর থাকে না। খেলার প্রকৃতি যদি সমাজের ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের কোন সুযোগ থাকে না। সুতরাং খেলা হ'য়ে দাঁড়ায় গতানুগতিক, পৌনঃপুনিক আচরণ (Stireo-typed behaviour)। সবশেষে, বলা যেতে পারে, এই তত্ত্বে শিশুর বংশগতির (Heredity) উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। এই সব কারণ হ'ল এর এই তত্ত্বকে খেলার যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না।

॥ পাঁচ ॥ প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব (Rivalry Theory):

এই তত্ত্বের প্রস্তাবক হ'লেন বিখ্যাত মনোবিদ্ ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall)। ম্যাক্‌ডুগাল তাঁর সংস্কারের (instinct) তত্ত্বের অংশ হিসেবে খেলার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকেই বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব বলা হয়। মানুষ তার মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতাকে খেলার মাধ্যমে প্রকাশ করে। তিনি মনে করেন,

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলো জন্মগত প্রবণতা আছে। এবং বিশেষ ভাবে শৈশবের বেশীর ভাগ আচরণই এই সব প্রবণতার দ্বারা চালিত হয়। মনোবিদ্যায় এই প্রবণতা (disposition) কথাটা এসেছে মানুষের আচরণের দুটো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সংব্যাখ্যান দিতে গিয়ে। একটা হ'ল আচরণের সমতা। বিশেষ বিশেষ প্রাণীকুলে, বিশেষ বিশেষ আচরণ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয়। এগুলোকে বলা হয় সমতাসম্পন্ন প্রতিক্রিয়া (Pattern reaction)। কোন বিশেষ এক শ্রেণীর সব প্রাণী নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে বা প্রতিক্রিয়া করে? নিশ্চয়ই তার মধ্যে এমন কোন সংগঠন আছে, যা তাদের বাধ্য করে এইভাবে প্রতিক্রয়া করতে। এই জৈব-মানসিক সংগঠনকে বা প্রবণতাকে ম্যাকৃডুগাল সংস্কার (instinct), অপর একদিক থেকে প্রবণতার (disposition) ধারণার প্রয়োজন ছিল, তা হ'ল তার আচরণের উদ্দেশ্যগত দিক বিশ্লেষণ করার জন্য। ম্যাকৃডুগাল বললেন, সব দেশের, সব কালের শিশুরা যখন খেলা করে, তখন তার জন্যও নিশ্চয়ই কোন প্রবণতা আছে। এবং তাঁর বিশ্লেষণ থেকে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা (Propensity of rivalry) থেকেই খেলার প্রকাশ। তবে স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা যখন খেলার পেছনে আছে তখন খেলা মানেই সাথীদের সঙ্গে মারামারি। ম্যাকৃডুগাল তারও সৎ উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা ও যুযুৎসার প্রবণতা (combative instinct) আলাদা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতার মধ্যে আত্মবিকাশের প্রচেষ্টা বা আত্মোন্নতির চেষ্টা আছে, কিন্তু যুযুৎসার মধ্যে আছে শত্রুকে ঘায়েল করার প্রবৃত্তি। তিনি বলেছেন—"The impulse of rivalry is to get the better of an opponent in some sort of struggle; but it differs from the combative impulse in that it does not prompt to, and does not find satisfaction in, the destruction of the opponet."

ম্যাকৃডুগালের এই তত্ত্বে মনোবিজ্ঞানসম্মত সংব্যাখ্যান থাকলেও খেলার প্রামাণিক তত্ত্ব হিসেবে বর্তমানে একেও গ্রহণ করা হয় না। তার কারণ, সব রকম খেলার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই তত্ত্বের দ্বারা দেওয়া যায় না। তাছাড়া বর্তমানে মনোবিদ্‌রা মনে করেন খেলা বিশেষ কোন সংস্কারের (instinct) বহিঃপ্রকাশ নয়। খেলার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়

তার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারগত চাহিদা (instinctive urge) চরিতার্থ হয়।

॥ ছয় ॥ বিরেচনবাদ (Cathartic Theory):

ক্যাথারসিস্ (Catharsis) কথাটা ডাক্তারী শাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। এর অর্থ হ'ল অন্তরের ময়লা পরিস্কার কথার পদ্ধতি। কিন্তু এই কথাটা ফ্রয়েড্ (Freud) তার মনোবিকলনের তত্বে (Psycho-analytic theory) বিশেষ এক অর্থে প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়ার (Primary process) পেছনে যে কৌশল কাজ করে তাকেই ফ্রয়েড্ বলেছেন বিরেচন (Catharsis)। মানুষের মনের অনেক আশা, আকাজ্ক্ষা ও চাহিদা আছে, যা তারা সমাজের অনুশাসনের জন্য স্বাভাবিক ভাবে চরিতার্থ করতে পারে না। এই ধরনের অসামাজিক চাহিদা বা আকাজ্ক্ষা (antisocial desire)-গুলোকে মানুষ অবচেতন মনে চাপা দিয়ে রাখে। কিন্তু অবচেতন মনে এই আকাজ্ক্ষাগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে না। তারা বিশেষ সংগঠনের মাধ্যমে গতীয় শক্তি (diriving force) লাভ করে এবং আমাদের প্রত্যক্ষ আচরণের মধ্যে বেরিয়ে এসে প্রকাশ পেতে চায়। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বাধা সব সময় তাদের প্রত্যক্ষ প্রকাশকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এমত অবস্থায় এই অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষাগুলো সমাজগ্রাহ্য কোন বস্তু বা প্রক্রিয়াকে কেন্দ্রে ক'রে পরোক্ষভাবে আমাদের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং এইভাবে তৃপ্তিলাভ ক'রে। এইভাবে কোন অতৃপ্ত অবদমিত আকাজ্ক্ষার (Repressed unfulfilled desire) প্রত্যক্ষ বস্তুকে ত্যাগ করে, অন্য সমাজগ্রাহ্য বস্তু বা আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার যে পদ্ধতি তাকে ফ্রয়েড্ বলেছেন প্রাথমিক প্রক্রিয়া (Primary Process)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী খেলাও এক ধরনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া। যেমন, স্বপ্নও প্রাথমিক প্রক্রিয়া। আর এর পেছনে যে কৌশল তাকেই বলা হ'চ্ছে বিরেচন। অর্থাৎ, খেলার মাধ্যমে আমরা মনের অনেক ময়লা পরিস্কার করতে পারি। খেলার মাধ্যমে আমরা অসামাজিক অতৃপ্ত আকাজ্ক্ষাকে চরিতার্থ করি। এই হ'ল এই তত্ত্বের মূল কথা। ফ্রয়েড্ এই তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবে সকল রকম আচরণের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন। খেলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এর প্রয়োগের পক্ষপাতী হলেন মনোবিদ্ রস (Ross)। তিনি এই তত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এবং যার মধ্যে কোন বাধা (restriction) নেই, তা শিক্ষারও অঙ্গ হ'তে পারে। প্রকৃত পক্ষে আধুনিককালে শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, খেলাকে শিক্ষার কাজে লাগতে পারলে, শিক্ষার কাজ অনেক সহজ হবে। তাই বর্তমানে তাঁরা একে শিক্ষাক্ষেত্রে একেধারে বর্জনীয় বলে স্বীকার করেন না। যদিও এই ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে খুব পুরাতন নয় তবুও এই অল্প সময়ের মধ্যে তা সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

খেলাভিত্তিক শিক্ষার মূল কথা হ'ল—খেলার মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য আছে, সেই সব বৈশিষ্ট্য শিক্ষার মধ্যে সংযোজিত করা। গতানুতিক ধারণা হ'ল— "কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা (work while you work, play whi!e you play)"। অর্থাৎ, দু'টোকে একত্রে মেশানো চলবে না। তাতে ক'রে কোনটাই সম্পূর্ণ হবে না। এই ছিল প্রচলিত ধারণা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন ঠিক এর উল্টো। তাঁরা বলেন "খেলার সঙ্গে কাজ, কাজের সঙ্গে খেলা (work while you play, play while you work)"। অর্থাৎ, শিক্ষা অথবা জীবনের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্য আনতে হবে এবং খেলার মাধ্যমে তাকে জীবনের কঠিন কর্মময় পরিস্থিতির সঙ্গে পরিচিত করতে হবে বা তাকে শিক্ষা দিতে হবে। এটাই হ'ল খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার মূল্য বক্তব্য। শিক্ষাবিদ্‌ ক্যাল্ডওয়েল কুক্‌ (Caldwell Cook) খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার (play-way) কথা প্রথম উল্লেখ করেন। তিনি নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখান কিভাবে খেলাকে শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়।

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে যায়। আমরা মনে করি এটা একটা বিশেষ ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতি (Teaching method) কিন্তু এটা আসলে তা নয়। যে-কোন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বা শিক্ষাপদ্ধতি যার মধ্যে খেলার মনোভাব, খেলার আনন্দ শিক্ষার্থী পায়, তাকেই আমরা খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা বলতে পারি। অধ্যাপক কে. কে মুখোপাধ্যায় এ সম্পর্কে তাঁর New Education and its Aspects বই-এ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"Strictly speaking play-way is not the name of one particular method of teaching but rather it may be called a general name for all modern psychological method that have the marks or charactaristics of play in them." তাই খেলা-ভিত্তিক শিক্ষাকে পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা না ক'রে শিক্ষাপদ্ধতির

তত্ত্বগত দিক হিসেবেই বিচেনা করা ভাল; বা, 'শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার তত্ত্ব' (Play-way principle in education)—এই ভাবে প্রকাশ করা ভাল। আধুনিক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতিতে আমরা এই খেলার উপাদান (Elements of play) দেখতে পাই। যেমন, ফ্রয়েবেলের 'কিণ্ডারগার্টেন', ডিউই পরিকল্পিত ও কিলপ্যাট্রিক প্রবর্তিত 'প্রোজেক্ট পদ্ধতি' (Project method), রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা' ইত্যাদি সবগুলোর মধ্যেই খেলার বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার কারণ কি? এর উত্তর খেলার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আছে। আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশু-কেন্দ্রিকতা, শিশুর আগ্রহ, অনুরাগ, ইচ্ছা, ক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছু বিবেচনা ক'রে, তার মনোমত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে খেলার বৈশিষ্ট্য হ'ল—স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক, সৃজনাত্মক-ক্রিয়া। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিশুর মধ্যে যা আসে তাতে স্বভাবতঃই শিশুরা আগ্রহশীল। সুতরাং শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার জন্য, শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক করার জন্য খেলাকেই কাজে লাগানো খুব সহজ হবে। দ্বিতীয়তঃ, খেলা যে শুধু নিছক অর্থহীন, দেহ সঞ্চালন তা নয়, সৃজনাত্মকও বটে। শিক্ষাও সৃজনীধর্মী, সুতরাং খেলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারলে, শিশুর সৃজনাত্মক স্পৃহা একদিকে যেমন চরিতার্থ হবে, অপর দিকে তাকে তার ব্যক্তিগত কল্যাণের কাজে লাগানো যাবে। তৃতীয়তঃ, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায়, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। খেলার মাধ্যমে শিশুর দেহ এবং মন উভয়ের বিকাশ সাধন হয়। তাই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা শিক্ষার মধ্যে খেলার উপাদান সংযোজনের পক্ষপাতী। সবশেষে, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে ব্যক্তিকে গড়ে তোলা; বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে সে যে বৃহত্তর কর্মজীবনে যাবে, তার যোগ্য ক'রে তাকে গড়ে তুলতে হবে। খেলা এই দিক থেকে সহায়তা করে। খেলাভিত্তিক শিক্ষাকাজের মধ্যে যে যান্ত্রিকতা মনোভাব আছে তার পরিবর্তে আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। ফলে কোন কিছুই তার কাছে বোঝা স্বরূপ মনে হয় না। সুতরাং খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা ব্যক্তিকে ভবিষ্যৎ কর্ম জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করার প্রশিক্ষণ দেয়, এবং গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে কর্মময় জীবনের ব্যবধানকে নিকটতর ক'রে তোলে। এই সব কারণেই আধুনিক শিক্ষাবিদরা-খেলা ভিত্তিক শিক্ষাকে, শিক্ষাক্ষেত্রে এক মূলনীতি হিসেবে স্বীকার করেছেন।

খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার উপকারিতা (Advantages of play-way Principle in Education) : শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করতে পারলে, আমাদের শিক্ষাদান কাজের অনেক সুবিধা হয়। শিক্ষাও ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক হয়। নীচে আমরা খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকটি উপকারিতার উল্লেখ করছি—

[এক] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের অনুকূল ব'লে, শিক্ষার্থীর কাছে তা বোঝাস্বরূপ মনে হয় না।

[দুই] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে শিশুরা আনন্দ পায়। ফলে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের সঙ্গে যে অভিজ্ঞতা আসে তা অনেক দিন স্থায়ী হয়।

[তিন] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষায় শিশু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা পায় ব'লে শিক্ষণ সঞ্চালনের (Transfer of Learning) কাজ অনেক সহজ হয় এবং এর জন্য কোন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

[চার] খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিশুর কৌতুহল, নির্মাণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলোকে সার্থকভাবে সমাজ-নির্দিষ্ট পথে বিকশিত করা যায়।

[পাঁচ] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিশুর ভয়, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি ক্ষতিকর আবেগ (Disruptive emotion)-গুলোকে সমাজনির্দিষ্ট পথে উদ্গমন করা সম্ভব হয়।

[ছয়] খেলার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক প্রবণতার বিকাশ সাধন করা যায়। সহযোগিতা, সমবেদনা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো শিশুর মধ্যে সহজে বিকাশ লাভ করে।

[সাত] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষায় শিশুর দলগত মনোভাবের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। দলের সঙ্গে একাত্মবোধের অনুভূতি জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ব-বোধের বিকাশ হয়।

[আট] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিতে যারা স্বল্পবুদ্ধি শিশু তারাও সহজ ভাবে পাঠ গ্রহণ করতে পারে।

[নয়] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষায় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অনুকরণমূলক শিক্ষণ (imitation learning) সংঘঠিত হয়। বিশেষভাবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষায়। এই ধরনের শিক্ষণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

[দশ] খেলা-ভিত্তিক শিক্ষায় শৃঙ্খলার (discipline) কোন বিশেষ সমস্যা থাকে না। স্বাভাবিক নিয়মেই স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজ করে

তাছাড়া আধুনিক শিক্ষায় শিশুর স্বাধীনতা (Freedom) দেওয়ার কথা বলা হ'য়েছে, খেলা-ভিত্তিক শিক্ষায় তার সুযোগ আছে। ফলে একঘেয়েমি, অবসাদ ইত্যাদির প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সহজে দূর করা যায়, যদি আমরা খেলা-ভিত্তিক করতে পারি শিক্ষাকে।

শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার উপায় (Means of installing play-way element in Education): শিক্ষার মধ্যে খেলার বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করতে হ'লে শিক্ষকদের সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, যে-কোন শিক্ষাপদ্ধতি শিক্ষক গ্রহণ করুন না কেন, তাকে খেলা-ভিত্তিক ক'রে তোলা যায়। শিক্ষাকে খেলা-ভিত্তিক করার জন্য শিক্ষক বিশেষ কয়েকটি দিকে নজর দিবেন।

[এক] শিক্ষায় খেলার আনন্দ আনতে হ'লে পাঠ্যক্রম শিশুর আগ্রহ ও অনুরাগের কথা বিবেচনা করে নির্ধারণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে, যার অনুশীলনের মাধ্যমে শিশু তার প্রয়োজনের অনুকূল অভিজ্ঞতা পায়।

[দুই] যে সব পাঠ শিশুদের মানসিক সামর্থ্যের উপযোগী নয়, তা দেখে শিশুরা আনন্দ পায় না। শিক্ষার মধ্যে খেলার আনন্দ আনতে হ'লে শিক্ষার্থীকে এমন সমস্যার সম্মুখীন করতে হবে, যা তারা মানসিক ক্ষমতার দ্বারা সমাধান করতে পারে। কোন বিষয়ে বারবার অকৃতকার্য হ'লে তার থেকে তার আগ্রহ চলে যায়।

[তিন] যে সব বিষয় আমরা শিশুকে শেখাতে চাই তা যেন শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই সে রকম জিনিস শিশুকে শেখাতে গেলে তার মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা যাবে না। ফলে শিক্ষণ পরিস্থিতি কৃত্রিম হ'য়ে পড়বে।

[চার] বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং সংগঠন শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশের উপযোগী হওয়ার দরকার। সে যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় কাজ করার সে ব্যবস্থা করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের দলগত কর্মপ্রচেষ্টা হাতে নিতে হবে, যার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক গুণের বিকাশ হবে। বিভিন্ন ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার অন্তর্গত কাজ যাতে তারা স্বাধীন ভাবে সমাধান করতে পারে তার সুযোগ দিতে হবে। শ্রেণী কক্ষের বাইরে মুক্ত পরিবেশে যাতে শিশুরা কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে।

[পাঁচ] শিক্ষার মধ্যে খেলার আনন্দ সংযোজন করতে হ'লে আদর্শ ধরনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব বজায় রেখে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পান সেই রকম আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষক, শিক্ষার্থীর বন্ধু হিসেবে কাজ করবেন। প্রয়োজন বোধে তাদের সাহায্য করবেন।

[ছয়] শিশুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না ক'রে, স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা স্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজধর্মী পরিবেশ এবং শিক্ষকের সমবেদনামূলক মনোভাব এই কাজে সহায়তা করবে।

এই সমস্ত দিকে নজর রেখে শিক্ষক যদি বিদ্যালয় পরিচালনা ও পাঠদানের কাজ পরিচালনা করেন, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক ভাবে আনন্দলাভ করবে এবং তিনি যে-কোন ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করুন না কেন, তা শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকতা এনে দেবে।

প্রশ্নাবলী

1. **Examine critically the Cathartic Theory of Play.** [C. U. B. T. '66]

Ans : ২১৩—২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. **"The whole education should be conducted in the spirit of play"— Elucidate.** [C. U., B. A '65]

Ans : ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. **How do you distinguish between play and work ? What is drudgery ? Write short note on play-way in Education.** [C. U., B. T. '64, N. B. U., B. T. '69]

Ans : ২০৩ হইতে ২০৬ পৃষ্ঠা ; ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. **"In the understanding of play lies the key to all educational problens, —Discuss** [N.B. U. B T. '68]

Ans : ২০০ হইতে ২০২ পৃষ্ঠা ; ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. **"By means of play, the child expands in joy as the flower expands when it proceeds from the bud for joy is the soul of all actions of that age." Elucidate the statement and discuss the educational value of play.** [C. U , B. T. '60]

Ans : ২০০ হইতে ২০২ পৃষ্ঠা ; ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

6. It is said that our school should be place in which work is play and play is life : three in one and one in three.—Elucidate [C.U , B T. '5৭ '62]

Ans : ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

7. Write short essay on Playway in education—its merits and short-comings. [N. B., U B.T. '67]

Ans : ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. What do you mean by play-way in Education ? Illustrate your answer with example. [C. U., B.A. '60, '64]

Ans : ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

9. Write a short essay on : Play-way. [C. U., B. A '62, N. B,U,. B. T. '63]

Ans : ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

10. Enumerate the psyclological characteristics of play as distinguished from work. What do you understand by play-way in Education. [C U. B A '66, '68]

Ans : ২০০ হইতে ২০২ পৃষ্ঠা ; ২১৫ হইতে ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

11. Critically discuss the various theories of play. How will you reconcile them ?

Ans : ২০৬ হইতে ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চৌদ্দ

শিক্ষায় সক্রিয়তাবাদ

Activity Principle in Education

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে চিন্তাধারা শিক্ষা জগতকে প্রভাবিত করছিল, তার মূলে এই মতবাদই ছিল যে—মনোময় জগতই প্রকৃত জগত ; মিথ্যা ছায়া মাত্র। তাই প্রাচীন শিক্ষার ব্যবস্থায় আমরা মানসিক বৃত্তির কৃত্রিম উৎকর্ষণের চেষ্টা দেখতে পাই। ভাববাদী দর্শনের প্রভাবে পৃথিবীর সকল দেশই এক সময় আচ্ছন্ন ছিল এবং তারই প্রভাবে শিক্ষাকে একটা অতি মানবীয় বস্তু জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হ'ত। এই শিক্ষার মূল নীতি হ'ল মানুষের মনকে জ্ঞানের বোঝায় ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে হবে, মানুষ এতদিনের প্রচেষ্টায় জীবনের যে মূলসূত্রগুলো আবিষ্কার করেছে, তা দিয়ে শিশুকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলতে হবে। সে শিক্ষা তার জীবনে কিছু কাজে আসুক বা না আসুক এবোঝা তাকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হবে, এই হ'ল গতানুগতিক শিক্ষার মূলনীতি।

এই প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ প্রথম জানালেন উনবিংশ শতাব্দীতে রুশো। তিনি তাঁর 'এমিলের' জন্য শিক্ষা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন যে, শিক্ষাব্যবস্থায় আসল ব্যক্তি শিশু যখন নিষ্ক্রিয়, সে শিক্ষার কোন মূল্য থাকতে পারে না। তিনি ঘোষণা করলেন, শিক্ষায় শিশুর স্বাভাবিক অঙ্গ সঞ্চালনকে যদি বাধা দেওয়া হয়, তার দ্বারা সার্থক জীবন বিকাশ হবে না। পরিবেশের মধ্যে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে শিখবে শিশুরা, তার জন্য কোন বাধা থাকবে না, বা তার উপর কোন ইচ্ছা জোর করে চাপানো হবে না। রুশোর পরবর্তী কালে শিক্ষার উপকরণ নির্বাচনে যেমন এক নতুন ধারার সৃষ্টি হ'য়েছে, তেমনি, শিক্ষার পদ্ধতিও নির্বাচনে নতুন ধারার প্রবর্তন হ'য়েছে। এক দিকে শিশুকে কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে স্থির ক'রে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা তার আপন বৈশিষ্ট্যকে যেমন প্রকাশ করেছে, তেমনি সক্রিয়তাকে শিক্ষার মূল নীতি হিসেবে গ্রহণ ক'রে, শিশুর শিক্ষাকে পরিপূর্ণতার পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে।

রুশোর অনুগামী প্রায় সকল শিক্ষাবিদ্‌ই সক্রিয়তাবাদকে শিক্ষার মূলনীতি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পেস্তালৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরী, হার্বার্ট, ডিউই প্রত্যেকই এই সক্রিয়তার উপর জোর দিয়েছেন। গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষাও সক্রিয়তাবাদের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। গান্ধীজি গতানুগতিক শিক্ষার সমালোচনা ক'রে সক্রিয়তাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেছেন—"We have upto now concentrated on stuffing children's minds with all kinds of information, without even thinking of stimulating or developing them. Let us now cry a halt and concentrate or educating the child properly through manual work ; not as a side activity but as a prime means of intellectual activity." ফ্রয়েবেল আত্মক্রিয়াকে (self-activity) একমাত্র শিক্ষার পদ্ধতি বলে বর্ণনা করেছেন। মন্তেস্বরীও স্বয়ং শিক্ষকের (auto-education) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ডিউইও তার সমস্ত শিক্ষাদর্শনের মধ্যে এই সক্রিতার মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে একতালে এক সুরে। সেটা ক্লাশ নামধারী খোঁচার জিনিস হবে না।" এমনিভাবে আধুনিক সকল শিক্ষাবিদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই তারা বিশেষভাবে শিশুর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এর থেকে আমরা বলতে পারি আধুনিক শিক্ষা যে শুধু শিশু-কেন্দ্রিক তাই না ; শিশু সক্রিয়তার যুগও বটে। এখন প্রশ্ন হ'ল শিক্ষায় সক্রিয়তা বলতে আমরা কি বুঝি ?

সক্রিয়তাবাদ কি ? (What is activity Principle) : সক্রিয়তাবাদের মূল কথা হ'ল মানুষ যান্ত্রিক সত্তা নয় ; সে জীবনীশক্তি সম্পন্ন জীব। তার মধ্যে স্বাধীন অহংসত্তা সবসময় ক্রিয়াশীল, নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত। তার জীবন বিকাশের মূল প্রক্রিয়া হ'ল আত্ম-অভিযোজন (self adjustment)। নিজের ইচ্ছার সক্রিয়তা সে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনে আগ্রহশীল, আর তার মাধ্যমেই শিক্ষা ও আত্মবিকাশ। সুতরাং তার জীবন বিকাশের মূলে আছে, প্রত্যক্ষ বস্তুজগতের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ ; নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানলাভ। সে স্বাভাবিক ভাবে হাতে কলমে কাজ ক'রে বিশ্ব জগতকে জানতে চায়। সুতরাং তার শিক্ষাও হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। জন্ ডিউই বলেছেন "Life is a byproduct of activities

and education is born out of these activities" কর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে, আর ব্যক্তি সত্তার বিকাশ হ'লেই শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে। এই হ'ল সক্রিয়তাবাদের মূল বক্তব্য। তাহ'লে শিক্ষায় সক্রিয়তা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষা হবে উদ্দেশ্যপূর্ণ কোন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যম (concrete and productive activity)। এই কর্মসম্পাদন কালেই শিশু শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখী, আচরণ, দক্ষতা, অভ্যাস এবং আদর্শ লাভ করবে।

শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ততা, সক্রিয়তাবাদের মূল কথা। শিশু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে, আনন্দের সঙ্গে, কাজে যোগদান করবে এবং কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিখবে। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার (Play-way principle) সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে, শিক্ষার্থীকে যে অবধি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, এই দুই তত্ত্ব তারই মূল নীতিতে বিশ্বাসী। খেলার মধ্যে যেমন শিশু কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না, তার স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি, কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশু তার স্বাভাবিক প্রবণতার বশবর্তী হ'য়েই কাজে হাত দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষা উপজাত ফল (By product) মাত্র। খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল খেলা; আর কর্মভিত্তিক শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল 'কাজ'। সুতরাং খেলাভিত্তিক শিক্ষাকে সক্রিয় কর্মভিত্তিক শিক্ষার একটা বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তাহ'লে সক্রিয়তা মূল্য বৈশিষ্ট্য হল :

(১) সক্রিয়বাদ অনুযায়ী শিক্ষা হবে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত কোন 'কর্ম' কেন্দ্রিক।

(২) সক্রিয়বাদ অনুযায়ী বিশেষ কর্মটি হবে উৎপাদনমূলক (Productive)। এইজন্য একে অনেক সময় উৎপাদন ভিত্তিক শিক্ষা তত্ত্বও (Productive principle) বলা হয়।

(৩) শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা-ভিত্তিক কর্ম নির্বাচন করা হবে।

(৪) এই মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা হবে উপজাত ফল (By product) মাত্র।

(৫) এতে শিশুর কাজ করার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হবে না, এবং আনন্দপূর্ণ পরিবেশে সে কাজ করবে।

(৬) সক্রিয়তাবাদের সঙ্গে খেলা-ভিত্তিক শিক্ষার কোন তফাৎ নেই।

সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological basis of Activity centred Education) : শিক্ষায় সক্রিয়তাবাদ মনোবিদ্যার আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত। আপাতঃভাবে আলোচনা

করলেই বোঝা যায় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে, এই মতবাদ শিশুর স্বাভাবজ দেহ সঞ্চালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে এই মতবাদে। শিশু বা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক যে-কোন শিক্ষণ পরিকল্পনা মনোবিজ্ঞার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সক্রিয়তাবাদের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি, বিভিন্ন দিক থেকে এর উপযোগিতা আমরা দেখতে পাই।

[এক] প্রাচীন দার্শনিকদের চিন্তাধারায় দেখতে পাই এবং আধুনিক মনোবিদ্‌রাও স্বীকার করেন, সুস্থ মন সুস্থ দেহের সঙ্গে সহাবস্থান করে। দেহ এবং মনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্কের কথা আধুনিক মনোবিদ্‌রাও স্বীকার করেন। সক্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট কোন কাজ সম্পাদন করে। এই কাজ করতে গেলে তার অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। যে কৃষি-সংক্রান্ত কাজই হোক বা কারখানার সরঞ্জাম নিয়ে কাজ হোক, প্রত্যেক কাজেই অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়, এর মাধ্যমেই দেহের পুষ্টি সাধন হয়। এই কাজের মাধ্যমে তার স্নায়ুমণ্ডলীর কাজের সক্রিয়তা বাড়ে এবং তা তার জ্ঞান আহরণে সহায়তা করে। কারণ বিভিন্ন ইন্দ্রিয় (Sense organ) এবং স্নায়ু মণ্ডলীর মাধ্যমেই আমরা বহির্জগতের জ্ঞান আহরণ করি।

[দুই] শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সংস্কার জাত প্রবণতা (Instinctive urge)-গুলো আছে সেগুলোকে সার্থক উদ্গমন (Sublimation) করা। যে-সব প্রবণতা তার ব্যক্তি-জীবনের পক্ষে ভাল তাদের বিকাশ করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এই দু'দিক থেকে সহায়তা করে। প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের কৌতূহল, (Curiosity), নির্মাণ (Construction), সংগ্রহ (Acquisition) ইত্যাদি প্রবণতাগুলোকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পায়। কাজের মাধ্যমে শুধু যে এই সব প্রবণতার শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ হয় তাই নয়, নতুন ধরনের প্রেষণা শক্তিও তার মধ্যে জাগ্রত হয়। কারণ, কোন প্রবণতার তাড়নায় তখন স্বাভাবিক ভাবে যে-কোন কাজ বেছে নিয়ে তা সার্থক ভাবে সম্পাদন করে, তখনই, তার মধ্যে সফলতার আনন্দ আসে, এবং এই আনন্দ তার মধ্যে নতুন প্রেষণা শক্তি (Motivation) জোগায়। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রের মূল প্রয়োজনীয় যে উপাদান প্রেষণা তা স্বাভাবিক ভাবে জাগ্রত হয় যদি সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করি।

[তিন] কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষার্থীর মনে আবেগমূলক তৃপ্তি (Emotional satisfaction) আনা সম্ভব হয়। শিশুদের আবেগমূলক আচরণের (Emotional behaviour) স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে বাধা দিলে তারা ক্ষুব্ধ হয়। শিক্ষার্থীর শ্রেণী কক্ষে হাসা বারণ গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। এই ধরনের বাধা, তার আবেগময় জীবনের সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা গরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল আবেগময় জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ (Emotional maturity)। আর শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে শিক্ষার্থীর আবেগমূলক পরিপক্কতা আনতে হবে; এবং তা বাইরে থেকে বাধার বা নিষেধের দ্বারা সম্ভব হবে না। তার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক প্রকাশের মাধ্যমেই আবেগমূলক আচরণের পরিপকতা আসবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা, শিশুর আবেগকে সহজ ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ ক'রে দেয়।

[চার] শিক্ষণের যে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির কথা বলা হ'য়েছে মনোবিদ্যায়, যেমন—অনুকরণ (Imitation), ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টা (Trial and error), অন্তর্দৃষ্টি (Insight), ইত্যাদির প্রত্যেকটিকে সক্রিয়তা-ভিত্তিক করা যায়। মনোবিদ্‌রা এই সব পদ্ধতি বিশ্লেষণ করার জন্য যে-সব পরীক্ষার উল্লেখ করেছেন, তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই ধরনের পদ্ধতি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সমস্যামূলক পরিস্থিতিতেই প্রয়োজ্য। সক্রিয়তাবাদে যে কাজের কথা বলা হ'চ্ছে তাও এক ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতি। সুতরাং মনোবিদ্যাসম্মত শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ রচনা করতে হ'লে, কর্মময় পরিস্থিতির একান্ত প্রয়োজন, যে পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর সামনে একটা সমস্যা তুলে ধরবে। সুতরাং, এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা মনোবিদ্যাসম্মত শিক্ষণের (Learning) পরিপন্থী। বিখ্যাত মনোবিদ্ থর্ণডাইক (Thorndike) তাঁর ভ্রান্তি প্রচেষ্টার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, প্রত্যক্ষ কর্ম-ভিত্তিক অভিজ্ঞতাকে (Learning by doing) শিক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করছেন।

[পাঁচ] থর্ণডাইক তার ফললাভের সূত্রে (Law of effect) বলেছেন শিক্ষণ সার্থক হয় যখন ফল ভাল হয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ফল অবগত করে। তারা নিজেরাই নিজেদের কর্মের ফল জানতে পারে। কোন কাজ করতে গেলে তা যদি সে সার্থকভাবে করতে পারে, স্বাভাবিক ভাবে সেই কাজ তার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করবে, তাকে আরো নতুন কাজে হাত দেওয়ার

জন্য প্রেষণা শক্তি (Motivation) জোগাবে। বিখ্যাত মনোবিদ্ গ্যারেট (Garrett) বলেছেন—"Learning is a function of motive incentive condition". উদ্‌বোধক (Incentive) শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা (Motive) সৃষ্টি করে ; এবং প্রেষণার তাড়নায়ই ব্যক্তি নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে অভিযোজন করতে চায় ; তার ফলেই তার শিক্ষণ (Learning) হয়। সক্রিয়বাদেরও মূল কথা হ'ল কাজ, যার প্রতি শিশু স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট তা উদ্‌বোধকের কাজ ক'রে তার মধ্যে প্রেষণা শক্তি সৃষ্টি করবে শিক্ষার জন্য। সুতরাং, এ দিক থেকেও সক্রিয়তাবাদ মনোবিজ্ঞান সম্মত।

[ছয়] মনোবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষে মানুষে পার্থক্য বর্তমান। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (individual difference) প্রকৃতির নিয়ম। কোন বিশেষ শ্রেণীতে এমন অনেক ছাত্র আছে, যারা উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ; স্বাভাবিক ভাবে তারা হয়তো গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিমূর্ত জ্ঞান (abstract knowledge) গ্রহণ করতে সক্ষম। কিন্তু সেই শ্রেণীতে অনেক ছাত্র আছে যারা স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তারা সহজ ভাবে কোন বিমূর্ত জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেই সব জ্ঞান যদি পরিবেশন না করা হয়, তারা তা গ্রহণ করতে পারে না। তাই সাধারণের সুবিধার জন্য বিমূর্ত জ্ঞানকে বস্তুধর্মী করার দরকার। যার জন্য মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—"From concrete to the abstract". কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা বিমূর্ত জ্ঞানকে বস্তুধর্মী ক'রে শিশু মনের উপযোগী ক'রে, পরিবেশন করতে সহায়তা করে।

[সাত] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য থাকার জন্য তা শিশুদের মধ্যে সহজে বিরক্তি (Boredom), একঘেঁয়েমি (Monotony) বা মানসিক অবসাদ (Mental fatigue) আনে না। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এগুলো বিশেষ সমস্যা হিসেবে দাঁড়ায়, যা মনোবিদ্‌দের সমাধান করতে হয়, নানা রকম পরোক্ষ পদ্ধতিতে।

[আট] মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন—"The workshop is undoubtedly a character building institution". সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষায় শৃঙ্খলার কোন সমস্যাই থাকে না। উচ্ছৃঙ্খলতা আসে অতৃপ্তি বা ব্যর্থতা (Frustration) থেকে। কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় সেই ধরনের কোন সুযোগ নেই। বিভিন্ন ধরনের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুরা নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ পায়। ফলে শৃঙ্খলা স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এসে যায়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"The progress that the child makes in the use of his limbs gives it a sense of joy and fulfilment, a feeling that is essential to the growth of every boy and girl......and when one is compelled merely to listen passively without any opportunity of self-expression, outbursts of indiscipline occur." মনোবৈজ্ঞানিক দিক থেকে শৃঙ্খলার মূল কথা হ'ল—আত্ম-বিকাশ (Self-expression), আত্মতৃপ্তি (Self-satisfaction) এবং স্বাধীনতা (Freedom)। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা এর সবগুলোই দিতে সক্ষম।

[নয়] শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন; বক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। তার এই বিকাশের মধ্যে পড়ে দেহ এবং মন উভয়েই। একমাত্র কর্মকেন্দ্রিক সক্রিয় শিক্ষাই ব্যক্তির এই পরিপূর্ণ বিকাশের দায়িত্ব বহন করতে পারে। শিশু সক্রিয়তার দ্বারাই তার দেহ ও মনের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিকাশে তাই এই পদ্ধতি বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। আধুনিক কালে সব চিন্তাবিদই একথা স্বীকার করেন। কার্ল মার্কস্ (Karl Marx), যিনি আধুনিক সমাজ চিন্তার ইতিহাসে এক বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করছেন, তিনিও বলেছেন—"The education of the future will, in the case of every child over a certain age, combine productive labour with education and athletics not merely as one of the methods of raising social production but as the only methods of producing fully developed human being."

সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষার সমাজবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Sociological basis of Activity-centred Education) : সক্রিয়তাবাদ যে কেবলমাত্র মনোবিদ্যার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তা নয়, এই শিক্ষাধারা সমাজ বিজ্ঞানের উন্নত আদর্শের উপরও প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের কল্যাণ সাধন করা। ব্যক্তির উন্নতি এবং সমাজের অগ্রগতি উভয়েই আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সমাজের দিকের কথাও বিশেষভাবে বিবেচনা করে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় পরস্পরের উপর শ্রদ্ধা রেখে বাস করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করে এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। সমাজ জীবনে সুষ্ঠুভাবে বাস করার জন্য যে সব মানসিক ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য থাকার

দরকার তার প্রত্যেকটির অনুশীলন করা হয় এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় সামাজিক উপযোগিতার কয়েকটা দিক সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করছি।

[এক] সুস্থ সমাজ জীবনের সবচেয়ে বেশী দরকার সহযোগিতামূলক সহ-অবস্থান। কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই সহযোগিতার প্রশিক্ষণ পায়। একত্রে মিলেমিশে তারা বিশেষ কোন কাজ সমাধান করে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবের বিকাশ লাভ করে। এই সহযোগিতার মনোভাব তারা পরবর্তিকালে সমাজ জীবনের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যায়। এই ধরনের কাজের মধ্যে তারা আনন্দ পায়। একজনের বোঝা আর একজন সহজভাবে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। বি জি খের বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, 'কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সুন্দর ব্যক্তি—সমাজ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

[দুই] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ছোট বেলা থেকে শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে শিশুদের সচেতন করে। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী জাতীয় উৎপাদনে সহায়তা করা। কিন্তু গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের মধ্যে কর্মবিমুখতা এনে দেয়। শিক্ষার পদ্ধতি যদি সক্রিয় হয়, তবে তার মাধ্যমে শিশুরা বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ লাভ করে, যা তার ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। এই ধরনের শিক্ষা সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে ভেদ আছে, তা দূর ক'রে সামাগ্রিক ভাবে সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

[তিন] আধুনিক কালে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছে, এই পদ্ধতি তার গতিকে ত্বরান্বিত করবে। শিক্ষায় গণতান্ত্রিকতার মূল কথা হ'ল শিক্ষা কোন বিশেষ এক শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শিক্ষা সকলকে দিতে হবে এবং সকলেরই তা পাওয়ার অধিকার আছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা সহজ ভাবে সকলের মনের উপযোগী ক'রে পরিবেশন করা যায়। জাকির হুসেন বলেছিলেন—"Under democratic and socialistic pattern of society, education has to meet the needs of everybody, and as such, productive and socially useful work should be the chief instrument of universal education." এবং এই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছিল।

[চার] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের বেকার সমস্যা সহজ ভাবে দূর করা যায়। শিক্ষা যদি জীবনের উপযোগী হয় তাহ'লে তা ব্যক্তিকে তার জীবিকা উপার্জনে সহায়তা করবে। শিক্ষা সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা এবং শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মবিমুখতা বেকার সমস্যার কারণ। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে যথাযোগ্য কর্মভাব (work attitude) জাগিয়ে তুলবে।

[পাঁচ] কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে শহরের জীবনের সঙ্গে গ্রামীন জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করে। আমাদের দেশে গ্রামীন জীবনের সঙ্গে শহরের জীবনের যে পার্থক্য আছে, কেবলমাত্র যোগ্য কর্মভার উদ্বুদ্ধ ক'রে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। যারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা যেমন কাজ করছে, আবার যারা কল-কারখানায় কাজ করছে, তারাও তেমনি কাজ করছে, এই মনোভাব জাগ্রত করতে না পারলে জাতীয় সংহতি ব্যাহত হবে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগ্য মনোভাব সৃষ্টি ক'রে এই ধরনের বিভেদমূলক চিন্তা দূর করতে পারে।

॥ আলোচনা ॥

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে কোন বাধা নেই যে, সক্রিয়তাবাদ শিক্ষা ক্ষেত্রে এক সার্থক সংযোজন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে তার শিক্ষাকে মনোবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা সম্মত করতে সক্রিয়বাদই একমাত্র পারে। মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী এবং তার মনোধর্মী শিক্ষা পদ্ধতি রচনা ক'রে, এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে মানববাদের আন্দোলন (Humanism) গড়ে তুলেছে, তা যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই কারণে এই মতবাদ আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। ডিউই-র ল্যাবরেটরী স্কুল, আমেরিকার প্রোগ্রেসিভ্ এসোসিয়েশনের Thirty School Experiment, রাশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মমূলক অভিজ্ঞতার তত্ত্ব (work experience), গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা,—এই তত্ত্বের সর্বজনীন আবেদনই প্রমাণ করে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (রাধাকৃষ্ণন), মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার) এবং ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের (কোঠারী) রিপোর্টে এই মতবাদকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে কর্মমূলক অভিজ্ঞতাকে (work-experience) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হ'য়েছে।

কিন্তু সক্রিয়তাবাদ যে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন সে কথা বলা যায় না। কর্মকেন্দ্রিক

শিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রম রচনার খুবই অসুবিধা আছে। কারণ বিশেষ কোন কাজকে কেন্দ্র ক'রে সম্পূর্ণ জ্ঞানকে সমন্বিত করা খুবই মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। এসম্পর্কে আমরা পাঠ্যক্রম আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। তাছাড়া এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা সকল স্তরের শিক্ষার পক্ষে উপযোগী নয়। প্রাথমিক স্তরে এই ধরনের পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দ আনতে পারে এবং শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে শুধুমাত্র কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যক্তির জ্ঞানকে খুব সীমাবদ্ধ ক'রে তুলবে। আবার এই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করলে পাঠ গ্রহণে অনেক বেশী সময় লাগে। জীবনের সীমিত পরিসরের মধ্যে আমরা যদি সম্পূর্ণ ভাবে এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করি, তাহ'লে শিক্ষার সময় কাল অনেক বেড়ে যাবে। এটা ব্যক্তি ও সমাজ কারো দিক থেকে কাম্য নয়। তাই ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় কর্মভিত্তিক শিক্ষা বা সক্রিয়তার তত্ত্বের অনেক অসুবিধা আছে।

ব্যবহারিক অসুবিধা থাকলেও একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি সক্রিয়তাবাদ শিক্ষার ইতিহাসে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এর মাধ্যমেই জীবনের তত্ত্বগত দিক ও ব্যবহারিক দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। সুন্দর পরিবেশে, সুশিক্ষকের পরিচালনায়, সুপরিকল্পিত পথে যদি সক্রিয়তাকে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তবে তা শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটিকে দূর করতে পারবে, তার যে ত্রুটির দিক আছে, তাকে আমরা দূর করতে পারি যদি শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন না ক'রে, তার পরিপূরক হিসেবে এই তত্ত্বকে ব্যবহার করি।

প্রশ্নাবলী

1. What is the ideology of activity education? What kinds of activities do you advocate in secondary schools? [C U., B T. '64]

Ans : ২২২ হইতে ২২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ; সক্রিয়তা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম।

2. What do you understand by activity principle in education? Why are children intrinsically interested in activity methods? [C. U., B. A '66]

Ans : ২২২ হইতে ২২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. The subjects of the curriculum are to be taught as activities Discuss stressing the need for activity principle in education. [C. U, B. T. '66]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

4. What is meant by activity principle in education? Discuss the psychological and sociological basis of such a principle.

Ans : ২২২ হইতে ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. Discuss what you know about activity movement in education. What sociological advantages are derived from such a principle.

Ans : ২২২—২২৪ পৃষ্ঠা ; ২২২ হইতে ২৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষণ-পদ্ধতি

Methods of Teaching

শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠ্যক্রম। এছাড়া শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণও শিক্ষাক্ষেত্রে সফলতার একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষার বিভিন্ন দিকে যেমন আধুনিক চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ হয়েছে তেমনি তার পদ্ধতির দিকেরও হ'য়েছে। ফলে পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা আমাদের বদলেছে এবং বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হ'য়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী শিক্ষকের কাজ হ'ল জ্ঞান ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। এই সংস্থাপনের জন্য যে প্রক্রিয়া শিক্ষক অনুসরণ করেন তাই হ'ল পদ্ধতি (Method)। এক কথায় পদ্ধতি শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া। রাস্ক (Rusk) একে "The process of establishing and maintaining contact between the pupil and the subject-matter" ব'লে সংজ্ঞা দিয়েছেন। সুতরাং, শিক্ষণ পদ্ধতি (Method of teaching) আমরা তাকেই বলবো যা শিক্ষার্থীর সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ সাধন করে। এটা শুধুমাত্র শিক্ষকের প্রচেষ্টা নয়। যে প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষার্থী জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী না হয় সে প্রক্রিয়াকে আমরা পদ্ধতি বলবো না।

শিক্ষণ পদ্ধতির বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে দেখতে পাই, এই পদ্ধতি মনের ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতে মন হ'ল কতকগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ শক্তির দ্বারা গঠিত, এবং শিক্ষার মাধ্যমে তাদের উৎকর্ষণ করাই হ'ল শিক্ষকের কাজ। সুতরাং পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য ছিল চর্চা করা। সে চর্চা হ'ল বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে মানসিক ক্ষমতার চর্চা। কিন্তু আধুনিক কালে মন সম্বন্ধে ধারণা বদলেছে। মন হ'ল সামগ্রিক সত্তা এবং মনের অভিজ্ঞতাও সামগ্রিক সুসামঞ্জস রূপ নিয়েই থাকে। বস্তুজগৎ থেকে আমরা খণ্ড অভিজ্ঞতা গ্রহণ করি না, সামগ্রিক অভিজ্ঞতাই গ্রহণ করি। গেস্টাল্ট মতবাদীরা বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। সুতরাং এই যদি

মনের ধর্ম হয়, তবে পদ্ধতিকেও সামগ্রিক রূপ নিতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। কিন্তু শিক্ষক পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই মতবাদ প্রয়োগের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। কারণ, শিশুদের মন অপরিপক্ক, তার সমস্ত কিছু জ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের পক্ষে জ্ঞানকে সুসংবদ্ধভাবে যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। যদিও আদর্শগত দিক থেকে এই পদ্ধতি বাঞ্ছনীয় তবুও ব্যবহারিক দিক থেকে এর অসুবিধা আছে। তাই আধুনিক কালে, আমরা দেখতে পাই পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার প্রচেষ্টা। এই কারণে দু'ধরনের শিক্ষণ পদ্ধতির আবির্ভাব হ'য়েছে—তর্কবিদ্যা সম্মত পদ্ধতি (Logical method) এবং মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি (Psychological method)। এখন আমরা এদের তুলনামূলক আলোচনা করবো।

তর্কবিদ্যা-সম্মত ও মনোবিদ্যা-সম্মত পদ্ধতি (Logical and Psychological Method): তর্কবিদ্যার নীতির উপর ভিত্তি ক'রে যে শিক্ষণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে, যা ঘটছে, যা হচ্ছে, তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। যা হওয়া উচিত সে দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা হয়; শিক্ষার্থীর যুক্তিশক্তিকে বা বিচার করার ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয় যে পদ্ধতিতে তাকেই বলা হ'চ্ছে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় (K. K. Mookherjee) তার New Education and its Aspects বই-এ যে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির সংজ্ঞা দিয়েছেন—"The logical method is one which is based upon the nature of knowledge." এখানে শিক্ষার্থীর বিচারশক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষক এই পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু সুসংবদ্ধভাবে পর পর ছাত্রদের কাছে উপস্থাপন করেন। ফলে, শিক্ষার্থীর মন পরিপক্ক না হওয়ার জন্য সব সময় সে জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে না এই পদ্ধতিতে। অপর দিকে মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়া এবং চাহিদার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনের প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেছেন—"The Psychological method, therefore, directs us to take the child mind as it is, and starts from the normal nature and capacities of children as we find them actually."

তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে কোন বিকৃতি না ক'রে শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু আমাদের পাঠ্য বিষয়ে এমন অনেক ধারণা আছে, যা এতই বিমূর্ত যে, শিশু মনের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ অপরিণত শিশুমন সহজে বিমূর্ত জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। তাই তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিশুর পক্ষে উপযোগী হয় না। অন্যদিকে মনোবিদ্যা সম্মত পদ্ধতিতে শিশুর মনের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা ক'রে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে, মূর্ত বস্তুর মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করতে পারে। তাই তাকে বিমূর্ত-জ্ঞান দিতে হ'লে মূর্ত বস্তুর (Concrete object) সাহায্য নিতে হবে। গণিতে সংখ্যা সম্বন্ধে ধারণা দিতে হ'লে তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি অনুযায়ী পর পর কতকগুলো শব্দ (এক, দুই তিন....) এবং তার সঙ্গে সংকেতগুলোর (১, ২, ৩...) সমন্বয় করবো মৌখিক চর্চার মাধ্যমে। কিন্তু এগুলো আসলে বিমূর্ত ধারণা। শিশুরা মুখস্থ করে ঠিকই, অর্থ তার কাছে বোধগম্য নয়। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে আমরা একটা, দুটো তিনটে বস্তু দেখিয়ে তাদের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবো। তাই মনোবিদ্যা সম্মত পদ্ধতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল বিমূর্ত জ্ঞানকে বস্তু-কেন্দ্রিক ক'রে মূর্ত করা (Concretization)। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত সংখ্যা নিয়েই নাড়াচাড়া করতে হবে এবং বিমূর্ত বস্তু সম্বন্ধে ধারণা স্থাপন করতে হবে। তাই মনোবিদ্যা-সম্মত পদ্ধতিতে আমরা প্রাথমিক কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিশুমনের বিশেষ উপযোগী। তাই আধুনিক শিক্ষার একটি নীতি হ'ল—"Concrete to abstract"।

তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামনে এমন জ্ঞান উপস্থিত করা হয়, যার সঙ্গে তাদের, প্রত্যক্ষ জীবনের কোন যোগাযোগ থাকে না বা তার পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই সেই জ্ঞানের। ফলে এই ধরনের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার পক্ষে অসুবিধা হয়। সে তার মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না। ফলে সব কিছুই তার কাছে বোঝাস্বরূপ মনে হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী শিক্ষণ হয় অভিজ্ঞতার পরিবর্ধন ও পরিবর্জনের মাধ্যমে। এখন এই পরিবর্ধনের জন্য সব সময় অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। শিক্ষার্থী যা জানে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে যদি নতুন জ্ঞান উপস্থাপিত না করা হয়, তাহ'লে সব কিছুই তার কাছে খাপছাড়া মনে হবে। মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিতে তাই অতীত অভিজ্ঞতার

পরিপ্রেক্ষিতে নতুন জ্ঞান পরিবেশন করা হয়। শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে না, যে এই দুই অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু ফাঁক আছে, বা, শিক্ষার্থীকে দুই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্যও আর অতিরিক্ত প্রচেষ্টা করতে হয় না। এতে মানসিক শক্তিরও অপচয় হয় না। তাই মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হ'ল এটা শিশুকে তার পরিচিত জগৎ থেকে অপরিচিতের দিকে নিয়ে যায় **(From known to unknown)**।

তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা থাকে একেবারে নিষ্ক্রিয়। আধুনিক কালে সব শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্ বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার্থী যে পদ্ধতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে, তার মাধ্যমে শিক্ষা হ'তে পারে না। শিশুরা স্বভাবতঃই সক্রিয় থাকতে চায়। তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তারা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শিক্ষকরা যুক্তির সাহায্যে তাদের কাছে বিষয়বস্তু পরিবেশন করেন। এই কারণে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে শিশুর প্রকৃতি বিরোধী। কিন্তু মনোবিজ্ঞা নির্ভর পদ্ধতিতে শিশুকে সক্রিয় রাখার চেষ্টা করা হয়। এটি কোন প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমেও হ'তে পারে বা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেও হ'তে পারে। মোট কথা শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে পাঠে যদি অংশ গ্রহণ না করে তাহ'লে শিক্ষা সার্থক হবে না। মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সেই সুযোগ দান করে।

আবার তর্কবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়। সব শিক্ষার্থী সব জিনিস সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে আমরা শ্রেণী কক্ষে যখন বিষয় উপস্থাপন করি, তখন আমরা ধরে নিই যে, প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সমান। আর ঠিক পাঠ্য পুস্তক যেমন যুক্তিক্রমে সাজানো হয় সেইভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার চেষ্টা করি। কিন্তু এতে ক'রে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে পদ্ধতির দ্বারা সকলে সমান উপকৃত হয় না। মনোবিজ্ঞার ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে ব্যক্তির নিজস্ব আগ্রহ, অনুরাগ, ক্ষমতা ইত্যাদি বিচার ক'রেই পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।

এছাড়া মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আরো নানা রকম বৈশিষ্ট্য আছে। সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, আংশিক ও সামগ্রিক পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, এই শিক্ষা পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলেছে। তাই আধুনিক কালে যে-কোন শিক্ষণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গেলেই

প্রথমে বলতে হয়, তা মনোবিদ্যাসম্মত (Psychological)। এই পদ্ধতিতে শিশুর মনের ধর্মকে কাজে লাগিয়ে মনোবিকাশের চেষ্টা করা হয়। এই পদ্ধতি শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক ব'লে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের আলাদা কোন সমস্যা থাকে না। শিশু কাজের আনন্দেই কাজ করে, সে কাজের মধ্যে সে যদি তার নিজের চাহিদাগুলো পরিপূর্ণ ভাবে চরিতার্থ করতে পারে, মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি তাকে সেই সুযোগ দান করে। তাই এই পদ্ধতি শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

কিন্তু এর থেকে যেন এই ধারণা না হয় তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতিরও অনেক সুবিধা আছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল শিক্ষার্থীরা জ্ঞানকে যে ভাবে ব্যবহার করবে, এই পদ্ধতিতে আমরা সেই ভাবে তাকে শিক্ষা দিই। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে, তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি ঐ পদ্ধতিতেই জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা করে। মনোবিদ্যা সম্মত পদ্ধতিতে জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আবার নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে হয়। তাছাড়া বয়স্কদের ক্ষেত্রে, বা উপরের শ্রেণীতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সবশেষে এ কথাই বলতে হয় যে, মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করলেও বিভিন্ন অংশের মধ্যে যুক্তিপূর্ণ সামঞ্জস্য বিধানের জন্য তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগ আছে। শিক্ষার্থীর বর্তমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছুকে বিচার করতে শিখলে, শিক্ষার যে চরম লক্ষ্য তা ব্যাহত হবে। সবকিছু যদি যুক্তি বিচারে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে, শিক্ষার মাধ্যমে যে সব জীবনাদর্শ সে গড়ে তুলবে, তা চিরস্থায়ী হবে না। তাই বলতে হয়, মনোবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি শিশুদের পক্ষে খুবই উপযোগী কিন্তু তর্কবিদ্যাসম্মত পদ্ধতি বয়স্কদের একমাত্র পদ্ধতি।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the difference between logical and psychological methods. Discuss their application is curricular subject. [N. B. U. ; B. T. '64]

Ans : ২৩২ হইতে ২৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Discuss the various characteristics of the psychological method of teaching.

Ans : ২৩২ হইতে ২৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি

Modern Methods of Instruction

আধুনিকালে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার লক্ষ্য (Aims), বিষয়-বস্তু (Subject-matter), শিক্ষার্থী, শিক্ষক ইত্যাদির ধারণার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের (Social science) অনুপ্রবেশের ফলে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন এবং তার পরিবর্তে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, নতুন পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য। এর ফলে আধুনিক কালে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি দেখতে পাই। এর প্রত্যেকটিতেই আধুনিক মনোবিদ্যার তত্ত্ব প্রয়োগ করার চেষ্টা হ'য়েছে। তাই এদের আমরা মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি (Psychological method)-ও বলতে পারি। এই সব পদ্ধতি ও পরিকল্পনার বিশেষ কয়েকটা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি (The Kindergarten System)॥ এই পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন জার্মান শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল (Froebel)। ১৮৩৭ সালে ফ্রয়েবেল তার শিক্ষাদর্শনকে প্রত্যক্ষ ভাবে কার্যকরী করার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর নাম দেন তিনি 'কিণ্ডারগার্টেন'। পরবর্তিকালে এই বিদ্যালয় থেকে তার অনুসৃত পদ্ধতিরই নাম হ'য়েছে কিণ্ডার গার্টেন পদ্ধতি। 'কিণ্ডারগার্টেন কথার অর্থ হ'ল 'শিশু উদ্যান' (Childrens' Garden)। ফ্রয়েবেল শিক্ষাক্ষেত্রে 'শিক্ষালয়' বা 'বিদ্যালয়' কথাটা ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মধ্যে শিশুর আত্ম-সক্রিয়তাই (self-activity) একমাত্র পদ্ধতি (Method)। শিশু স্বাধীন ভাবে নিজে নিজে কাজ করবে, এবং তার মাধ্যমে সে শিক্ষার উন্নততর আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবে। তাই তাঁর কিণ্ডারগার্টেনের মূল কথা হ'ল শিশুর স্বাধীন সক্রিয়তা। তাঁরা নাচবে, গান গাইবে এবং বিভিন্ন খেলনা নিয়ে খেলা করবে। শিশুরা বাগানের

ছোট ছোট চারাগাছ। মালী যেমন বাগানের প্রত্যেক গাছের প্রতি যত্ন নেয়, তাদের জল দেয়, সার দেয়, ঠিক তেমনি শিক্ষকরাও শিশুদের যথাযোগ্য যত্নের সঙ্গে, তার জীবন বিকাশের পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল আত্মসচেতনতার মাধ্যমে, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনার ভেতর তিনি সেই প্রচেষ্টাই করেছেন।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য (Main characteristics of Kindergarten System) : (১) আত্ম-সক্রিয়তা ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই উদ্দেশ্যে শিশুদের অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে ছড়া, গান ইত্যাদি শেখানোর ব্যবস্থা থাকে এই পদ্ধতির মধ্যে।

(২) ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার (sense-training) উপর এই পদ্ধতিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিশুর জ্ঞান আসে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। তাই ফ্রয়েবেল শৈশবে ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর জন্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের খেলনা নিয়ে খেলার ব্যবস্থা থাকে। এদের বলা হয় 'উপহার' (Gifts)। ফ্রয়েবেল বলেছেন, এইসব উপহার শিশুর কাছে জগতের প্রতীক হিসেবে কাজ করে। বিভিন্ন 'উপহারের' মধ্যে থাকে বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতির কাঠের টুক্রো, কাঠি, তুলো, সুতো, নানা রঙের বল ইত্যাদি। এইসব ছোট ছোট খেলনা যার প্রতি শিশু খুব সহজে আকৃষ্ট হয়, তাদের মাধ্যমে, শিশুর রঙ্, আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা হয়।

(৩) আনন্দই হ'ল কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির মূল কথা, শিশুরা তাই খেলাধুলা করার সুযোগ পায় এই পদ্ধতিতে। ফ্রয়েবেল শিশুদের খেলার সঙ্গে কাজের সঙ্গে সার্থক সমন্বয় করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। এগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন বৃত্তি (Occupations)। নানা রকমে কাগজ ভাঁজ করা, কাগজের ভাঁজ দিয়ে নানা রকম খেলনা তৈরী করা, কাগজের ফুল তৈরী করা, সেলাই করা ইত্যাদি নানারকম কাজের ব্যবস্থা থাকে এই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে। এগুলো কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির উপকরণ।

(৪) গান এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশুদের যে-কোন কাজ করতে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের গানের ছন্দের তালে, তারা ছন্দের তালের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং ফলে কাজগুলোও তারা আগ্রহের সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করে।

(৫) কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি প্রকৃতি পরিচয়কে (Nature study) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। বিশ্বের সব শক্তির সঙ্গে একাত্মতা বোধ অনুভব করতে হ'লে প্রকৃতি জগতের সঙ্গে একান্ত ভাবে পরিচিত হওয়ার দরকার। তাই শিক্ষার এই প্রথম স্তরে ফ্রয়েবেল প্রকৃতি পাঠের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হ'ল এই যে, এই শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী জীবন বিকাশ সম্ভব হয়, এবং শিশু-জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম কৌশলই শিক্ষার্থী এখানে শেখে, তবে নিষ্ক্রিয় ভাবে নয়; তার প্রতি পর্যায়ে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর জীবনকে এক স্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপন করা হয়, ফলে একই সঙ্গে জ্ঞানমূলক এবং সামাজিকতামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই জন্যই শিশুর মধ্যে এক ঐক্যবদ্ধ জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি শিশুর সুষম ও ঐক্যবদ্ধ (consistent) ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে। তাই আজকাল প্রায় পৃথিবীর সমস্ত দেশেই এই পদ্ধতির প্রচলন হ'য়েছে তিন থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমাদের দেশেও প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় এই পদ্ধতির প্রচলন হ'য়েছে, বিশেষ ক'রে শহর অঞ্চলে।

॥ মন্তেস্বরী পদ্ধতি (The Montessori Method) ॥

মন্তেস্বরী পদ্ধতির প্রবর্তক হ'লেন ইতালীর ডঃ মাদাম মারিয়া মন্তেস্বরী। মন্তেস্বরী রুশোর শিক্ষা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি শিশুর স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন, তিনিও ফ্রয়েবেল-এর মত ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার (sense training) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাদাম মন্তেস্বরী চিকিৎসা বৃত্তি ছেড়ে সারা জীবন ধ'রে শিক্ষামূলক গবেষণায় নিজেকে নিয়োগ করেন এবং তার শিক্ষাতত্ত্বকে প্রয়োগ করার জন্য ১৯০৭ সালে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর নাম দেন Case dei Bambini বা শিশু নিকেতন; শিশুর মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আছে, তাকে প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল তাঁর পদ্ধতির মূল কথা। তিনি ফ্রয়েবেলের উপহার ও বৃত্তির (Gifts and Occupation) মত নানা ধরনের খেলনা তৈরী করেন। এদের নাম দেন ডিডাকৃটিক্ যন্ত্র (Didactic apparatus)। এই সব খেলনা এমন ভাবে পরিকল্পিত যে, শিশুরা নিজেরাই ঐ সব খেলনার মাধ্যমে নিজেরাই নিজেদের ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার কাজ হাতে নেবে, নিজেরাই নিজেদের ভ্রম সংশোধন কববে।

মন্তেস্বরী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Montessori System) :

[এক] এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দান। এই পদ্ধতির মূল বক্তব্য হ'ল, শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর মনের পরিপূর্ণ বিকাশ করতে হবে। সুতরাং তার মধ্যে যে সব অন্তর্নিহিত সত্তা আছে, তাকে যদি বিধিনিষেধ অনুশাসনে চেপে রাখা হয়, তাহ'লে তার পরিপূর্ণ বিকাশ কোন মতে সম্ভব হবে না। শৃঙ্খলা আসবে, স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে।

[দুই] শিক্ষা হবে শিশুর সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা। শিশুকে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হবে। তাঁরা নিজেরা হাতে কলমে কাজ করবে। তাতে তাদের ভুল হ'তে পারে, কিন্তু তারা নিজেরা শুধরে নেবে। বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয় পরিমার্জনের উপযোগী কাজ দেওয়ার জন্য মন্তেস্বরী ডিডাকৃটিক যন্ত্রের (Didactic apparatus) প্রবর্তন করেন। এই খেলনাগুলোতে নিজের ভুল শুধ্‌রে নেওয়ার মত ব্যবস্থা আছে। শিশুরা যখন এইসব খেলনা যন্ত্র নিয়ে খেলা করবে একজন শিক্ষিকা তাদের পরিচালনা করবেন। মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে এই শিক্ষিকার নাম দেওয়া হ'য়েছে পরিচালিকা (Directress)। কারণ, শিক্ষিকা যতদূর সম্ভব কম হস্তক্ষেপ করবেন শিশুদের স্বাধীন কাজে। সুতরাং এই পদ্ধতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল স্বয়ং শিক্ষার তত্ত্ব (Principle of Auto-education)।

[তিন] মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। তিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় উভয়ের উৎকর্ষণের কথা বলেছেন। জ্ঞনেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডিডাকৃটিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন মন্তেস্বরী। অপর দিকে কর্মেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের শরীর চর্চার ব্যবস্থা, হাতের কাজ করার ব্যবস্থা এই পদ্ধতিতে স্থান পেয়েছে। বাগানের কাজ করা, পশুপাখী পোষা ইত্যাদি কাজের মাধ্যমে একদিকে তাদের কর্মেন্দ্রিয়ের যেমন উন্নতি হবে, অন্যদিকে নানারকম সামাজিক গুণেরও বিকাশ হবে।

[চার] মন্তেস্বরী পদ্ধতির সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্বকে (Theory of individual difference) বিশেষভাবে অনুমোদন করা। প্রত্যেক শিশুরই নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা আছে এবং এই ব্যক্তিসত্তার দিক থেকে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হওয়ার দরকার যাতে

ক'রে কোন শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না ক্ষুণ্ণ হয়। এই কারণে শ্রেণীকক্ষে দলগত ভাবে পাঠদানের পদ্ধতিকে এখানে স্থান দেওয়া হয়নি। প্রচলিত ব্যবস্থাকে মন্তেস্বরী একেবারে বাতিল ক'রে দিয়েছেন। অ্যাডাম (Adam) বলেছেন—"The knell of class teaching has been rung." আর সেই ঘণ্টা বাজিয়েছেন মন্তেস্বরী। বিদ্যালয়ে শ্রেণী বিভাগের প্রচলন থাকবে। কিন্তু তা শিক্ষাদানের জন্য নয়, প্রশাসনের সুবিধার জন্য মাত্র। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। এই দিক থেকে বিচার ক'রে বলা যায় মন্তেস্বরী পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষা (Individualized instruction)।

বর্তমান শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে মন্তেস্বরী পদ্ধতি এক অভিনব সংযোজন। পৃথিবীর সকল দেশে এই পদ্ধতির বহুল প্রচার হ'য়েছে। অনেক দিক থেকে এই পদ্ধতির সঙ্গে ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির অনেক মিল আছে। দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রবর্তিত পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। যেমন, শিশুর স্বাধীনতার ব্যবস্থা উভয় পদ্ধতির মধ্যেই স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষা যে শিশুর সক্রিয়তার দ্বারা সম্ভব সে কথাও দু'জনে স্বীকার করেছেন। এই সক্রিয়তাকে কার্যকরী করার জন্য কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে যেমন উপহার এবং বৃত্তির (Gifts and occupation) ব্যবস্থা করা হ'য়েছে, মন্তেস্বরী পদ্ধতিতেও তেমনি বিভিন্ন ধরনের ডিডাক্‌টিক যন্ত্রের (Didactic apparatus) ব্যবস্থা আছে। তাঁরা উভয়েই খেলা-ভিত্তিক (Play-way) শিক্ষার কথা বলেছেন। উভয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। উভয় পদ্ধতিতেই ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার (sense training) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। তাই বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাচ্ছে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং মন্তেস্বরী পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে।

তবে তাদের মধ্যে পার্থক্যও অনেক আছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শৃঙ্খলার দায়িত্ব শিক্ষিকার। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষিকা শিশুর কাজ নানা ভাবে উপহার ও বৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে পরিচালিকা (Directress), সে রকম কোন নিয়ন্ত্রণ রাখেন না। শিশুরা নিজের ইচ্ছা মত খেলা বেছে নিতে পারে এই পদ্ধতিতে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুর

সামগ্রিক গুণের বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাকে সমাজ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন ক'রে তার সামাজিক গুণ বিকাশের চেষ্টা করা হয় এই পদ্ধতিতে। কিন্তু মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রকৃতি পরিচয় পড়ানো হয় দুই পদ্ধতিতে দুই উদ্দেশ্য নিয়ে। এই রকম নানা দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে।

তবে উভয় পদ্ধতিরই বহুল প্রচার আধুনিক কালে হয়েছে। তবে এই দুই পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হ'ল যে, এখানে যে সব খেলনা (উপহার, বৃত্তি এবং ডিডাকৃটিক যন্ত্র) ব্যবহার করা হয় তার সংখ্যা এত কম যে, তাদের দ্বারা শিশুর সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'তে পারে না। এই সবের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা শিশুরা অর্জন করতে পারে না। এর বাইরেও নানা রকম কাজে তারা আকৃষ্ট হয়।

॥ ডাল্টন পরিকল্পনা (The Dalton Plan) ॥

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলেন, তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন শিক্ষাদানের পরিকল্পনার আবির্ভাব হয়। ডাল্টন পরিকল্পনা এই আন্দোলনের ফলেই গড়ে উঠেছে। এই পরিকল্পনার স্রষ্টা হ'লেন পার্কহার্স্ট (Parkhurst)। তিনি শিশুর ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মধ্যে বিদ্যালয় হবে একটা পরীক্ষাগার (Laboratory) যেখানে শিশুরা নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। শুধু মাত্র নিষ্ক্রিয় ভাবে শিক্ষকের কাজ থেকে জ্ঞান আহরণ করবে না। এইজন্য তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনাকে পরীক্ষাগার প্রণালী (Laboratory Plan) আখ্যা দিয়েছেন। শ্রীমতী পার্কহার্স্ট, তার শিক্ষাতত্ত্বের পরীক্ষা-মূলক প্রয়োগ করেন ১৯২০ সালে আমেরিকার ডাল্টন শহরে এক বিদ্যালয়ে। এই থেকে এই পরিকল্পনার নাম দেওয়া হ'য়েছে ডাল্টন প্ল্যান।

ডাল্টন পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of the Dalton Plan):

ডাল্টন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনটি—স্বাধীনতা (Freedom), সামাজীকরণ (Socialization) এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়া (Individual work)।

ডাল্টন পরিকল্পনার মূল ভিত্তি হ'ল স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা দু'দিক থেকে দেওয়া হবে এই পরিকল্পনায়। এক হ'ল প্রশাসনিক স্বাধীনতা, দ্বিতীয় হ'ল কাজের স্বাধীনতা। বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক পাঠ্য তালিকা বিদ্যালয়ে থাকবে না এবং নির্দিষ্ট সময়-তালিকারও প্রয়োজন নেই। শিশুরা কোন বিশেষ

বিষয়ে যতক্ষণ আগ্রহী থাকবে, তত সময় ধরেই সেই বিষয়ের উপর কাজ করবে। ঘণ্টা বাজিয়ে তার আগ্রহকে বাধা দিয়ে বিষয়ান্তরে মনযোগ নিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। অন্য দিক থেকে শিশুদের কাজের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তারা শ্রেণীকক্ষে, যখন তখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারে এবং দরকার হ'লে পরস্পরের মধ্যে যুক্তি পরামর্শ করতে পারে। গতানুগতিক শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে তাদের স্বাধীনতাকে নষ্ট করা চলবে না।

ডাল্টন পরিকল্পনার আর একটা উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সামাজিক গুণ বিকাশ করা। শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দিলে তারা পরস্পরের সঙ্গে যে মেলা-মেশার সুযোগ পাবে তার মাধ্যমে তাদের সামাজিক শিক্ষা হবে, তাদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান হবে ; কাজের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের বিকাশ হবে ; এই ভাবে তাদের মধ্যে আরো নানা ধরনের সামাজিক গুণের বিকাশ হবে। তাই অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—ডাল্টন পরিকল্পনা ঠিক বিশেষ এক ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি (Teaching methed) নয়। এক নতুন ধরনের সংগঠনিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে নিজের জীবন বিকাশের উপযোগী পথে এগিয়ে যাবে।

ডাল্টন পরিকল্পনার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তিতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা (Individualized instruction)। যদিও ডাল্টন পরিকল্পনায়, শিশুদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি আছে, তবে সে শ্রেণী বিন্যাস পাঠদানের জন্য। প্রত্যেক শিশুকে তার নিজস্ব ক্ষমতা, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ দান করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। নিজের ক্ষমতার জন্য কোন শিশু যদি এগিয়ে যায় তাকে বাধা দেওয়া চলবে না। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"The individual student is never sacrificed for the class in a Dalton School" এক কথায় মনোবিদ্যার তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের (Individual difference) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে এই পরিকল্পনায়।

ডাল্টন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক (Different aspects of the Dalton Plan) :

ডাল্টন পরিকল্পনায় কাজ পরিচালনা করার জন্য চারটি জিনিস অবশ্য প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায়কে পরিচালনা করায় জন্য দরকার— (১) পরীক্ষাগার (Laboratory), (২) বিশেষজ্ঞ শিক্ষক (Specialist

teacher), (৩) কার্যভার (Assignment) এবং (৪) মূল্য নিরূপণের ব্যবস্থা (Assessment)।

পার্কহার্স্ট তার শিক্ষা পরিকল্পনাকে 'পরীক্ষাগার পরিকল্পনা' নাম দিয়েছিলেন। এর কারণ, তিনি বলেছেন, বিদ্যালয়ে যদি এই পরিকল্পনা চালু করতে হয়, তা'হলে শ্রেণীকক্ষগুলোকে পরীক্ষাগারে অবশ্য পরিণত করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণী হবে এক একটা সামাজিক চর্চামূলক পরীক্ষাগার (Sociological Laboratory)। এই পরীক্ষাগারে কিছু যন্ত্রপাতি থাকবে, কিছু বই, চার্ট এবং ছবি থাকবে। শিক্ষার্থীরা যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবে। এ ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক একটা ছোট পরীক্ষাগার থাকবে, এই গুলোকে বলা হবে বিষয়কক্ষ (Subject room)। প্রত্যেক ঘরে, বিষয়ের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে, যন্ত্রপাতি ছবি এবং চার্ট দিয়ে, যেমন ইতিহাসের ঘরের দেওয়ালে, বিভিন্ন ঘটনার চিত্র আঁকা থাকবে, ঐতিহাসিক ম্যাপ থাকবে, ফটোগ্রাফ, মডেল, চার্ট ইত্যাদিও থাকবে। প্রত্যেক শিশুর স্বাধীনতা থাকবে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাওয়ার। ইচ্ছা করলে সে একই ঘরে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কয়েক মিনিট ক'রে বিভিন্ন ঘরে কাটাতে পারে। যদি কোন বিষয়ে কোথাও সে অসুবিধা অনুভব করে, শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাহায্য করতে পারেন। অর্থাৎ, এক কথায় শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় তার আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী শিখবার। অনেক সময় এই ধরনে হাতে কলমে কাজ শিখতে গিয়ে ছাত্ররা নানা রকম অসুবিধার মধ্যে পড়ে। অনেক সময় তাদের জ্ঞান সুসমঞ্জস হয় না তাই প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন করে সাধারণ ভাবে আলোচনার ব্যবস্থাও থাকে এই পদ্ধতিতে। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে হ'লে বিদ্যালয়ের সমস্ত গতানুগতিক সংগঠনকে বদলে ফেলতে হবে এবং ছাত্রদের শিক্ষার মান অনুযায়ী শ্রেণী কক্ষের বিন্যাস না ক'রে বিষয়কেন্দ্রিক শ্রেণীকক্ষ গড়ে তুলতে হবে।

ডাল্টন পরিকল্পনায়, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য যেমন পরীক্ষাগার থাকবে, তেমনি প্রত্যেক পরীক্ষাগারের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ক'রে শিক্ষক থাকবেন। সাধারণ শ্রেণীতে শিক্ষা দান করার চেয়ে, এই শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশী হবে। সাধারণ বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, একই শিক্ষক ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী পরিবর্তন করেন তাই নয়, বিষয়ও পরিবর্তন

করেন। অর্থাৎ একই শিক্ষক, ইতিহাস পড়ান, ইংরেজীও পড়ান আবার দরকার হ'লে অঙ্কও করান। কিন্তু এই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হ'লে এক একজন শিক্ষক এক একটি বিষয়ের ভার নিয়ে থাকবেন। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষাগারের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক থাকবেন। এই শিক্ষকের ঐ বিষয়ের জ্ঞান গভীর হওয়ার দরকার। কারণ তিনি শ্রেণীকক্ষে কোন বাঁধাধরা নিয়মে তৈরী পাঠ দেবেন না। ছাত্রেরা নিজেরা কাজ করবে এবং যখন যা অসুবিধা মনে করবে, বা বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখনই শিক্ষকের কাছে আসবে এবং শিক্ষককে সেই প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনক ভাবে দিতে হবে। ফলে শিক্ষককে বিশেষজ্ঞের ভূমিকা নিতে হবে, তিনি যে-কোন অবস্থাতেই ছাত্রদের যে-কোন সমস্যার সমাধানে যাতে সহায়তা করতে পারেন, সেইমত তাঁকে তৈরী থাকতে হবে।

কার্যভার (Assignment) ডাল্টন পরিকল্পনার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক, একে কেন্দ্রবিন্দুও বলা যায়। কার্যভার বলতে বলা হ'চ্ছে নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থী যতটা কাজ করবে তাকে। অর্থাৎ, বিভিন্ন বিষয়ের মূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো একটা ছকের মধ্যে ফেলে পরিকল্পনা করা হয়। এক বছরে বা বিদ্যালয়ে যে ক'বছর শিশুরা থাকবে, সেই অনুপাতে সম্পূর্ণ বিষয়ের জ্ঞানকে ভাগ ক'রে ফেলা হয়। আবার বিভিন্ন পর্যায়ে সময়টাকে ছোট ক'রে ফেলা হয়। সাধারণতঃ এক বছরের মধ্যে শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বিষয়ে যতটা করবে তাকে বলা হয় কন্‌ট্রাক্ট (Contract)। এই সম্পূর্ণ কন্‌ট্রাক্টকে ভেঙ্গে ছোট ছোট ক'রে এক এক মাসের জন্য ভাগ করা হয়। এই এক মাসের কার্যভারকে বলা হয় অ্যাসাইনমেণ্ট (Assignment)। আবার মাসের কাজকে ভাগ ক'রে সপ্তাহের কাজ নির্দেশ করা হয়। এই এক সপ্তাহের কাজকে বলা হয় পিরিয়ড্ (Period)। আবার একদিনের কাজকে বলা হয় একক (Unit)। তাহ'লে শিক্ষার্থী যত বছর বিদ্যালয়ে পাঠ্যাভ্যাস করবে, তাকে ততগুলো কন্‌ট্রাক্ট করতে হবে। সুতরাং এই পরিকল্পনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, শিক্ষাদানের আগে শিক্ষক সম্পূর্ণ ভাবে তার বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করেন ও পরিকল্পনা করেন। একবার পরিকল্পনা তৈরী হ'য়ে গেলে, তাঁর কাজ হবে, শিক্ষার্থীদের যা কাজ দেওয়া হ'য়েছে, তারা তা নির্দিষ্ট সময়ে করছে কিনা দেখা। অবশ্য প্রত্যেক দিনের 'একক' (Unit) সে সম্পূর্ণ করছে কিনা দেখার দরকার নেই। সারা মাসের অ্যাসাইনমেণ্ট সে সম্পূর্ণ করেছে কিনা সেটুকু

দেখলে চলবে। কারণ সে ইচ্ছা করলে একদিন সারাদিন ভূগোলের ঘরেই কাটিয়ে দিতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে এইটুকু বন্ধনই মাত্র থাকে। আবার কোন শিক্ষার্থী যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই তার কাজ সমাধান করে তাহ'লে তাকে আবার নতুন কাজ দেওয়া হয়। কিন্তু যারা নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে পারে না, তাদের নিয়েই হয় মুস্কিল। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষককে সক্রিয় হ'তে হয়, এই সব শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে সাহায্য ক'রে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

প্রত্যেক শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার ফল সম্বন্ধে জানার জন্য কোন একটা ব্যবস্থা থাকার দরকার। সাধারণ শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা কি রকম হ'য়েছে তা জানার জন্য আমরা পরীক্ষা নিই। ঠিক তেমনি ডাল্টন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কতটা শিখলো সে সম্পর্কে অবগত থাকার জন্য, ছাত্রদের অগ্রগতির তালিকা (Record card) রাখার প্রয়োজন। বিশেষ ক'রে, ডাল্টন পরিকল্পনার মত শিক্ষা ব্যবস্থায়, যেখানে সমস্ত দায়িত্বই শিক্ষার্থীর উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানে এ ধরনের তালিকা একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যদি জানতে না পারে, তারা কতদূর এগিয়েছে, তাহ'লে তারা নিরুৎসাহিত হ'য়ে পড়বে। সুতরাং এই ধরনের তালিকা শিশুদের আরও সক্রিয় ক'রে তুলবে। পার্কহার্স্ট এ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তাই ছাত্রদের কাজের অগ্রগতি ও মূল্য নিরূপণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তিন ধরনের তালিকা বা কার্ডের কথা বলেছেন। একটা হ'ল শিক্ষার্থীদের জন্য। এই কার্ড শিক্ষার্থীদের কাজে প্রেষণার শক্তি জোগাবে। দ্বিতীয়টা হ'ল শিক্ষকের কার্ড, এর দ্বারা শিক্ষক নিজে জানতে পারবেন কার কতদূর অগ্রগতি হ'য়েছে, কে বিশেষ সাহায্য চায়, ইত্যাদি; এবং তৃতীয়টা হ'ল অভিভাবকের কার্ড; এটা সাধারণতঃ বছরে একবার দেওয়া হবে অভিভাবকদের শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করার জন্য এবং তাঁদের সহযোগিতা পাওয়ার জন্য। পার্কহার্স্ট, প্রত্যেক ধরনের কার্ডে লেখচিত্রের (Graph) সাহায্যে ছাত্রের অগ্রগতি পরিবেশন করার কথা বলেছেন। কারণ এতে ক'রে খুব কম সময়ে কাজ হয় এবং ছাত্রের বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি সম্পর্কে খুব সহজে ধারণা পাওয়া যায়।

এই সব দিক ছাড়াও ডাল্টন পরিকল্পনায় সম্মেলন (Conference) এবং কাজের (Group activities) ব্যবস্থার কথা বলা হ'য়েছে। সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

বিষয়ের সমাধান করবেন। এতে ক'রে তাদের জ্ঞানের সমন্বয়ও হয়। এছাড়া, সামাজিক ও মানসিক বিকাশের সহায়করূপে বিভিন্ন ধরনের কাজেরও ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, সাহিত্য সভা, বিতর্ক, বক্তৃতা, অভিনয়, রাজনৈতিক আলোচনা, খেলাধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি। এদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামাজিক সচেতনতা আসে।

ডাল্টন পরিকল্পনার গুণাবলী (Merits of the Dalton Plan):

[এক] ডাল্টন পরিকল্পনায়, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব (Theory of individual difference) আধুনিক মনোবিদ্যার পরীক্ষিত তত্ত্ব। এর মধ্যে ব্যক্তি তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সাধারণ পদ্ধতিতে আমরা দলগত ভাবে যখন শিক্ষা দিই তখন তার এই স্বাতন্ত্র্যের প্রতি মর্যাদা দেওয়া হয় না। ফলে সব শিক্ষার্থী সমানভাবে উপকৃত হয় না। যারা বেশী বুদ্ধিমান, তারা তাড়াতাড়ি শেখে আবার যারা স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন তারা দেরীতে শেখে। আমরা চেষ্টা করে যদি মধ্যমপন্থাও অবলম্বন করি, তাতে ক'রে, ভালরা পিছিয়ে যায়, খারাপরা উপকৃত হয় না। ডাল্টন পরিকল্পনা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ ক'রে দেয়। বর্তমান শতাব্দীতে শিক্ষাকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করার চেষ্টা চলেছে। ডাল্টন পরিকল্পনা তাকে কার্যকরী রূপ দিয়েছে। এই দিক থেকে এই পরিকল্পনা মনোবিজ্ঞানসম্মত।

[দুই] ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে কাজের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। মানসিক অবস্থা ও আগ্রহকে বাইরের কোন বাধাধরা নিয়ম দিয়ে আটকে রাখা হয় না। শিক্ষার্থী তার ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন বিষয় যখন ইচ্ছা শিখতে পারে। তাকে কোন বিশেষ বিষয় বিশেষ সময়ে শেখার জন্য বাধ্য করা হয় না। শিক্ষার্থী তার ইচ্ছামত যে-কোন জায়গায় যেতে পারে, যে-কোন শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। তবে তাদের একমাসের কাজ নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া হয় এবং মাসের প্রথমে তাদের একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হয়। এই চুক্তির ফলে, তার উপর একটা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ সব সময়ই থেকে যায়, ফলে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে না। ম্যাক্‌নি (Macnee) এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"This freedom does not imply licence, which is not freedom at all."

[তিন] এই স্বাধীনতার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্জাত শৃঙ্খলা বা মুক্ত-শৃঙ্খলার ভাব গড়ে ওঠে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলার কোন সমস্যা থাকে না।

এই দিক থেকে ডাল্টন পরিকল্পনা তার সংগঠনের মধ্যেই শৃঙ্খলার সমস্যাকে সমাধান করেছে বলা যেতে পারে।

[চার] এই পরিকল্পনায় শিক্ষার মান অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি, ফলে একই বিষয়ের পক্ষে একজন শিক্ষার্থী যে ইতিপূর্বে তিনটে কন্‌ট্রাক্ট শেষ করেছে, সেও কাজ করছে, আবার যে প্রথম কন্‌ট্রাক্ট শুরু করেছে, সেও কাজ করছে। এর ফলে পারস্পরিক সাহায্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। কোন শিক্ষার্থী বিশেষ কোন অসুবিধা বোধ করলে, সে গিয়ে তার চেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষার্থীর পরামর্শ চাইতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থার দরুণ অবাধ মেলা মেশার সুযোগ পায় শিক্ষর্থীরা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বোধ তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে এবং আরো নানা রকম সামাজিক গুণেরও বিকাশ হয়।

[পাঁচ] ডাল্টন পরিকল্পনার আর একটা ব ড়গুণ হ'ল, এখানে কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। শিক্ষক শুধু সহায়করূপে থাকেন, তবে তাঁর ভূমিকা বিশেষ ভাবে নিষ্ক্রিয়। এই ধরনের দায়িত্ব নিয়ে নিজেরা কাজ করার ফলে, তাদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা আসে এবং এই কাজের মাধ্যমে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা চরিতার্থ হয়।

[ছয়] এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের অগ্রগতিসূচক বিভিন্ন ধরনের যে কার্ড ব্যবহার করা হয়, তা মনোবিজ্ঞানসম্মত। এই কার্ড বা তালিকা, শিক্ষার্থী শিক্ষক এবং অভিভাবক সবাইকে আরো সক্রিয় ক'রে তোলে।

ডাল্টন পরিকল্পনার ত্রুটি (Demerits of the Dalton Plan) : ডাল্টন পরিকল্পনার মধ্যে অভিনবত্ব থাকলেও, তার ত্রুটির দিকও কম নয়। ডাল্টন পরিকল্পনাকে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার ক'রে দেখতে গেলে, অনেক অসুবিধাই দেখা দেয় এবং এই কারণে সম্পূর্ণ ভাবে এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

[এক] ডাল্টন পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা করতে হ'লে বিদ্যালয়ের ঘর বাড়ী থেকে শুরু করে চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি সব কিছু বদলে ফেলতে হয়। এর ব্যয়ভার বহন করা সব বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম তো আছেই। তাই এর ব্যবহারিক প্রয়োগের বিশেষ অসুবিধা আছে।

[দুই] এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা পরিচালনা করলে, যারা লাজুক প্রকৃতির ছেলে, তারা পিছিয়ে পড়ে এবং শিক্ষকের পক্ষে, তাদের খুঁজে বের

করা সম্ভব হয় না। এই সব ছেলেরা সহজে কাউকে জিজ্ঞাসা করে না, তাছাড়া যারা শিখতে পারে না, তাদের মধ্যে অনেক সময়, হীনমন্যতা বোধ (sense of inferiority) দেখা দেয়। এই ধরনের মনোভাব ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের পক্ষে ক্ষতিকর।

[তিন] অনেক সময় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য, তারা যে সব বিষয়ে বেশী আগ্রহী, সেগুলোতে অনেক এগিয়ে গেছে এবং যে সব বিষয় তার ভাল লাগে না, যে সব বিষয়ে পিছিয়ে আছে।

[চার] খুব ছোটদের ক্ষেত্রে, এই পরিকল্পনা কার্যকরী নয়। কারণ, এতটা দায়িত্ব বোধ তাদের থাকে না।

[পাঁচ] ডাল্টন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হ'লে উপযুক্ত শিক্ষক চাই। বিশেষজ্ঞ শিক্ষক সব সময় পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া, এই পরিকল্পনায় শিক্ষককে পাঠদান করতে হয় না ঠিকই, তবে তার অন্যান্য কাজ অনেক বেড়ে যায়।

এই সব কারণে ডাল্টন পরিকল্পনাকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োগ করার অসুবিধা আছে। তবে এর মূলতত্ত্বের মধ্যে যে কোন ভ্রান্তি নেই একথা সকলেই স্বীকার করেন। আমাদের দেশে এই পরিকল্পনা পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু কিছু প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তার ঐ সব ব্যবহারিক অসুবিধার জন্য, আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

॥ প্রোজেক্ট পদ্ধতি (The Project Method) ॥

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিভিন্ন দিক থেকে আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছে, প্রোজেক্ট পদ্ধতি তাদেরই একটি ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তাকে যোগ্য স্থান দিতে গিয়ে এই পদ্ধতির সৃষ্টি। জন ডিউই বলেছিলেন, শিশুদের শিক্ষা হবে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের মধ্যে। আর সেই সমস্যা সমাধান করবে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই। সুতরাং জ্ঞান লাভ বা শিক্ষার জন্য দুটো জিনিস দরকার—একটা হ'ল সমস্যা (Problem), অপরটা হ'ল শিশুদের সক্রিয়তা। এই দুই উপাদানের সমন্বয় করা হ'য়েছে প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতি জন ডিউইর তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে থাকলেও, জন ডিউই কিন্তু এর প্রবর্তক নন। জন ডিউই সমস্যা পদ্ধতির (Problem Method) কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে পদ্ধতি নানা কারণে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাঁরই এক অনুগামী উইলিয়াম হার্ড কিলপ্যাট্রিক (Kilpatric) এই প্রোজেক্ট

পদ্ধতি পরিবর্তিত আকারে প্রবর্তন করেন। দার্শনিক দিক থেকে এই পদ্ধতি জন ডিউইর সমস্যা সক্রিয়তার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে এই পদ্ধতি মনোবিদ্যা সম্মতও বটে। কারণ এখানে থর্ণডাইকের প্রচেষ্টা ও ভ্রান্তির (Trial and Error) কৌশলকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এক সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারা ভ্রান্তি ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের সক্রিয়তার দ্বারা তা সমাধান করবে। অধ্যাপক কৃষ্ণায়া (G. S. Krishnayya) বলেছেন—"The project briefly described, is that method teaching which encourages a maximum amount of purposeful activity on the part of the pupils" প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এক একটি প্রোজেক্ট (Project)-এর মাধ্যমে। প্রোজেক্ট বলতে বলা হ'চ্ছে কোন উদ্দেশ্যযুক্ত সমস্যামূলক পরিস্থিতি। এই পদ্ধতির প্রবর্তক কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick)। প্রোজেক্ট বলতে—তিনি কোন উদ্দেশ্যযুক্ত কাজকে বুঝিয়েছেন, যা একটি সমাজের অনুকূল পরিবেশে আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পাদন করা হয় (A whole-hearted purposeful activity, proceeding in a social environment)। প্রোজেক্টের আরো কার্যকরী সংজ্ঞা দিয়েছেন স্টিভেনসন (Stevenson)। তিনি বলেছেন যে সমস্যামূলক কাজ তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়, তাই হ'ল প্রোজেক্ট (A project is a problematic act carried to completion in its natural setting)। এই ধরনের কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Project Method):

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রোজেক্ট পদ্ধতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

[এক] প্রত্যেক প্রোজেক্ট মানেই একটি সমস্যা। সমস্যা ছাড়া প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া যায় না। কারণ, এই পদ্ধতির মূল কথা হ'ল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন সমস্যার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করা এবং তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করা।

[দুই] প্রোজেক্টে বা সমস্যা নির্বাচন করা হয় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে, অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করে তা একেবারে উদ্দেশ্যহীন নয়;

বরং সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ ঠিক করা হয় এবং ঐ কাজ সম্পাদন করলে আমাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। সুতরাং প্রোজেক্ট পদ্ধতির সক্রিয়তা যান্ত্রিক সক্রিয়তা নয়, উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) সক্রিয়তা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

[তিন] প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক পরিবেশে কাজ করবে। সাধারণ বিদ্যালয়ে আমরা পাঠদানের জন্য কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করি; ফলে গতানুগতিক শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবনের কোন সম্পর্কই থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা যে কাজ করে, তা তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেই সম্পন্ন ক'রে থাকে। এতে ক'রে শিক্ষা পরিবেশ থেকে কৃত্রিমতা দূর করা যায়।

[চার] আবার প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে দু'ধরনের পরিবেশের কথা বলা হ'য়েছে। এক ধরনের পরিবেশ কাজের স্বাভাবিক পরিবেশ যার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করলাম। অপর যে পরিবেশের কথা বলা হ'য়েছে তা সমাজের অনুরূপ পরিবেশ। শিক্ষার্থী যে-কোন সমস্যাই গ্রহণ করুক না কেন তা তারা দলগত ভাবে সমাধান করবে। যদি কোন একক সমস্যা সমাধানেরও প্রচেষ্টা থাকে, তার জন্য সমাজে যেমন সে অন্যের সাহায্য নেয়, সে সাহায্য নেওয়ার বা পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ থাকবে। সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হ'ল—সমবেদনা, সহযোগিতা, অনুকরণের সুযোগ এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে এই সব কিছুই সংযোজন করা হয় কর্মমূলক পরিস্থিতিতে। এর মাধ্যমে হয় কর্ম পরিস্থিতি থেকে কৃত্রিমতা যেমন দূর হবে, অন্যদিকে, বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণেরও বিকাশ হবে।

[পাঁচ] প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহকে কাজে প্রয়োগ করা। প্রচেষ্টার সংজ্ঞায় "whole hearted" কথাটা এই অর্থে ব্যবহার করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে যে কাজকে গ্রহণ করবে, তাকেই তারা সম্পূর্ণতার দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তার জন্য তারা সর্বান্তকরণে চেষ্টা করবে। তাই শিশুদের স্বাধীনতা দেওয়া কর্ম নির্বাচন করার জন্য। ফলে তারা আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে। এই আন্তরিকতা প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

[ছয়] প্রোজেক্ট পদ্ধতির আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল দায়িত্ববোধ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর উপর কর্ম সম্পাদনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে তাদের দায়িত্ব বোধের বিকাশ হয়।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির বিভিন্ন দিক (The Different aspects of the Project Method):

যে-কোন শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে পাঠ দান করতে হলে তাঁকে চারটে স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তা সেই পর্যায়গুলো সম্বন্ধে সচেতন থাকুন আর নাই থাকুন। প্রথমতঃ, হ'ল তাঁকে বিশেষ পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। পরে পাঠদানের জন্য একটা খসড়া পরিকল্পনা করতে হয়; তৃতীয়তঃ, পাঠদান করতে হয়, তাঁর ঐ খসড়া পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং সবশেষে,তার শিক্ষার দ্বারা ছাত্ররা কতটা প্রভাবিত হ'য়েছে, তা বিচার ক'রে বা পরীক্ষা ক'রে দেখতে হয়। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতেও এই চারটে স্তরকেই অনুসরণ করা হয়—

(১) উদ্দেশ্য স্থাপন (Purposing),

(২) পরিকল্পন (Planning),

(৩) সম্পাদন (Execution) এবং

(৪) বিচারকরণ বা পরীক্ষণ (Judgment)।

প্রোজেক্ট পদ্ধতি এই চারটি স্তরকে মেনে চললেও তার প্রয়োগের তারতম্য আছে। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে এই প্রত্যেকটি স্তরকে শিক্ষকের কাজ বলেই মনে করা হয় এবং তিনিই এগুলো করতেন, কিন্তু প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে এই সব স্তরেই শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য শিক্ষক তাদের সব সময়ই সাহায্য করেন। বিশেষভাবে উদ্দেশ্যস্থাপন এবং পরিকল্পনা স্তরে শিক্ষকের পরোক্ষ সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণা আছে, যেহেতু সমস্ত দায়িত্বই শিক্ষার্থীর উপর দেওয়া হ'চ্ছে, সেহেতু এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কোন স্থান নেই। বরং একথা বলতে হ'লে এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে হ'লে শিক্ষককে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে এবং তা দলনায়কের ভূমিকা, যিনি প্রয়োজনের সময় তাঁর সুচিন্তিত মত দিয়ে, শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। সব সময় প্রত্যক্ষ ভাবে তার নিজের মতবাদ চাপিয়ে দেবেন না।

এখন আলোচনা করা যায়, এই বিভিন্ন স্তরে কাজ কিভাবে হয়। প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকের সহযোগিতায় তাদের কাজটি ঠিক করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজ করলে কি উদ্দেশ্য সাধন হবে সে সম্পর্কেও তারা আলোচনা করবে। এমনি ভাবে কোন কাজ নেওয়ার আগে তারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হবে। এই উদ্দেশ্য তাদের পরবর্তিকালে প্রেরণা-শক্তি যোগাবে। এইটাই হ'ল প্রথম স্তর [উদ্দেশ্য স্থাপন]।

দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থীরা এবং শিক্ষক মিলিত ভাবে কিভাবে কর্ম সম্পাদন করা হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় শিক্ষার্থীরা বিশেষ ভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ক'রে, কি কি ভাবে অগ্রসর হ'লে সমাধান করা যাবে ; কার কার সাহায্য দরকার, কখন কি করার দরকার, এসব কিছু পূর্বে থেকে ঠিক করে নেওয়া হয় [পরিকল্পন]।

এর পরে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ কর্মমূলক স্তরে যায়। পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা কাজে অগ্রসর হয় এবং কর্ম সম্পাদন করে। শিক্ষক এই পর্যায়ে তাদের পাশেই থাকেন, কোন অসুবিধা হ'লে সাহায্য করেন এবং প্রয়োজন বোধে প্রোজেক্টটিকে বিশ্লেষণ ক'রে তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতেও সহায়তা করেন [সম্পাদন]।

সবশেষে, সমস্যা বা কাজটির ফলাফল বিচার করা হয়। যে উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ শুরু করা হ'য়েছিল তা কতটা সার্থক হ'য়েছে বিচার ক'রে দেখা হয় এই স্তরে [বিচারকরণ]।

উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রোজেক্টকে আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ভাবে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। আমরা কিল-প্যাট্রিকের শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ করছি। তিনি মনে করেন উদ্দেশ্যই হ'ল এই পদ্ধতির মূল কথা। তাই উদ্দেশ্যের দিক থেকে প্রোজেক্টকে তিনি চার ভাগে ভাগ করেছেন—

[এক] সংগঠনমূলক কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে সব প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয় তাকে কিলপ্যাট্রিক **সংগঠনমূলক প্রোজেক্ট** বলেছেন। অবশ্য এই সংগঠনমূলক প্রোজেক্টের অন্তর্গত হবে যে-কোন ধরনের সৃজনধর্মী কাজও। নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা বা কোন একটা জিনিস তৈরী করা, ইত্যাদি কাজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

[দুই] **উপভোগাত্মক বা গ্রহণাত্মক প্রোজেক্ট** বলতে তিনি সেই সব কাজকে বলেছেন যাদের উদ্দেশ্য হ'ল কোন আদর্শ জিনিসকে উপভোগ বা গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ বা প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়। যেমন, গল্প শোনা, গান শোনা, ইত্যাদি।

[তিন] অনেক সময় প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য হয় বিশেষ কোন বিষয়কেন্দ্রিক কাজ শেখা বা জ্ঞান আয়ত্ত করা। যেমন, কবিতা মুখস্থ করা ; অঙ্কের সুদ কষা শেখা, ভূগোলের জরিপ শেখা ইত্যাদির জন্য যে ধরনের প্রোজেক্ট তাদের বলা হয় **বিশেষ শিক্ষামূলক** প্রোজেক্ট।

[চার] কোন বিশেষ মানসিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে যে সব প্রোজেক্ট গ্রহণ করা হয়, তাদের বলে, **সমস্যামূলক প্রোজেক্ট**। যেমন, গ্রহণ কেন হয়, কুয়াশা কেন হয়, ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করার জন্য যে-সব প্রোজেক্ট নেওয়া হয় তার ভেতর শিক্ষার্থীদের সামনে একটা বিশেষ সমস্যা তুলে ধরা হয় বা তাদের মনের মধ্যে এই সমস্যার সৃষ্টি করা হয়।

শিশুর সম্পূর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-কোন এক ধরনের প্রোজেক্ট হ'লেই চলবে না। প্রোজেক্টের শ্রেণী করণের উদ্দেশ্য এই নয় যে, বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রোজেক্ট গ্রহণ করবো। প্রত্যেক শিশুর পরিপূর্ণ জীবন বিকাশের জন্য সব রকম প্রোজেক্ট-এরই প্রয়োজন।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির গুণাবলী (Merits of the Project Method):

প্রোজেক্ট পদ্ধতি গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতির অনেক দোষ-ত্রুটিই দূর করেছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতি সঠিক ভাবে প্রয়োগ করতে পারলে শিক্ষাদানের কাজ অনেকাংশে বিজ্ঞানসম্মত হবে। এর গুণাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করলে দেখা যাবে যে, এই পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতির অন্তর্নিহিত গুণগুলোর উল্লেখ করছি—

(১) প্রথমতঃ, প্রোজেক্ট সক্রিয়তাবাদের (Activity principle) উপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য ব্যক্তির সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কোন রকম মানসিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা ছাড়া চিরস্থায়ী ভাবে আনা যায় না। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সেই সক্রিয়তায় উদ্বুদ্ধ করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করলে, শিশুদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, পাঠ্যবস্তু নির্বাচন থেকে শুরু ক'রে সম্পাদন এবং পরীক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার সব স্তরেই সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এর ফলে শৃঙ্খলার সমস্যা যেমন থাকে না তেমনি আত্মনির্ভরতার বিকাশ হয়।

(৩) এই পদ্ধতি নিজেই শিক্ষার্থীকে কর্মপ্রেরণা বা প্রেষণা জোগায়। কারণ প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীরা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা তাদের কর্মের প্রেরণা যোগায়। ফলে তারা কাজকে বোঝা বলে মনে করে না।

(৪) প্রোজেক্টগুলো সাধারণতঃ শিক্ষার্থীদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়। দৈনন্দিন জীবনে যা তারা দেখেছে, তাকেই কেন্দ্র ক'রে প্রোজেক্ট রচনা করে। ফলে শিক্ষা হয় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষার অর্থ খুবই পরিষ্কার হ'য়ে দাঁড়ায় এবং তারা স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহী হয়।

(৫) প্রোজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের (correlation) কাজ সহজভাবে হয় এবং শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ের (subject) মধ্যে যে আপাতঃ বিভেদের রেখা আছে তা ধরা পড়ে না। ফলে জ্ঞান সুসংবদ্ধ ভাবে মনের সংগঠনের ঐক্য আনে।

(৬) প্রোজেক্ট পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৃত্তিমুখী শিক্ষাও লাভ করে। এই পদ্ধতিকে তাই জীবনকেন্দ্রিক পদ্ধতিও বলা চলে। বিভিন্ন প্রোজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ভিত্তি তৈরী হয়। এবং এই সব কাজ করার ফলে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে বৃত্তি নির্ধারণ অনেক সহজ হয়। তার কারণ বিশেষ বৃত্তির প্রতি তার প্রবণতা অনেক সময় এখান থেকে বিকাশ লাভ করে।

(৭) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা কোন সমস্যা যৌথ প্রচেষ্টার দ্বারা সমাধান করে। এই ধরনের যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তাদের অনেক সামাজিক গুণ বিকাশ লাভ করে। এই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় প্রোজেক্ট পদ্ধতি সামাজিকতা শিক্ষাতেও সহায়তা করে।

(৮) প্রোজেক্টের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী শরীর চর্চা করার সুযোগ পায়। তাই এই পদ্ধতি দৈহিক বিকাশেরও সহায়ক।

(৯) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব রচনাত্মক চিন্তার (original thinking) উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে মুখস্থ ক'রে পাশ করার প্রচেষ্টাকে এখানে কোন সুযোগ দেওয়া হয় না। ফলে শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ লাভ করে।

(১০) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজের ফলাফল সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাই জানতে পারে। ফলে তারা কতদূর এগিয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা তাদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করে।

(১১) সবশেষে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক অনেক সহজ হয়। পারস্পরিক প্রীতির ভাব জেগে ওঠে তাদের মধ্যে এবং শিক্ষকও অনেক সময় একঘেঁয়ে কাজের হাত থেকে রেহাই পান বলে তাঁর মনের প্রফুল্লতা আসে।

প্রোজেক্ট পদ্ধতির ত্রুটি (Demerits of the Project Method) : প্রোজেক্ট পদ্ধতির মধ্যে নানা রকম সুবিধা থাকলেও তার পরিকল্পনা এবং ব্যবহারিক মূল্যবোধের দিক থেকে তাকে সম্পূর্ণরূপে আদর্শ পদ্ধতি বলা যায় না।

এই পদ্ধতির অসুবিধা বা ত্রুটির দিকও আছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ একে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন—

[এক] এই পদ্ধতির উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করলে, পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান পাওয়া শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ পাঠ্যক্রমের সব অংশকেই সমস্যামূলক পরিস্থিতি বা প্রোজেক্টে রূপান্তরিত করা যায় না। ফলে জ্ঞানের মধ্যে ফাঁক থেকে যায় এবং শিক্ষার্থীর ধারণাও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। গতানুগতিক পদ্ধতি বা বক্তৃতার দ্বারা ঐ ফাঁক পূরণ করতে হয়।

[দুই] এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের-প্রয়োজন। কোন প্রয়োজনীয় অংশ যদি পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে যায়, তাহ'লে সম্পূর্ণ প্রোজেক্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। তাই শিক্ষকের বিশেষভাবে চিন্তা করার দরকার হয় এবং তার অভিজ্ঞতাও থাকা চাই। এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করতে হ'লে, কিন্তু এই ধরনের শিক্ষক সব সময় পাওয়া মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে পরিশ্রম অনেক বেশী হয় বলে শিক্ষকরা একে যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে চান।

[তিন] আবার অনেক সময় পরিচালনার ত্রুটির জন্য প্রোজেক্ট উদ্দেশ্যের চেয়ে পরিকল্পনাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা কাজটাই শেখে কিন্তু অন্যান্য যে সংযুক্ত জ্ঞান তা তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই সম্ভাবনা দু'দিক থেকেই আসতে পারে—শিক্ষকের দিক থেকেও, শিক্ষার্থীর দিক থেকেও। শিক্ষার্থী স্বাভাবিক ভাবে কাজ ভালবাসে, তারা যদি কাজ পায় সেটাকে বড় ক'রে দেখে, উদ্দেশ্যটাকে দেখে না।

[চার] এই পদ্ধতিতে উপরের দিকের শ্রেণীতে শিক্ষা দান করার খুব অসুবিধা আছে। এই ধরনের প্রয়োগ করলে দেখা গেছে, তারা বিষয়ের উপর তত গুরুত্ব দেয় না। তাদের কাছে সব কিছু খুব হাল্‌কা মনে হয়। ফলে তারা নিজেদের খুব বেশী ক'রে প্রয়োগ করতে চায় না।

[পাঁচ] এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না। কারণ শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর ক'রে শিক্ষককে বসে থাকতে হয়।

এই সব অসুবিধাগুলোর কথা এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদ্‌রাও বিবেচনা করেছেন। তাঁরা মনে করেন, এর বেশীর ভাগ ত্রুটিই আমাদের গতানুগতিক চিন্তাধারাপ্রসূত। আমাদের চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণরূপে বদলে ফেলতে হবে,

তবেই এর সার্থকতা উপলব্ধি করা যাবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হ'লে, পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আমাদের গতানুগতিক চিন্তাধারা বদলে তার পরিবর্তে কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity curriculum) রচনা করতে হবে। শিক্ষকের মনোভাবেরও পরিবর্তন করতে হবে।

॥ বাটাভিয়া পরিকল্পনা (Batavia System) ॥

বাটাভিয়া পরিকল্পনার প্রবর্তক হ'লেন জন কেনেডি (John Kennedy)। তিনি ছিলেন নিউইয়র্ক-এর বাটাভিয়া বিদ্যালয়ের সুপারইনটেনডেন্ট্। তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন। এই পরিকল্পনায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা (individualized instruction) এবং শ্রেণীশিক্ষার (class teaching) মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হ'য়েছে। এখানে দু'ধরনের শিক্ষক থাকেন। একদল শিক্ষক সাধারণ ভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালনা করেন এবং এছাড়া কিছু শিক্ষক থাকেন যারা স্বল্পবুদ্ধি বা পড়াশুনায় পিছিয়ে আছে তাদের দেখাশুনা করেন। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে—

(১) বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে কাঁচা বা পিছিয়ে আছে তাদের ব্যক্তিগত ভাবে পাঠদানের ব্যবস্থা থাকছে।

(২) যে সব শিক্ষকরা ব্যক্তিগত পাঠ পরিচালনা করবেন, তাঁরা সাধারণ শ্রেণীতে পাঠদান করেন তাদের চেয়ে যোগ্যতা কোন দিক থেকে কম নয়।

(৩) এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা কোথায় আছে তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের পৃথক ভাবে সাহায্যও করা হয়।

এই পরিকল্পনাতে যাঁরা পড়াশুনায় পিছিয়ে আছে তাদের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা আছে। তবে সেই পৃথকীকরণ তাদের মধ্যে যাতে হীনমন্যতা এনে না দেয় তার জন্য তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্যান্যদের সমতুল্য করার চেষ্টা করা হয়। এদিক থেকে এই পরিকল্পনা যেমন শিক্ষামূলক তেমনি সমাজ সেবামূলকও বটে। অধ্যাপক কৃষ্ণায়া (Krishnayya) বলেছেন—"The main argument in favour of the system lies in the fact that it actually eliminates the backward pupil, not however by casting him out of the school. but by developing him up to the level of the brighter pupils." এছাড়া এই পরিকল্পনায় পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

এই পরিকল্পনার প্রধান অসুবিধা হ'ল এর পরিচালনার জন্য বিশেষ দক্ষতা-

সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন যিনি ছাত্রদের অনগ্রসরতাকে নির্দেশ করতে পারবেন এবং তার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করতে পারবেন। এই ধরনের শিক্ষক সব সময় পাওয়া মুশকিল। তাছাড়া এই পরিকল্পনা এখনও পরীক্ষামূলক স্তরেই আছে। তাই ব্যাপক প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠে না।

॥ উইনেট্‌কা পরিকল্পনা (The Winnetka Plan) ॥

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ছোট এক শহর উইনেট্‌কাতে প্রাথমিক এবং জুনিয়ার হাইস্কুলে এই পরিকল্পনার প্রথম প্রয়োগ করা হয়। এই পরিকল্পনার প্রবর্তক হ'লেন ওয়াসবার্ণ (Carleton W. Washburn)। ডাল্টন পরিকল্পনা ও বাটাভিয়া পরিকল্পনার মত, স্থানের নামের সঙ্গে এই পরিকল্পনার নাম যুক্ত। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের (individualized instruction) উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। ডাল্টন পরিকল্পনার সঙ্গে এর অনেক মিল আছে। ওয়াসবার্ণ দলগত শিক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তার পরিবর্তে ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। এছাড়া, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণ বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই পরিকল্পনার নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। এই পরিকল্পনাকেও আমরা ডাল্টন পরিকল্পনার মত বিশেষ শিক্ষাদানের পদ্ধতি বলতে পারি না, একে সংগঠনের পরিকল্পনা বলাই ভাল। এর মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য-গুলো দেখতে পাই—

[এক] এই পরিকল্পনায় পাঠ্যক্রমকে বিশেষভাবে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হ'য়েছে। এই পাঠ্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে—(ক) সাধারণ প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাঠ্যক্রম এবং (খ) সামাজিক ও সৃজনাত্মক কার্যাবলীর পাঠ্যক্রম। সাধারণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে সেই সব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা আছে। এ ছাড়া, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা বিকাশের জন্য এবং সৃজনাত্মক ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজকেও পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত করা হয়েছে।

[দুই] এই পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সুযোগ দেওয়া হয় নিজের ক্ষমতা-নুযায়ী কাজ করার। বিশেষ ভাবে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে, তার নিজের ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায়। পাঠ্যক্রমের এই সাধারণ অংশকে কতকগুলো এককে ভাগ করা হয় এবং এক একটি এককের (unit) কার্যভার

সুন্দর ভাবে পরিকল্পনা ক'রে দেওয়া হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক এককের সঙ্গে ত্রুটি সংশোধনের জন্য অভীক্ষা (Diagnostic Sheet) এবং তাদের উন্নতি পরীক্ষার জন্য অভীক্ষা (test) থাকে।

[তিন] শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয় কাজ করার জন্য, ফলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। বিশেষ কোন শিক্ষার্থী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারে। আবার অনেক বিষয়ে পিছিয়ে থাকতে পারে। ডাল্টন পরিকল্পনায় যেমন এক মাসের কাজের ভার সম্পূর্ণরূপে শেষ না করলে পরের মাসের কাজ দেওয়া হয়। এখানে সে রকম কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই। এক এককের কাজ ঠিক ভাবে সম্পন্ন করলে, অন্য একক গ্রহণ করার তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

[চার] পরিকল্পনায় দিনের অর্ধেক সময় শিক্ষার্থীরা যৌথ প্রচেষ্টা ও সামাজিক গুণাবলীর চর্চা করে। সাধারণতঃ সকালের দিকে তারা ব্যক্তিগত ভাবে কাজ করে এবং পরে বিকেলের দিকে তারা যৌথ কাজে লেগে যায়। ডাল্টন পরিকল্পনার সঙ্গে এখানেই এর তফাৎ। এখানে এই যৌথ প্রচেষ্টার উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, ডাল্টন পরিকল্পনায় যা দেওয়া হয়নি।

[পাঁচ] এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন ক'রে মনোবিদ্ (Psychologist), একজন মনোবিক্ষক (Psychiatrist) এবং একজন চিকিৎসক থাকেন। মনোবিদের কাজ হ'ল ছাত্রদের ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী বিশেষ ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। মনোবিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থীর আচরণমূলক সমস্যার দিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা। আবার চিকিৎসকের কাজ হ'ল শিক্ষার্থীদের দৈহিক অসুস্থতা ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখা। এদের সকলের কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একজন সেক্রেটারীও থাকেন। এইভাবে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সম্পূর্ণ শিক্ষা পরিচালনা করা হয়।

[ছয়] কোন শিক্ষার্থীকে পাঠদানের পূর্বে, তাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে অভীক্ষার দ্বারা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় এবং তার পারদর্শিতার সীমা থেকেই তার জন্য পাঠ রচনা করা হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করা হয় বানান শিক্ষার ক্ষেত্রে। এই শিশুদের বানান শেখাতে গিয়ে দেখা গেল, এমন অনেক বানান তাদের শিখতে দেওয়া হয়, যা তারা পূর্বেই জানে। ফলে এতে ক'রে ছাত্রদের পরিশ্রম নষ্ট হয়। তাই মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে শিক্ষাদান করতে

হ'লে, তার অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি ক'রেই পরবর্তী পাঠ তাকে দিতে হবে। এই পরিকল্পনায় সেই ব্যবস্থা রাখা হ'য়েছে।

[সাত] এই পরিকল্পনায় বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। ছাত্রদের বছরের শেষে কোন পরীক্ষা দিতে হয় না। ছাত্রদের ক্ষমতা ও পারদর্শিতা অনুযায়ী বিষয়গত ভাবে (Subject-wise) বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

উইনেট্‌কা পরিকল্পনার গুণাবলী (Merits of the Winnetka Plan):

[এক] এই পরিকল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হ'য়েছে। শিশুরা নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায় এই পদ্ধতিতে।

[দুই] এই পরিকল্পনায় ব্যক্তির সামাজিক গুণ বিকাশের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। বিদ্যালয়ের অর্ধেক সময় যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের নিয়োজিত করে। এই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের মধ্যে নানা ধরনের সামাজিক গুণ বিকাশ লাভ করে। বিভিন্ন যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে শেখে। এর ফলে তাদের জীবন পরিবেশের সঙ্গেও পরবর্তিকালে অভিযোজন করতে সুবিধা হয়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় (K. K. Mookherjee) বলেছেন—"In this plan pupils are also given scope for adjusting themselves to the environment, so that they might not prove misfits in their later life". এই দিক থেকে উইনেট্‌কা পরিকল্পনাকে জীবনোপযোগী পরিকল্পনা বলা যায়।

[তিন] এই পরিকল্পনায় শিশুদের কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা থাকে ব'লে শৃঙ্খলার বিশেষ কোন সমস্যা থাকে না।

[চার] এই পদ্ধতিতে পাঠ বা পাঠ্যপুস্তক মনোবিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী করা হয়। পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের পারদর্শিতা পরীক্ষা করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হয় এবং এই অবগতি তাদের নতুন জিনিস শেখায় আগ্রহান্বিত করে।

[পাঁচ] এই পদ্ধতিতে সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেরা এই সব কাজ পরিচালনার ভার নেয়। বিদ্যালয়ে এই সব কাজ পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি থাকে, এই শিক্ষার্থীদের কোন না কোন কমিটির সদস্য হ'তে হয়।

এক কথায় বলা যেতে পারে, উইনেট্‌কা পরিকল্পনা শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তি-তান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেছে এবং এর মধ্যে দু'রকম পদ্ধতিরই ভাল গুণ আছে। তবে ব্যবহারিক দিক থেকে এর কিছু অসুবিধাও আছে—

[এক] শিক্ষার্থীদের উপর অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার ফলে, অনেক সময় খারাপ ফল দেখা দিতে পারে। যারা খুব বেশী সাহায্য চায় তাদের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অনেক কমে যায়, ফলে তারা বেশী পিছিয়ে পড়ে।

[দুই] শিক্ষার্থীদের নিজেদের উপর অগ্রগতির পরিমাপের ভার দিলে, অনেক সময়, তারা গোপন করার চেষ্টা করতে পারে।

[তিন] এই পরিকল্পনায় যে বিভিন্ন ধরনের বিশেষজ্ঞ নিয়োগের কথা বলা হ'য়েছে, তাদের জন্য ব্যয়ভার বহন করা বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হ'য়ে ওঠে না।

[চার] সবশেষে এই পদ্ধতিতে কোন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকার জন্য অনেক সময় দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা যে সব বিষয়ে বেশী আগ্রহী বা যে-সব বিষয় সহজ সেই সব বিষয়ে অনেক এগিয়ে যায় এবং অন্যান্য বিষয়ে পিছিয়ে থাকে। এতে ক'রে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা হয়। সবশেষে গিয়ে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, একই শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে যখন দশম শ্রেণীর উপযোগী জ্ঞান আহরণ করেছে তখন অন্য কোন বিষয়ে তার জ্ঞান ষষ্ঠ শ্রেণীর উপযোগী হ'তে পারে।

এই সব অসুবিধা থাকার জন্য উইনেট্‌কা পরিকল্পনার কার্যকরিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হ'য়েছে। এই সব অসুবিধাগুলোকে দূর করতে পারলে, এই পদ্ধতি যে খুব কার্যকরী হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ ডেক্রলী পদ্ধতি (The Decroly Method) ॥

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ওভাইড্ ডেক্রলি (Ovide Decroly) বেলজিয়ামের ব্রুশেল শহরে তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি যে শিক্ষাপদ্ধতি সেখানে অনুসরণ করেন, তা বর্তমানে তাঁর নামানুসারে, ডেক্রলি পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে উইনেট্‌কা পরিকল্পনার মতই ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা হ'য়েছে। ডেক্রলির শিক্ষাচিন্তার মূল নীতি হ'ল শিক্ষা ব্যক্তিকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গীন জীবন যাপনে সহায়তা করবে। 'জীবন যাপনের জন্য শিক্ষা'

এই হ'ল তার শিক্ষানীতির মূলমন্ত্র এবং এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাকে নিয়োজিত করতে হ'লে—

(১) শিশুকে সমাজ উপযোগী পরিবেশ দিতে হবে বিকাশের জন্য ;

(২) শিশুকে ক্রমবর্ধমান জৈবিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা ক'রে, তার বর্তমান বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ;

(৩) শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে ;

(৪) শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহভিত্তিক করতে হবে ;

(৫) শিশুর সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। কারণ এই প্রবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষাদানের কাজ অনেক সহজ হবে, এবং শিশুর কাছে তা তাৎপর্যপূর্ণ হ'য়ে উঠবে।

এই শিক্ষানীতির উপর ভিত্তি ক'রে ডেক্রলি তার শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁর পদ্ধতির মধ্যে উপরোক্ত নীতিগুলোর প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখতে পাই।

ডেক্রলি পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Decroly Method) :

[এক] ডেক্রলি পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যে শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহভিত্তিক করতে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহের (Centre of interest) নিরূপণ ক'রে শিক্ষাকে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এই পদ্ধতিতে। গতানুগতিক শিক্ষায় আগ্রহের কোন স্থান নেই। শিক্ষার্থীর উপর জ্ঞানের বোঝা জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষা শুরু হয় শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে। আর শিক্ষার মাধ্যমেও তার মধ্যে নতুন চাহিদা ও আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়। এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ শিক্ষার চাহিদা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিশুর মধ্য থেকে আসে।

[দুই] শিশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে মৌলিক চাহিদা আছে তাকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। ডেক্রলি শিশুর চাহিদাকে চারটে ভাগে ভাগ করছেন—(১) খাদ্যের চাহিদা, (২) প্রকৃতির সঙ্গে অভিযোজনের চাহিদা, (৩) আত্মরক্ষার চাহিদা এবং (৪) সক্রিয়তার চাহিদা। এই মৌলিক চাহিদা (Basic needs)-গুলোকে ভিত্তি ক'রে এক একটা আগ্রহের কেন্দ্র (Centre of interest) তৈরী করা হয় এবং এক একটি কেন্দ্রের উপর এক বছরের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই আগ্রহ-কেন্দ্রের মাধ্যমে সব রকম বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়।

[তিন] ডেক্রলী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা থেকে শুরু করে, পশু পাখী পোষা পর্যন্ত সমস্ত কাজই শিক্ষার্থীরা করে। এতে ক'রে তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন হয়।

[চার] এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হ'য়ে কাজ করে এবং কাজ শেষ হ'য়ে গেলে সব শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক একত্রে মিলিত হন এবং বিভিন্ন কাজের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন। তাদের পরস্পরকে সমালোচনা করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং যদি অন্যের মত ঠিক হয়, তা সহজ ভাবে গ্রহণ করতে শেখানো হয়।

[পাঁচ] এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়ানো হয়। কোন বিশেষ বিষয়বস্তুর উপর একজন শিক্ষার্থী বক্তৃতা দেয়। এতে ক'রে তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়।

[ছয়] এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয় পরিচালনা ও পরিবেশের সংগঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তিনি বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ বিদ্যালয়ে আদর্শ পরিবেশ না থাকলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কখনই সার্থক হবে না। বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন—

(১) বিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব স্বাভাবিক হওয়া দরকার। শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেন বাস্তবোচিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করতে হবে।

(২) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেন খুব বেশী না হয়।

(৩) বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের সহপাঠের (Co-education) ব্যবস্থা থাকা উচিত। এর মাধ্যমে সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে তাদের মধ্যে।

(৪) বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষগুলোকে পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করতে হবে। এতে থাকবে নানা ধরনের কাজ করার উপকরণ।

(৫) শিক্ষকের দায়িত্ব হবে ডাল্টন পরিকল্পনার বিশেষজ্ঞদের মত। শিক্ষার্থীদের যে-কোন সমস্যার সমাধান করার মত ক্ষমতা তাদের থাকা চাই এবং তাদের প্রেরণা জোগানোর মত উদ্যম তাদের থাকার দরকার।

[ছয়] বিদ্যালয় পরিচালনা করবে শিক্ষার্থীরাই, এজন্য তাদের মধ্যে বিভিন্ন দল গঠন করা হবে।

[সাত] এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয় ও অভিভাবকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের

উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন হ'লে বিদ্যালয়ের কাজ অনেক সহজে সম্পন্ন করা যায়।

ডেক্রলি পদ্ধতিতে খেলাভিত্তিক শিক্ষার তত্ত্বকে পুরোপুরি ভাবে প্রয়োগ করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে পাঠাভ্যাস করবে। খেলার মাধ্যমে জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় কৌশল আয়ত্ত করবে, বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে বিভিন্ন জিনিস সংগ্রহ করবে এবং প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হবে—এই ছিল ডেক্রলির ইচ্ছা এবং তিনি তার শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমে তা করতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। তাই এই পদ্ধতির বহুল প্রচলন ইওরোপ ও আমেরিকায় দেখা যায়।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি (Basic Systems) ॥

বুনিয়াদী শিক্ষা মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষামূলক চিন্তার ফলস্বরূপ প্রবর্তিত হ'য়েছে। গান্ধীজি যদিও বিশেষভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেছেন জীবনের বেশীর ভাগ সময়, তবুও তাঁর মনে ধারণা ছিল, এই রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য দেশবাসীর আদর্শ শিক্ষার প্রয়োজন। তিনি গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা বহু দিনের চিন্তার ফল। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন, তাঁর যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল এবং পরে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বাস করার সময়, তাঁর যে অভিজ্ঞতা হ'য়েছে তার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষা জন্মলাভ করেছে। ১৯১৪ সালে তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন, তখন টলস্টয় ফার্মে (Tolstoy farm) তিনি নতুন ধরনের শিক্ষামূলক পরীক্ষার সূত্রপাত করেন। এখানে সবাই একই পরিবারভুক্ত লোকের মত বাস করতো এবং গান্ধীজিকে পিতার মত শ্রদ্ধা করতো। গান্ধীজি দেহ ও মনের বিকাশের জন্য ছাত্রদের দৈহিক আট ঘণ্টা কাজ করাতেন। পাঠ্যপুস্তকের কোন ব্যবস্থা ছিল না। মানসিক বিকাশের জন্য ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় মুখে মুখে শেখানো হ তো এবং দৈহিক বিকাশের জন্য নানারকম কাজও নির্দিষ্ট করা ছিল। মাটি কাটা, লাঙ্গল করা, বাগান পরিচর্যা করা ইত্যাদি কাজ ছাত্রদের করতে হ'ত। ১৯১৫ সালে তিনি ভারতবর্ষে এসে শাবরমতীতে অনুরূপ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে ১৯৩৫ সালে সেবাগ্রামে আর একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে থাকাকালীন ১৯৩৭ সালে তিনি প্রকাশ্য ভাবে তাঁর শিক্ষামূলক পরীক্ষার কথা

হরিজন পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এইজন্য একে অনেক সময় সেবাগ্রাম পদ্ধতিও বলা হয়। এই বছরই অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় তিনি শিক্ষাবিদ্‌দের এক সম্মেলন ডাকেন এবং এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য ডঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠন করা হয়। তাই অনেক সময় ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardha Scheme) বলা হয়। এই পরিকল্পনা বিভিন্ন রূপান্তরের মাধ্যমে তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে। আমরা এখানে তার বর্তমান সংগঠনের দিক সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ সাধন করা, আর তার জন্য যে-কোন একটা হাতের কাজকে শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তিনি হরিজন পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"The principle idea is to impart the whole education of the body and the mind and the soul through the handicraft that is to be taught to the children. You have to draw out all that is in the child through teaching all the processes of the handicraft and all your lessons in history, geography and arithmetic will be related to the craft."

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও পাঠ্যক্রম (Salient features of Basic system and its Curriculum) :

গান্ধীজির বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনার অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে আধুনিক কালে। এই পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করবো। আমরা এই পরিকল্পনায় যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই তার উল্লেখ করছি—

[এক] শিক্ষাকে জল, বায়ু, আলো ইত্যাদির একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হ'চ্ছে। বায়ু, আলো, জল যেমন আমরা মুক্তভাবে পাই, তার জন্য অর্থের দরকার হয় না, তেমনি শিক্ষাকেই অবৈতনিক করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাই অবৈতনিক করার কথা বলা হ'য়েছে।

[দুই] গান্ধীজি তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের কালে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথাও বলেছেন।

[তিন] এই শিক্ষার সময়কাল হবে আট বৎসর। যদিও ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় এর সময় সীমার কথা বলা হয়েছিল, পরে খের (Kher) কমিটি এই

শিক্ষাকাল আরো এক বছর বাড়ান। ফলে এই শিক্ষার অন্তর্গত শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা হবে ছয় থেকে চোদ্দ বৎসর।

[চার] এই পদ্ধতিতে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কারণ, মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিশুর চিন্তাশক্তি, ভাব বোধ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করা সম্ভব হবে।

[পাঁচ] এই পদ্ধতিতে শিক্ষাকে সক্রিয় করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়েছে। কাজ এবং খেলার মাধ্যমে শিশুরা শিক্ষা করবে। তাই গান্ধীজি খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন—"In my scheme of things, the hand will handle tools before it draws or traces the writing, the eyes will read the pictures of letteıs and words as they will know other things in life, the ear will catch the names and meanings and sentences."

[ছয়] বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার উপর শুধু যে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে তাই নয়। শিক্ষার্থীরা যে কাজ করবে তা উৎপাদনমূলকও হবে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমূলক কাজের (Productive activity) মাধ্যমে শিক্ষা করবে এই পদ্ধতিতে।

[সাত] এই শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাকে স্বয়ং নির্ভরশীল করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। শিক্ষার্থী বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে শিখবে, একই সঙ্গে উৎপাদন করবে এবং এই সব জিনিস বিক্রয় ক'রে যে অর্থাগম হবে তাতে শিক্ষার কিছুটা খরচ চলবে। এই উদ্দেশ্যেই গান্ধীজি এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এতে ক'রে দুঃস্থ পিতামাতাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে বর্তমান কালে, আর গ্রহণ করা হয়নি।

[আট] এই পদ্ধতিতে হস্তশিল্পকে (Craft) বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। সুতো কাটা, কাপড় বোনা ইত্যাদি শিল্পকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন গান্ধীজি। এছাড়া কৃষিকাজ, সেলাই-এর কাজ ইত্যাদিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে বলা হয়েছে।

[নয়] বুনিয়াদী শিক্ষায় হস্তশিল্পকে শুধুমাত্র শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও বিবেচনা করা হ'য়েছে। গান্ধীজি বলেছিলেন, এই হস্তশিল্পকে কেন্দ্র ক'রেই অন্য সমস্ত বিষয়ের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের (Correlation) জন্য

হস্তশিল্পকেই কেন্দ্রবিন্দু ধরতে বলা হ'য়েছে। অবশ্য জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আরো দুটো মাধ্যমের কথা বলা হ'য়েছে। এই দু'টো মাধ্যম হ'ল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ।

[দশ] পাঠ্যক্রম রচনার ব্যাপারেও এই পদ্ধতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই পাঠ্যক্রম বিশেষভাবে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—

(১) মূল একটি হস্তশিল্প (Basic Craft)—সুতো কাটা, কাপড় বোনা, কৃষিকাজ, কাঠের কাজ বা ধাতুর কাজ।

(২) মাতৃভাষা—শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ।

(৩) অঙ্ক, শুধুমাত্র ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। কাজ করতে গিয়ে যতটুকু অঙ্কের প্রয়োজন হয় তাই শিখবে শিক্ষার্থীরা।

(৪) সমাজবিদ্যা : এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিজে বুঝতে শিখবে।

(৫) সাধারণ বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান যা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে, সেইটুকুই মাত্র জানতে হবে।

(৬) চিত্রাঙ্কন : এর মাধ্যমে সৌন্দর্যবোধের বিকাশ হবে এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হবে।

(৭) সংগীত : এর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সংগীতের প্রতি যে স্বাভাবিক আগ্রহ আছে তা চরিতার্থ হবে।

(৮) বাধ্যতামূলক শরীর চর্চা : এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশ হবে। পাঠ্যক্রমের সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীরা শিখবে উপজাত অভিজ্ঞতা হিসেবে, কাজ করতে গিয়ে।

[এগার] বুনিয়াদী শিক্ষার সংগঠনের পদ্ধতিতেও নতুনত্ব আছে। শিশুর সম্পূর্ণ শিক্ষাকে দু'টো স্তরে ভাগ করা হ'য়েছে—একটা হ'ল নিম্ন বুনিয়াদী ৬ থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত এবং অপরটা হ'ল উচ্চ বুনিয়াদী স্তর ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত। এই দুই স্তরের পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। কেবলমাত্র উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে মেয়েদের জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের কথা বলা হ'য়েছে।

[বার] এই পদ্ধতিতে যৌথ প্রচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন কাজ শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে সম্পাদন করে। এই

সব যৌথ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক গুণের বিকাশ হয় এবং নৈতিক গুণেরও বিকাশ হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার গুণাবলী (Merits of the Basic System) :

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার যে সব সাধারণ গুণ আছে, বুনিয়াদী শিক্ষারও তা আছে। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষাও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা। এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্মত। এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার চাহিদাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে, অন্য দিকে ভারতবর্ষের মত অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশের সামাজিক চাহিদাকে সম্পূর্ণ ভাবে বিবেচনা ক'রে তার সমাধান করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। এছাড়া তার বিভিন্ন বিশেষ গুণগুলোর কথা উল্লেখ করছি—

(১) এই পদ্ধতি সক্রিয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে, শিক্ষার্থীরা বিশেষ ভাবে আগ্রহী হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে যে কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার সৃজনাত্মক এবং সামাজিক উপযোগিতার দিকও আছে। ফলে সেই কাজ সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক চেতনার বিকাশ হয়।

(৩) কায়িক শ্রমকে পাঠ্যক্রমে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মন থেকে কর্মবিমুখতা ছোট বেল থেকে দূর হয়।

(৪) কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বিরাজ করে।

(৫) দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পর্ক আছে বলে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনে এই পদ্ধতি সহায়তা করে।

(৬) শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে যখন কর্মসম্পাদন করে, তার মধ্য দিয়ে তাদের অনেক প্রয়োজনীয় সামাজিক সংলক্ষণের (Social traits) বিকাশ লাভ করে এবং এই বৈশিষ্ট্য সুস্থ সমাজ জীবন যাপনে সহায়তা করে। যেমন—সততা, আত্মসংযম, সহযোগিতা ইত্যাদি।

(৭) এই পদ্ধতিতে মাতৃভাষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে ক'রে শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশের সুযোগ পায়। প্রথম এই পরিকল্পনা যখন রচনা করা হয়, তখন ইংরেজী শিক্ষাকে এই পদ্ধতি থেকে বর্জন করা হ'য়েছিল। কিন্তু এখন ইংরেজী একটা ভাষা হিসেবে বা বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে।

(৮) বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তিমূলক জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। এখানে যে সব হস্তশিল্প শেখানো হয়, তার যে-কোন একটাকে পরবর্তিকালে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। বুনিয়াদী শিক্ষার এই দিকের কথা বিবেচনা ক'রে তাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

(৯) এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এটা শিশুকেন্দ্রিকও বটে। শিক্ষার্থীর চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর এই পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

(১০) এই পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে দেহ চর্চাকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। ফলে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশকেও শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়েছে।

(১১) সবশেষে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নৈতিক মানের উন্নতি করার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি (Demerits of the Basic System) : বুনিয়াদী শিক্ষার উপরোক্ত গুণগুলো থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে তা যথেষ্ট পরিমাণে জনপ্রিয় হয়নি। এর কারণ অবশ্য নানা রকম আছে। এর জন্য আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, আমাদের চিন্তাধারা অনেকাংশে দায়ী। কিন্তু তাছাড়াও এই পদ্ধতির মধ্যেকার অনেক ত্রুটিও এর জন্য দায়ী। এর প্রধান ত্রুটিগুলো আমরা নীচে উল্লেখ করছি—

প্রথমতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষ কোন হস্তশিল্পের সাহায্যে শিক্ষাকে সক্রিয় ক'রে তোলার কথা বলা হ'য়েছে। কিন্তু এতে ক'রে পরিপূর্ণ সক্রিয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে আসে না। তার কারণ, আমরা যদি শুধু একটি কাজের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আবদ্ধ রাখি তাহ'লে তার অন্যান্য কাজের প্রতি যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তাকে দমন করা হয়। তাছাড়া সব শিক্ষার্থীর যে মুষ্টিমেয় কয়েকটা কাজের মধ্যে একটার প্রতি প্রবণতা থাকবে তার কোন অর্থ নেই।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ শিক্ষাকে বিশেষ হস্তশিল্পের মাধ্যমে শেখানোর কথা বলা হ'য়েছে। এই ধরনের অনুবন্ধ (correlation) স্থাপন সব সময় সম্ভব হয় না। অনেক সময় এই অনুবন্ধ কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে। বর্তমানে অবশ্য শিক্ষার্থীর প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হ'য়েছে। তাতে ক'রে কাজ অনেকটা সহজ হ'য়েছে।

তৃতীয়তঃ, এই অনুবন্ধ প্রণালীতে পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দেশে উপযুক্ত শিক্ষকের খুবই অভাব। ফলে বুনিয়াদী পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে চলেছে।

চতুর্থতঃ, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রামীন ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ যে পরিবেশে এই শিক্ষার কথা বলা হ'য়েছে, তা গ্রামের জীবনের পক্ষে উপযোগী এবং শিল্প নিবাচন গ্রামের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব। কিন্তু শহরের শিল্প নির্বাচন ক'রে এই পদ্ধতিতে পড়ানোর অনেক অসুবিধা আছে। তার কারণ শহরের শিল্প মানেই যান্ত্রিক এবং জটিল। এই কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে সর্বজনীন শিক্ষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেনি।

সবশেষে, এই শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পর আর কোন পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা এ পর্যন্ত হয়নি। ফলে যারা আরো শিক্ষা চায় তাদের আবার গতানুগতিক বিদ্যালয় এবং কলেজে যেতে হয় এবং এই পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোন মিল না থাকায় তাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। এই শিক্ষা তাদের পক্ষেই উপযোগী যারা এই স্তরের পর আর পড়াশুনা করবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি ক্রমবিকাশমান পদ্ধতি। তাই গান্ধীজির প্রবর্তনের পর এর অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হ'য়েছে, এবং হ'য়ে চলেছে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা এবং তার চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে জাতির জনক শিক্ষার যে আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে গেছেন, তাকে স্থির রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। ভারত সরকার এই পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য খুবই সচেষ্ট। এই কারণে, ১৯৫৬ সালে এক কমিটি নিয়োগ করা হ'য়েছিল বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি সমীক্ষা ক'রে দেখার জন্য। এই কমিটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তাদের রিপোর্টে এবং উন্নতির জন্যও নান' রকম পন্থার কথা বলেছেন। সে সম্পর্কে আলোচনা ক'রে আমরা এই আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

প্রশ্নাবলী

1. Describe Froebl's Kindergarten System and main principles acting behind it.

Ans : ২৩৭ হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান
Class Teaching

শিক্ষক (Learning) এবং পাঠদান (Teaching) শিক্ষা প্রক্রিয়ারই দুটো দিক, এদের পারস্পরিক সক্রিয়াতার মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক হয়। এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে কোন একটা ত্রুটি থাকলে, সম্পূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনাই নষ্ট হ'য়ে যাবে। এদের মধ্যে শিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের (Educational Psychology) অন্তর্গত, কিন্তু পাঠদান (Teaching) শিক্ষা বিজ্ঞানের (Education) আলোচনার অন্তর্গত ; বৃহত্তর অর্থে পাঠদান বলতে আমরা সেই সব উপায়কে বলি যার দ্বারা সমাজের বয়স্ক লোকেরা শিশুদের জীবন পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করে [Teaching is the means whereby the experienced members of the group guide the immature and infant members is their adjustment to life.—*Yoakam & Simpson*]. পাঠদানের কাজ সমাজের যে কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা হ'য়ে থাকে। পরিবারের সভ্যরা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পুরোহিতরা, রাষ্ট্রনায়করা সকলেই অপরিপক্ক শিশুকে পাঠদান করে থাকেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে তার শিক্ষক। তবে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঠদানের দায়িত্ব তার উপরই সবচেয়ে বেশী এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব যাঁরা নিয়ে থাকেন সেই শিক্ষকের উপর পাঠদানের কাজ এসে পড়ে। তাই সাধারণ অর্থে পাঠদান (Teaching) বলতে শিক্ষকের কাজকে বুঝি। তবে এটা পাঠদানের একটা বিশেষ রূপ মাত্র। একে নিয়মতান্ত্রিক পাঠদান (Formal teaching) বলাই ভাল।

সার্থক পাঠদানের মূলনীতি (Principles of good teaching) : শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে পাঠদানকে সার্থক ও ত্রুটিহীন করতে হবে ; তাঁর কাজের যথার্থতা প্রমাণ হবে, শিশু কতটা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পেরেছে, তার থেকে। কৃষ্ণায়া (Krishnayya) বলেছেন "The fundamental distinction between successful and unsuccessful

teaching lies in the amount and value of learning that is stimulated in the pupils." ভাল পাঠদান কতকগুলো মূলনীতির উপর ভিত্তি ক'রে আছে। এগুলোকে আমরা আদর্শ পাঠদানের বৈশিষ্ট্যও বলতে পারি।

[এক] আদর্শ পাঠদানের মূলনীতি হ'ল শিক্ষার্থীকে সার্থক ভাবে তার আত্মশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োগ করতে সহায়তা করা। আধুনিক কালে মনোবিদ্‌রা বিশ্বাস করেন, কোন কিছু শেখানো যায় না, সবকিছুই শিখতে হয় (Nothing can be taught everything is to be learned)। তাই শিক্ষার্থীর সেই শিক্ষণের ইচ্ছাকে জাগ্রত ক'রে সার্থক শিক্ষণে সহায়তা করাই হবে আদর্শ পাঠদানের বৈশিষ্ট্য।

[দুই] আদর্শ পাঠদানের মূলনীতি হ'ল—সহানুভূতি ও হৃদ্যতামূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি। সহানুভূতিশীল ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছাড়া পাঠদানের কাজ সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

[তিন] আদর্শ পাঠদানের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল ভাল পরিকল্পনা। আদর্শ শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কি কি কাজ করবেন ছাত্রদের শিক্ষণকে সহায়তা করার জন্য তা আগে থেকেই ভেবে রাখেন। একেই বলা হয় তাঁর পরিকল্পনা বা পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson plan)। এই পরিকল্পনা সুন্দর এবং ত্রুটিহীন না হ'লে পাঠদান সার্থক হবে না।

[চার] আদর্শ পাঠদানের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল শ্রেণীকক্ষের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করা। ছাত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া পাঠদানের কাজ ও শিক্ষণ সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তাই আদর্শ পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক এই সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন।

[পাঁচ] আদর্শ পাঠদানের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—অনুভাবন প্রক্রিয়ার (suggestion) যথাযথ প্রয়োগ। ছাত্ররা স্বভাবতঃই শিক্ষকের দ্বারা অনুভাবিত হয়। শিক্ষক পাঠদানের সময় এই প্রক্রিয়াকেই কাজে লাগাবেন। তাদের উপর জোর ক'রে কিছু চাপিয়ে দেবেন না।

[ছয়] আদর্শ পাঠদানের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষক যদি একনায়কত্বের নীতি শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা স্বভাবতঃই বিদ্রোহী হ'য়ে উঠবে। শিক্ষক পাঠদানের

সময় এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন যাতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না হয়। তাই আদর্শ পাঠদানের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে তার শিক্ষণে সহায়তা করা।

[সাত] আদর্শ পাঠদানের রীতি শিক্ষার্থীকে সক্রিয় ক'রে তুলবে। অর্থাৎ, শিক্ষক পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন ভাবে উত্তেজিত (stimulate) করবেন যে, তারা নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষণে প্রবৃত্ত হবে।

[আট] পাঠদানের কাজকে ভাল করতে হ'লে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগতে হবে। পাঠদানের মাধ্যমে আমরা শিশুর অভিজ্ঞতাকে পুনর্বিন্যাস করবো। আধুনিক সংব্যাখ্যানে শিক্ষণ হ'ল (organisation and re-organisation of experience) অতীত অভিজ্ঞতার পুনর্বিন্যাস ছাড়া কিছুই নয়, তাই পাঠদানের কাজ এমন ভাবে পরিচালনা করতে হবে যাতে ক'রে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। তাই অতীত অভিজ্ঞতার বিবেচনাকেও আদর্শ পাঠদানের বৈশিষ্ট্য বা মূলনীতি হিসেবে উল্লেখ করতে পারি।

[নয়] আদর্শ পাঠদানের সব সময় একটা উচ্চ আদর্শ থাকবে এবং সেই আদর্শের পথে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব সময় সচেষ্ট হ'তে হবে। এই আদর্শ ই শিক্ষার আদর্শ বা লক্ষ্যের সামিল।

[দশ] আদর্শ পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করবেন তাই নয়, তারা যখন সক্রিয় ভাবে কাজ করবে তখন তিনি তাদের বিশেষ অসুবিধা-গুলোও লক্ষ্য করবেন। অর্থাৎ আদর্শ পাঠদানের বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষার্থীর ত্রুটি ও অসুবিধাগুলো নির্দেশ করা।

[এগার] আদর্শ পাঠদানের বৈশিষ্ট্য শুধু শিক্ষার্থীদের ত্রুটি নির্ধারণে সীমাবদ্ধ নয়, সেই ত্রুটি দূর করার জন্য সংস্কারমূলক (Remedial) ব্যবস্থা গ্রহণেরও প্রয়োজন। পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ধরনের যে ত্রুটিগুলো থাকে তা দূর করার চেষ্টা করবেন।

[বারো] সবশেষে, আদর্শ পাঠদান শিক্ষার্থীদের উন্মুখতা এনে দেবে। তারা আত্মনির্ভরশীল হবে, আত্মবিশ্বাস আসবে তাদের ভাল পাঠদানের মধ্য দিয়ে। তাই একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ বলেছেন—"The ideal of good teachers is to liberate the child from teaching."

পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি উপরোক্ত মনোভাবগুলো জাগিয়ে

তোলা যায়, তবেই পাঠদানের কাজ সার্থক হবে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যে পৌছানো সহজ হবে। তাই প্রত্যেক শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে যেন এই সব নীতিগুলোকে মনে রেখে, আদর্শ ভাবে পাঠ-পরিকল্পনা করেন।

॥ পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Planning) ॥

পাঠদানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনা একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। পাঠ-পরিকল্পনার (Lesson Planning) প্রয়োজনীয়তা যে-কোন শিক্ষকই শ্রেণীকক্ষে উপলব্ধি করেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করার আগে প্রত্যেক শিক্ষকই, লিখিত না হ'লেও মনে মনে পাঠ তৈরী ক'রে নেন। কিন্তু অনেকেই নিয়মমাফিক কোন পরিকল্পনা রচনার কথা ভাবেন না। আর এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিও আগে ছিল না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ্ প্রথম পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পন্থার কথা বলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বিশেষ ভাবে, এই পাঠ-পরিকল্পনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাঁর পাঠ-পরিকল্পনার রীতি তাঁর শিক্ষাদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মন-সম্পর্কীয় ধারণাও এই পাঠ-পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। তিনি মনে করেন 'মনে' এ জ্ঞান সুসংবদ্ধ ভাবে অবস্থান করে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মনে পৃথক ভাবে অবস্থান করে না। তারা একত্রিত হ'য়ে অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সৃষ্টি করে। শিশু যে-সব নতুন জ্ঞান আহরণ করে তা সেই অভিজ্ঞতাপুঞ্জের (Apperceptive mass) সঙ্গে একাত্ম ক'রে রাখে। যে অভিজ্ঞতা ঐ পুঞ্জের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে আসে না ব্যক্তি তাকে গ্রহণ করতে পারে না, বা গ্রহণ করতে হ'লেও অনেক চেষ্টা করতে হয়। হার্বার্ট (Herbert) এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে পাঠ-পরিকল্পনার কাঠামো রচনা করেন এবং প্রায় প্রত্যেক দেশেই তার প্রবর্তিত নীতি অনুসরণ ক'রে, পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করা হয়। তাঁর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা পাঠের (Lesson) বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

শ্রেণীকক্ষে আমরা বিভিন্ন ধরনের যে বিষয় পড়াই তার বিভিন্নতা বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন আছে, পাঠদানের কৌশল এবং উদ্দেশ্যের দিক থেকেও আছে। এমন অনেক বিষয় আছে যার জন্য বিশেষ ভাবে আগমনমূলক চিন্তাশক্তি (inductive thinking) প্রয়োজন হয়; আবার কিছু বিষয় আছে যেখানে নিগমনমূলক চিন্তাশক্তির (deductive thinking) বিশেষ প্রয়োজন হয়।

এছাড়া কিছু বিষয় আছে যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল কিছু অভ্যাস বা দক্ষতা গঠন এবং কিছু আছে যেখানে ছাত্রদের বোধগম্যতার (appreciation) উপর গুরুত্ব দেওয়া, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের পাঠে বিভিন্ন ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে। এই দিক থেকে পাঠকে (lesson) বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, আগমন চিন্তামূলক পাঠ (Inductive lesson), নিগমন চিন্তামূলক পাঠ (Deductive lesson), চর্চামূলক পাঠ (Drill lesson, বা, Habit lesson) এবং বোধগম্যতামূলক পাঠ (Appreciation lesson)। এদের মধ্যে আগমন চিন্তামূলক পাঠে (Inductive lesson) হার্বার্টের পাঠ-পরিকল্পনার পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষকরা এত বেশী পরিমাণে হার্বার্টের এই পদ্ধতির উপর আস্থা প্রকাশ করেন যে, কোন রকম পাঠেই এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

পাঠ-পরিকল্পনা পদ্ধতি (Methods of Planning Lesson) : হার্বার্ট তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বলেছেন শিক্ষা হবে অতীত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সঙ্গে অনুষঙ্গের (association) মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করি। অর্থাৎ নতুন পাঠের সঙ্গে অতীত পাঠের একটা সংযোগ যদি না থাকে তাহ'লে শিক্ষা হবে না। তাই তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এছাড়া হার্বার্ট পরস্পর সম্পর্ক রেখে অভিজ্ঞতা সমূহের উপস্থাপনের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে, ক্রমানুসারে বিষয়বস্তু উপস্থাপন না করলে অনুষঙ্গ স্থাপন হবে না। এছাড়া হার্বার্ট স্পষ্টতার (clearness) কথা বলেছিলেন। অভিজ্ঞতা স্পষ্ট না হ'লে তা অতীত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সঙ্গে মিশবে না। এই নীতির উপর ভিত্তি ক'রে হার্বার্টের অনুগামীরা পাঠদানের ক্ষেত্রে নতুন এক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনার যে নিয়মের কথা বলা হ'য়েছে, তা মনোবিজ্ঞার তত্ত্বের দ্বারা সমর্থিত। এই পাঠ পরিকল্পনার রীতি বর্তমানে বহু প্রচলিত পঞ্চ সোপান (Five steps) নামে পরিচিত। এই পাঁচটি সোপান হ'ল—(১) আয়োজন (Preparation), (২) উপস্থাপন (Presentation), (৩) অনুষঙ্গ বা সংযোগ স্থাপন (Association), (৪) সামান্যীকরণ (Generalization), এবং (৫) অভিযোজন (Application)। তবে প্রকৃতক্ষেত্রে হার্বার্টের তিনটি মুখ্য সোপান—আয়োজন (Preparation), উপস্থাপন (Presentation) এবং অভিযোজন (Application)। এই স্তরের

উপর ভিত্তি ক'রে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা হয়। অনুষঙ্গ ও সামান্যীকরণ —এই দু'টো স্তরকে ঠিক বাদ দেওয়া হয় না; স্বাভাবিক ভাবে আয়োজন, উপস্থাপন ও অভিযোজনের মাধ্যমে তাদের অনুশীলন হয়। তাই সাধারণতঃ শিক্ষকদের তৈরী পাঠ-পরিকল্পনায় এই দুই স্তরের নির্দেশ থাকে না।

হার্বার্টের পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনার বর্ণনা (Description of Lesson-plan on Herbertian Steps):

সাধারণতঃ পাঠ-পরিকল্পনা কিভাবে করা হয় এবং পাঠ-পরিকল্পনায় কি কি অংশ থাকে ধারাবাহিক ভাবে তার উল্লেখ করছি—

১। **প্রাথমিক তথ্য (Preliminary Information):** পাঠ-পরিকল্পনায় প্রথমেই কতকগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়। এই তথ্যগুলো পাঠ-পরিকল্পনার তাৎপর্য অনেকাংশে প্রকাশ করে। এই তথ্য দু'ধরনের হয়। প্রথমতঃ, ছাত্র, বিদ্যালয়, শিক্ষক ইত্যাদি-সংক্রান্ত; দ্বিতীয়তঃ, পাঠ-সংক্রান্ত। দু'ধরনের তথ্য তালিকার আকারে কিভাবে লেখা হয় এবং কি কি তথ্য তা নীচে দেখানো হ'ল—

॥ বিদ্যালয়ের নাম ॥	॥ বিষয় ॥
॥ শ্রেণী ॥	॥ বিশেষ বিষয় ॥
॥ শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ॥	॥ পাঠক্রম ॥
॥ শিক্ষার্থীদের গড় বয়স ॥	(১) ....
॥ শিক্ষকের নাম ॥	(২) ....
॥ সময় সীমা ॥	(৩) ....
॥ তারিখ ॥	(৪) ....
	দিনের পড়া

২। **পাঠের উদ্দেশ্য (Purpose of the Lesson):** এর পর পাঠ-পরিকল্পনায় বিশেষ পাঠের উদ্দেশ্য কি, অর্থাৎ শিক্ষক কি উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠ দিচ্ছেন তা লেখার দরকার। পাঠ্য বিষয় বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে, সুতরাং তার উদ্দেশ্যেরও পার্থক্য হবে। সাধারণতঃ উদ্দেশ্যকে দু'ভাগে ভাগ ক'রে লেখা হয়। একটা হ'ল প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য (direct or immediate aim)। এখানে বিশেষ ভাবে শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক কি কি পরিবর্তন করা হ'চ্ছে তা উল্লেখ করা হয়। আর একটা হ'ল পরোক্ষ উদ্দেশ্য (indirect or ultimate aim)। এই ধরনের উদ্দেশ্যগুলো সাধারণতঃ বাহ্যিক আচরণগত

নয়; মানসিক বৈশিষ্ট্যগত। এই উদ্দেশ্য শিক্ষকের কাছে পরবর্তী পর্যায়গুলির নির্ণায়ক হিসেবে কাজ করবে। শিক্ষক যদি উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহ'লে তিনি পাঠদানের কাজে সফল হ'তে পারবেন না। তাই পাঠ পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করার রীতি আছে।

৩। **পূর্বজ্ঞান সম্পর্কিত বিবরণ (Statement of previous Knowledge):** এই অংশে শিক্ষক ছাত্রদের আলোচ্য পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে কি পূর্বজ্ঞান আছে তা উল্লেখ করেন। এই বিবরণের উপর নির্ভর ক'রে পরবর্তী স্তরের দিকে অগ্রসর হবেন। কারণ, শিক্ষাকে পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত না করতে পারলে তা সার্থক হবে না। হার্বার্টের এই নীতির উপর গুরুত্ব দিতে হ'লে বলতে হয়, শিক্ষক যদি পূর্বজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন না থাকেন তাহ'লে পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করতে পারবেন না। তাই শিক্ষককে এখানে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের বিবরণ দিতে হয়। অর্থাৎ পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি পাঠে কি ভাবে অগ্রসর হবেন তা বলতে হয়। এই পূর্বজ্ঞান সব সময় যে পূর্ববর্তী পাঠের জ্ঞান হবে তার কোন মানে নেই। শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও হ'তে পারে।

৪। **উপকরণ (Materials required):** এই অংশে শিক্ষক পাঠদানের জন্য কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন বা কি কি উপকরণ তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে তার উল্লেখ থাকে। সাধারণ ভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে গেলে, বোর্ড, চক, ঝাড়ন, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি লাগে। এগুলোর উল্লেখ না করলেও চলে, বিশেষ ভাবে কোন উদ্দীপনের (aid) পরিকল্পনা তিনি করেছেন কিনা তা উল্লেখ করবেন।

৫। **আয়োজন ও পাঠঘোষণা (Preparation and Announcement of the Lesson):** এই স্তরে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের যে পূর্বজ্ঞান আছে বলে ধারণা করছেন, তা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা ক'রে দেখবার এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ ঘোষণা করবেন। এতে ক'রে পূর্ব জ্ঞানের সঙ্গে নতুন পাঠের কিছুটা সম্পর্ক স্থাপন হবে। এই স্তরে শিক্ষক ছোট ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে, আলোচ্য পাঠের অনুকরণ ক'রে তুলবেন এবং শিক্ষার্থীদের মনকে পাঠাভিমুখী করবেন।

৬। **উপস্থাপন (Presentation):** এর পর শিক্ষক কিভাবে পাঠ-পরিচালনা করবেন তা লিখবেন। এই পর্যায়ের বিবরণী সাধারণতঃ দু'টো

স্তম্ভে লেখা হয়—একদিকে পদ্ধতি এবং আর এক দিকে বিষয়। পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কি কি কাজ করবেন, কি ধরনের প্রশ্ন করবেন, ছাত্রদের কি কি কাজ দেবেন ইত্যাদি ক্রমানুসারে লিখবেন; অন্যদিকে বিষয়ে, বিষয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো লিখবেন; দরকার হ'লে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরগুলোও লিখতে পারেন। অনেকে এই পর্যায়ের বিবরণী তিনটে স্তম্ভেও লেখেন। একটায় থাকে শিক্ষকের পদ্ধতি, আর একটিতে শিক্ষার্থীর উত্তর ও কাজ এবং অপরটায় বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞান। যে ভাবে লেখা হোক্ না কেন, শিক্ষক এই পর্যায়ে সব সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্ণ সহযোগিতায়, তাদের সক্রিয়তার উপর দৃষ্টি রেখে পাঠ-পরিচালনা করবেন। এই পর্যায়ে শিক্ষক যা প্রশ্ন করবেন, তা যেন বিষয়বস্তু উপস্থাপন বা বিশ্লেষণে সহায়তা করে। এই সব প্রশ্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্ন হবে না। সব প্রশ্নের উত্তর যে শিক্ষার্থীরা দিতে পারবে তা নয়। প্রয়োজন হ'লে শিক্ষক উত্তর বলে দেবেন। তবে প্রশ্ন যদি ঠিক পারম্পর্য বজায় রেখে করা হয় তাহ'লে বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই আসবে।

৭। **পুনরালোচনা (Recapitulation) :** পুনরালোচনার উদ্দেশ্য ঠিক পুনরাবৃত্তি নয় ববং সামান্যীকরণ। অনেক পাঠদানের পর খণ্ড অংশগুলো বা ধারণাগুলোকে গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীর অসুবিধা হয়। এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য হবে সমগ্র পাঠ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক ধারণা দেওয়া। প্রয়োজন বোধে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে সম্পূর্ণ বিষয়ের সার-সংক্ষেপ ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতায় বোর্ডে লেখার ব্যবস্থাও করতে পারেন। তিনি কি করবেন পাঠ-পরিকল্পনায় তা উল্লেখ করবেন।

৮। **অভিযোজন (Application) :** এই পর্যায়ে শিক্ষক পরীক্ষা ক'রে দেখবেন, শিক্ষার্থীরা তার পাঠ কতটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। এখানে পরীক্ষামূলক •ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন। দরকার হ'লে লিখতেও দিতে পারেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন লিখবে তখন তিনি শ্রেণীকাজ পরিদর্শন করবেন, শিক্ষক এই বিষয়ে কি কি কাজ করবেন, কি কি ধরনের প্রশ্ন করবেন তা পাঠ-পরিকল্পনার এই অংশে লিখবেন। এই থেকে শিক্ষকের পাঠ-পরিকল্পনা কতটা সুন্দর হ'য়েছে তা বোঝা যাবে।

৯। **বাড়ীর কাজ (Home task) :** শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান লাভ করলো তা যদি পুনরাবৃত্তির দ্বারা অনুশীলন না করে, তাহ'লে ভুলে যাবে। তাই

শিক্ষকের দায়িত্ব হবে এমন কিছু কাজ দেওয়া, যার সমাধানের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান বার বার প্রয়োগ ক'রে তারা অনুশীলন করবে।

যে-কোন আদর্শ পাঠ-পরিকল্পনায় এই সব অংশগুলো থাকে। এছাড়া আর একটা অংশ থাকলে ভাল হয়। যে অংশটা ঐ পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কিছু কার্যকরী হবে না, পরবর্তী পাঠ-পরিকল্পনা করার সময় তা বিশেষ ভাবে কাজ দেবে। সেটা হ'ল পাঠদান-সংক্রান্ত সমস্যা। পাঠ-পরিকল্পনা যতই সুচিন্তিত হোক্ না কেন, শ্রেণীকক্ষের মধ্যে নানা রকম সমস্যা দেখা যায়, যেগুলো পূর্বে থেকে প্রত্যাশা করা যায় না। এই ধরনের সমস্যাগুলো যদি পাঠদানের পর লিখে রাখা যায় তাহ'লে, পরবর্তী পাঠ-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগানো যাবে। যে পাঠ-পরিকল্পনার বিবরণ আমরা দিলাম তার সম্পূর্ণ একটা ছক এখানে দেওয়া হ'চ্ছে বুঝবার সুবিধার জন্য।

॥ পাঠ-পরিকল্পনা ॥

॥ বিদ্যালয়ের নাম ॥	॥ বিষয় ॥
॥ শ্রেণী ॥	॥ বিশেষ বিষয় ॥
॥ ছাত্র-সংখ্যা ॥	॥ পাঠ্যক্রম ॥
॥ গড় বয়স ॥	(১) ....
॥ সময় সীমা ॥	(২) ....
॥ শিক্ষক ॥	(৩) ....
॥ তারিখ ॥	দিনের পাঠ

॥ উদ্দেশ্য ॥ [প্রত্যক্ষ :
পরোক্ষ :

॥ পূর্বজ্ঞান ॥ [ছাত্রদের কি পূর্বজ্ঞান আছে।

॥ উপকরণ ॥ [শ্রেণীকক্ষের সাধারণ উপকরণ ও অন্যান্য যা কিছু ব্যবহার করবেন।

॥ আয়োজন ॥ [ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য ও তাদের মন পাঠা-ভিমুখী করার জন্য শিক্ষক যে প্রশ্ন করবেন, সেগুলো লিখবেন।

	বিষয়	পদ্ধতি
॥ উপস্থাপন ॥	বিষয়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বা শিক্ষার্থীর উত্তর	শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যা করবেন তার বিবরণ।

॥ পুনরালোচনা ॥	শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতা কিভাবে পুনরালোচনা করবেন।
॥ অভিযোজন ॥	শিক্ষক ছাত্রদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য কি কি কাজ করতে দেবেন, তা লিখবেন।
॥ বাড়ীর কাজ ॥	ছাত্রদের প্রয়োগমূলক কি কি কাজ দেবেন চর্চার জন্য তা লিখবেন।
॥ পাঠদান-সংক্রান্ত সমস্যা ॥	পাঠদানের পর লিখবেন।

পাঠ-পরিকল্পনার সুবিধা (Merits of Lesson Planning) :

পাঠ-পরিকল্পনা রচনাই আদর্শ পাঠদানের বৈশিষ্ট্য। পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে নানাদিক দিয়ে সাহায্য ক'রে শিক্ষার কাজকেও সার্থক ক'রে তোলে। পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করলে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায়—

॥ এক ॥ পাঠ-পরিকল্পনা করা থাকলে শিক্ষকের শ্রেণীর কাজ পরিচলনা করতে সুবিধা হয়। পাঠ-পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষকের যে প্রস্তুতি হয় তা শ্রেণীকক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয়।

॥ দুই ॥ পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষককে নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। তিনি অযথা পাঠের কোন বিশেষ জায়গায় গুরুত্ব দিয়ে সময় নষ্ট করেন না, ফলে শ্রেণীর কাজ অনেক দ্রুত হয়।

॥ তিন ॥ পাঠ-পরিকল্পনা করা থাকলে শিক্ষক সুসামঞ্জস্য ভাবে ছাত্রদের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন। ফলে তাদের গ্রহণ করতে সুবিধা হয়।

॥ চার ॥ পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষক তার নিজের মধ্যে যা কিছু ভাল তা শিক্ষার্থীদের দিতে পারেন।

॥ পাঁচ ॥ পূর্বকল্পিত পাঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে গেলে শিক্ষকের উৎসাহ বাড়ে। কারণ তিনি তাঁর নিজের পরিকল্পনার

সার্থক রূপায়ণই দেখতে চান। তাকে বিফল হ'তে দিতে চান না। ফলে শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

॥ ছয় ॥ পাঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে পাঠদান করলে, শিক্ষক তাঁর প্রচেষ্টার ফল হাতে হাতে পান, অভিযোজন স্তরে। শিক্ষার্থীরা পাঠ ঠিক মত গ্রহণ করেছে কিনা তিনি তা বুঝতে পারেন। ফলে তারা যদি কৃতকার্য হয়, শিক্ষক স্বাভাবিক ভাবে কাজের প্রতি অনুরক্ত হন। অর্থাৎ পাঠ-পরিকল্পনার সাহায্যে পাঠদান করলে, শিক্ষক প্রেষণা শক্তি পান।

॥ সাত ॥ পাঠ-পরিকল্পনা বিদ্যালয় পরিচালনার কাজেও সহায়তা করে। বিদ্যালয়ের বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট বছরের পাঠ্যক্রমকে সহজে পরিমাণ মত ভেঙে পরিকল্পনা তৈরী করা যায়। এতে ক'রে সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমটি পরিকল্পিত আকারে বছরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।

॥ আট ॥ পাঠ সুপরিকল্পিত হ'লে শিক্ষার্থীরা তা সহজে গ্রহণ করতে পারে এবং এতে ক'রে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়।

পাঠ-পরিকল্পনার এই সব সুবিধা আছে বলে, এই ধরনের পাঠ-পরিকল্পনাকে বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই পাঠ-পরিকল্পনা রচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ-পরিকল্পনা সুন্দর ভাবে রচনা করতে পারলে শিক্ষাদানের অর্ধেক কাজই এগিয়ে যায়। পরিকল্পনা ভাল হ'লে শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না।

পাঠ-পরিকল্পনার ত্রুটি (Demerits of Lesson planning):

পাঠ-পরিকল্পনা রচনার মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে তাহ'লে সেই ধরনের পরিকল্পনার পাঠদানের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। তা'ছাড়া পাঠ-পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমাদের কিছু সংস্কার আছে। সেগুলোও পাঠ-পরিকল্পনার খারাপ প্রভাবের কারণ। পাঠ-পরিকল্পনার সাধারণ ত্রুটিগুলোর কথা উল্লেখ ক'রে আমরা এই আলোচনা শেষ করবো।

প্রথমতঃ, পাঠ-পরিকল্পনার শিক্ষাদানের কাজকে যান্ত্রিক (Mechanical) ক'রে তোলে। পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণ ক'রে পড়ালে শিক্ষকের স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়। তাতে ক'রে সম্পূর্ণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটা যান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ, পাঠ-পরিকল্পনা তৈরী হয় বিশেষ ভাবে যুক্তি-তর্কের উপর ভিত্তি ক'রে। পাঠ-পরিকল্পনার মূলতঃ মনোবিদ্যা সম্মত যুক্তি থাকলেও পরিকল্পনায়

বিশেষ ভাবে যুক্তি-তর্কের উপর ভিত্তি ক'রে বিষয়গুলোকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ক'রে সাজানো হয়। এতে ক'রে তর্কবিন্যাসম্মত হ'য়ে পড়ে আমাদের পদ্ধতি। ফলে, শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করতে কষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, হার্বার্টের অনুষঙ্গের তত্ত্ব আধুনিক মনোবিদ্‌রা ঠিক বলে মেনে নেন না। ফলে সেই তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে যে পাঠ-পরিকল্পনা রচনা করা হয় তা মানসিক প্রক্রিয়ার অনুকূল হ'তে পারে না।

চতুর্থতঃ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার বিশেষ কোন সুযোগ থাকে না। খুব চিন্তাশীল শিক্ষকই এর মধ্যে কিছু সক্রিয় উপাদানের সংযোজন করেন, তবে বেশীর ভাগ শিক্ষকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। ফলে আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে অস্বীকার করা হয়। ফলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব সৃজনীস্পৃহার বিকাশের কোন সুযোগ থাকে না।

॥ আলোচনা ॥

পূর্বেই উল্লেখ করেছি শিক্ষকরা এত পরিমাণে এই ধরনের পরিকল্পনার উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন যে, সমস্ত রকম পাঠের ক্ষেত্রেই এই পরিকল্পনার পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এতে ক'রে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই বেশী হয়। কারণ সমস্ত রকম পাঠের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য নয়। শুধুমাত্র আগমন চিন্তামূলক পাঠের (inductive lesson) ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা-পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয়। তবে এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বা আগমন যুক্তিমূলক পদ্ধতি বলা যায় না কারণ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সামান্যীকরণের স্তরে বা পুনরালোচনার স্তরে শিক্ষক নিগমনমূলক যুক্তিরও (deductive reasoning) সাহায্য নেন, ফলে তাই একে অনেক সময় আগমন-নিগমন যুক্তিমূলক পদ্ধতিও (inductive-deductive method) বলা যেতে পারে। কিন্তু তাহ'লেও সব রকম পাঠের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার বাধামুক্ত প্রয়োগ শিক্ষাক্ষেত্রে কাম্য নয়।

নিগমন যুক্তিসম্পন্ন পাঠের ক্ষেত্রে (deductive lesson) পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন ও পর্যায়ের পুনর্বিন্যাস দরকার। পর্যায়ক্রমে এর সোপানগুলো হওয়া উচিত—(১) সমস্যা নির্ধারণ (finding the problem), (২) সাধারণ সূত্র নিরূপণ (finding the general principle), (৩) সিদ্ধান্ত গঠন (inference) এবং (৪) বিচারকরণ (verification)। অর্থাৎ, সমস্যার মধ্যেই নিগমন-পদ্ধতির শুরু এবং সেই সমস্যাকে সার্থক সংব্যাখ্যান দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থী নিজেরা বা শিক্ষকের সহযোগিতায় সাধারণ-সূত্র নির্বাচন করবে।

এই সাধারণ সূত্র থেকে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, সমস্যা সম্বন্ধে। এর পরে সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা ক'রে দেখবে, প্রয়োগের মাধ্যমে। সুতরাং যে সব পাঠে, এই ধরনের যুক্তি একান্ত প্রয়োজন এবং এই ধরনের পদ্ধতি ছাড়া অনুশীলন সম্ভব নয়, যে সব ক্ষেত্রে হার্বার্টের পঞ্চ সোপান পদ্ধতি কার্যকরী নয়। কারণ সেখানে আমরা ঠিক এর বিপরীত পদ্ধতিতে সমাধান করি। খণ্ড খণ্ড টুকরো ঘটনাকে একত্রিত ক'রে সাধারণ সূত্র গঠন করি। অঙ্কে এমন অনেক সমস্যা আছে, যা নিগমনমূলক পরিকল্পনা ছাড়া পাঠদান করা যায় না।

আবার অভ্যাসমূলক যান্ত্রিক পাঠের (Habit lesson or drill lesson) ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ একেবারে অর্থহীন। বিদ্যালয়ে এই ধরনের অনেক অভ্যাসমূলক বিষয় আছে, যেমন—হাতের লেখা, পড়া ইত্যাদি। এখানে শিক্ষার্থীর দক্ষতার উন্নতি চাওয়া হয় যাতে ক'রে পরিশ্রম কমে যায় এবং বার বার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সংগঠন করা হয়। হার্বার্টের পদ্ধতিতে যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তির কোন সুযোগ নেই। এখানে শিক্ষকের কাজ হবে—(১) কাজ করার জন্য বা অভ্যাস গঠনের জন্য যথাযোগ্য প্রেরণার সৃষ্টি করা; (২) শিক্ষার্থীর ধারণা দেওয়া ঠিক কি ধরনের কাজ তাকে করতে হবে; (৩) শিক্ষার্থীদের দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে পুনরাবৃত্তি করানো; (৪) পুনরাবৃত্তির মধ্যে নতুনত্ব আনা, বিভিন্ন ধরনের কাজের পুনরাবৃত্তির সুযোগ দিয়ে; (৫) শিক্ষার্থীদের ভুলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, করণ এই ধরনের পাঠে শিক্ষার্থীরা একবার যদি ভুল শেখে তা দূর করা খুব মুশকিল হ'য়ে পড়ে এবং (৬) সবশেষে, সম্পূর্ণ অভ্যাসের বিচারণ করণ।

বোধগম্যতামূলক পাঠেও হার্বার্টের পদ্ধতি খুব কার্যকরী নয়। এই ধরনের পাঠে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখার জন্য যত বেশী সম্ভব উদ্দীপনের (Teaching aids) ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষকের মতামত অন্ধ ভাবে গ্রহণ না করে সে দিকে নজর রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার মূল্য দিতে হবে। এক কথায় শিক্ষার্থীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে তার নিজের প্রয়োজন মত ও চিন্তাশক্তির উপযোগী ধারণা সংগ্রহে। স্বতঃস্ফূর্ত অবস্থা ছাড়া বোধগম্যতামূলক পাঠ (appreciation lesson) কার্যকরী হবে না। তাই এখানে হার্বার্টের গতানুগতিক পদ্ধতি পাঠের উদ্দেশ্যকেই বদলে দেবে। কারণ তার মধ্যে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ততাকে চেপে রাখা হয়।

সুতরাং পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কে শেষ কথা হ'ল, শিক্ষক এটাকে তার হাতিয়ার হিসেবে কোন সময় ব্যবহার করবেন না। পাঠদানের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন। পাঠ পরিকল্পনা রচনা করার অভ্যাস শিক্ষকের সেই প্রস্তুতির চর্চা মাত্র। শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষকের পরীক্ষাগার—তিনি সেখানে সচেতন ভাবে তার চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করবেন। নির্দিষ্ট পূর্ব-পরিকল্পনা থেকে বিচ্যুতি শিক্ষকের দোষ নয়, যদি সেটি তার পাঠদানে সহায়ক হয়। তিনি শ্রেণীকক্ষের সর্বময় কর্তা এবং সেখানে তার অবাধ স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাই পাঠ-পরিকল্পনা তার শৃঙ্খল নয়; তার মানসিক উন্মুক্ততার প্রতীক।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss fully the essential elements needed in the preparation of an effective lesson plan. [C. U.; B. A., '63]

Ans: ২৭২ হইতে ২৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2. Discuss in details the essential characteristics of good teaching.

Ans: ২৭২ হইতে ২৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Describe the Harbertian Method of Planning Lesson and discuss its merits and demerits.

Ans: ২৭৫ হইতে ২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. Discuss the steps that you will follow in planning different types of lesson.

Ans: ২৭৭ হইতে ২৮১ এবং ২৮২ হইতে ২৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষা গ্রহণ

Examination

শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তির মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনা। সব রকম শিক্ষা প্রচেষ্টার মূলে ঐ একই উদ্দেশ্য কাজ করছে। শিক্ষাদান বা পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীরা কতদূর অগ্রসর হ'য়েছে, তা পরিমাপ ক'রে না দেখলে আমরা বুঝতে পারবো না শিক্ষার প্রক্রিয়ার ফলাফল কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছে। এই কারণে শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষা ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অতি প্রাচীনকাল থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। শিক্ষার্থী শিক্ষার প্রভাব দ্বারা কতটা প্রভাবিত হ'য়েছে তার পরিমাপ করার পদ্ধতিকেই পরীক্ষা বলা হয়। শিক্ষার্থীর উন্নতির বা অগ্রগতির পরিমাপ ছাড়াও পরীক্ষা দ্বারা আরো অনেক উদ্দেশ্য সাধন হয়। তাই পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হ'য়ে আসছে।

॥ পরীক্ষার উদ্দেশ্য (Functions of Examination) ॥

পরীক্ষা পদ্ধতির রীতি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষার প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তার কারণ পরীক্ষা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে—।

[এক] **পরীক্ষা—শিক্ষার্থীর দক্ষতা ও জ্ঞানের পরিমাপক (Examination measures the achievement of the pupil) :**

সাধারণতঃ পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থী বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রভাবে কতটুকু জ্ঞান অর্জন করলো তা পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন হ'য়েছে।

[দুই] **পরীক্ষা—শিক্ষকের দক্ষতার পরিমাপক (Examination measures the efficiency of teacher) :**

শিক্ষক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। তিনি নির্দিষ্ট সময় ধ'রে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। তিনি কি রকম পাঠদান করেছেন তার যথার্থতা প্রমাণিত হবে তার শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় কি রকম ফল

করেছে তার দ্বারা ; তাই পরীক্ষা পাঠদানের সামর্থ্যকেও (Teaching efficiency) পরিমাপ করে।

[তিন] **পরীক্ষা—শিক্ষা পদ্ধতি ও বিদ্যালয়ের ক্ষমতা পরিমাপক (Examination measures the efficiency of teaching Method) :**

পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতির যোগ্যতাও পরিমাপ করা যায়। শিক্ষক কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান করেছেন। এখন ঐ পদ্ধতি যদি উপযুক্ত না হয় তাহ'লে শিক্ষার্থীদের আচরণেরও আশানুরূপ পরিবর্তন হবে না। পরীক্ষার দ্বারা তাঁর এই পদ্ধতির উপযোগিতাও বিচার করা যায়। তাছাড়া, বিদ্যালয়ের পরিবেশ এবং অন্যান্য সাংগঠনিক দিকও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ আদর্শ স্থানীয় না হ'লে, পদ্ধতি যতই ভাল হোক্, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব যতই আদর্শ স্থানীয় হোক্ না কেন, শিক্ষার্থীদের উপর আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে না। তাই পরীক্ষা পরোক্ষ ভাবে শিক্ষণ পদ্ধতি ও বিদ্যালয় পরিবেশের প্রভাবকে পরিমাপ করে।

[চার] **পরীক্ষা—শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পারদর্শিতার নিরূপক (Examination predicts the future performance of the pupil) :**

বর্তমানে যে পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী শিক্ষাস্তরে বা বৃত্তির ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তি নির্বাচন (selcetion) ক'রে থাকি। বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদের ফলাফল বিচার ক'রে বিভিন্ন কলেজে বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। আবার কোন বিশেষ বৃত্তির জন্য কর্মী নিয়োগ করার সময় তাদের পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা হয়। এর পেছনে মূলনীতি হ'ল—পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে পরবর্তী শিক্ষাস্তরের সাফল্যতার বা কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যতার বিশেষ সংযোগ আছে। সুতরাং পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ণায়ক (Prognostic) একটা মূল্য আছে।

[পাঁচ] **পরীক্ষা—শিক্ষণের প্রেষণা শক্তির উৎস (Examination provide motivation to learning) :**

পরীক্ষা শিক্ষার্থীকে প্রেরণা যোগায় শিক্ষণে। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অনেকে পরীক্ষার জন্যই পড়াশুনা করে। তবে এই ধরনের চরম অবস্থার কথা ছেড়ে দিলেও পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীরা তাদের অগ্রগতি সম্বন্ধে যে ধারণা পায়, তাই তাদের পরবর্তী শিক্ষণে প্রেরণা জোগায়। কৃতকার্যতা সম্পর্কে ধারণা (knowledge

of success) যে-কোন প্রচেষ্টামূলক কাজে মানুষকে প্রেরণা জোগায়। এই দিক থেকে পরীক্ষাকে শিক্ষণ-সহায়ক একটি ভাল কৌশল বলা যেতে পারে।

[ছয়] **পরীক্ষা—শিক্ষার্থীর দুর্বলতার নির্ণায়ক (Examination as a diagnostic measure of pupils' weakness) :**

পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা বিশেষ কোন্ কোন্ জায়গায় দুর্বলতা আছে তা নির্ণয় করতে পারি এবং সেই অনুযায়ী নিবারণমূলক শিক্ষার (Remedial teaching) পরিকল্পনা রচনা করতে পারি। তাছাড়া অনেক সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটিগুলো জানতে পারলে, আত্মচেষ্টায় তা দূর করতে পারে। এই কারণে, পরীক্ষার ত্রুটি-নির্ণায়ক একটা মূল্য (diagnostic value) আছে একথা সকলে স্বীকার করেন।

[সাত] **পরীক্ষা—শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির পরিমাপক (Examination as measures of all round development of the pupil) :**

আদর্শ পরিকল্পিত পরীক্ষার লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য (objectives of education) কতটা লাভ করা গেছে, তা পরিমাপ করা। শিক্ষার উদ্দেশ্য বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, এবং সামাজিক সকল রকম বৈশিষ্ট্যের বিকাশ। গতানুগতিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা বলতে আমরা বৌদ্ধিক বিকাশকে (intellectual development) বুঝি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বের সংব্যাখ্যানে শিক্ষা হ'ল সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তাই পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু যে আমরা বৌদ্ধিক বিকাশের পরিমাপ করি তাই নয়, তার অন্যান্য মানসিক, দৈহিক ও সামাজিক গুণের বৃদ্ধিও পরিমাণ করি। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষণ বা পরিমাণকে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা মূল্যায়ন (evaluation) নাম দিয়াছেন।

[আট] **পরীক্ষা—বিদ্যালয় সংগঠনের সহায়ক (Examination as aid to school organisation) :**

বিদ্যালয়ের শ্রেণী বিন্যাস (classification into groups), সময় তালিকা নির্ণয় (fixing of time-table), সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের পরিচালনা (organisation of co-curricular activities), পাঠ্যক্রম নির্ধারণ (determination of curriculum)—সব কিছু পরীক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা দেখে এই সব ব্যবস্থাকে সংগঠিত করতে হবে। তাই পরীক্ষারও একটা সাংগঠনিক দিক আছে।

[নয়] পরীক্ষা—শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনার সহায়ক (Examination as aid to Education and Vocational guidance) :

শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যা দরকার হয় তা হ'ল শিক্ষার্থী সম্পর্কীয় তথ্য (pupil data)। শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তথ্য পেতে হ'লে তা পরিমাপ করে দেখার দরকার। পরিমাণগত (quantitative) তথ্য ছাড়া বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব হয় না। এর জন্য একদিকে যেমন ব্যক্তির বৌদ্ধিক বিকাশকে পরিমাপ করে দেখার দরকার হয়, তেমনি তার বিভিন্ন বিষয়ে (subject) কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে, তাও পরীক্ষা ক'রে দেখার দরকার হয়। বিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা আমাদের এ বিষয়ে সহায়তা করে।

আমরা এই যে উদ্দেশ্যগুলোর উল্লেখ করলাম, তার সমস্তগুলো প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা সার্থক ভাবে সাধিত হয় না। তবে আদর্শগত দিক থেকে বিচার করতে গেলে বলতে হয় যে, কোন পরীক্ষা এই ধরনের উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। বর্তমানে পরীক্ষা ব্যবস্থায় নানা দোষত্রুটি থাকার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষাবিদ্ তার সমালোচনা করেছেন। তার কারণ, তার দ্বারা এই সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কিন্তু পরীক্ষা যদি এই সকল উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহ'লে তার প্রয়োজনও শিক্ষাক্ষেত্রে চিরদিনই থাকবে।

প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ও তার ত্রুটি (Traditional Examination and its Defects) :

প্রচলিত পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা সকলে পরিচিত। সাধারণতঃ শিক্ষাবর্ষের শেষে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা বিদ্যালয়ের পাঠ্যস্তরের শেষে কোন বহিঃপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষা পরিচালনা করেন এবং এই পরীক্ষার ফলাফল বিচার ক'রে পরবর্তী উঁচু শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের বসার অনুমতি দেন বা একটি বিশেষ মানপত্র দেন। এই পরীক্ষার পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে, কতকগুলো বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্রে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্ন দেওয়া হয়, তার মধ্যে খুব সামান্য নির্বাচনের সুযোগ থাকে। হয়তো আটটি প্রশ্ন দিয়ে যে-কোন পাঁচটি লিখতে বলা হয় বা অনেক সময় বিশেষ প্রশ্নের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ থাকে। চতুর্থতঃ, প্রশ্নগুলোর উত্তরে

বিশেষ একটি ক'রে রচনা (Essay) লিখতে হয়। তাই এই গতানুগতিক পরীক্ষার পদ্ধতিকে অনেক সময় রচনাভিত্তিক পরীক্ষা (Essay-type examination) বলা হয়। গতানুগতিক পরীক্ষার এই সব বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার ত্রুটিগুলো উল্লেখ করছি—

[এক] প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি হিসেবে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা বলেছেন যে, এই পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের পরিসর (Range of knowledge) পরিমাপ করা যায় না। তার কারণ, এই ধরনের পরীক্ষায় নির্বাচিত কতকগুলো প্রশ্ন দেওয়া হয়। এই সব প্রশ্ন দ্বারা কোন বিষয়ের সমস্ত অংশের জ্ঞান পরীক্ষা করা যায় না। যেমন ইতিহাসে প্রশ্ন করা হ'ল— "আকবরের রাষ্ট্রনীতির বিবরণ দাও।" এই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষার্থীরা যা লেখে তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের আকবর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণাকে পরিমাপ করা যায় না। এই রকম কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে পাঠ্যসূচীর সব বিষয়গুলোকে অন্তর্গত করা যায় না। সুতরাং এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞানকে সম্পূর্ণ ভাবে পরিমাপ করা যায় না।

[দুই] এই পরীক্ষা-পদ্ধতি ব্যক্তিগত (subjective) উপাদানকে পরিমাপের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের সুযোগ দেয়। বিশেষ এক প্রশ্নের উত্তরে কোন শিক্ষার্থী যে উত্তর দেয় সেই উত্তরকে বিচার করতে গিয়ে পরীক্ষক তার নিজের ব্যক্তিগত ধারণা, মতবাদ, রুচি, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে এই ধরনের পরিমাপে ব্যক্তিগত অবস্থা-জানিত ভুল (personal error) থেকেই যায়। তাই গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যক্তিগত অবস্থা-জনিত ভুলে দুষ্ট। পরীক্ষণের মানসিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য একই উত্তর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে পরিমাণ করা হ'য়ে থাকে।

[তিন] রচনাভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা খুবই কম। একই বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর দু'বার পরীক্ষা নিলে এবং একই পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করালে দেখা যায় যে, সে দু'বারে দু'রকম নম্বর পেয়েছে। এর থেকেই বোঝায় যে, এই পরিমাপের কোন নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) নেই। আবার একই খাতা যদি দু'জন পরীক্ষককে দিয়ে দেখানো হয়, তাতেও দেখা গেছে নম্বরের পার্থক্য হয়। অর্থাৎ এই ধরনের পরিমাপে সব সময় একটা পরিবর্তনশীল ভুল (variable error) থেকে যায়। বিভিন্ন মনোবিদ্‌ এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন, তাদের পরীক্ষা থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,

বিভিন্ন পরীক্ষকের পরিমাপের মধ্যে সহগতির সহগাঙ্ক (Co-efficient of Correlation)+ ·৬০ বেশী হয় না।

[চার] এই ধরনের পরীক্ষার পরিমাপের যথার্থতাও (validity) নেই বললে চলে। যে বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান বা দক্ষতা পরিমাপের জন্য পরীক্ষা করি এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তা পরিমাপ করে না। যেমন, কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন ধরা যাক, ইতিহাসের প্রশ্নের পরীক্ষার্থীরা যে উত্তর লেখে, তাতে আমরা তার শুধু ইতিহাসের জ্ঞানই পরীক্ষা করি না, প্রকাশভঙ্গী, ভাষা জ্ঞান, হাতের লেখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আরো নানা রকম জ্ঞানও পরীক্ষা করি। ফলে যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা দিচ্ছি, কেবল সেই উদ্দেশ্যকে মূল্যায়নের সময়ে বিচার করি না। যদি কোন পরিমাপ যন্ত্র পরিমাপে সব সময় একই ধরনের ভুল করে তাহ'লে বলবো সেই পরিমাপ যন্ত্রের যথার্থতা নেই। কোন পরিমাপ যন্ত্রের যথার্থতা নির্ভর করে তার স্থায়ী ভুলের (constanct error) উপর। গতানুগতিক পরিমাপে এই ধরনের ভুল সব সময় থেকে যায়। ফলে এই পরীক্ষার দ্বারা কোন সময় আমরা সঠিক ভাবে শিক্ষার্থীর বিষয়ের জ্ঞানকে পরিমাপ করতে পারি না।

[পাঁচ] এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের উত্তরের সাংখ্যমূল্য নির্ধারণের (Marking or scoring) কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় নানারকম অসুবিধা হয়। এতে ক'রে বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিমাণ নম্বর পেতে পারে। কোন পরীক্ষকের হয়তো বিশেষ একটা দিকে প্রবণতা আছে, বা কোন আলোচ্য বস্তুর বিশেষ একটা জায়গা সম্বন্ধে দুর্বলতা আছে, কোন পরীক্ষার্থী যদি সেটা উল্লেখ না করে, তিনি সেটাকে গুরুতর ভুল মনে করেন এবং নম্বরও কম দেন। আবার অন্য পরীক্ষকের হয়তো সে রকম কিছু নেই, তিনি ঐ ধরনের ভুলে খুব গুরুত্ব দেন না। ফলে তাদের পরিমাপে পার্থক্য দেখা দেয়। সুতরাং এই পরীক্ষা-পদ্ধতিতে সাংখ্যমূল্য দেওয়ার কোন নির্দিষ্ট মান থাকে না ব'লে, শিক্ষার্থীদের উন্নতির সত্যিকারের পরিমাপ সম্ভব হয় না।

[ছয়] এই ধরনের পরীক্ষার সময় নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় না। ফলে, অনেক সময় দেখা যায় প্রশ্নের প্রত্যাশিত উত্তরের তুলনায় সময় খুব বেশী বা খুব কম হ'য়ে গেছে। সময় যদি কম হয়, তাতে ক'রে শিক্ষার্থীরা বিষয় সম্বন্ধে জানলেও সময়ের অভাবের জন্য লিখতে পারে না। ফলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিমাপ আমরা সঠিক ভাবে করতে পারি না। তাই গতানুগতিক পরীক্ষায় সময়-সীমা নির্ধারণের কোন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নেই।

[সাত] এই পরীক্ষার পরিমাপ দ্বারা আমরা সব সময় ব্যক্তির বা শিক্ষার্থীর মধ্যে তুলনা করতে পারি না। বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত বিভিন্ন শিক্ষার্থী যদি তাদের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসে, তাতে দেখা যাবে কোন এক বিশেষ বিষয়ে বিশেষ এক বিদ্যালয়ের এক ছাত্র অনেক বেশী নম্বর পেয়েছে অথচ অন্য এক বিদ্যালয়ের তার চেয়ে কম নম্বর পাওয়া ছাত্রের তুলনায় সে অনেক কাঁচা। যে বিদ্যালয়েব গড় মান নিচু সে বিদ্যালয়ের ছাত্রের, আর যে বিদ্যালয়ের গড়মান উঁচু সে বিদ্যালয়ের ছাত্রের কোন বিষয়ে একই বিষয়ের একই নম্বর তাদের সমান পারদর্শিতার পরিচায়ক নয়। ফলে, এই ধরনের পরীক্ষার নম্বরকে তুলনামূলক ভাবে বিচার করা যায় না।

[আট] এই ধরনের পরীক্ষা বোধগম্যতার চেয়ে মুখস্থের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা আদর্শ শিক্ষার সহায়ক নয়। শিক্ষার্থীরা কতকগুলো অংশ ভাল ভাবে মুখস্থ ক'রে পাশ ক'রে যায়, হয়তো বিষয়ের উপর কোন দক্ষতাই তার থাকে না। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত 'হয়।

[নয়] এই ধরনের পরীক্ষায় ছাত্ররা পূর্বে থেকে প্রশ্ন প্রত্যাশা করে এবং সেই মত তৈরী হয়। এটা শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে কাম্য নয়। এর ফলে, দেখা যায় অনেক খারাপ ছেলে ভাল ফল করে, আবার অনেক ভাল ছেলে খারাপ ফল করে।

[দশ] প্রচলিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর সারা বছরের সামগ্রিক পারদর্শিতার উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরীক্ষার তিন ঘণ্টা সময়ের পারদর্শিতাকেই পরিমাণে বিচার করা হয়। ফলে কোন ছাত্র যদি কোন মানসিক বা দৈহিক কারণে ঐ সময়-সীমার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে না পারে তাহ'লে তাকে অযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হয়।

[এগার] এই ধরনের পরীক্ষায় ছাত্রদের মধ্যে একটা অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে এবং এই মনোভাব শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ জীবন-যাপনের সহায়ক নয়।

[বার] সবশেষে, বলা যায় এই ধরনের পরীক্ষার দ্বারা আমরা শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করতে পারি না। শিক্ষার দ্বারা আমরা শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চাই না, তার চারিত্রিক বিকাশও করতে চাই। কিন্তু তার চারিত্রিক বিকাশ কতটা হ'য়েছে, তা আমরা এই ধরনের পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করতে পারি না।

এই সব দোষত্রুটি থাকার জন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এই রচনাধর্মী পরীক্ষার পক্ষপাতী নন। এর সংস্কার সাধনের জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পন্থার কথা বলেছেন। সেই সব পন্থাগুলোর মধ্যে প্রধান হ'ল—

(১) নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন গঠন (Objective type test)।

(২) আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠন (Standardized test)

(৩) মূল্যায়ন (evaluation) ও ধারাবাহিক পরিমাপ পত্রের (Cumulative record card) প্রচলন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন গঠন (Preparation of Objective-type test) :

প্রচলিত পরীক্ষার দোষত্রুটির কথা বিবেচনা ক'রে তা দূর করার জন্য নানা রকম পরীক্ষা চালানো হ'য়েছে। মনোবিদ্‌রা মনে করেন, প্রচলিত এই পরীক্ষার দোষত্রুটি বিশেষ ভাবে তার একটা সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য থেকে এসেছে – তা হ'ল তার রচনাধর্মিতা। তাই তাঁরা বললেন এমন প্রশ্নপত্র তৈরী করতে হবে, যার মধ্যে ব্যক্তিগত উপাদানের প্রভাব একেবারে না আসতে পারে। তাঁরা বিশেষ ভাবে গতানুগতিক পরীক্ষকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক (Subjective) ব'লে সমালোচনা করেছেন এবং তার পরিবর্তে পরীক্ষাকে নৈর্ব্যক্তিক (Objective) করার চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই তারা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন গঠনের কথা বলেছেন। এই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য হ'ল—এতে একটার বেশী উত্তর থাকতে পারে না ; এখানে শিক্ষার্থীর উত্তরের জন্য বিশেষ কিছু লিখতে হয় না ; ফলে পরীক্ষা-ক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত প্রভাবকে দূর করা যায়। এই ধরনের প্রশ্ন বিভিন্ন রকমের হ'তে পারে। কয়েক রকম প্রশ্নের এখানে উল্লেখ করা হ'চ্ছে—

[এক] **সত্য-মিথ্যা নিরূপণ (True-false Type)**

এই ধরনের প্রশ্নে বিষয়-সংক্রান্ত কতকগুলো উক্তি বা ঘটনার বিবরণ বা মন্তব্য পর পর সাজানো থাকে। তবে এই সব উক্তি বা ঘটনা বা মন্তব্য সবগুলো ঠিক নয়। কতকগুলো ভুলও থাকে এবং ভুল ও সত্য প্রশ্নগুলো ইতস্ততঃ ভাবে মিশিয়ে সাজানো থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল এদের মধ্যে কোন গুলো ভুল এবং কোন গুলো ঠিক তা খুঁজে বের করা। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধান করার জন্য শিক্ষার্থীর পুনরুদ্রেক (Recall) এবং প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) এই দু'ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। প্রশ্নপত্রের উপরে নির্দেশ দেওয়া থাকে পরীক্ষার্থীকে কিভাবে উত্তর করতে হবে।

নির্দেশ | নীচে কতকগুলো বাক্য দেওয়া আছে। এর মধ্যে কতকগুলো ঠিক এবং কতকগুলো ভুল। যেগুলো ভুল তার পাশে F লিখবে এবং যেগুলো সত্য তার পাশে T লিখে নির্দেশ করবে।

॥ **নমুনা** ॥

(ক) প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ আকবর আর হিমুর মধ্যে হয়েছিল।

(খ) পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ হ'ল এভারেস্ট।

(গ) কোন সংখ্যাকে অপর সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে গুণফল সব সময় সেই সংখ্যা দু'টির চেয়ে বড় হয়।

(ঘ) ফা-হিয়েন হর্ষবর্ধনের সময় ভারতবর্ষে আসেন।

॥ দুই ॥ সম্পূর্ণ করণ (Completion Type)

এই ধরনের প্রশ্নে কতকগুলো অসম্পূর্ণ বাক্য বা ধারণা উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল ঐ অসম্পূর্ণ অংশগুলোকে তার অভিজ্ঞতা বা বিষয়ের জ্ঞান থেকে পূর্ণ করা। এখানে পরীক্ষার্থীর পুনরুদ্রেক (Recall) প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে কাজ করে। পরীক্ষার্থীকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়—

নির্দেশ | নীচে কতকগুলো বাক্য বা ধারণা দেওয়া আছে যার কিছু কিছু অংশ অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। তুমি ঐ অসম্পূর্ণ অংশে প্রয়োজনীয় শব্দ লিখে ধারণাটিকে সম্পূর্ণ করবে।

॥ **নমুনা** ॥

(ক) রবীন্দ্রনাথ — খ্রীষ্টাব্দে — শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

(খ) প্রোজেক্ট পদ্ধতির প্রবর্তক হ'লেন —।

(গ) গান্ধীজি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তার নাম হ'ল —।

(গ) ফ্রয়েবেল — পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং ডাল্টন পরিকল্পনার প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন —।

॥ তিন ॥ বহুর মধ্যে নির্বাচন (Multiple-choice Type)

এই ধরনের প্রশ্নে কতকগুলো প্রশ্ন থাকে এবং তার সাম্ভাব্য কতকগুলো উত্তরও পাশে লেখা থাকে। পরীক্ষার্থীকে আসল উত্তরটা খুঁজে বের করতে বলা হয়। আবার অনেক সময় এগুলো প্রশ্নের উত্তর হিসেবে না দিয়ে সম্পূর্ণ-করণের মত অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে তার কতকগুলো সম্ভাব্য উত্তর দিয়ে দেওয়া

হয়। শিক্ষার্থীর কাজ হ'ল সঠিক উত্তর বা শব্দের নীচে দাগ দিয়ে নির্দেশ করা। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়।

নির্দেশ | নীচে কতকগুলো প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং তাদের প্রত্যেকের পাশে কতকগুলো করে সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। প্রশ্নটি পড়ে তার সঠিক উত্তরটি নীচে দাগ দিয়ে নির্দেশ কর।

॥ **নমুনা** ॥

(ক) আজ পর্যন্ত কতজন ভারতবাসী নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? —একজন, দু'জন, তিনজন, দশজন।

(খ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?—আকবর, বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ।

(গ) ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে সব চেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী?—পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ।

(ঘ) 'কিং লিয়ারের' রচয়িতা কে?—সমরসেট্ মম, বার্নাড শ, ওনীল, শেকস্‌পীয়ার

অন্য ভাবে,

(ক) আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভারতীয় নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন—একবার, দু'বার, তিনবার, দশবার।

(খ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন—আকবর, বাবর, হুমায়ুন, শেরশাহ।

(গ) ভারতবর্ষে যে রাজ্যে সবচেয়ে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী তার নাম হ'ল—পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ।

(ঘ) 'কিং লিয়ার' এর রচয়িতা হ'লেন—সমরসেট মম, বার্নাড শ, ওনীল, শেকস্‌পীয়ার।

॥ চার ॥ যোজ্যতা নিরূপণ (Matching Type)

এই ধরনের প্রশ্নে দু'টো সারি থাকে। বাঁদিকের সারিতে থাকে কতকগুলো ধারণা বা প্রশ্ন এবং ডানদিকের সারিতে থাকে তার সাম্ভাব্য ধারণা বা তার উত্তর। কিন্তু ডান দিকের সারিতে উত্তরগুলো বা ধারণা ইতস্ততঃ সাজানো থাকে। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল বাঁ দিকের সারির প্রশ্নগুলো পড়ে ডান দিকের

সারির সঠিক উত্তরটা খুঁজে বের করা এবং তার পাশে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা বসিয়ে নির্দেশ করা। এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর বিশ্লেষণমূলক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বিচার করা হয়। বিভিন্ন ভাবে এই প্রশ্ন তৈরী করা যায়। কোন সময় এক দিকে অসম্পূর্ণ বাক্য রেখে অন্য দিকে যোগ্য শব্দগুলো রাখা হয়। শিক্ষার্থীর কাজ হ'ল যোগ্যতা খুঁজে বের করা এবং তা নির্দেশ করা।

নির্দেশ ‖ নীচের প্রশ্নে দু'টো সারি আছে। বাঁ দিকের সারিতে কতকগুলো বস্তু বা ধারণার নাম দেওয়া আছে এবং তার পাশের সারিতে তাদের অর্থ ব্যাখ্যা করা আছে। কিন্তু অর্থগুলো ঠিক বস্তু বা ধারণার পাশে লেখা নেই। প্রথম বাঁ দিকের সারিতে লক্ষ্য কর এবং তার প্রত্যেকটি ধারণার উপযোগী—ব্যাখ্যাটি পাশের সারিতে খুঁজে বের কর। এর পর ঐ ব্যাখ্যাটির পাশে ধারণাটির যা ক্রমিক সংখ্যা আছে বসাও।

॥ **নমুনা** ॥

প্রথম সারি	**দ্বিতীয় সারি**	
(ক) 'জোস্ট্-ল'	(ক) পরিবাহকের রোধ (Resistance)-সংক্রান্ত সূত্র।	( )
(খ) 'ল-অফ-রেডিনেস্'	(খ) স্মৃতি-সংক্রান্ত সূত্র।	( )
(গ) 'ল-অফ ফাইনেল রিগ্রেশান'	(গ) শিক্ষণ-সংক্রান্ত সূত্র।	( )
(ঘ) 'ওহম্-ল'	(ঘ) বংশগতির নিয়ম-সংক্রান্ত সূত্র	( )

॥ পাঁচ ॥ শ্রেণীকরণ (Classification Type)

এই ধরনের প্রশ্নে, কতকগুলো সমজাতীয় ধারণার সঙ্গে একটা অন্য ধারণাকে মিশিয়ে এক সঙ্গে উপস্থাপন করা হয়। পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল বিজাতীয় শব্দটি খুঁজে বের ক'রে নির্দেশ করা। এই ধরনের প্রশ্ন সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার (Analytical thinking) এবং সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষমতার প্রয়োজন হয়।

নির্দেশ নীচের প্রত্যেক প্রশ্নে কতকগুলো ক'রে শব্দ বা ধারণা একত্রে শ্রেণীভুক্ত করা আছে। এদের মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলি সমজাতীয় বা কোন না কোন দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে। যেটি ঐ শ্রেণীভুক্ত নয়, তার নীচে দাগ দিয়ে নির্দেশ কর।

॥ নমুনা ॥

(ক) চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, পাখা, আলমারি।

(খ) লোহা, তামা, পারদ, জল, রূপা।

(গ) শিরা, ধমনী, মস্তিষ্ক, জালক, হৃদপিণ্ড।

(ঘ) কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কেরল, চণ্ডীগড়।

॥ ছয় ॥ উপমান নির্ণয় (Analogy Type)

এই ধরনের প্রশ্নে প্রথমে এমন দু'টো বস্তু বা ধারণা দেওয়া থাকে, যারা বিশেষ সম্পর্কে যুক্ত, পরে অপর আর একটা বস্তু বা ধারণা দিয়ে পরীক্ষার্থীকে বলা হয় এই তৃতীয় বস্তু বা ধারণার সঙ্গে কোন বস্তু বা ধারণার সেই সম্পর্ক, যে সম্পর্ক প্রথম দু'টোর মধ্যে বর্তমান। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর কাজ হ'ল প্রথম দুই শব্দের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কে তৃতীয় শব্দ বা ধারণার সঙ্গে কোন্ শব্দ যা ধারণাযুক্ত তা খুঁজে বের করা। এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য খুব জটিল মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করতে হয়। প্রথমে পূর্বের জোড়া শব্দের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয় এবং পরে সেই সম্পর্কে তৃতীয় শব্দের সঙ্গে কোন্ শব্দ যুক্ত তা স্থাপন করতে হয় (Education of correlates)। উদাহরণ থেকে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হবে :

নির্দেশ নীচে প্রত্যেক প্রশ্নে তিনটে ক'রে শব্দ দেওয়া আছে, এদের প্রথম দুটোর মধ্যে যে সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্ক কোন্ শব্দের সঙ্গে প্রদত্ত তৃতীয় শব্দের যে সম্পর্ক আছে তা নির্ণয় কর এবং পাশে লিখ।

॥ নমুনা ॥

(ক) চোখের সঙ্গে দেখার যে সম্পর্ক, কানের সঙ্গে কার —— সে সম্পর্ক।

(খ) পেনসিলের সঙ্গে ড্রয়িং এর যে সম্পর্ক, তুলির সঙ্গে কার —— সে সম্পর্ক।

(গ) সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর যে সম্পর্ক, পৃথিবীর সঙ্গে কার —— সে সম্পর্ক।

(ঘ) মানুষের সঙ্গে ভাতের যে সম্পর্ক, গরুর সঙ্গে কার —— সে সম্পর্ক।

এদের অন্যভাবেও পরিবেশন করা হয়—

(ক)	চোখ	:	দেখা	::	কান	:	?——
(খ)	পেনসিল	:	ড্রয়িং	::	তুলি	:	?——
(গ)	সূর্য	:	পৃথিবী	::	পৃথিবী	:	?——
(ঘ)	মানুষ	:	ভাত	::	গরু	:	?——

॥ **আলোচনা** ॥

এই ধরনের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির কথা অনেক শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ্ বলেছেন। এদের মাধ্যমে গতানুগতিক পরীক্ষার অনেক দোষত্রুটি দূর করা যায়, বিশেষভাবে, ব্যক্তিগত উপাদানের যে খারাপ প্রভাব তার থেকে পরীক্ষাকে মুক্ত করা যায়। কিন্তু শুধুমাত্র প্রশ্নের গঠন বদ্‌লালেই পরীক্ষা পদ্ধতি আদর্শ হবে না। কারণ তার অন্যান্য ত্রুটিও আছে, যেমন নির্ভর-যোগ্যতা (Reliability), যথার্থতা (Validity), এবং সাধারণ তাৎপর্য নির্ণয়ের অসুবিধা, তুলনাযোগ্য পরিমাপ পাওয়ার অসুবিধা ইত্যাদি। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ত্রুটিহীন করতে হ'লে এগুলোও দূর করার প্রয়োজন। তাই বর্তমান কালে মনোবিদ্‌রা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তাঁরা প্রশ্নপত্রের সংস্কারের কথাও বলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতীয় প্রশ্নের ভিত্তিতে আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardized achievement test) গঠন করতে বলেছেন।

আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardized achievement Test) :

আদর্শায়িত অভীক্ষার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং তাৎপর্য নির্ণয়ের পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা থাকে। আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা বলতে আমরা বুঝি এমন এক প্রশ্নপত্র যার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতা একটা নির্দিষ্ট সাংখ্যমানে প্রকাশ করা যায় (The standardized achievement tests are those which express the achievement of the pupil in different school subjects or any skill in a single score)। আদর্শায়িত অভীক্ষার পরিচালনা পদ্ধতির মান নির্ণয়ের নিয়ম সবকিছু নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। এর মধ্যে যে প্রশ্নগুলো (test item বলা হয়) থাকে, সেগুলো নৈর্ব্যক্তিক ধরনের (Objective type) এবং তাদের উত্তর খুব সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। এই সব প্রশ্নের একের বেশী উত্তর থাকে না, ফলে এই অভীক্ষা

বিদ্যালয়ে নিরপেক্ষ ভাবে প্রয়োগ করা যায় এবং তুলনা করার সুবিধা হয়। এই ধরনের আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করার জন্য কতকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়। সেই স্তরগুলোর উল্লেখ করলে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা আরো পরিষ্কার হবে।

আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা তৈরীর বিভিন্ন সোপান (Steps for the construction of Standardized Achievement Test):

[এক] আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করতে হ'লে, প্রথম, যে বিষয়ের অভীক্ষা, যে শ্রেণীর জন্য তৈরী করতে চাই সেই শ্রেণীতে সেই বিষয়ের পারদর্শিতা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে ধারণা স্থির করতে হবে। যদি অঙ্কের একটি অভীক্ষা তৈরী করতে চাই সপ্তম শ্রেণীর জন্য, সপ্তম শ্রেণীর অঙ্কের পারদর্শিতা বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে একটা ধারণা আগে নিতে হবে এবং একই সঙ্গে পরিষ্কার ক'রে বলার দরকার কি কি আচরণের মধ্যে সেই সব গুণ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ কি কি ধরনের সমস্যা সমাধান করতে পারলে আমরা বলবো তার সপ্তম শ্রেণীর অঙ্কের পারদর্শিতা আছে। এ পর্যায়কে বলা হয় ধারণা গঠনের পর্যায় (Stage of concept formation)।

[দুই] এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পূর্বোক্ত ধারণা অনুযায়ী অভীক্ষা প্রশ্ন (test item) নির্বাচন করতে হয়। শিশুর যে ধরনের ক্ষমতাগুলোর বিকাশ করতে চাইছি অঙ্কের মধ্য দিয়ে, সেইগুলো যাতে প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ পায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্ন নির্বাচন করতে হবে। এই পর্যায়কে বলা হয় প্রশ্ন নির্বাচনের (item selection) স্তর।

[তিন] এর পর এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতামত নেওয়ার দরকার হয়, তাতে ক'রে যদি প্রশ্ন নির্বাচনে ভুল থাকে তাহ'লে তা দূর করা সম্ভব হবে। এই পর্যায়কে বলা হয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বিচারকরণের (expert verification) স্তর।

[চার] অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা বিচারকরণের পর প্রশ্নগুলোকে কাঠিন্যের ক্রমে সাজানো হয় (arranged in order of difficulty) এবং একটা সময়সীমা আপাতভাবে নির্দেশ করা হয়। এর পর ঐ প্রশ্নগুলো যে শ্রেণীর জন্য অভীক্ষা তৈরী হ'চ্ছে সেই শ্রেণীর এক বাছাই দলের (sample) উপর প্রয়োগ করা হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় প্রাথমিক পরীক্ষণ (Try out)।

[পাঁচ] এর পর শিক্ষার্থীদের উত্তর-পত্রগুলোর সাংখ্যমান নির্ণয় করা হয় এবং রাশি বিজ্ঞানের বিশেষ কৌশল অবলম্বন ক'রে, শেষ বারের মত প্রশ্ন ঠিক করা হয়। এখানে প্রত্যেক প্রশ্নের বিভাজন ক্ষমতা (discriminating value) এবং কাঠিন্য (difficulty value) বিচার ক'রে দেখা হয়। যে সব প্রশ্নগুলোর বিভাজন ক্ষমতা নেই সেগুলোকে বাদ দেওয়া হয়। আর প্রশ্নগুলোকে তার কাঠিন্যানুসারে সাজানো হয়। এই পর্যায়কে বলা হয় প্রশ্ন বিশ্লেষণের (item-analysis) স্তর। এই পর্যায়ে সময়ও স্থির করা হয়।

[ছয়] পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে সে সব প্রশ্নগুলো একত্রিত ক'রে অভীক্ষাকে তৈরী করা হয় এবং আবার ঐ শ্রেণীর আরো বেশীসংখ্যক শিক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা হয়। এই শিক্ষার্থীদের একই সঙ্গে ঐ বিষয়ের আদর্শায়িত অভীক্ষাও দেওয়া হয়।

[সাত] এই নতুন অভীক্ষার ফলাফলকে পুরাতন অভীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে বিচার ক'রে দেখা হয়। যদি তাদের সাংখ্যমান প্রায় সমান হয় তাহ'লে বুঝতে হবে অভীক্ষাটির যথার্থতা (validity) আছে। এই যথার্থতা সহগতির সহগাঙ্কের (Co-efficient of correlation) দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

[আট] এর পরে নির্ভরযোগ্যতা বিচার ক'রে দেখা হয়। নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করার জন্য বিভিন্ন রাশিবৈজ্ঞানিক কৌশল (Statistical technique) আছে। তার যে-কোন একটি প্রয়োগ ক'রে নির্ভরযোগ্যতা দেখা হয়। যাথার্থ্য ও নির্ভরযোগ্যতা যদি ঠিকমত থাকে তাহ'লে অভীক্ষা তৈরীর কাজ অনেকটা হ'য়ে গেছে বলা যায়।

[নয়] এই অভীক্ষাতে প্রশ্নের উত্তরগুলোতে সাংখ্যমান নির্দেশ-পদ্ধতি কি ভাবে অনুসরণ করা হ'য়েছে, কিভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত ভাবে অভীক্ষার সঙ্গে দিতে হবে, যাতে যে-কোন শিক্ষক এই অভীক্ষা প্রয়োগের সময় ঐ নিয়ম অনুসরণ করেন। এতে ক'রে বিভিন্ন পরীক্ষকের মধ্যে যে পার্থক্য হয় তা দূর করা যায়।

[দশ] সবশেষে, অভীক্ষার ফলাফলের তাৎপর্য নির্ধারণের জন্য এই অভীক্ষার একটা সাধারণ মান (Norm) দেওয়া হয়, যাতে ক'রে যে-কোন শিক্ষক তার ফলাফল ঐ সাধারণ মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন। এই মানও রাশিবিজ্ঞানের কৌশলে নির্ণয় করা হয়।

নৈর্ব্যক্তিক আদর্শায়িত অভীক্ষার গুণাবলী (Merits of Objective-type Standardized Test) :

আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার অনেক গুণ আছে। গতানুগতিক পরীক্ষার তুলনায়, এর পরীক্ষা অনেক ক্রটিহীন। গতানুগতিক পরীক্ষার অনেক সংকীর্ণতাকে এই পদ্ধতি দূর করতে পারে। যেমন—

(১) এই ধরনের অভীক্ষার যাথার্থ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই অভীক্ষা ঠিক যে বিষয়ের জন্য তৈরী সেই বিষয়ের পারদর্শিতা বিশেষ ভাবে পরিমাপ করে এবং অন্য গুণকে বিচার ক'রে দেখে না। ফলে পরিমাপ অনেক সঠিক হয়।

(২) এই ধরনের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন চিন্তা করতে হয় না, কারণ, উন্নত ধরনের গাণিতিক কৌশল দ্বারা তা নির্ধারণ করা হয়। ফলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই পরীক্ষার ফলাফল স্থির থাকে।

(৩) এই অভীক্ষা নৈব্যক্তিক ব'লে, বিভিন্ন পরীক্ষকের মধ্যে পার্থক্য থাকার অবকাশ থাকে না।

(৪) এই অভীক্ষার ফলাফল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তুলনা করা যায়। কারণ, এর প্রয়োগবিধি অনেক সহজ এবং পরিস্থিতির প্রভাব নিরপেক্ষ।

(৫) এই অভীক্ষার উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের কম পরিশ্রম করতে হয় এবং পরীক্ষকদেরও মান নির্দেশ করার সময় পরিশ্রম অনেক কম হয়।

(৬) এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না; তার বোধগম্যতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

(৭) এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর বিষয়ের সমগ্র অংশের উপর পরীক্ষা করা হয়। শুধুমাত্র কয়েকটি নির্বাচিত অংশ থেকে পরীক্ষা করা হয় না। প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশী থাকে এবং ফলে তা সম্পূর্ণ পাঠ্য বিষয়ের উপর থেকে প্রশ্ন করা হয়।

(৮) এই ধরনের অভীক্ষায় পরীক্ষাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের (Objectives) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভাবে বিবেচনা করা হয়।

এই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় গতানুগতিক পরীক্ষার তুলনায় এই ধরনের পরীক্ষা অনেক উন্নত এবং এর বহুল প্রচার করার জন্য আধুনিক প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্‌ই সচেষ্ট। কিন্তু তাহ'লেও এর কতকগুলো অসুবিধা থেকেই যায়। তাই অনেকে এর প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলেছেন।

নৈর্ব্যক্তিক আদর্শায়িত অভীক্ষার ত্রুটি (Demerits of Objective-type Standardized Test):

[এক] নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা তৈরী করতে শিক্ষকের অনেক পরিশ্রম হয়। দৈনন্দিন কাজের চাপ তাদের উপর এত বেশী থাকে যে, সব ক'রে তারপর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরী করার সময় তাঁদের হ'য়ে ওঠে না। তাছাড়া এই ধরনের অভীক্ষায় অর্থের খরচও বেশী হয় যা সব স্কুলের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ এই পদ্ধতিতে প্রশ্ন করলে, প্রশ্নপত্রের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হয় এবং ছাপা খরচ অনেক বেড়ে যায়।

[দুই] এই জাতীয় অভীক্ষা তৈরী সাধারণ শিক্ষক দ্বারা সম্ভব হয় না, তাতে এত ত্রুটি থেকে যাবে যে, তা গতানুগতিক পরীক্ষার চেয়েও খারাপ ফল দেবে। তাই বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই ধরনের বিশেষ প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব বিদ্যালয়ে আছে তাই এই ধরনের অভীক্ষার বহুল প্রচার ব্যবহারিক দিক থেকে সম্ভব হ'য়ে ওঠে না।

[তিন] যাঁরা অভীক্ষা তৈরী করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত প্রভাব যে এর উপর এসে একেবারে পড়ে না একথা বলা যায় না। কারণ বিভিন্ন ব্যক্তিভেদে প্রাথমিক ধারণার তফাৎ হওয়া স্বাভাবিক এবং এই কারণে দেখা গেছে, যতই একে নৈর্ব্যক্তিক বলা হোক্ বিভিন্ন পরীক্ষক-ভেদে শিক্ষার্থীর পরিমাপের পার্থক্য হয়। তবে গতানুগতিক পার্থক্যের তুলনায় এই পার্থক্য অনেক কম।

[চার] অনেক সময় শিক্ষার্থীরা এই সব প্রশ্নের উত্তর অনুমানের উপর দেয়। হয়ত পাঁচটা প্রশ্নের নীচে দাগ দিতে হবে, শিক্ষার্থী যদি ইচ্ছামত দাগ দিয়ে যায় তাহ'লে এমন হ'তে পারে দুটো ঠিক হ'য়ে গেল, এ ক্ষেত্রে সঠিক ভাবে বুঝবার উপায় থাকে না যে, শিক্ষার্থী কতটা অনুমানের উপর নির্ভর করেছে এবং কতটা উত্তর করেছে তার প্রকৃত জ্ঞান।

[পাঁচ] অনেক সময়, পরীক্ষার্থীরা এই জাতীয় প্রশ্নের নির্দেশ ঠিকমত বুঝতে পারে না ব'লে প্রশ্নের উত্তর করতে পারে না। তাছাড়া এই সব প্রশ্ন এমন ধরনের হয়, যে এখানে নানা ধরনের মানসিক কৌশল ও প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করতে হয়। সুতরাং এই ধরনের অভীক্ষা শুধু যে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপ করে তা নয়, অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিমাপের ক্ষেত্রে বিবেচনা করে। যে পরীক্ষার্থী বিভেদমূলক প্রতিক্রিয়া (discriminating response) করার ক্ষমতা কম, সে অনেক সময় যোজ্যতামূলক প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে

পারে না। আবার ঐ প্রশ্ন যদি 'সম্পূর্ণকরণের' মাধ্যমে দেওয়া হয়, যেগুলোর সব উত্তর সে করতে পারে, সুতরাং শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরিমাপের ক্ষেত্রে এগুলো যে সব সময় সঠিক ফল দেবে তার কোন স্থিরতা নেই।

[ছয়] এই অভীক্ষার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'ল এদের মাধ্যমে আমরা জ্ঞান যে ভাবে ব্যবহার করা হবে, তার কথা বিচার না ক'রে পরীক্ষা করি। জ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটা একেবারে গ্রাহ্য করা হয় না। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রকাশ-ভঙ্গী, চিন্তাশক্তি, লেখার ভঙ্গী ইত্যাদি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। সভ্য জগতে এগুলোরও মূল্য অনেক। কারণ ব্যক্তির মধ্যে শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তার সুষ্ঠু প্রকাশও হওয়ার দরকার। শিক্ষার্থীর উপলব্ধি (Appreciation), কল্পনা শক্তি (Imagination) ইত্যাদি এই অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা হয় না।

[সাত] সবশেষে, শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ এই অভীক্ষার দ্বারা করা যায় না। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীকে দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকে বিকাশ সাধন করা, এতে শুধুমাত্র মানসিক বিকাশেরই পরিমাপ হয়। তাই আধুনিককালে শিক্ষাবিদ্ এবং মনোবিদ্‌রা এই ধরনের পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়নের (Evaluation) উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

॥ **আলোচনা** ॥

এই ধরনের বিভিন্ন দোষত্রুটি থাকলেও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে যে ভাল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই সব অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা (Reliability), যথার্থতা (Validity), নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) গতানুগতিক পরীক্ষার চেয়ে অনেক বেশী। তাই গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তে এদের গ্রহণ করলে, পরীক্ষা-পদ্ধতি সংস্কারের পথে এক ধাপ এগিয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর যে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে, তার মধ্যে শিক্ষকের ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলো খুব সহজেই দূর করা যায়, বাকী অন্যান্য সাংগঠনিক ত্রুটিগুলো আশা করা যায় মনোবিদ্‌দের চেষ্টায় নিশ্চয়ই দূর করা সম্ভব হবে। কারণ পরিমাপের কৌশল ও পদ্ধতির উপর আধুনিক মনোবিদ্যায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষার সংস্কার (Reformation of Essay type Examination):

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-পদ্ধতির বিভিন্ন অসুবিধার কথা চিন্তা ক'রে অনেক শিক্ষবিদ্ প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের কথা বলেছেন। তাঁরা বলেছেন,

নতুন পরীক্ষা-পদ্ধতি একদিকে পরিশ্রমসাধ্য, তাতে যদি তার এত দোষত্রুটি থাকে, তবে প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করাই ভাল। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন ধরনের উন্নত কৌশলের কথা বলেছেন যার দ্বারা গতানুগতিক পরীক্ষার উন্নতি সাধন করা যায়। এর মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার কিছু ভাল উপাদানেরও সংযোজন করার চেষ্টা হ'য়েছে।

[এক] এই পদ্ধতিতে কোন বিশেষ বিষয়ে প্রশ্ন করার পূর্বে পরীক্ষক বা শিক্ষক ঠিক ক'রে নেবেন সেই বিষয় পড়ানোর উদ্দেশ্য কি কি? এর পরে ঐ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ থেকে প্রশ্ন করবেন, এতে ক'রে প্রশ্নের সংখ্যার সঙ্গে সমতা রেখে শিক্ষার উদ্দেশ্য উপযোগী পরিমাপের ব্যবস্থা করা যাবে।

[দুই] পরীক্ষার প্রশ্নের সংখ্যা যত বেশী হবে নির্ভরযোগ্যতাও তত বেশী হবে। তবে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি প্রশ্ন করতে হয়, রচনাধর্মী পরীক্ষায় খুব বেশী প্রশ্ন দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এই অসুবিধাকে দূর করার জন্য গতানুগতিক প্রশ্নের রীতিকে বদলে সংক্ষিপ্ত উত্তর হয় এরকম কতকগুলো প্রশ্ন (short answer type) দেওয়া ভাল, তবে সবক্ষেত্রে সময় স্থির করার সময় সুবিবেচনার দরকার।

[তিন] একই প্রশ্ন দু'বার যেন একই প্রশ্নপত্রে না থাকে বা, এমন প্রশ্ন করা হবে না যা আংশিক ভাবে অন্যের উত্তরের সঙ্গে মিলে যায়। এতে ক'রে প্রশ্নের নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

[চার] প্রশ্নের ভাষা যেন সাধারণের বোধগম্য হয়, এবং কি উত্তর চাওয়া হ'চ্ছে তা প্রশ্নের ভেতর স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা থাকে। যে শিক্ষার্থী জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন না বুঝতে পারার জন্য লিখতে পারেনি সেটা তার দোষ নয়, দোষ প্রশ্নকর্তার। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য হ'ল তার প্রকৃত জ্ঞান পরীক্ষা করা, সে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগই যদি না পায়, তাহ'লে তাকে পরীক্ষা করবো কি করে?

[পাঁচ] প্রশ্নের উত্তরে নম্বর দেওয়ার পূর্বে, একটা পরিকল্পনা ক'রে নেওয়া উচিত। প্রত্যেক প্রশ্নকে বিশ্লেষণ ক'রে তার কি উত্তর হবে তা নির্দেশ ক'রে, প্রত্যেক অংশের জন্য কত নম্বর দেওয়া হবে, তা সব ঠিক ক'রে নিলে, নম্বর দেওয়ার কাজকে অনেকটা ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থার প্রভাবমুক্ত করা যায়।

[ছয়] প্রশ্নের উত্তর একজন পরীক্ষককে দিয়ে না পরীক্ষা করিয়ে অন্ততঃ পক্ষে দু'জন পরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করলে ভাল হয়। যদি একটি পরীক্ষকের বোর্ড দ্বারা পরীক্ষা করানো যায় তাহ'লে অনেক ভাল হয়।

[সাত] উত্তরের সংখ্যাগত মান না দিয়ে গুণগত মান দেওয়ার কথা অনেক শিক্ষাবিদ্ বলেছেন। এতে ক'রে তুলনার সুবিধা হয়, তাছাড়া রচনাধর্মী পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর বিষয়ের পারদর্শিতা ছাড়াও আরো অনেক গুণ পরিমাপ করা হ'চ্ছে তখন গুণগত মান বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। মুদালিয়ার কমিশনও তাঁদের রিপোর্টে এই পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেছেন (The system of symbolic rather than numerical marking should be adopted for evaluating and grading the work of the pupil in external and internal examinations and in miantaining the school records.)

[আট] শিক্ষার্থীদের উত্তর পরীক্ষার সময় পরীক্ষকরা যদি এক একটি প্রশ্ন পৃথক ভাবে পরীক্ষা করেন তাহ'লে খুব ভাল হয়, অর্থাৎ বিশেষ একটি প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষার্থী কেমন উত্তর দিয়েছে তা বিচার ক'রে দেখেন, তাতে ক'রে তুলনামূলক বিচারের অনেক সুবিধা হয় এবং নম্বরেরও সমতা থাকে। সাধারণ পদ্ধতিতে যে এক একজন পরীক্ষার্থীর সম্পূর্ণ প্রশ্নের উত্তরপত্র এক সঙ্গে পরীক্ষা করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ। তাতে ক'রে পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা কমে যায়।

॥ **শিক্ষায় মূল্যায়ন (Educational Evaluation)** ॥

মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করছে এবং এই বিকাশের পেছনে আছে নতুন শিক্ষাদর্শনের প্রভাব। আধুনিক শিক্ষাদর্শনের মূল বক্তব্য শিশুর শুধুমাত্র জ্ঞান, দক্ষতা বা বৌদ্ধিক বিকাশ নয়। তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর আগ্রহ, চিন্তন শক্তি, সামাজিক অভিযোজন ক্ষমতা ইত্যাদি সবই বিকশিত করতে হবে। সুতরাং এই ধরনের বিকাশকে পরিমাপ করতে হ'লে পরিমাপের কৌশলকে এবং পরিমাপের ভিত্তিকে আরো দৃঢ় এবং আরো সর্বাঙ্গীন গুণসম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে এই সর্বাঙ্গীন গুণসম্পন্ন করার চেষ্টা থেকেই 'মূল্যায়ন' (evaluation) কথার উৎপত্তি হ'য়েছে মনোবিদ্যা ও শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। মূল্যায়ন বলতে আমরা ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের পরিমাপকে বুঝি। অর্থাৎ বৌদ্ধিক, দৈহিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক—যত রকম গুণের বিকাশ শিক্ষার মধ্য দিয়ে হয় তার সুসামঞ্জস রূপ ব্যক্তি-জীবনে কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার পরিমাপ করাকে বলে মূল্যায়ন। মূল্যায়ন বলতে খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন অংশের পৃথক পরিমাপ নয়, অর্থাৎ বৌদ্ধিক বিকাশের পরিমাপ করলাম—পৃথক ভাবে পারদর্শিতার অভীক্ষা এবং বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে, সামাজিক বিকাশ

পরিমাপ করলাম—সামাজিক বিকাশ পরিমাপক কোন অভীক্ষা দিয়ে, নৈতিক বিকাশের পরিমাপ করলাম—কোন অভীক্ষা দিয়ে। এই ধরনের পরিমাপকে মূল্যায়ন বলবো না, মূল্যায়ন করবো আমরা ব্যক্তির। তার সকল রকম বিকাশের ফলে ব্যক্তি যে একক সত্তার অধিকারী হ'য়েছে, তার পরিমাপকে বলা হবে মূল্যায়ন। মনরো (W. S. Monroe) মূল্যায়ন ও পরিমাপ (Evaluation and Measurement)-এর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে একই কথাই বলেছেন "....in measurement the emphasis is upon single aspect of subject-matter, achievement or specific skills and abilities, whereas in evaluation the emphasis is upon broad personality changes and major objectives of educational programme." ব্যক্তিত্বের এই মূল্যায়নের জন্য পরিমাপ কৌশল সাহায্য করে মাত্র। পরিমাপই শেষ কথা নয়, এটা একটা পন্থামাত্র—এ কথা আধুনিক সকল শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করেন।

মূল্যায়নের সোপান (Different steps of Evaluation) :

বিদ্যালয়ে মূল্যায়নের ধারণাকে কাজে লাগাতে হ'লে, কতকগুলো স্তরের মধ্য দিয়ে কাজ করতে হবে। মূল্যায়ন গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতি ও গতানুগতিক পরীক্ষা-সংক্রান্ত ধারণার চেয়ে যে উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মূল্যায়নের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হ'লে আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরীর মত কতকগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে।

প্রথমতঃ, পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্য (Objectives of curriculum) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা স্থাপন করতে হবে। কারণ মূল্যায়ন হবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বা শিক্ষার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। কি কি আদর্শ নিয়ে আমরা বিদ্যালয়ে কাজ করছি, সেগুলোকে তালিকার আকারে সাজাতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, ঐ সব ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য বা আদর্শগুলো যদি শিক্ষার্থী অর্জন করে তাহ'লে তাদের মধ্যে কি ধরনের বহিঃআচরণের পরিবর্তন হবে, বা, ব্যক্তির আচরণের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বুঝবো যে তার মধ্যে সেই গুণগুলো বিকশিত হয়েছে। এই আচরণগুলোকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন ধরনের আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য যে সব মানসিক অভীক্ষা আছে তা সংগ্রহ করতে হবে এবং সেগুলোকে শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ ক'রে তাদের আচরণগত উন্নতির পরিমাপ করতে হবে।

চতুর্থতঃ, এমন অনেক সময় হ'তে পারে যে, কোন কোন আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিমাপের জন্য কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardized test) নেই। সে সব ক্ষেত্রে ঐ আচরণ পরিমাপ অভীক্ষা তৈরী করতে হবে। এই অভীক্ষা তৈরী করার জন্য অভীক্ষা প্রস্তুতিকরণের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

পঞ্চমতঃ, ঐ সব নতুন অভীক্ষাগুলিও ছাত্রদের উপর প্রয়োগ ক'রে ফলাফল দেখা হবে।

ষষ্ঠতঃ, এই সব পরিমাপের ফলাফলের তাৎপর্য নির্ণয় করতে হবে, পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যের (Curricular Objectives) পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত পরিমাপকে একত্রিত ক'রে যদি তার সামগ্রিক তাৎপর্য নির্ণয় না করা যায় শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন হ'য়েছে কিনা বোঝা যাবে না।

এর থেকে বোঝা যায় মূল্যায়নে ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশের উপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। সামগ্রিক ভাবে পরিমাপের কৌশলের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এখন বিভিন্ন পরিমাপকে সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে হ'লে, তাদের একত্রিত করার দরকার এবং তা ঠিক তাৎপর্য অনুসারে হ'লে ভাল হয়। এই কারণে মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পরিমাপ ও শিক্ষার্থী-সম্পর্কীয় খবরাখবর একত্রে সুসজ্জিত ভাবে তালিকাভুক্ত করার প্রয়োজন। তাছাড়া তার বিকাশের ধারাকে প্রকৃত ভাবে অনুশীলন করতে হ'লে ধারাবাহিক রেকর্ড থাকার দরকার। এই কারণে আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা বিশেষ এক ধরনের রেকর্ড করার পদ্ধতির কথা বলেছেন, যাকে বলা হয় "কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড" (Cumulative Record Card)। এছাড়া আরো নানা ধরনের রেকর্ড করার পদ্ধতি আছে। তবে এই পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় এবং কার্যকরী।

মূল্যায়ন ও কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড (Evaluation and Cumulative Record Card):

কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ডে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দিকের পারদর্শিতা এবং তার সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর একত্রে ক্রমানুসারে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে তালিকা ভুক্ত করা হয়। এই তালিকাকে যতদূর সম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করার চেষ্টা করা হ'য়েছে এবং এখন শিক্ষাবিদ্‌রা এর উপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন কি করে এর আরো উন্নতি করা যায়, কিভাবে এর মধ্যে আরো বেশী পরিমাণ তথ্য সংযোজন করা যায়। সাধারণতঃ এই রেকর্ডের বিভিন্ন অংশে শিক্ষার্থীর জীবন-সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য লিখে রাখা হয়। এর মূল অংশগুলো হ'ল—

(১) **শিক্ষার্থীর সম্পর্কে সাধারণ তথ্য (General information about Pupil)**—এখানে নাম, বয়স, ভর্তির তারিখ, পূর্বের বিদ্যালয় পরিবর্তনের কারণ, ইত্যাদি সাধারণ তথ্য লেখা থাকে।

(২) **গৃহ পরিবেশ-সংক্রান্ত তথ্য (Information about Home or Family)**—এখানে গৃহ পরিবেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন খবর লেখা হয়, বাবার নাম, মায়ের নাম, কতজন ভাইবোন, পরিবারের আর্থিক আয় ইত্যাদি।

(৩) **দৈহিক বা স্বাস্থ্যগত তথ্য (Information about Health)**—শিক্ষার্থীর উচ্চতা, ওজন এবং বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসক যে রিপোর্ট দিয়েছেন সে সম্পর্কে তা এখানে লেখা হয়।

(৪) **বুদ্ধি ও অন্যান্য ক্ষমতা-সংক্রান্ত তথ্য (Information about Mental Abilities)**—এখানে বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফল লেখা হয়।

(৫) **পাঠ্য-বিষয়ের সাফল্য (Achievement in different School Subjects)**—এখানে ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে কি রকম পারদর্শিতা তা দেখিয়ে লিখে রাখা হয়।

(৬) **ব্যক্তিগত গুণাবলীর পরিমাপ (Personality traits)**—এই অংশে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের (Personality traits) পরিমাপ লিখে রাখা হয়। যেমন, সামাজিকতা, উৎসাহ, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণগুলোর বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের ফলই এখানে লেখা হয়। এক কথায় আমরা একে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ বলতে পারি।

(৭) **সহপাঠ্যক্রমিক কাজের বিবরণী (Record of Co-curricular Activities)**—শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে কি ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজে যোগ দিয়েছে এবং কতটা পারদর্শিতা দেখিয়েছে তাতে সে সব কিছু এই অংশে থাকে।

(৮) **বিশেষ গুণ (Special qualities)**—এই অংশে শিক্ষার্থীর কোন্ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ (Interest) আছে, তার হার কি, সাধারণতঃ কিভাবে সময় কাটায় ইত্যাদি তথ্য লেখা থাকে।

এ ছাড়া শিক্ষার্থীর যদি বিশেষ কোন তথ্য বাদ পড়ে যায় তার জন্য একটা সাধারণ অংশ থাকে, যেখানে শিক্ষক সেটা লিখে রাখতে পারেন।

এক কথায় বলা যেতে পারে কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড কার্ড শিক্ষার্থী সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য একত্রে ধরে রাখে। তাই এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন

মনোবিদ্ বলেছেন "It is a systematic body of informations about the individual". সুতরাং এই ধরনের কার্ড বা ধারাবিবরণীর মূল্য যে শিক্ষাক্ষেত্রে অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, প্রধান শিক্ষক সকলেই এর দ্বারা উপকৃত হবেন এবং পরীক্ষার যা উদ্দেশ্য তাও খুব সহজে সফল হবে। তাই মুদালিয়ার কমিশনে, এই কিউমিউলেটিভ্ রেকর্ড রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কমিশন সুপারিশ করতে গিয়ে বলেছেন—"In order to find out the pupils all round progress and to determine his future, a proper system of school records should be maintained for every pupil indicating the work done by him for time, and his attainments is different spheres." কিন্তু এই ধরনের রেকর্ড রাখতে গেলে শিক্ষককে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয়, এটা তার কাছে খুবই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার। শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে এখন যে কাজ করতে হয়, তার উপর যদি এটা চাপানো হয়, তাহ'লে সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে না, কিন্তু এ সম্পর্কেও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার) বলেছেন, প্রথমটা অসুবিধা হবে ঠিকই কিন্তু একবার ঠিকমত প্রবর্তন করতে পারলে, তার ভাল ফল শিক্ষকরাও পাবেন। তাই শিক্ষার্থীর উন্নতিকল্পে, শিক্ষকের নিজের কাজের সুবিধার্থে এবং আধুনিক মূল্যায়নে ধারণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য প্রয়োগ করতে হ'লে এই ধরনের রেকর্ড কার্ডের প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়। এই ধরনের বিবরণী থেকে ব্যক্তি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারনা পাওয়া যাবে, তা ব্যক্তি বিকাশের ধারাকে সার্থকভাবে অনুশীলন করতে সহায়তা করবে।

বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষা (External Examination, or, Public Examination) :

প্রত্যেক দেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে দু' ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন আছে। এই শ্রেণী বিভাগ করা হ'চ্ছে, পরিচালক মণ্ডলীর পার্থক্য ভেদে। পরীক্ষা পরিচালনার রীতিকে এই পরীক্ষকের প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দু'ভাগে ভাগ করা হ'চ্ছে। যেমন, সংগঠনের দিক থেকে দু'ভাগ করা হয়েছে—প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষা (Internal Examination) এবং বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষা (External Examination)। যখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পরীক্ষার পরিচালক একই সংস্থা হয়, তখন সেই পরীক্ষাকে বলা হয় আভ্যন্তরীন পরীক্ষা

(Internal Examination)। যেমন, বিদ্যালয়ে যে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, ষান্মাসিক পরীক্ষা (Half-yearly Examination), সাপ্তাহিক পরীক্ষা (Weekly test), বাৎসরিক পরীক্ষা (Annual Examination) ইত্যাদি। এই সব পরীক্ষার পরিচালনা করেন শিক্ষকরাই। তাঁরা প্রশ্নপত্র তৈরী করেন, তাঁরাই উত্তরপত্রের মান নির্ধারণ করেন। অন্যদিকে, শিক্ষাসংস্থা এবং পরীক্ষার সংস্থা যখন পৃথক পৃথক সংস্থা হয় তখন সেই ধরনের পরীক্ষাকে বলা হয় বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষা (External Examination)। যেমন, স্কুল ফাইন্যাল (School Final) ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শেষ পরীক্ষা (Higher Secondary Examination) একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। তার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ কোন শিক্ষামূলক সংযোগ নেই। সব রকম ডিগ্রি পরীক্ষাই এই জাতীয় পরীক্ষা। এই পরীক্ষা সাধারণ ভাবে সকল ছাত্রছাত্রীই দিতে পারে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অনুমোদিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। এইজন্য এদের অনেক সময় সাধারণ পরীক্ষা (Public Examination) বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত পরীক্ষা, কোন বিশেষ অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত পরীক্ষা, যেমন, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, কারিগরি শিক্ষা পর্ষৎ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার ত্রুটি (Defects of External Examintion) :

যদিও এই ধরনের পরীক্ষা গ্রহণের রীতির বহুল প্রচলন আছে, তবু একথা ঠিক যে, এর মধ্য দিয়ে নানারকম গলদ শিক্ষাক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে। তাই আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা মনে করেন, এই ধরনের পরীক্ষায় সাধারণ পরীক্ষা প্রথার সমস্ত দোষই বর্তমান। তাছাড়া এর নিজস্ব কতকগুলোর ত্রুটি আছে। এই ধরনের পরীক্ষা প্রথার সাধারণ যা দোষ তা হ'ল—

*(১) নির্ভরযোগ্যতার অভাব,

*(২) যাথার্থ্যের অভাব,

*(৩) নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব,

*(৪) তুলনা করার অসুবিধা,

*(৫) বোধগম্যতাকে বাদ দিয়ে প্রকাশভঙ্গীকে বড় করে দেখা,

*(৬) তাৎপর্য নির্ণয়ের অসুবিধা,

*(৭) মুখস্থের উপর বিশেষ গুরুত্ব দান,

*(৮) প্রশ্ন বেছে পড়ার স্বভাব গঠন।

এছাড়া বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার নিজস্ব অনেক ত্রুটি আছে। যেমন—

(৯) এই ধরনের পরীক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হ'য়ে পড়ে। পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাধান্য লাভ করে, চারিত্রিক অন্যান্য গুণের বিকাশ গৌণ হয়। এর ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়।

(১০) এই ধরনের পরীক্ষার প্রশ্নকর্তাদের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের কোন সংযোগ থাকে না। অনেক সময় তাঁদের এই স্তরের শিক্ষার্থীর জ্ঞান কতটা হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ধারণা থাকে না, ফলে প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের উপযোগী হয় না।

(১১) এই ধরনের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব সৃষ্টি করে। যার জন্য সামাজিক গুণগুলোর সুস্থ বিকাশের চেষ্টা বিদ্যালয়ে ব্যর্থ হয়। তাই অনেকে পরীক্ষাকে Necessary evil বলে মনে করেন।

(১২) শিক্ষার্থীরা এই ধরনের পরীক্ষায় অনেক সময় পরীক্ষককে ঠকানোর জন্য প্রশ্নের সঠিক উত্তর না দিয়ে একটা আচরণের আড়ালে উত্তর লিখে যায়।

(১৩) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না থাকায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারনা হয় না। এর ফলে, পাশ করার জন্য তারা অনেক সময় অসদুপায় অবলম্বন করে।

(১৪) এই পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক বিকাশের পরিমাপকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সাময়িক একটা প্রভাবই মাত্র দেখা হয়।

বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার সংস্কার (Reforms of External Examination) :

বহিঃসংস্থার পরিচালিত পরীক্ষার মধ্যে এই সব দোষত্রুটি আছে বলে, বর্তমান কালে শিক্ষাবিদ্‌রা একে উঠিয়ে দেওয়ায় পক্ষপাতী। তাঁরা যতদূর সম্ভব আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন। অনেক প্রগতিশীল দেশে তাই আজকাল বিদ্যালয়গুলো নিজেরাই শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির সংগঠনের মধ্যে এমন অনেক গলদ আছে, যার জন্য এই

[*এগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি তা পুনরাবৃত্তি করলাম না]।

ধরনের পরীক্ষাকে হঠাৎ উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই এর কিছু উন্নতি সাধনের চেষ্টা করা উচিত। নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রচলিত বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার কিছু কিছু সংস্কার করা যায়।

[এক] প্রশ্নপত্র রচনার সময় পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর ক্ষমতা ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। পরীক্ষক যেন মনে রাখেন, প্রশ্ন করা হ'চ্ছে শিক্ষার্থীর উন্নতি পরিমাপ করার জন্য, তাকে ঠকানোর জন্য নয়।

[দুই] বহিঃসংস্থা পরিচালিত পরীক্ষার সংখ্যা যত কমানো যায় তত ভাল। কারণ, এই পরীক্ষা শিক্ষার্থীর মনকে বিচলিত করে।

[তিন] পরীক্ষা বহিঃসংস্থার দ্বারা পরিচালিত হ'লেও যতদূর সম্ভব শিক্ষকদের দিয়ে প্রশ্ন করানো উচিত এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করানো উচিত। এতে ক'রে পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন হয়।

[চার] সবশেষে এই পরীক্ষার ত্রুটি কমাতে হ'লে সম্পূর্ণ ভাবে এর ফলাফলের উপর গুরুত্ব দিলে চলবে না। আভ্যন্তরীন পরীক্ষার ফলাফলের উপর এই ধরনের পরীক্ষায় সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

॥ আলোচনা ॥

পরীক্ষা গ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল, প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং তাকে বিভিন্ন দিক থেকে সংস্কার ক'রে আংশিক ফল পাওয়া যায়। আবার আধুনিক আদর্শায়িত অভীক্ষায়ও নানা রকম ত্রুটি আছে। তাই পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে সুফল পেতে হ'লে এবং পরীক্ষাকে শিক্ষার উদ্দেশ্যের অনুকূল ক'রে কাজে লাগাতে হ'লে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মূল্যায়নই একমাত্র পন্থা। তাই মূল্যায়নের (evaluation) ধারণাকে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে এবং শিক্ষাবিদ্, মনোবিদ্, শিক্ষক সকলকে সমবেত ভাবে চেষ্টা করতে হবে কি করে এই পদ্ধতিকে নিখুঁত করা যায়। প্রত্যেকে যদি আগ্রহ এবং সৎ ইচ্ছা নিয়ে এদিকে হাত বাড়ান তাহ'লে পরীক্ষাকে আর Necessary Evil আখ্যা দিতে হবে না, তার পরিবর্তে শিক্ষাক্ষেত্র Vital necessity হ'য়ে দাঁড়াবে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the defects of the existing system of examination? How would you bring about reforms in the system? **[C. U. ; B. A. 59]**

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. Discuss the merits and demerits of public examination. Can examination be improved ? [C.U. B.A. '57,' 58, C.U. ; B. T.' 58,' 59,'61]

Ans. ৩০৯ হইতে ৩১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Enumerate and explain the advantages and disadvantages of new types of tests. [C. U. B. T. 62,

Ans. ২৯৩ হইতে ৩০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. Why have examination been called a "necessary evil" ? How can you make them more conducive to the all round development of the pupil and more significant of the true ends of education. [N. B, U. ; B. T. '63]

Ans. ২৮৬ হইতে ২৮৯ পৃষ্ঠা এবং ৩০৫ হইতে ৩০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

5. Discuss the value and limitations of the examination held by an external body as the final evaluation of school education. [C. U. ; B. T. '57

Ans. ৩০৯ হইতে ৩১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

6. Indicate the significance of evaluation as a new concept in examination. Discuss in this context some of the recent trends in determining pupils' progress and promotion and consider their usefulness.

[N. B. U. ; B. T. '63]

Ans. ৩০৫ হইতে ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

7. What is evaluation any what is its role in education ? Discuss the various ways and means for assessing the more worthy outcomes of education and the all round development of the personality of the pupil.

[N. B. U. B. T. '63]

Ans. ৩০৫ হইতে ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বংশগতি ও পরিবেশ

Heredity and Environment

যে-কোন সমাজ বিজ্ঞানে (Social science) বংশ (heredity) এবং পরিবেশের (environment) মধ্যে দ্বন্দ্ব সমগ্র আলোচনার বিরাট একটা অংশ জুড়ে থাকে। চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে বংশগতি ও পরিবেশের প্রভাব নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে বংশগতি প্রধান, না পরিবেশ প্রধান এ নিয়ে শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্‌দের মধ্যে বহুদিন ধরে জল্পনা-কল্পনা ও আলোচনা চলে আসছে। কেউ কেউ বলেন শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির ভূমিকা প্রধান, আবার কেউ কেউ বলেন পরিবেশের ভূমিকা প্রধান। যা হোক্ শিক্ষাক্ষেত্রে এদের গুরুত্বকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে, বংশগতি ও পরিবেশ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা দরকার।

॥ বংশ ধারা কি ? (What is meant by Heredity ?) ॥

শিশু জন্মের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের যে-সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় তাকেই বলা হয় তার বংশগতি। প্রত্যেক শিশুই তার বাবা, মা, ঠাকুরমা ইত্যাদির কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে শুধু বাবা মায়ের গুণ নিয়ে জন্মাবে তার মানে নেই। যে-কোন পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে তার বৈশিষ্ট্য লাভ হ'তে পারে। এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা তার বাবা মায়ের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল, যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাইনি, সে সব গুণও শিশুর মধ্যে দেখা যায়। এই বংশগতির ধারায়ই পরিবারের বৈশিষ্ট্য ফুঠে ওঠে। বর্তমান কালে, জীব বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন যে, সন্তান উৎপাদন, শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদার ফল নয়। বিশেষ ক'রে মানুষের মত বিচারবুদ্ধিশীল প্রাণীর ক্ষেত্রে একেবারেই নয়। তার পেছনে একটা প্রেষণা-শক্তিও কাজ করে। এই প্রেষণা হ'ল নিজের বৈশিষ্ট্যকে সময়ের দূরত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বজায় রাখার চেষ্টা। তাই মানুষ শিশু যদি তার বাবা-মায়ের বৈশিষ্ট্য নিয়ে না জন্মাতো, আর তার পেছনে যদি আত্মসংরক্ষণের প্রচেষ্টা না থাকতো তাহ'লে, বাবা মা তাকে এত যত্ন ক'রে লালন পালন করতেন না। অবশ্য এর পেছনে বাৎসল্য যে নেই তা

নয়, তবে ঐ ধরনের প্রেষণা ও শক্তি জোগায়। তাই বংশগতি আছে বলেই মানবসভ্যতা সৃষ্টির আদি যুগ থেকে জলস্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে। তাহ'লে বংশগতি বলতে আমরা শিশু জন্ম মুহূর্তে তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে সব দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে তার সমবায়কে বলবো। স্টোন (Stone) বলেছেন—"It is the sum total of all the physical and mental characteristics received by the individual from his ancestor at birth". পূর্বপুরুষ বলতে তিনি সকলকেই বুঝাতে চাইছেন শুধু বাবা মা নয়, বাবা মা তাঁর প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষ, তাই তাঁদের কাছ থেকে যা পায় তাকে আমরা প্রত্যক্ষ বংশগতি (Direct heredity) বলতে পারি, আর অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পায় তাকে আমরা পরোক্ষ বংশাগতি (Indirect heredity) বলতে পারি। আমরা বাবা মা ছাড়াও যে অন্যান্য পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে বংশগতির ধারায় নানা ধরনের বৈশিষ্ট্য লাভ করি, তার উল্লেখ করেছেন মনোবিদ্ গ্যাল্টন (Galton) তাঁর Law of Ancestral Inheritance-বইএ। এই সূত্রে তিনি বলেছেন, কোন শিশু তার বৈশিষ্ট্যের অর্ধেক ($\frac{1}{2}$) অংশ পায় বাবা মায়ের কাছ থেকে, এক চতুর্থাংশ ($\frac{1}{4}$) পায় দাদু দিদিমা শ্রেণীর পূর্ব পুরুষদের কাজ থেকে, এক অষ্টমাংশ ($\frac{1}{8}$) পায় তারও পূর্ববর্তী বংশধরদের কাছ থেকে। এমনি ভাবে চলতে থাকে। গ্যাল্টনের এই তত্ত্ব অভ্রান্ত নয়। তিনি যে পরিমাণের নির্দেশ দিয়েছেন, তার ভিতর সত্যতা নেই। কিন্তু মূল বক্তব্যের মধ্যে যে ভুল নেই, সে কথা আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন। কি নিয়মে এবং কিসের মাধ্যমে বংশগতির ধারা সঞ্চালিত হয়, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ আছে। লামার্ক (Lamark) থেকে শুরু ক'রে, ডি ভ্রাইজ (De Vries), মেণ্ডেল (Mendel), মর্গান (Morgan), ম্যাকল্যাং (McLung) প্রভৃতি অনেক রকম ব্যাখা দিয়েছেন। সে আলোচনার অবতারণা আর এখানে করবো না। যে-কোন ক্রিয়া বা কৌশলের মধ্যে হোক্ না কেন, বংশগতি, শিশুর মধ্যে বর্তমান থাকে, তার জন্ম মুহূর্তে। সে তার পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, তাকেই আমরা সাধারণ ভাবে তার বংশগতি বলছি। উড্ওয়ার্থ ও মারকুইস (Woodworth and Marquis) খুব সহজ ভাবে এই বংশগতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ব'লে—Heredity covers all the factors that were present in the individual when he began life……"

বংশগতি সম্পর্কে আর একটা প্রশ্ন হ'ল—বংশগতির ধারায় আমরা কি কি ধরনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করি। উডওয়ার্থ-মারকুইস্ তাঁদের সংজ্ঞায় 'সব রকম গুণ' (all the factors) যা জন্মগত ভাবে পাওয়া তাকে বলেছেন বংশগতি। এই সব গুণ কি, কি ? স্টোনের (Stone)-এর সংজ্ঞায় এর একটু বিশ্লেষণ পাই। তিনি বলেছেন—জন্মগত ভাবে পাওয়া দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য (Physical and mental characteristics)। তাঁর এই বিশ্লেষণের পথ ধরে, আমরা বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—

[এক] **দেহগত বংশগতি** (Physical heredity): ব্যক্তির দৈহিক আকৃতি, গঠন, গায়ের রং, চুলের রং, চোখের মনির রং ইত্যাদি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো যা ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে, তাদের বলা যেতে পারে দেহগত বংশগতি। এর সঙ্গে দেহের অভ্যন্তরে রসক্ষরা গ্রন্থিগুলোরও সংযোগ আছে।

[দুই] **মানসিক বংশগতি** (Mental heredity): এর অন্তর্গত নানা ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলো—সংস্কার (Instinct), আবেগ (Emotion), চিন্তন (Thinking), ইচ্ছন (Willing) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলোও সম্পাদন করার প্রাথমিক কৌশল আমরা জন্মগত ভাবে পাই। এছাড়া বুদ্ধি এবং বিশেষ ক্ষেত্রের দক্ষতাও আমরা জন্মগত ভাবে অর্জন করি।

এ ছাড়া কিছু কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যেগুলোকে সম্পূর্ণ ভাবে দৈহিক বা সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক বৈশিষ্ট্য বলা যায় না। এদের জন্য দেহ ও মন উভয়ে দায়ী (Psycho-somatic)। এগুলোকে আমরা মনঃপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (Temparamental characteristic) বলতে পারি। সাধারণ কথায় আমরা যাকে বলি মুড (mood)। এই ধরনের মানসিক অবস্থা কোন বিশেষ জন্মগত দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সৃষ্টি হয় এবং ইহা কম বেশী চিরস্থায়ী। সুতরাং এই ধরনের বৈশিষ্ট্যকেও আমরা বংশগতির ধারায় লাভ করি। আলপোর্টও এই মনঃপ্রকৃতির ধারণার মধ্যে জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—**"Temparament refers to the characteristics phenomena of an individual's emotional nature including his susceptibility to emotional stimulation, his customary strength, and speed of response, ... , these phenomena being regarded as dependent upon constitutional make up, and therefore largely hereditary in origin."**

॥ পরিবেশ কি ? (What is Environment ?) ॥

পরিবেশ বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তিকে যা পরিপূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত ক'রে আছে। মনোবিদ্যায় বা শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশ কথাটা ঠিক এরকম নিষ্ক্রিয় অর্থে ব্যবহার করি না। আধুনিক মনোবিদ্যায় পরিবেশের সক্রিয় সংব্যাখ্যান দেওয়া হ'য়েছে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরিবেশ স্থান কালের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। যে সব উত্তেজক জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে উত্তেজিত করে, তারই সমবায়ে সেই ব্যক্তির পরিবেশ গঠিত। স্টোন (Stone) বলেছেন—"Environment is sum total of all the stimulations received by an individual from birth till death" এই সংজ্ঞাকে এক দিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, ব্যক্তির পরিবেশ নিষ্ক্রিয় নয়। প্রাকৃতিক জগতের যে সব বস্তু তাকে উত্তেজিত করতে পারে তাই হ'ল তার পরিবেশের অন্তর্গত। যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে বসে গবেষণার কাজ ক'রে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে পরিবেশই হ'ল তাঁর পরীক্ষাগারের বিভিন্ন অংশ—যারা তাঁকে সক্রিয় ক'রে তোলেন। কিন্তু অন্য ব্যক্তি যে সাধারণভাবে সেখানে দেখতে গিয়েছে, তার কাছে তা পরিবেশ নয়। কারণ, ঐ সব জিনিস তাকে উত্তেজিত করতে পারে না। যে দেখতে পায় তার কাছে আলো উত্তেজক (Light stimulus) পরিবেশ কিন্তু অন্ধের কাছে তা নয়। অর্থাৎ, বিশ্ব প্রকৃতির যে-সব অংশ ব্যক্তিকে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে উত্তেজিত করেছে, বা সক্রিয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তারই সমবায় হ'ল তার জীবন পরিবেশ। আবার, পরিবেশ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। এখানে জন্ম বলতে আমরা ঠিক ভূমিষ্ঠ হওয়ার ক্ষণকে বলছি না। জন্ম বলতে আমরা মায়ের গর্ভে প্রথম জীবনের সঞ্চার মুহূর্তকে বুঝাতে চাইছি। এই অর্থে বিচার করলে, আমরা ব্যক্তির পরিবেশকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—

[এক] **ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ (Pre-netal Environment) :** মায়ের গর্ভে থাকাকালীন বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উত্তেজনা ভ্রূণকে প্রভাবিত করে। এই ধরনের প্রভাবকে আমরা বলছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বের পরিবেশ। ব্যক্তি-জীবনের বিকাশে, এই ধরনের পরিবেশের গুরুত্ব বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেন। গর্ভাবস্থায় মায়ের আঘাত লাগলে, মা খুব জোরালো ওষুধ খেলে, মা ঠিক মত খাওয়া দাওয়া না করলে শিশুকে তা নানা ভাবে প্রভাবিত করে। এই পর্যায়ে পরিবেশ মায়ের দেহের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে ক্রিয়া করে।

[দুই] **ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ (Post-netal environment) :** ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে যে সব প্রাকৃতিক শক্তি ব্যক্তিকে মৃত্যু পর্যন্ত সক্রিয় রাখে তাকেই বলা হ'চ্ছে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের পরিবেশ। এর ভেতর সমস্ত রকমের উত্তেজককে ফেলা যায়। এই পরিবেশকে ব্যক্তির ক্রিয়ার ক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—বিদ্যালয় পরিবেশ, পরিবারের পরিবেশ, সমাজ পরিবেশ, কর্ম পরিবেশ ইত্যাদি।

বংশগতি ও পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Relative importance of Heredity and Environment) :

পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে, বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব নিয়ে শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'য়েছে। একদল বলেন, শিশুর শিক্ষার জন্য বংশগতিই একান্ত প্রয়োজন, পরিবেশের কোন প্রয়োজন নেই। এই মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তাবিদ্‌দের বলা হয় বংশগতিবাদী (Hereditarian), আবার অপর একদল আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন, বংশগতির মূল্য কিছু নেই ; শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশই প্রধান। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শিশুর শিক্ষাকে যে কোন ভাবে পরিবর্তন করা যায়। এদের বলা হয় পরিবেশবাদী (Environmentalist)। এঁদের উভয় পক্ষের সিদ্ধান্তের পেছনে কিছু যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। সে সব সম্পর্কে আলোচনা করলে, তাঁদের যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

বংশগতির পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি (Arguments in favour of Heredity) :

বংশগতিতে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁদের বক্তব্য নীচের মন্তব্যটির দ্বারা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছে। "Heredity not environment is the chief maker of men. Nearly all the misery and nearly all the happiness in the world are due not the environment."... (*Wiggam*)। বংশগতির উপর যে সব চিন্তাবিদ্ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাদের মধ্যে গ্যাল্টন (Galton) প্রধান। তাঁকেই বংশগতিবাদীদের প্রবক্তা বলা হয়। তিনি শিশুর জীবনে বংশগতির প্রভাবের উপর এমন আস্থাবান ছিলেন যে, তিনি এক বিজ্ঞানের শাখারও সৃষ্টি করেছেন, এ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য। একে আধুনিক কালে বলা হয় Eugenics. গ্যাল্টনের মূল বক্তব্য হ'ল মানুষ শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তাকে ভাল বংশগতির অধিকারী করতে হবে (Mankind will have to breed first, before

we attempt to educate him)। বাংলায় প্রবাদ আছে, 'গাধা পিটিয়ে মানুষ করা যায় না'—এই মতবাদে এঁরা বিশ্বাসী। গ্যাল্টন এবং তাঁর অনুগামীরা পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা তাঁদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে দেখিয়েছেন।

[এক] গ্যাল্টন নিজে ডারউইন প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যক্তির কুলপঞ্জী (Family history) সংগ্রহ ক'রে তার পর্যালোচনা করেন এবং তা Hereditary Genius নামে এক পুস্তকে প্রকাশ করেন। গ্যাল্টনের এই কাজকে সম্পূর্ণতর করেন কার্ল পিয়ার্সন (Pearson)—তিনি ওয়েজউড্-ডারউইন-গ্যাল্টন (Wedgewood-Darwin-Galton) পরিবারের এক হাজার বছরের বংশতালিকা তৈরী করেন এবং তার থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই কয়টি পরিবার থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিভাবান ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদিতে নিজেদের কীর্তি রেখে গেছেন। ডারউইন পরিবারের পাঁচ জন রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হ'য়েছিলেন। এর থেকে গ্যাল্টন এবং পিয়ার্সন সিদ্ধান্ত-করেছিলেন যে, মানুষের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তাঁর বংশগতি বা জন্মগত ভাবে পাওয়া বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। তাই একই পরিবারে এতজন বিশিষ্ট মনীষীর জন্মগ্রহণ সম্ভব হ'য়েছিল।

[দুই] এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমরা ডাগডেল (R. L. Dugdale)-এর এক পর্যবেক্ষণে পাই। তিনি নিউইয়র্ক-এর জেলসমূহের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর কর্ম জীবনে তিনি লক্ষ্য করেন, জেলখানায় যে বিভিন্ন ধরনের কয়েদী আসে তাদের অনেকের পদবীতে সাদৃশ্য আছে। তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন তারা একই বংশোদ্ভব। তিনি জিউক (Juke) এই ছদ্ম নাম ব্যবহার ক'রে, সেই পরিবারের কুলপঞ্জী প্রকাশ করলেন। তাতে দেখা গেল, এই পরিবারটির শুরু হ'য়েছে এক দুশ্চরিত্র ভবঘুরে লোক থেকে এবং বহু বৎসর পর পর্যন্ত ঐ পরিবার থেকে যে সব ব্যক্তি জন্মেছে, তাদের লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই অসৎ ব্যক্তি। তিনি এই পরিবার থেকে উদ্ভূত প্রায় পাঁচ পুরুষে ১৬৬৭ জন লোকের খোঁজ পান। তার মধ্যে ৩০০ জন শিশু অবস্থায়ই মারা গেছে, ৩১০ জন বহু বছর ধরে খুব দুঃস্থ অবস্থায় জীবন যাপন করেছে, ৪৪০ জন রোগে মারা গেছে, ৪০০ জন নিজেদের ধূর্ততার জন্য মারা গেছে, ৭ জন ছিল খুনী, ৬০ জন চোর, যারা অন্ততপক্ষে ১২ বছর ক'রে জেল খেটেছে; ১৩০ জনকে কোন-না-কোন সময়ে অপরাধী হিসেবে কোর্টে অভিযুক্ত করা হ'য়েছে, এবং মাত্র ২০ জন কোন রকমে

হাতের কাজ শিখে সুস্থ জীবন যাপন করেছে। এর থেকে ডাগডেল, একই সিদ্ধান্ত করলেন যে, বংশগতির প্রভাবেই একই বংশের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে এক জাতীয় গুণ দেখা গেছে। এই সব ব্যক্তিদের মধ্যে বংশগতির প্রভাবই বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

[তিন] গডার্ড (Goddard) অনুরূপভাবে কালিকক্ ছদ্মনামে (Kalikak) এক পরিবারের কুলপঞ্জী পর্যালোচনা করেন। তিনি দেখেন, এই পরিবার যে ব্যক্তি থেকে শুরু হ'য়েছে, তিনি দুইটি বিবাহ করেন—একজন সুস্থ বুদ্ধিমতী মহিলাকে এবং আর একজন ক্ষীণবুদ্ধি মহিলাকে। এই দুই স্ত্রীর সন্তান থেকে দেখা যায়, ক্ষীণবুদ্ধি স্ত্রীর দরুণ যে পরিবারের ধারা চলে এসেছে, তাতে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন এবং অসামাজিক গুণসম্পন্ন। আর বুদ্ধিমতী স্ত্রীর দরুণ যে পরিবারের ধারা এসেছে, সেখানে দেখা যায় বুদ্ধিমান এবং স্বাভাবিক ব্যক্তির আবির্ভাব। এর থেকে গডার্ড বংশগতির অনুকূলে সিদ্ধান্ত করলেন।

[চার] টারম্যান (Terman) কালিফোর্নিয়ার এক হাজার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের (Gifted children) বুদ্ধির পরিমাপ করেন এবং তাদের পিতা-মাতার বুদ্ধির পরিমাপ ক'রেই এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, বংশগতি ব্যক্তির বুদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান।

[পাঁচ] নিউম্যান ফ্রেড্ (Fred) এবং এড্উইন্ (Edwin) নামে দু'জন সমকোষী যমজ সন্তানের খোঁজ পান যখন তাদের বয়স ২৬ বছর। শৈশবেই তারা পৃথক হ'য়ে যায় এবং বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়। কিন্তু ২৬ বছর বয়সে তিনি যখন তাদের খোঁজ পান, তখন দেখেন, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে। দৈহিক বিকাশের দিক থেকে তাদের মধ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য দেখা যায়নি। গায়ের রঙ্, চুলের রঙ্, ওজন, সবই প্রায় একরকম ছিল। আবার মানসিক দিক থেকেও তাদের মধ্যে অনেক মিল দেখা গেল। দু'জনেই একই ধরনের বৃত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। তার বিভাগে, তাদের উভয়েরই বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করার ঝোঁক আছে। তাদের মধ্যে বুদ্ধাঙ্কেরও বিশেষ তফাৎ নেই; দু'জনেই বিয়ে করেছে প্রায় একই সময়ে এবং তাদের একটি ক'রে ছেলেও হ'য়েছে। দু'জনে কুকুরের একই নাম রেখেছে 'টিক্সি'। এর থেকে নিউম্যান সিদ্ধান্ত করলেন পরিবেশের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যখন তাদের মধ্যে মিল দেখা যাচ্ছে, সুতরাং জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতির প্রভাবই বেশী।

শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির গুরুত্ব (Importance of heredity in Education) : পূর্বোক্ত যুক্তি থেকে বংশগতিবাদীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, শিশুর শিক্ষার জন্য তার বংশগতি একান্ত প্রয়োজন। বংশগতি প্রয়োজন অর্থে, এই নয়, যে তাদের কারুর কারুর বংশগতি থাকে না ; অর্থাৎ ভাল বংশগতি দরকার। শিশু যদি যথার্থ দৈহিক ও মানসিক গুণ জন্মগত ভাবে না পায় তাহ'লে তাকে শত চেষ্টা করলেও, আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতির দ্বারা উন্নত করা যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর মধ্যে যদি কোন সম্ভাবনাই না থাকে তার বিকাশ কি ক'রে হবে। বিকাশধর্মী কোন বস্তুর মধ্যে বিকাশধর্মী কোন সত্তা অবশ্য থাকার দরকার। একটা বীজ থেকে চারাগাছ হয়, তার থেকে একদিন বড় গাছ হয়। বীজের মধ্যে জীবনের বা বিকাশের সম্ভাবনা আছে বলেই ত সম্ভব হয়েছে, তেমনি শিশুর মধ্যে যদি বংশগতির ধারায় সম্ভাবনাগুলো না থাকে তার বিকাশেরও কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই যুক্তির উপর ভিত্তি ক'রে গ্যাল্টন এবং তাঁর অনুগামীরা বললেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান হ'ল বংশগতি ; বংশগতিই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের উপাদান যোগায়। অধ্যাপক নান (Nunn)-এর ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, এই বংশগতিবাদীরা মনে করেন—"the circumstances of life are to a man what rocks and winds and currents to a ship ; merely accident that make his qualities manifest but have nothing whatever to do with producing them."

পরিবেশের পক্ষে বক্তব্য ও যুক্তি (Arguments in favour of Environment) : পরিবেশবাদীদের বক্তব্য সম্পর্কে আমাদের ধারণা হ'বে যদি আমরা ওয়াট্‌সন-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি। তিনি বলেছেন—"Give me a dozen healthy infants, well formed, and my own specified world to bring them up in and I'll guarantee to take any one at random and train him to become any type of specialised, I might select....."এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, এঁরা বংশগতি বলতে কিছু আছে তা বিশ্বাস করেন না। এঁরা মনে করেন, অন্তর থেকে বিকাশ করার মত শিশুর মধ্যে কিছুই থাকে না। নির্দিষ্টসংখ্যক হাত, পা, আঙুল ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকলে আমরা যে-কোন শিশুকে আমাদের ইচ্ছা মত পরিবেশের প্রভাবে গঠন করতে পারি। দরকার হ'লে একই ব্যক্তিকে উন্নত

পরিবেশের মধ্যে রেখে প্রতিভাবান ক'রে তুলতে পারা যায়; তাকেই আবার অন্য রকম পরিবেশের মধ্যে অসামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত করা যায়।

এই মতবাদের স্বপক্ষে বলেছেন ফরাসী দার্শনিক হেলভিসিয়াস (Helvetius)। ফরাসী দার্শনিক রুশোও এই মতবাদ প্রচার ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন মানুষ ভাল বা খারাপ হ'য়ে জন্মায় না। সততা বা অসৎ ভাব সমাজেরই সৃষ্টি। রুবার্ট আওয়েন (Robert Owen) এই মতবাদকে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রয়োগ ক'রে স্কটল্যাণ্ডের এক গ্রামের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। পরবর্তিকালে বিভিন্ন মনোবিদ ও শিক্ষাবিদ্ তাঁদের পথ অনুসরণ করেন এবং তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নানা রকম যুক্তি দেখান। বিশেষ ভাবে আচরণবাদীরা এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মতবাদের সমর্থনের পেছনে তাঁদের আরো অনেক উদ্দেশ্য ছিল ঠিকই, কিন্তু পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁরা যে সব যুক্তি এর পক্ষে দেখিয়েছেন, তাতে ক'রে এই মতবাদের গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। এখন পরিবেশের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করবো।

[এক] ইস্টার ব্রুক্ (Easter Brook, A, H,) ১৯১৫ সালে ডাগডেলের জিউক পরিবার-সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কে আরো তথ্য প্রকাশ করেন। তাতে তিনি দেখালেন, জিউকদের অনেকেরই সামাজিক পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে উন্নতি হ'য়েছে, তিনি তার প্রকাশিত পুস্তিকায় বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে, এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ডাগডেলের অনুসন্ধান সম্পূর্ণ ছিল না তাই তিনি বংশগতির স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। আসলে দেখা যাচ্ছে, পরিবেশের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সব ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি হ'য়েছে এবং তিনি এর থেকে পরিবেশের স্বপক্ষে রায় দেন, তবে বংশগতিকে একেবারে অস্বীকার করেননি।

[দুই] ক্যাটেল (Cattell) আমেরিকার কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের জীবনী অনুশীলন ক'রে তার পর্যবেক্ষণের ফল ১৯০৬ সালে প্রকাশ করেন "A Statistical Study of American Man of Science."—এই নামে। ক্যাটেল বলেছেন, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বুদ্ধির উন্নতি বা বিকাশ, লোকবসতি, সুযোগ, আর্থিক সংগতি, আদর্শ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। ক্যাটেলের এই সিদ্ধান্ত গ্যাল্টন ও পিয়ার্সনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যায়।

[তিন] বারবারা বার্কস্ (Barbara Burks) শিশুর বিকাশের উপর পালিত পিতামাতার গৃহ পরিবেশের (Foster Home) প্রভাব পরীক্ষা ক'রে দেখেন। তিনি প্রায় ২০৭টি ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন। এদের

প্রত্যেককেই এক বছর বয়স হওয়ার আগেই পোষ্য নেওয়া হ'য়েছিল। তিনি শিশুদের বুদ্ধি পরিমাপ করে দেখেন, তাদের পিতামাতার বুদ্ধি পরিমাপ করেন এবং তাদের পালক পিতা-মাতাদেরও বুদ্ধির পরিমাপ ক'রে দেখেন। এদের তুলনামূলক বিচার ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পরিবেশের প্রভাবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে পালক পিতা-মাতার প্রভাবে শিশুর বুদ্ধির কিছু পরিবর্তন হয়। তিনি দেখেছেন সবচেয়ে বেশী পরিবর্তন হয় ২০ বুদ্ধাঙ্কের। তিনি আরো সিদ্ধান্ত করেছেন, শিশুদের সামগ্রিক পার্থক্যের জন্য শতকরা ১৭ ভাগ পরিবেশ দায়ী। তিনি অবশ্য একেবারে বংশগতিকেও অস্বীকার করেননি। তিনি তার পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত করেছেন বংশগতির প্রভাব শিশুর মধ্যে বেশী পরিমাণেই থাকে তবে পরিবেশ সেখানে একেবারে অনুপস্থিত নয়। বার্কস্-এর এই সিদ্ধান্তকে লীহি (Leahy) নামে আর একজন মনোবিদ্ সমর্থন করেছেন। অনুরূপ ভাবে পরীক্ষা ক'রে, তবে এই পরীক্ষার ফলকে একদিকে যেমন পরিবেশের পক্ষে উপস্থাপন করা যায়, আবার বংশগতির পক্ষেও উপস্থাপন করা যায়।

[চার] ফ্রীম্যান (Freeman), হোলৎজিঙ্গার (Holzinger) এবং মীচেল (Mitchell প্রভৃতি মনোবিদ্‌রা যমজ সন্তানদের (Twins) উপর বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করেন। যমজ দু'ধরনের হয়। অনেক সময় একই নিষিক্ত অণ্ড (Fertilized ovum) থেকে কোষ বিভাজনের সময় দুটি যমজ সন্তান সৃষ্টি করে। এদের বলা হয় এককোষী যমজ (Identical twin)। দৈহিক এবং মানসিক দিক থেকে এদের খুব বেশী মিল থাকে। আবার অনেক সময় একই গর্ভ সঞ্চারের সময় দু'টো নিষিক্ত অণ্ড (Fertilized ovum) থেকে যমজ সন্তান হয়। এদের বলা হয় ভিন্নকোষী যমজ (Fraternal twin)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের যমজ সন্তানই বেশী হয়। এদের মধ্যে খুব বেশী রকম মিল থাকে তবে সমকোষী যমজদের থেকে অপেক্ষাকৃত কম। এই সব যমজদের ১৯ জোড়া সম্পর্কে ফ্রিম্যান, হোলৎজিঙ্গার এবং মিচেল এক বিবরণী প্রকাশ করেন। এই যমজদের মধ্যে একজন ক'রে তাদের পিতামাতার কাছে মানুষ হয়। আর একজন দত্তক পিতার বাড়ীতে মানুষ হয়। মনোবিদ্‌রা এই যমজদের দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক গুণের পরিমাপ করেন। এর থেকে তারা সিদ্ধান্ত করেন যে, বুদ্ধাঙ্কের দিক থেকে তাদের পার্থক্য কোন সময় ২৪ পর্যন্ত হ'য়েছে। ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এরা কখনও বেশ কাছাকাছি আবার কখনও তাদের পার্থক্য যথেষ্ট। তবে স্বইসিন্‌জার (Schwesinger) পরে এই সব

যমজ পর্যবেক্ষণের ফলাফল পর্যালোচনা ক'রে দেখে বলেছেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পালক পিতার বাড়ীর পরিবেশ এবং নিজস্ব পিতার বাড়ীর পরিবেশ এক রকম ছিল ব'লে পার্থক্য দেখা যায়নি। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পার্থক্য ছিল, সে সব ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য দেখা গেছে।

[পাঁচ] পরিবেশের স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে প্রায়ই গ্লাডিস (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে দুই সমকোষী যমজ সন্তানের উল্লেখ করা হয়। এরা দু'জন ঘটনাচক্রে দেড় বছর বয়সের সময় পরস্পর দূরে সরে যায়। হেলেন পালিতা মাতার যত্নে পড়াশুনা ক'রে বি. এ. পাশ ক'রে। পরে এক বিত্তশালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার বিয়ে হয় এবং সে ভালভাবেই ঘর সংসার করতে থাকে। তার মধ্যে বৈশিষ্ট্যগুলোও বেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়।

কিন্তু গ্ল্যাডিস্ ঠিক তার বিপরীতধর্মী হ'য়ে ওঠে। সুযোগের অভাবে সে লেখাপড়া করতে পারেনি। ক্যানাডার রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কল-কারখানায় ঘুরে বেড়ায়। স্বাস্থ্যও খুব ভাল ছিল না। ৩৫ বৎসর বয়সের সময় যখন তাদের আবিষ্কার করা হয়, তখন দেখা যায় তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায় দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে। দৈহিক অবয়বের দিক থেকে তাদের মধ্যে কিছু মিল দেখা গেলেও, দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে তাদের মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও তাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। বুদ্ধির দিক থেকে তাদের মধ্যে ২৪ পয়েন্ট বুদ্ধাঙ্কের তফাৎ দেখা যায়। এর থেকে স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত করা যায়, পরিবেশের গুরুত্ব জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে কম নয়।

[ছয়] পরিবেশের প্রভাবে বুদ্ধাঙ্কের পরিবর্তন হয় কিনা তা অনুসন্ধান করার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ্ পরীক্ষা করেন, এ সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বুদ্ধাঙ্কের বেশ পরিবর্তন হ'য়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি।

এই সব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে পরিবেশবাদীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানুষের জীবন বিকাশ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হ'ল পরিবেশ। তাঁরা মনে করেন, শিক্ষা হ'ল জীবন বিকাশের কৌশল। তাই শিক্ষার জন্য পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন। অঙ্কুরোদ্গম করার জন্য যেমন উপযুক্ত তাপ, বায়ু এবং জলের প্রয়োজন; তেমনি শিশুর জীবন বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। মানব শিশুর প্রথম জীবনের সঞ্চার হয় মাতৃ গর্ভে তখন

থেকেই তাকে পরিবেশ উপযুক্ত ভাবে যদি উত্তেজিত না করে, তাহ'লে তার ভূমিষ্ট হওয়ার কোন সম্ভবনাই থাকবে না, তার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাই শুকিয়ে যাবে। সে মায়ের গর্ভে উপযুক্ত পরিবেশ পায় বলেই নির্দিষ্ট সময়ের পর সে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে জন্ম লাভ করে। তাই শিশুকে জন্মের পরে ঠিকভাবে জীবন পথে পরিচালিত করতে হ'লে শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ দিতে হবে। পরিবেশ ভাল হ'লে শিক্ষাও ভাল হবে, পরিবেশ যদি ঠিকমত না হয় শিক্ষার কাজও সার্থক হবে না।

বংশগতি ও পরিবেশ-সংক্রান্ত আধুনিক সমন্বয়ী ধারণা (Modern synthetic concept on heredity and environment):

বংশগতি ও পরিবেশ উভয়ের পক্ষেই নানা রকম যুক্তির অবতারণা করেছেন বিভিন্ন মনোবিদ্ ও শিক্ষাবিদ্। বংশগতিবাদীরা যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, শিশুর-জীবন বিকাশে বংশগতিই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আবার পরিবেশবাদীরা যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে, পরিবেশ জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই পরস্পরবিরোধী যুক্তির জালে আমাদেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধা। কোন্‌টা আমরা করবো? কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিদ্ বা মনোবিদরা এই ধরনের একপক্ষীয় মনোভাবে বিশ্বাসী নন। তাঁরা চরম বংশগতিবাদকে যেমন বিশ্বাস করেন না, তেমনি চরম পরিবেশবাদও তাদের কাছে অগ্রাহ্য। নান (Nunn) এই বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—'...The actual problem is not to choose one of the horns of a dilemma but to decide how much two distinct influences contribute to human development."

আধুনিক কালে, প্রায় প্রত্যেক মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাসী করেন, ব্যক্তি-জীবন এই দুই শক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। আধুনিক কালে, যমজ সন্তান, একই পিতা মাতার বিভিন্ন সন্তান, কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ ইত্যাদির উপর যে সব পরীক্ষা হ'য়েছে, তার থেকে কোন মনোবিদ্‌ই কোন এক বিশেষ পক্ষে রায় দেননি। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে এই দু'ধরনের উপাদানেরই গুরুত্বের কথা বলা হ'য়েছে। যে জীবনের সমস্ত রকম সম্ভাবনা নিয়ে মাতৃগর্ভে প্রথম সঞ্চার হয়, সেই সম্ভাবনাকে যদি তার জন্মমুহূর্ত থেকে মাতার দৈহিক অবস্থা ঠিক মত পরিবেশের মধ্যে যত্নের সঙ্গে ধরে না রাখতো তাহ'লে তার সেই সব সম্ভাবনার অবস্থা কি হ'ত তা সহজেই অনুমান করা যায়। আবার সেই কোষের মধ্যে যদি প্রাণের সম্ভাবনা না থাকতো

তাহ'লে যতই আদর্শ আভ্যন্তরীন অবস্থা থাকুক না, তার মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হ'ত না। তাই ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ এই দুই উপাদান—বংশগতি ও পরিবেশ, এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই ঘটে থাকে। তাই এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেছেন—"Heredity and environment are correlative factors." ব্যক্তি যে বংশগতির মাধ্যমে যে সব সম্ভাবনাগুলো নিয়ে জন্মেছে, তা পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করবে তার জীবন পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার যদি কোন বিশেষ এক অশিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে যদি জন্ম হ'ত তাহ'লে তিনি কোন দিন বিশ্বের কবি হ'তে পারতেন না। হয়তো তাঁর জন্মগত সম্ভাবনা ও গুণ থাকার জন্য, সেই গোষ্ঠির মানসিকতার উপযোগী ভাল গান রচনা করতে পারতেন। আবার অন্যদিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায়, সুন্দর আদর্শ পরিবেশ ব্যক্তির উপর কতটা কাজ করবে, তার জীবন বিকাশে কতটা সহায়তা করবে, তা নির্ধারণ করবে ব্যক্তির বংশগতির ধারা কি অর্জন করেছে তার উপর। এই কারণেই বড় লোকের ছেলেরা আদর্শ পরিবেশ ও সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় জীবনে উন্নতি করতে পারে না। সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বংশগতি ও পরিবেশ এদের যে-কোন একটা নয়, এদের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপরই ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ নির্ভর করছে। বংশগতি এবং পরিবেশ পরস্পরের উপর কিভাবে ক্রিয়াশীল হবে তার উপর নির্ভর করছে শিশুর জীবন বিকাশ কোন পথে পরিচালিত হবে। মনোবিদ্ আলপোর্ট'ও এই মত সমর্থন করেছেন। তিনি ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির পরিবেশ ও বংশগতির গুণফলের উপর নির্ভরশীল (Personality = f (Heredity) × (environment))। এর যে কোন একটির প্রভাব যদি শূন্য হয়, তাহ'লে ব্যক্তিসত্তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। তিনি মন্তব্যও করেছেন—"Since every quality is probably influenced by the original determinants inherent in the genetic system, and at the same time by the course of life an actively stimulating environment, it becomes impossible to ascribe with finality any single feature of personality either to heredity or to experience."

শিক্ষায় বংশগতি ও পরিবেশ (Heredity and Environment in Education) : শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ সাধন করা। আবার

পূর্বেই আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, শিশুর জীবন বিকাশের জন্য বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই প্রয়োজন। সুতরাং শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাদের গুরুত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের ভিত্তি হিসেবে তাদের মধ্যে যেমন সমন্বয় করেছি, তেমনি, শিক্ষাক্ষেত্রেও তাদের সমন্বয়িত প্রয়োগ না করতে পারলে, শিক্ষা সার্থক হবে না।

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বংশগতির কথা বিবেচনা করতে গেলে, দেখতে পাই শিক্ষার এবং শিক্ষকের দায়িত্ব সেখানে নগণ্য। বিদ্যালয়ে শিশুরা আসে পাঠ গ্রহণের জন্য, জীবন উপযোগী প্রশিক্ষণ পাওয়ার জন্য। কিন্তু যখন সে আসে তখন কিন্তু বংশগতির ধারা নিয়েই আসে। এই বংশগতির ধারাকে নির্ধারণ করায় শিক্ষকের কোন সুযোগই নেই। তিনি কেবলমাত্র তাদের গ্রহণ করতে পারেন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে। যে শিশু যে মানসিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে, সেই মতই তাকে গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে তাকে প্রকৃতির নিয়ম মেনে নিতে হবে। প্রত্যেক শিশুর উপর বংশগতির নীতি (Principle of heredity) যেমন ভাবে কাজ করেছে, সেই মতই সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বংশগতির নিয়মকে শিক্ষক কোন চেষ্টার দ্বারাই অতিক্রম করতে পারেন না। যতই উন্নত ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি তিনি গ্রহণ করুন না কেন, তার ক্ষমতা এক্ষেত্রে সীমিত।

অপর পক্ষে, বংশগতির সূত্রে বিভিন্ন সম্ভাবনাকে আদর্শ পরিবেশের মধ্যে স্থাপন ক'রেই পরিস্ফুট করা যায়। আর শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবেশকে শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সমস্ত রকম শিক্ষা প্রচেষ্টার মূলেই আছে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশের গুরুত্বই প্রধান, কারণ এই পরিবেশের প্রকৃতিই শিক্ষকের হাতে একটা সুযোগ দেয়, শিশুকে তার সম্ভাবনার উপযোগী ক'রে বিকাশ করতে। স্যাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) এই পরিবেশকে বলেছেন—সামাজিক বংশগতি (Social heritage)। তিনি বলেছেন—শিশু তার জৈবিক বংশগতি নিয়ে জন্মায়। তাই তার উপর আমাদের কোন হাত নেই, কিন্তু সে সামাজিক বংশগতির মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়; আর এই সামাজিক বংশগতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। (A child is born with a biological heritage, he is born into a social heritage—*Sandiford*)। পরিবেশকে বংশগতির সঙ্গে সমতুল্য হিসেবে কল্পনা করেছেন, তার কারণ, শিশুর বেশ কিছু বয়স পর্যন্ত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন অধিকার থাকে না।

জৈবিক বংশগতি যেমন সে পিতামাতার কাছ থেকে স্বাভাবিক নিয়মে পায় ঠিক তেমনি পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতিও পিতা-মাতা বা সমাজ তাকে দেয়, একে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার বেশ কিছুদিন পর্যন্ত থাকে না। এই পরিবেশও তার অধীন নয়। সমাজের বয়স্করা তাকে যেমন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাখবেন তেমনি সে পরিবেশ পাবে। আর এখানেই শিক্ষার সুযোগ। তিনি জৈবিক বংশগতির নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না কিন্তু এই সামাজিক বংশগতিকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। জৈবিক বংশগতির সঙ্গে সামাজিক বংশগতির পার্থক্য হ'ল, জৈবিক বংশগতি স্বাভাবিক নিয়মে বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, তার জন্য বাইরের কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সামাজিক বংশগতিকে প্রত্যেক বংশধরের জন্য নতুন ক'রে গড়ে তুলতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে, বিশেষ সময় ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্য নতুন ক'রে গড়ে তোলা সুতরাং দেখা যাচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতির গুরুত্ব শিক্ষকের হাতে যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছে, তার নিজস্বতা প্রকাশ করার। সুতরাং শিক্ষক তার বৃত্তিমূলক যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য পরিবেশে স্থাপন করার জন্য নিম্নলিখিত পন্থাগুলো অবলম্বন করবেন—

[এক] শিক্ষক—বংশগতির জন্য শিশুদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তা যথার্থ ভাবে নির্ধারণ করবেন এবং ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করবেন। শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার আগে, তার মধ্যে কতটুকু সম্ভাবনা আছে তা বিচার করে দেখার দরকার। এ বিষয়ে তাকে বিভিন্ন ধরনের মানসিক অভীক্ষা (Psychological tests) সাহায্য করবে। তিনি প্রত্যেক শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করবেন।

[দুই] বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশেরও উন্নতি করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে যাতে পাঠ গ্রহণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয় গৃহের সজ্জা পাঠের অনুকূল যাতে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিভিন্ন মনীষীদের ছবি দেওয়ালে ও বিভিন্ন জায়গায় টাঙানো থাকবে, বিভিন্ন মনীষীদের বাণী লেখা থাকবে। পাঠাগারে শিশুদের উপযোগী সুন্দর সুন্দর বই থাকবে।

[তিন] শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষক আদর্শ সম্পর্ক স্থাপন না করতে পারলে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। বিদ্যালয়ের পরিবেশে বিভিন্ন ধরনের মানবীয় সম্পর্ক (Human relationship) গড়ে ওঠে। শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক,

শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক, শিক্ষার্থী ও তার দলের মধ্যে সম্পর্ক, এমনি নানা ধরনের সম্পর্ক স্থাপিত হয় বিদ্যালয় জীবনে। শিক্ষক এই সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে যদি সক্রিয় ভূমিকা না নেন, তাহ'লে শিক্ষার জন্য যে পরিবেশ তিনি ছাত্রদের দেবেন, তা আদর্শ স্থানীয় হবে না। কারণ এই সম্পর্কের উপরই নির্ভর করছে, বিদ্যালয় কতটা ব্যক্তি-জীবনকে প্রভাবিত করবে।

[চার] শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন ধরনের আধুনিক উপকরণ শিক্ষককে সংগ্রহ করতে হবে। তিনি ছাত্রদের তাঁর বিষয়-সংক্রান্ত সর্বাধুনিক জ্ঞান যাতে দিতে পারেন সেই মত প্রস্তুতি তাকে নিতে হবে। তিনি যদি জ্ঞানের দিক থেকে পিছিয়ে থাকেন তাহ'লে ছাত্রদের যুগোপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে পারবেন না।

[পাঁচ] বিদ্যালয়ের অবসর সময়ে শিক্ষার্থীরা যাতে সুস্থ ভাবে শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে সময় কাটাতে পারে তার আয়োজন করতে হবে। খেলাধূলার ব্যবস্থা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানোর ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে করতে হবে। এই সব কাজের মাধ্যমে শিশুরা একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের কাজের এক ঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি পাবে, অন্যদিকে এই ধরনের শিক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করা যাবে।

[ছয়] বিদ্যালয়ে সুপরিবেশ গড়ে তুলতে হ'লে ছাত্রদের স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না, সে পরিবেশ তাদের কাছে জেলখানাস্বরূপ। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ভার শিক্ষকের হ'লেও, শিশু যাতে তাকে খুব স্বাভাবিক বোধ করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যে পরিবেশের মধ্যে শিশু তার বংশগতির ধারা অনুযায়ী কাজ করতে না পারবে, সে পরিবেশের প্রভাব কিছুই থাকবে না শিক্ষার্থীর মনে। ব্যক্তি-জীবনে পরিবেশের প্রভাব আসে সক্রিয়তার মাধ্যমে। সেই সক্রিয়তাকে অস্বীকার ক'রে পরিবেশের পুনর্গঠনের কোন অর্থ হয় না।

[সাত] সবশেষে, বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দিতে হবে এবং ছাত্রদের মনকে বর্তমান সমাজের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে বিভিন্ন ধরনের দলগত *নির্দেশনার কৌশল* (**Group guidance technique**) প্রয়োগ করতে হবে।

এই ধরনের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন ক'রে, শিক্ষক যদি পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহ'লে শিক্ষাক্ষেত্রে তার নিজের প্রয়োজনীয়তাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন না। শিক্ষালয় যদি শিক্ষার্থীকে তার জীবন বিকাশের

উপযোগী পরিবেশই না দিতে পারে, শিক্ষার্থীর বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো পরিস্ফুট ক'রে তুলতে না পারে তাহ'লে সমাজব্যবস্থায় তার কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না।

শিক্ষায় অনুকরণ, অনুভাবন ও অনুবেদন
Imitation, Suggestion and Sympathy in Education

মানুষের জীবনে সংস্কারের (instinct) প্রভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিদ্ আলোচনা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বের কথাও আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকার করেন। সংস্কার হ'ল মানুষের জন্মগত জৈব মানসিক প্রবণতা যা তাকে বিশেষভাবে কর্ম সম্পাদনে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু এই সব বিশেষ ধরনের সংস্কারগত প্রবণতা ছাড়াও মানুষের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ প্রবণতা আছে, যাকে ঠিক বিশুদ্ধ সংস্কার (pure instinct) বলা যায় না। সংস্কারের সঙ্গে বিশেষ নির্দিষ্ট আবেগমূলক কেন্দ্র (Emotional core) আছে এবং নির্দিষ্ট আচরণের মধ্যে তার প্রকাশ হয়, এই সব সাধারণ প্রবণতার সে রকম কোন স্থিরতা নেই। কিন্তু মানুষের সুস্থ ও সামাজিক জীবনযাপনের দিক থেকে এদের প্রয়োজনীয়তার কথা আধুনিক শিক্ষবিদ্‌রা বলেছন। সংস্কারের সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য এর মধ্যেও বর্তমান। অর্থাৎ সকল মানুষের মধ্যে এই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু সংস্কারের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নেই বলে ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) এদের নকল সংস্কার (Pseudo instiuct) বলেছেন। এই ধরনের প্রবণতার তিনটি—অনুকরণ, অনুভাবন এবং সমবেদন সম্পর্কে আলোচনা করবো। ম্যাক-ডুগাল এদের বৈশিষ্ট্য ও কাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—(১) এই তিন ধরনের প্রক্রিয়ার জন্য অন্ততঃপক্ষে দু'জন ব্যক্তির দরকার, একজন প্রভাবক এবং অন্য জন প্রভাবিত ব্যক্তি; (২) একজন ব্যক্তির উপর আর একজন ব্যক্তি প্রভাবিত করবে এবং প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে। They (imitation, suggestion and sympathy) are closely allied as regards their effects, for in each case the process in which the tendency manifests itself involves an interaction between at least two individuals of one whom is the agent, while other is the person acted upon or patient.)। নান্ (Nunn) এই তিন ধরনের দলীয় প্রবণতাকে

(Group tendency) একত্রে নাম দিয়েছেন মেমিসিস্ (Mimesis)। অন্যের ক্রিয়াকলাপ, অনুভূতি এবং চিন্তাধারা গ্রহণ করার যে স্বাভাবিক প্রবণতা তাকেই নাম্ বলেছেন মেমিসিস্। ("The general tendency shown by an individual to take over from others their modes of action, feeling and thought.)

সুতরাং এই তিন ধরনের প্রতিক্রিয়াকেই আমরা অনুকরণ বলতে পারি। ম্যাক্‌ডুগাল বলেছেন, যখন আমরা অন্যের বাহ্যিক আচরণ গ্রহণ করি, তখন তাকে বলা হয় অনুকরণ (imitation)। আবার যখন আমরা অন্যের অনুভূতির দ্বারা প্রভাবিত হই তখন তাকে বলা হয় অনুবেদন (sympathy)। যখন আমরা অন্যের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হই তখন তাকে বলা হয় অনুভাবন (suggestion)। বৃহত্তর অর্থে সবগুলোকেই অনুকরণ (imitation) বলতে পারি। আচরণগত বৈশিষ্ট্যের অনুকরণের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণতঃ অনুকরণ কথাটা ব্যবহার করি। আবার অনুভূতিমূলক অনুকরণকে অনুবেদন (sympathy) বলতে পারি। আর চিন্তন বা ধারণামূলক অনুকরণকে অনুভাবন (suggestion) বলতে পারি। এখন আমরা এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করবো।

॥ অনুকরণ (Imitation) ॥

অনেক মনোবিদ্ অনুকরণকে সংস্কার (instinct) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। যেমন, উইলিয়াম জেমস্ (Willium James) বলেছেন—"Imitativeness is possessed by man in common with other gregarious animals, and is an instinct in the fullest sense of the term." মনস্তত্ত্ববিদ্ বল্ডউইনও (Baldwin) অনুকরণকে সংস্কার (instinct) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় অনুকরণের (instinct of imitation) সংস্কারকেও পৃথক ভাবে আলোচনা করেছেন। কিন্তু অধুনিক কালে কোন মনোবিদ্ অনুকরণ প্রবণতাকে একটি মাত্র সংস্কারের ক্রিয়া হিসেবে কখনও বিবেচনা করেন না। এর কারণ, আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

আধুনিক শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্‌রা অনুকরণকে শিক্ষণের (learning) প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ড্রিভার (Driver) বলেছেন, অন্যের দেখে কোন কাজ করাই হ'ল অনুকরণ। এই ধরনের কাজের অনুপ্রেরণা

আসে অন্যের কাছ থেকে। "Performing an act seen performed by another, the process being stimulated (and guided) by the seen act."—*Dictionary of Psychology.* মনোবিদ থ্যুলেস্ (Thoules) বলেছেন, অন্যে যে কাজ করছে, সেই ধরনের কাজ করার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতি তাই হ'ল অনুকরণ (Readiness to follow other persons course of action, which we call imitation)। তিনি এটাকে যুথ জীবনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মনোবিদ্ গ্যারেটও অনুকরণকে কোন বিশেষ সংস্কার না ব'লে প্রাণীর একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে কোন মানুষ যখন অন্য কাউকে এক ধরনের কাজ করতে দেখে, সেই রকম কাজ করার চেষ্টা করে, তখন আমরা তাকে বলি অনুকরণ।

মনোবিদ্ নান্ (Nunn) বিষয়টির আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন। তিনি মনে করেন, অনুকরণ-প্রবণতা যখন সর্বজনীন, তার জন্য নিশ্চয় মনের মধ্যে কোন সাধারণ প্রবণতার (General tendency) উৎস আছে। এই সাধারণ প্রবণতার উৎসকে তিনি বলেছেন মেমিসিস্ (Mimesis) এবং অনুকরণের (imitation) বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"Imitation bears to mimesis the same relation that conation bears to horme and memory to mneme." সুতরাং আধুনিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, দলগত পরিস্থিতিতে মানুষ তার সাধারণ প্রবণতার প্রভাবে যখন অন্যের কর্ম বা আচরণের রীতিকে গ্রহণ করার পদ্ধতিই হ'ল অনুকরণ (imitation)।

অনুকরণের প্রকারভেদ ও বিকাশ (Types of Imitation and their Development):

মনোবিদ আলপোর্ট মানুষের অনুকরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে তিন ধরনের অনুকরণের উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, এই তিন ধরনের অনুকরণ বয়সানুপাতে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ অনুকরণের শ্রেণিবিভাগ, শিশুর অনুকরণে প্রবণতার বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা দেয়। জন্মের পর থেকেই শিশুরা অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। বয়স্কদের আচরণ এবং প্রথম স্তরের অনুকরণ বিশেষ ভাবে অনুবর্তিত প্রক্রিয়ার (Conditioned respose machanism) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আলপোর্ট (Allport) এই ধরনের অনুকরণের নাম দিয়েছেন—

(১) **অনুবর্তনমূলক অনুকরণ** (Conditioned reflex imitation)। জন্মের পর এক বৎসর পর্যন্ত এই ধরনের অনুকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায়। শব্দ উচ্চারণ করা এবং সাধারণ ধরনের অর্থপূর্ণ অঙ্গভঙ্গী করার কৌশল শিশু এই ধরনের অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা করে। কোন কোন মনোবিদ্ একে প্রতিধ্বনির কৌশল (Echo-principle) নাম দিয়েছেন। শিশু যখন কোন জিনিসের প্রতি বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া করার চেষ্টা করতে থাকে তখন যদি কোন ব্যক্তির সঠিক প্রতিক্রিয়া তার কোন ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে তাহ'লে সে সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের প্রতিক্রিয়ার প্রতিধ্বনি করে। (A child will learn to echo back any action of another, provided that another's performance of the act stimulates any of the child's sense organs at a moment when the child is engaged in a (random) performance of the same act.)। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া যে করে অনুবর্তনের (conditioning) জন্য। এই ধরনের অনুকরণের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তিনটে পর্যায় দেখা যায়। ধরা যাক্ শিশু কথা বলার চেষ্টা করেছ। প্রথমতঃ, সে একটা শব্দ উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। যার কোন অর্থ হয় না। এই চেষ্টার ফলে হয়তো হঠাৎ এমন একটা শব্দ বলে যেটা আমাদের কাছে কিছু অর্থপূর্ণ মনে হয়। তখনই আমরা আনন্দে আবার সেই শব্দটা উচ্চারণ করি। এটা হ'ল দ্বিতীয় স্তর। এরপর তৃতীয় স্তরে শিশু ওটাকে বিভিন্ন সময়ে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং তার ফলে অনুবর্তন হয়। শুধু শব্দ শিক্ষা নয়, বিভিন্ন ধরনের ছোটখাট আচরণও এই ধরনের অনুকরণের দ্বারা শিক্ষা করে।

(২) দ্বিতীয় ধরনের অনুকরণকে আলপোর্ট **Empathy** নাম দিয়েছেন। ছোট ছেলেরা মায়ের কোলে বসে আছে, সে সময় মা যদি অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিচলিত হন তাহ'লে তারও দৈহিক অবিচলতা দেখা যায়। ফুটবল খেলার মাঠে খেলা দেখতে দেখতে অনেকে পা দিয়ে পায় বল মারার ভান করেন। এই ধরনের দৈহিক বা পেশীর ক্রিয়ার অনুকরণ হ'য়ে থাকে। একেই আলপোর্ট বলেছেন Empathy.

(৩) তৃতীয় ধরনের অনুকরণ হ'ল **সচেতন** এবং **ইচ্ছাকৃত অনুকরণ**। প্রায় এক বয়স থেকে এই ধরনের অনুকরণ শুরু হয়। এই ধরনের অনুকরণ দু'রকম হ'তে পারে। প্রথম অবস্থায় শিশুদের মধ্যে দেখা যায়, তারা কোন কিছু

বিচার বিবেচনা না ক'রেই বড়দের আচরণ অনুকরণ করে। এরকম ধরনের অনুকরণ বড়দের মধ্যেও কিছু কিছু দেখা যায়। আবার অনেক সময় অনুকরণ করার পূর্বে শিশুরা বিচার বিবেচনা করে, আচরণ বিশ্লেষণ করে, তার পর অনুকরণ করে। এই ধরনের অনুকরণ সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সে দেখা দেয় এবং এর প্রভাব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে।

॥ শিক্ষা ও অনুকরণ (Education and Imitation) ॥

আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক মনোবিদ্ এবং শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাক্ষেত্রে অনুকরণের গুরুত্বের কথা স্বীকার করেছেন। মনোবিদরা প্রাথমিক শিক্ষণের অনুকরণকে (Learning) কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কারণ শিশুরা প্রথম স্তরে অনুকরণের মাধ্যমে শিক্ষা করে। অনুকরণ হ'ল শিক্ষণের সহজতম উপায়। সুতরাং মনোবৈজ্ঞানিক গুরুত্বের কথা বিচার করলে, আমাদের অবশ্যই বলতে হ'বে অনুকরণ শিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। শিক্ষার মাধ্যমে আমরা, একদিকে যেমন ব্যক্তির চিন্তা জগতে পরিবর্তন আনতে চাই, অন্যদিকে তার বাহ্যিক আচরণেরও পরিবর্তন করতে চাই। চিন্তার বা মনো-জগতের বিকাশের সঙ্গে যদি বাহ্যিক আচরণের পরিবর্তন না হয়, শিশু তার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা তা ব্যাহত হবে। তাই শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হ'লে ব্যক্তির আচরণগত দিকেরও বিকাশ করতে হবে সমাজ নির্ধারিত পথে। অনুকরণ এবিষয়ে আমাদের সহায়তা করে। বিদ্যালয়ের সক্রিয় জীবনের মাধ্যমেই হোক আর পরিবারের স্নেহময় দায়িত্বহীন জীবনযাপনের মাধ্যমেই হোক, শিশু স্ব ইচ্ছায়ই অনুকরণ করে এবং যখন বিচার বা বিবেচনা করার শক্তি তার মধ্যে আসে তার পূর্বেই সে সমাজের ধারার সঙ্গে গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য সামাজীকরণ (Socialization), শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির উৎকর্ষণ (Individual development)। এই দুই উদ্দেশ্যই সার্থকতা লাভ করে অনুকরণের মাধ্যমে। সুতরাং প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন সম্পূর্ণ ভাবে অনুকরণের উপর নির্ভর করা হ'ত, আধুনিক কালে ততটা না হ'লেও শিক্ষাকে অনেকাংশে অনুকরণের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো বলেছেন "All art is imitation, and education is uudoubtedly an art."

অনুকরণের এই গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষাবিদ, শিক্ষাক্ষেত্রে এর

॥ অনুভাবন (Suggestion) ॥

অনুভাবন কথাটা আমরা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। খুব সংকীর্ণ অর্থে আমরা কোন ঘটনা বা ধারণার সম্ভাব্য উত্থাপনকে (Probable occurance) অনুভাবন বলে থাকি। কোন লেখক যদি তাঁর লেখার মাধ্যমে কতকগুলো সমস্যা-মূলক পরিস্থিতি তুলে ধরে তার সমাধানের ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেন, তাকেও আমরা অনুভাবন বলে থাকি। কিন্তু মনোবিদ্যায় আমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করি। বিচার না ক'রে, বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিচারে বিশ্লেষণ না ক'রে, অন্যের ভাবনা বা চিন্তাকে গ্রহণ করা। অর্থাৎ চিন্তনমূলক-অনুকরণকেই বলা হয় অনুভাবন।

মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport) বলেছেন, "Suggestion is the acceptance of a proposition for belief or action in the absence of complete self-determination." অনুভাবনের জন্য কোন বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার প্রয়োজন হয় না। যে ব্যক্তি অন্যের চিন্তাধারা গ্রহণ করে, তার মনে স্থির ধারণা থাকে যে, ঐ চিন্তাধারা তারই। অনুভাবন হয় অবচেতন মনে। কেন সে ঐ আচরণ বা ভাবনাকে গ্রহণ করবে, তা সে নিজেকে কোন সময় জিজ্ঞাসা করে না।

ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) তাই অনুভাবনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন—"A process of communication resulting in the acceptance with conviction of the communicated proposition in the absence of logically adequate grounds for its acceptance."

অনুভাবনের প্রকার ভেদ (Different types of Suggestion) :

অনুভাবনকে প্রকৃতি ভেদে এবং প্রভাবকারীর প্রকার ভেদে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং এই প্রত্যেক ধরনের অনুভাবনই মানুষের মধ্যে সব সময় দেখা যায়। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অনুভাবন শিশুদের মধ্যে দেখা দেয়—

[১] প্রথমতঃ, শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তি উভয়েই, তাদের তুলনায় যাদের উন্নত গুণসম্পন্ন মনে করে তাদের চিন্তাধারা অনুকরণ করে। শিশুরা পিতা-মাতা, শিক্ষক ইত্যাদির চিন্তাধাবা গ্রহণ করে। এই ধরনের অনুভাবনকে বলা হয় **পদমর্যাদা হেতু অনুভাবন** (Prestige suggestion)। অর্থাৎ যখন কোন

প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের দরুণ অন্যের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেন, তখন তাকে বলা হয় পদমর্যাদা হেতু অনুভাবন (Prestige suggestion)। এই ধরনের অনুভাবনের প্রভাবই ব্যক্তি-জীবনে প্রবল এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুভাবনই দেখা যায়।

[২] সাধারণতঃ অনুভাবনের জন্য অন্ততঃ দু'জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। একজন যিনি অনুভাবিত হবেন এবং আর একজন যার চিন্তার দ্বারা অনুভাবিত হবেন। কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজেদের দ্বারা অনুভাবিত হই। এই এই ধরনের অনুভাবনকে বলা হয় **আত্ম অনুভাবন** (Auto-suggestion)। অনেক সময় অসুস্থ অবস্থায় আমরা যখন বার বার ভাবতে থাকি সেরে উঠছি তখন দেখা যায় সত্যি সত্যিই সেরে যাই। কোন অলৌকিক ক্রিয়ার মত এই ধরনের অনুভাবন কাজ করে, এই সময় ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তিকে একেবারে শিথিল ক'রে নিজেকে এক কল্পনার রাজ্যে নিয়ে যায় এবং নিজের মনের উপর কোন চিন্তা বা ধারনাকে আরোপ ক'রে। এখানে প্রভাবিত এবং প্রভাবকারী ব্যক্তি একই।

[৩] ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব (Negativism) বিশেষভাবে দেখা যায়। তাদের যা করতে বলা হয় তারা তার উল্টো করে। রবীন্দ্রনাথের রাইচরণ যদি খোকাবাবুকে জলের ধারে যেতে বারণ না করতো, তাহ'লে সে জলে পড়তো না। শিশুদের তাই প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভাবন দ্বারা প্রভাবিত করা মুশকিল হ'য়ে পড়ে। তাই তাদের ক্ষেত্রে পরোক্ষ ভাবে এই প্রভাব আনতে হয়। অর্থাৎ তাদের 'এই কাজ কর বা করো না', না বলে "এই রকম কাজ করলে ভাল হয় বা এ রকম কাজ করলে ভাল হয় না'—এরকম ধরনের অনুভাবন করা দরকার। এই ধরনের অনুভাবনকে **বিপরীতমুখী অনুভাবন** বা **পরোক্ষ অনুভাবন** (Contra-suggestion, or, Indirect suggestion) বলা হ'য়ে থাকে। এই ধরনের অনুভাবন শিশুদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় তার কারণ, তারা মনে করে, প্রভাব বাইরের কোন ব্যক্তি তার উপর চাপিয়ে দিচ্ছে না, এটা তার নিজেরই মত।

॥ শিক্ষা ও অনুভাবন (Education and Suggestion) ॥

শিক্ষক্ষেত্রে বিশেষভাবে চরিত্র গঠনের শিক্ষায়, অনুভাবনের প্রয়োগ একান্ত প্রয়োজন। শৈশবে শিশুদের যখন, বিচার বিবেচনা ক'রে, চিন্তা ক'রে আচরণ ধারা গ্রহণ করার মত মানসিক বিকাশ হয়নি, সে মত অবস্থার অনুভাবনের দ্বারা তার

আচরণের নৈতিক মানকে উন্নত করা যায়। শিশুর সামাজিক শিক্ষায়ও অনুভাবনের দান অনেক। অনুভাবন সমাজ সংরক্ষণে সহায়তা করে। শিশুরা অবচেতন মনে নিজের বিচার ও যুক্তিশক্তি বিকাশের পূর্বেই অনেক কিছু সামাজিক কৌশল আয়ত্ত করে।

মনোবিদ্ আলপোর্ট এই অনুভাবনের সামাজিক মূল্যের কথা আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন—"By the time he comes of more critical age, deciding henceforth to guide his own destiny, he is already a creature of innumerable conventional forms of behaviour and outlooks, acquired by suggestion from which he can never completely escape."

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক তার উন্নত ও পদ মর্যাদার জন্য ছাত্রকে খুব সহজভাবে অনুভাবিত করতে পারেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি অনুভাবন হ'ল চিন্তনমূলক অনুকরণ। তাই এই ধরনের প্রভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে বিস্তার করতে হ'লে শিক্ষককেও চিন্তার ও আদর্শের অধিকারী হ'তে হবে। আট, নয় বছর বয়সে যখন তাদের ভাষা শক্তির বিকাশ ভালভাবে হয় এবং বিভিন্ন ধরনের বিমূর্ত সামাজিক ধারণা সম্পর্কে তারা ভাবতে শেখে, তখনই শিশুদের বেশী পরিমাণে অনুভাবনের দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা যায়। শিক্ষককে এই বয়সের দিকে নজর রেখে শিক্ষার্থীদের অনুভাবনের দ্বারা প্রভাবিত করতে হবে। বিপরীতমুখী অনুভাবন প্রয়োগ করার সময় একথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে, খুব বেশী পরিমাণে এই ধরনের অনুভাবন হ'লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতিবাচক ভাব (Negativism) প্রবল আকার ধারণ করবে এবং তা সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে কাম্য নয়। সবশেষে, বলা যায়, অনুভাবন, শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ কৌশল এবং শিক্ষক শিক্ষাক্ষেত্রে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে, ব্যক্তি-জীবনের বিকাশে সহায়তা করবেন।

॥ অনুবেদন (Sympathy) ॥

সাধারণ অর্থে অনুবেদন বলতে আমরা কোন ব্যক্তির প্রতি সমবেদনামূলক অনুভূতিকে বুঝাই। এই অর্থ যে ঠিক নয় একথা আমরা বলতে পারি না। তবে এটা অনুবেদনের একটা বিশেষ ক্ষেত্র। যদিও অনেক মনোবিদ্ অনুবেদনকে আবেগ হিসেবে কল্পনা করেছেন। তা সত্ত্বেও আধুনিক মনোবিদ্‌দের কাছে অনুবেদন হ'বে অনুভূতিমূলক অনুকরণ (imitation of feeling)।

ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) অনুবেদনকে এই অর্থে গ্রহণ করেছেন। তিনি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন "The fundamental and primitive form of sympathy is exactly what the word implies, a suffering with, the experiencing of any feeling or emotion when and becsuse we observe in other persons or creatures the expression of that feeling or emotion," শিক্ষাবিদ্ হার্বার্ট স্পেনসারও (Herbert Spencer) এই অর্থে অনুবেদন কথাটাকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

মানব জীবনে অনুবেদনের গুরুত্বকে কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। যে-কোন যুথবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। মানুষের সমাজের বহমানতার পেছনে এই অনুবেদনের দান অনেকখানি। শিশুদের মধ্যে অনুবেদন খুব প্রবল পরিমাণে দেখা যায়। তারা দলবদ্ধ ভাবে যখন খেলা করে তখন একজন ভয় পেলে, সকলে ভয় পায়। একজন কাঁদলে আর একজন কাঁদতে আরম্ভ করে। মায়েরা কোন কারণে কাঁদলে শিশুরা কোন কারণ বিবেচনা না করেই কাঁদতে থাকে। অর্থাৎ একজনের মধ্যে কোন বিশেষ সংস্কারগত প্রবণতার ক্রিয়ার ফলে কোন বিশেষ অনুভূতি বা আবেগ জাগ্রত হ'লে যারা তার সেই আচরণ দেখছে, তাদের মধ্যে সেই অনুভূতির সৃষ্টি হয়। ম্যাক্‌ডুগাল (Mcdougall) এই ধরনের অনুবেদনকে বলেছেন অনুবেদনমূলক প্রভাব (Sympathetic induction)।

শিক্ষার কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অনুবেদনের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের কাজকে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করতে হ'লে দলগত মনোভাব শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এই দলের মধ্যে তারা পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদানের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হবে। অনুবেদন তাদের এই ঐক্য গঠনে সাহায্য করবে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দেওয়ার সময় শিক্ষক অনুবেদনের সাহায্য নিতে পারেন। অনুবেদনমূলক মনোভাব নিয়ে শিশু যাকে গ্রহণ করবে তা চিরদিন মনে রাখবে। বিশেষ কোন দেশের সামাজিক পরিস্থিতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে, শিক্ষক যদি ছাত্রদের মধ্যে অনুবেদনের ভাব জাগিয়ে তুলতে পারেন সেই দেশের লোকের প্রতি, তাহ'লে তাদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা একাত্মবোধ করবে। এমনিভাবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হবে। সবশেষে অনুবেদন-মূলক বৈশিষ্ট্য সামাজিক গুণের মধ্যে গণ্য করা হয়। যে ব্যক্তি গরীবদের দুঃখে দুঃখিত হন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন, তাকে আমরা

আদর্শ চরিত্রের ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করি। সুতরাং শিক্ষার কাজ হ'বে দ্বিমুখী—একদিকে অনুবেদনমূলক ভাব জাগিয়ে তোলা এবং অপর দিকে অনুবেদনকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সফল করা।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the place of suggestion and imitation in education. What are the best forms of suggestion ? [N. B. U. ; B. T. '65]

Ans : ৩৩১ হইতে ৩৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

2 The most original minds find themselves only in playing the sedulous ape to others who have gone before them along the same path of self assertion" Explain the significance of the statement.

[C. U., B. T. '61]

Ans : ৩৩১ হইতে ৩৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Discuss the place of imitation suggestion and sympathy in education,

Ans : সমগ্র অংশ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষায় আধুনিক ভাবধারা
Modern Trends in Education

আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন অংশে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আধুনিক শিক্ষা, যে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে, সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমাদের ধারণা জন্মেছে। শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of education), শিক্ষার অর্থ (Meaning of education), শিক্ষার তাৎপর্য (Concept of education), শিক্ষার্থী সম্পর্কে ধারণা (Concept about pupil), শিক্ষক সম্পর্কে ধারণা (Concept about teacher), পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ধারণা (Concept about curriculm), শৃঙ্খলার ধারণা (Concept of discipline), পাঠদান পদ্ধতি (Method of teaching) প্রভৃতি শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গেই বিংশ শতাব্দী নতুনত্বের ছোঁয়া এনে দিয়েছে। বিংশ শতাব্দী চিন্তা জগতে যেমন আলোড়ন এনেছে, সমাজ-জীবনকে যেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ঢেলে সাজিয়েছে, শিক্ষাকেও তেমন নবরূপে সাজিয়েছে। শিক্ষার এই সব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গেলে, এর বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করার দরকার। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং যে জীবনব্যবস্থা শিক্ষাকে তার নবরূপ দিয়েছে, তাকে বিশ্লেষণ না করলে, শিক্ষার আধুনিক ভাব-ধারা সম্পর্কে ধারণা হবে না।

॥ ঐতিহাসিক পটভূমিকা (Historical Back-ground) ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মানুষের চিন্তাজগতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হ'য়েছিল তার পরিপূর্ণরূপ আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে। জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের দার্শনিক মতবাদ এই সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, আর তার প্রতিফলন জীবনের সকল ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল। শিক্ষাও সে প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি। জীবনদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে. শিক্ষাদর্শনও গড়ে উঠেছিল। এই সব শিক্ষাদর্শ ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, পরিপূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে এবং বিংশ শতাব্দীতে এসে যেন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শিক্ষাদর্শনে আমরা তিনটি বিচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করি—মনোবৈজ্ঞানিক ধারা (Psychological ten-

dency), বৈজ্ঞানিক-ধারা (Scientific tendency) এবং সমাজ বৈজ্ঞানিক ধারা (Sociological tendency)। পেস্তালাৎসী, ফ্রয়েবেল, মন্তেস্বরী, হার্বার্ট স্পেনসার, হাক্সলে, লেস্টার ওয়াড প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌দের প্রচেষ্টার ফলে, এই সব দার্শনিক ভাবধারাগুলো কখনও সম্পর্কহীন ভাবে আবার কখনও পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাক্ষেত্রকে, শিক্ষার পরীক্ষাভূমিতে পরিণত করেছিল।

শিক্ষায় মনোবৈজ্ঞানিক ভাবধারার মূল বক্তব্য হ'ল শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ, তার আগ্রহ, অনুরাগ, মানসিক ক্ষমতা সব কিছুর উপর নির্ভর ক'রে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষাকে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত চাহিদার সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে। শিশুর প্রতি সমবেদনা বোধ, এই সবই ছিল মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতির (Correlation of studies) কথাও এই মতবাদে বলা হ'য়েছে। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান সম্মত করার জন্য যা কিছু পরিবর্তন করার দরকার তার দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতিতে সব কিছুই এই মতবাদে উল্লেখ করা হ'য়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, বৈজ্ঞানিক ভাবধারা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষাতত্ত্বের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যে নবযুগের সূচনা হ'য়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে। তার পূর্বে, শিক্ষা বিশেষভাবে কতকগুলো গতানুগতিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভাবধারার মূল বক্তব্য হ'ল শিক্ষার মাধ্যমে শিশুকে সেই সব জ্ঞান দিতে হবে যা তার আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। যার দ্বারা জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, সেই ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের দিতে হবে। এই ভাবধারায় বিশেষভাবে পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস ক'রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সংযোজন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল, এই মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের (Complete living) অধিকারী ক'রে গড়ে তোলা।

তৃতীয়তঃ, সমাজ-বৈজ্ঞানিক ধারার মূল বক্তব্য হ'ল শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ সমাজ জীবন যাপনের অধিকারী ক'রে তুলবে। এই মতবাদের একজন প্রবক্তা রুডিজার (Ruediger) বলেছেন—"To educate a man means to adjust him to those elements of his environment that are of concern in modern life, and to develop, organise and

train his powers so that he may make efficient and proper use of them." শিক্ষাকে সামাজিক অভিব্যক্তি (social evolution)-রূপে বর্ণনা করা হ'য়েছে এই মতবাদে। সমাজ অভিব্যক্তির উপাদান হ'ল আত্ম-সচেতনতা (self-consciousness) এবং উন্নতির বা অভিব্যক্তির ইচ্ছা (will to evolve)। শিক্ষা মানুষকে এই দুই উপাদানের অধিকারী করতে পারে। এই মতবাদের আর একটা বক্তব্য হ'ল সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা। শিক্ষা প্রাচীনকালে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের সাধারণ ব্যক্তির শিক্ষার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু এই মতবাদে সর্বজনীন শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষা ছাড়া ব্যক্তির উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) রাখা যায় না।

এই তিন ধরনের মতবাদ আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ভাবে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা আধুনিক শিক্ষার আর একটা উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করবো, সেটা হ'ল তার জীবন পরিবেশ।

আধুনিক শিক্ষা ও জীবন পরিবেশ (Modern Education and Life-conditions) :

আধুনিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পরিবর্তনশীলতা। চিন্তাধারা জীবন ধারণের কৌশল ; সমস্ত কিছুই দ্রুত পরিবর্তন হ'চ্ছে। এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের সার্থক অভিযোজনের জন্য চাই পরিবর্তনশীল মনোধর্ম। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের যদি খাপ খাইয়ে দিতে না পারি, তাহ'লে সুস্থ জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে বাস করতেন তার অনেক পরিবর্তন হ'য়ে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে অনেক জীবনাদর্শ (value) অচল ব'লে পরিত্যক্ত হ'য়েছে, অনেক নতুন জীবনাদর্শের সৃষ্টি হ'য়েছে। তাই শিক্ষাও জীবনের উপযোগী হ'য়ে সততই পরিবর্তিত হ'চ্ছে। আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা আমাদের এই জীবন পরিবেশের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্ণীত হ'য়েছে।

॥ আলোচনা ॥

আধুনিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল সমন্বয়িত ভাব (eclectic tendency)। প্রাচীন সমস্ত ভাবধারার সমন্বয়েই এই মতবাদ গড়ে উঠেছে। বিগত শতাব্দীতে যে সব দার্শনিক ও শিক্ষামূলক চিন্তাধারা শিক্ষাক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে, তার প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে বেছে নিয়ে আধুনিক জীবন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে

তাদের সমন্বয় সাধন করা হ'য়েছে' বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট হ'ল যুক্তি বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ। যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ ক'রে, পরীক্ষার দ্বারা স্থির ক'রে তবেই যে কোন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করাই রীতি; কিন্তু সব কিছুর ঊর্ধ্বে যে উদ্দেশ্য আছে তাহ'ল সমন্বয়ের ভাব। আমাদের মন কোন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা ধারণ করতে পারে না; সে তার স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। আধুনিক শিক্ষার ভাবধারাও সেই সমন্বয়ধর্মী মানব মনের রূপ মাত্র। মন্‌রো (Monroe) এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, প্রথমেই আধুনিক শিক্ষার চিন্তার বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—"The educational thought of the present seeks to summarize these movements (psychological, sociological and scientific) of the recent past and to re-arrange and relate the essential principles of each in one harmonious whole." এই মন্তব্যের সত্যতা প্রমাণ হবে, আমরা যদি আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করি।

আধুনিক শিক্ষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (Different characteristics of Modern Education):

॥ এক ॥ **শিক্ষার তাৎপর্য (Significance of Education):** প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা হ'ল জ্ঞান আহরণের কৌশল মাত্র। শিক্ষক জ্ঞানের ভাণ্ডার, তিনি শিশুকে তার উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু জ্ঞান বিতরণ করবেন এবং শিক্ষার্থীর কাজ হ'ল তা গ্রহণ করা, কিন্তু আধুনিক যুগে 'শিক্ষা' শব্দের তাৎপর্যের অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। এ সম্পর্কে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি। শিক্ষা হ'ল শিশুর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ব্যক্তি-পরিবেশের সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে চলেছে, সেই প্রক্রিয়াকে আধুনিক অর্থে শিক্ষা বলা হ'চ্ছে। শিক্ষার এই তাৎপর্য নির্ণয়ে অভিব্যক্তিবাদের (Theory of evolution) প্রয়োগ দেখতে পাই। জীবজগতে চিরন্তন এক অভিযোজনের প্রক্রিয়া চলছে। পরিবেশের সঙ্গে যারা সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে পেরেছে তারাই টিকে আছে; আর যারা পারেনি তারা বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। শিক্ষাও এক ধরনের অভিযোজন-প্রক্রিয়া। শিক্ষার এই তাৎপর্য, বৈজ্ঞানিক ও সমাজ-বৈজ্ঞানিক মতবাদ (Scientific and sociological tendency) দ্বারা প্রভাবিত।

॥ দুই ॥ **শিক্ষার লক্ষ্য (Aims of Education) :** আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্যের মধ্যেও আমরা সমন্বয়ের ভাব দেখতে পাই। শিক্ষার পূর্ববর্তী যুগের কথা বিবেচনা করলে দেখতে পাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ধরনের মতবাদ পোষণ করেছেন। তাঁদের সেই মতবাদগুলোকে আমরা প্রধানতঃ দুটো শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। একটা হ'ল ব্যক্তিতান্ত্রিক মতবাদ (Individualistic view) এবং অপরটা হ'ল সমাজতান্ত্রিক মতবাদ (Socialistic view)। যেমন, পেস্তালাৎসী ব্যক্তির জীবন বিকাশের (Individual development) উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আবার বাগ্‌লে (Baglay) বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল সমাজ জীবনের উপযোগী ক'রে ব্যক্তিকে তৈরী করা (The development of socially efficient individual is the ultimate aim of education)। আধুনিক শিক্ষাধারা এই ধরনের পরস্পরবিরোধী মতবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। বর্তমানে শিক্ষার উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্তির বিকাশকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, সমাজের চাহিদার উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আধুনিক কালের চিন্তাবিদ্ ডিউই শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এই ধরনের সমন্বয়িত উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, "Process of remarking experience, giving it a more socialized value through increased individual experience, by giving the individual better control over his own power." অন্য দিকে আধুনিক শিক্ষাবিদ হর্নি (Horne), শিক্ষার সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য স্থাপন করতে গিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করেছেন। নান্‌ও (Nunn) একই ভাবে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যেও বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তাধারার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই।

॥ তিন ॥ **শিক্ষার উপাদান (Factors of Education) :** আধুনিক শিক্ষার উপাদানের কোন পার্থক্য হয়নি। শিক্ষার প্রধান তিনটে উপাদানের কথা আমরা উল্লেখ করেছি—শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং পাঠ্যক্রম। শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই তিন উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কোন সময় জ্ঞান বা পাঠ্যক্রমকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, কোন সময় শিক্ষককে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হ'য়েছে। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে, শিশুকেই শিক্ষাক্ষেত্রে

প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার শিশুর ব্যক্তিত্বকে বড় ক'রে দেখা হ'য়েছে। শিশুর চাহিদা, অনুরাগ, মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা বিচার ক'রে শিক্ষা পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষক এবং পাঠ্যক্রম এখানে গৌণ। শিক্ষক জোর ক'রে তার উপর জ্ঞান চাপিয়ে দেবেন না। শিশু নিজেই তা গ্রহণ করবে তার মানসিক সংগঠন অনুযায়ী। তাই বর্তমান শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক (Child-centric) শিক্ষা বলা হয়। এর বৈশিষ্ট্য এবং বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা পরবর্তী অংশে বিশদভাবে আলোচনা করবো। তবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষার এই গুরুত্ব মনোবৈজ্ঞানিক ধারার (Psychological tendency) দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে।

॥ চার ॥ **আধুনিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum for Modern Education) :** প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী সার্থক শিক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে থাকবে সমাজের অতীত অভিজ্ঞতা। শিক্ষার কাজ হবে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মানুষের কৃষ্টিমূলক অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত করা। কিন্তু আধুনিক সংব্যাখানে পাঠ্যক্রমকে গতীয় বৈশিষ্ট্য (Dynamic characteristic) দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার কথা বিবেচনা ক'রে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পাঠ্যক্রমের জীবনীশক্তি ছিল বিংশ শতাব্দীতে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। শিক্ষার্থীর বর্তমান জীবন পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তার মধ্যে এমন বিষয়ের সংযোজন করতে হবে, যা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শুধুমাত্র কতকগুলো সংস্কৃতিমূলক বিষয় (Classical subjcet) পড়ালে চলবে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের জগতে যে বিশাল অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন হ'য়েছে, তার সব কিছুর সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করতে হবে। তা না হ'লে সমাজ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে না। আবার অন্য দিকে ব্যক্তিরও কল্যাণ হবে না। মনরো (Monroe) আধুনিক পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"The curriculum must present to the child in idealized form, present life, present social activities, present ethical aspirations, present appreciation of the cultural value of the past." পাঠ্যক্রমের এই আধুনিক ধারণা বৈজ্ঞানিক ধারার (Scientific tendency) দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে।

॥ পাঁচ ॥ **আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি (Modern method of Instruction) :** আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতি নানা দিক থেকে প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক ছিলেন প্রধান এবং একমাত্র পদ্ধতি ছিল মৌখিক নির্দেশনা (verbal instruction), ছাত্ররা ছিল নিষ্ক্রিয়। তারা শ্রেণীতে বসে শুধুমাত্র শিক্ষকের দেওয়া জ্ঞান আহরণ করত। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রে স্থাপন করতে হবে। তার ব্যক্তিগত চাহিদা, প্রবণতা ও মানসিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। তাছাড়া, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু নিষ্ক্রিয় থাকবে না। সে সক্রিয়তার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির মূল কথা হ'ল ব্যক্তিকেন্দ্রিক পদ্ধতি রচনা এবং সক্রিয়তার ভিত্তিতে পদ্ধতি রচনা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা আমরা দেখতে পাই। ডাল্টন পরিকল্পনা (Dalton plan), উইনেট্কা পরিকল্পনা (Winnetka plan), ডেক্রলী পদ্ধতি (Decroly system), প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project method), বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা (Basic system)—এই প্রচেষ্টারই ফল। শিক্ষা পদ্ধতিকে খেলাভিত্তিক করার প্রচেষ্টাও আধুনিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্য। হার্বার্টের প্রবর্তিত পাঁচটি সোপান আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে এক মনোবিজ্ঞানসম্মত সংযোজন। সুতরাং, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি সক্রিয়তার তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত।

॥ ছয় ॥ **শিক্ষকের কর্তব্য (Responsibilities of the Teacher) :** আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রাধান্য বেশী ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, শিক্ষককের দায়িত্ব অনেক কমেছে, বরং, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। তিনি শুধুমাত্র জ্ঞান দান ক'রে তাঁর কর্তব্য শেষ করবেন না। তিনি হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু, নির্দেশক এবং জীবনাদর্শের প্রতীক। ব্যক্তিজীবনে যে জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রক্রিয়া চলছে, তার তিনি নির্বাক দর্শক নন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব, নিজের কুশলতা এবং সমবেদনামূলক মনোভাবের এবং জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করবেন। শিক্ষার্থী যখন আপন সক্রিয়তার মাধ্যমে পাঠ অর্জন করবে, শিক্ষক তাকে প্রয়োজন বোধে সাহায্য করবেন। এই কারণে, আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আর দায়িত্বভার মনোবৈজ্ঞানিক ধারার (Pyschological tendency) প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে এসে গেছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সকল রকম সহায়তা করবেন।

॥ সাত ॥ **শিক্ষালয়ের সংগঠন (Organisation of School):** আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষালয়ের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষালয় বর্তমানে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র নয়। শিক্ষালয় বর্তমানে সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি হবে। যে কোন ধরনের আদর্শ প্রতিক্রিয়ার জন্য আদর্শ পরিবেশ দরকার। শিক্ষা যদি ব্যক্তিকে উন্নতিশীল অভিযোজনের অধিকারী ক'রে তোলে, তার জন্য পরিবেশ দরকার। তাই শিক্ষালয়ের পরিবেশকে আদর্শভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া শিক্ষালয়ের পরিবেশ হবে স্বাভাবিক এবং সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। শিক্ষালয়ের জীবনের সঙ্গে যদি সমাজ জীবনের পার্থক্য থাকে, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা ঠিক মত অভিযোজন করতে পারবে না। তাই আধুনিক শিক্ষালয়ের বৈশিষ্ট্যর কথা বলতে গেলে তাকে সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বলতে হয়।

তাছাড়া আধুনিক শিক্ষালয়ের দায়িত্বেরও অনেক পরিবর্তন হ'য়েছে। একদিকে সে যেমন শিক্ষার্থীর সামনে সমাজ-জীবনের প্রতিরূপ তুলে ধ'রে তাদের সামাজিক জীবন বিকাশে সহায়তা করবে, অন্যদিকে সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ক'রে, শিশুর শিক্ষালয় জীবনের সঙ্গে কর্মজীবনের সহজতম সংযোগ স্থাপন করবে। এই সব চিন্তাধারা সমাজ-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

॥ আট ॥ **আধুনিক শিক্ষায় শৃঙ্খলা (Disicpline in Modern Education):** আধুনিক শিক্ষালয়ের জন্য শৃঙ্খলার নতুন তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করা হ'য়েছে। পূর্বে শিক্ষালয়কে ভাবা হ'ত একটি শৃঙ্খলার স্থান, শৃঙ্খলা বলতে তখন শাসনকে বোঝাতো। শিশুর সকল রকম স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছাকে দমন না করতে পারলে শিক্ষার কাজ হবে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীন ক্রিয়াকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাকে যদি স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার স্বাধীনতা না দেওয়া হয়, তাহ'লে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। তাই মুক্ত শৃঙ্খলা বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার (Free discipline or spontaneous discipline) উপর আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। শিশু স্বাধীনতাকে দমন করার চেষ্টা ক'রে শিক্ষা দিতে গেলে তার ফল হবে খারাপ; তার মানসিক সংগঠন হবে শিথিল। তাই এই মতবাদ মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং মনোবৈজ্ঞানিক ধারার প্রভাবে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই মতবাদ গড়ে উঠেছে।

॥ আলোচনা ॥

এই আলোচনা থেকে একটা কথাই প্রমাণিত হ'চ্ছে, আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছে। মানুষ বর্তমানকে নিয়ে বাঁচতে

চায় ; আর সেই বর্তমানকে সুন্দর করার জন্য অতীতের অভিজ্ঞতাকে সে কাজে লাগায়। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমান গড়ে উঠতে পারে না। ঠিক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাতত্ত্বের কথা আলোচনা করতে গেলে, তা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য সে কথা আর নতুন ক'রে বলার প্রয়োজন নেই। অতি নিকট অতীত উনবিংশ শতাব্দীতে সে সব শিক্ষাচিন্তা প্রাধান্য লাভ করেছিল, বর্তমান শতাব্দীতে তারই প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে একত্রে গেঁথে সুসামঞ্জস আকারে তার শিক্ষাতত্ত্ব রচনা ক'রেছে। আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য ও অর্থের মধ্যে আমরা বৈজ্ঞানিক এবং সমাজবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রভাব দেখি। শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে দেখতে পাই সমাজবৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক এবং মনোবৈজ্ঞানিক তথা ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজ-তান্ত্রিক মতবাদের সমন্বয়। শিক্ষার উপাদানের ক্ষেত্রে দেখি, গুরুত্বের পুনর্বিন্যাস ক'রে শিশুকে শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচনা করা। এ হ'ল মনোবৈজ্ঞানিক ধারার প্রভাব। পাঠ্যক্রমের তাৎপর্যকে গতিধর্মী ক'রে তুলে তার মধ্যে জ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিসরের সংযোজন, বৈজ্ঞানিক ধারার প্রভাবে ঘটেছে। আধুনিক শিক্ষার পদ্ধতিতে সক্রিয়তাবাদ জীবধর্মের মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে আছে। তাই এই পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষককের কর্তব্য নির্ধারণও মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। অন্যদিকে শিক্ষালয়ের সংগঠন সমাজ-বৈজ্ঞানিক ধারার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছে। সবশেষে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের আধুনিক সংব্যাখ্যান সেও মনোবিজ্ঞানসম্মত। সুতরাং আধুনিক নবধারার মধ্যে নতুনত্ব বিশেষ কিছু নেই, বৈশিষ্টতার সামঞ্জস্য বিধানে।

আধুনিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য—শিশু-কেন্দ্রিকতা (Characteristic of Modern Education—Child-centricism) :

শিক্ষার আধুনিক ভাবধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা উল্লেখ করেছি, আধুনিক ভাবধারার প্রধান একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিশু-কেন্দ্রিকতা। শিশু-কেন্দ্রিকতা বলতে আমরা বুঝেছি, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর গুরুত্ব। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুর আগ্রহ, শিশুর প্রয়োজন, শিশুর নিজস্ব ক্ষমতা ইত্যাদিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এই মতবাদ গড়ে উঠেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে আধুনিক যুগকে শিশু কেন্দ্রিকতার যুগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু ঠিকভাবে বিচার করলে বলতে হয় শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার জন্ম বিংশ শতাব্দীতে নয়। বহু প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রের শিশুর

গুরুত্বের কথা বিভিন্ন মনীষী ও চিন্তাবিদ্ বলে আসছেন। বরং বলা যেতে পারে এই আদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ হ'য়েছে বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস (History of Child-centric Education):

প্রাচীন রোমান চিন্তাবিদ্ কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে আমরা শিশু শিক্ষার আদর্শ দেখতে পাই। তিনি শিশুর সামর্থ্য বা ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছিলেন। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তোলার কথাও তিনি বলেছেন। এছাড়া দৈহিক শাস্তিদানের (Physical punishment) তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন।

প্রাচীন শিক্ষাবিদ ইরাসমাসও শিশুর নিজস্বতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে ছিলেন। পাঠ্যসূচীতে শিশুর আগ্রহ অনুযায়ী খেলাধূলার ব্যবস্থা করা তাকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ ক'রে তার বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার কথা বলেছেন। শিক্ষা যাতে শিশুর প্রকৃত চাহিদা মেটাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করতে হবে।

কমেনিয়াসও অনুরূপ শিক্ষার কথা বলেছেন, তিনিও দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কে রেখে শিশুর শিক্ষা পরিচালনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনিই প্রথম শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত প্রবর্তন করেন। তার মধ্যে শিক্ষাকে প্রত্যক্ষ বস্তুধর্মী করতে হবে। তিনি এই ধরনের পাঠ পরিচালনা করার জন্য পাঠ্যপুস্তকও রচনা করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রুশোর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে এই মতবাদ খুব দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করা হ'য়েছে। তিনি শিশুকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং বলেছেন শিশুর পবিত্র মনকে সমাজই কলুষিত করে, তাই তিনি বললেন শিশুকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হ'লে তাকে সমাজ থেকে দূরে নিয়ে যেতে হবে। তার শিক্ষা হবে প্রাকৃতিক সহজ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশে। তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে তার জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নির্ধারণের জন্য। আত্ম-সক্রিয়তার মাধ্যমেই শিশু এগিয়ে যাবে পরিণতির দিকে এবং তার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা হবে। বর্তমান শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে ছিল কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করতে পারেননি। তার অনুগামীরা এই তত্ত্বকে প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবর্ধন ক'রে আধুনিক পরিণতিতে নিয়ে এসেছে।

যে সব শিক্ষাবিদ্ রুশোর পথ অনুসরণ ক'রে, শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে তার

আধুনিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এনে তুলেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বেস্‌ডো (Besdow), পেস্তালাৎসী (Pestalozzi), হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল, প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বেস্‌ডো একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানে তিনি রুশোর নীতি অনুসরণ ক'রে পাঠদানের ব্যবস্থা করেন। পেস্তালাৎসীও রুশোর চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন এবং তিনি যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, তার মধ্যে শিশুর নিজস্ব আগ্রহ ও বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি বলেছিলেন, শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে আবিষ্কার করাই হ'ল শিক্ষকের কর্তব্য। তিনি ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার (Sense training) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর অবাধ স্বাধীনতার কথা বলেছেন এবং স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পরে হার্বার্ট শিক্ষাকে আগ্রহ (interst)-ভিত্তিক করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট পদ্ধতি এবং তাঁর আগ্রহের তত্ত্ব শিশুশিক্ষার পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর পরে ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুর আত্মক্রিয়াকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই সকল মনীষীর চিন্তাধারায় আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জন্ম হয়েছে।

এই মনীষীদের প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক কালে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ বিভিন্ন দেশে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। যেমন, আমেরিকায় পার্কার (Parker), জন ডিউই (Dewey) ; ফ্রান্সে কুসিনে, জার্মানীতে বার্টহোল্ড অটো (Otto), ইংলণ্ডে সেসিল রেড্ডি (Reddie), ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রচেষ্টায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

সুতরাং শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা যা আমরা বর্তমানে দেখছি, তা বিংশ শতাব্দীর নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য নয়। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারার মধ্যে এর প্রকাশ দেখা গেছে। তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কালের সীমা অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাই বিংশ শতাব্দীর শিক্ষার নবধারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুকেন্দ্রিকতা (Child centricism)।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Child-centric Education) :

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য একই। কারণ আধুনিক শিক্ষার সমস্ত দিকই শিশুকেন্দ্রিকতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই শিশুকেন্দ্রিক

শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গেলে, আধুনিক শিক্ষাধারার যে বৈশিষ্ট্য সেগুলোরও উল্লেখ করতে হয়। তার পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য, বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য, শিক্ষকের কর্তব্য ইত্যাদি সবকিছু তাছাড়া আরো কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।

[এক] **স্বাধীনতা (Freedom) :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দান। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছা মত কাজ করতে পারে। সে ইচ্ছামত যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে, যে কোন সহকর্মীর পরামর্শ নিতে পারে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য তার উপর জোর ক'রে বিধিনিষেধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় না।

[দুই] **সক্রিয়তা-ভিত্তিক শিক্ষা (Education through activity) :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল—শিশু শিক্ষাপদ্ধতি প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে পরিচালনা। শিশুকে নিষ্ক্রিয় রেখে কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ ও সার্থক হ'তে পারে না। শিশু নিজে হাতে কলমে কাজ ক'রে নিজে যা শিখবে, তাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর এই সক্রিয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। যার ফলে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তা-ভিত্তিক পদ্ধতিরও বিকাশ হ'য়েছে; যেমন, প্রোজেক্ট পদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি, ইত্যাদি।

[তিন] **ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পাঠদান (Individualized instruction) :** ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পাঠদানের ব্যবস্থা শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আর একটা বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকাশ লাভ করে। তার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হ'লে শিক্ষাদান পদ্ধতিকেও ব্যক্তি-কেন্দ্রিক করতে হবে। তাই বর্তমান কালে আমরা ব্যক্তি-কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির প্রচলন দেখতে পাই। সাংগঠনিক দিক থেকে শ্রেণী থাকলেও, পাঠদানের দিক থেকে শ্রেণীর বিশেষ কোন মূল্য নেই। প্রত্যেক শিশু নিজ নিজ ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী যাতে বিকাশ লাভ করতে পারে, তার ব্যবস্থা রাখা হয়।

[চার] **অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিক্ষা (Experience-centred Education) :** বর্তমানে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্ব প্রথম স্থান দেওয়া হয়। যে সমাজ অভিজ্ঞতার মধ্যে সে জন্ম গ্রহণ করেছে, যে অভিজ্ঞতা সে সমাজ থেকে পাচ্ছে তাকেই পরিপূর্ণভাবে বিকাশ করাই শিক্ষার

মূল কথা। তাই বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে শিক্ষা দেওয়ার কথা বিশেষ ভাবে বলা হ'য়েছে। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে, বিভিন্ন সমাজ অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু সমাজের উপযোগী ব্যক্তি হিসেবে বড় হয়ে উঠবে।

[পাঁচ] **সৃজন-মূলক প্রচেষ্টা (Creative effort) :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনী স্পৃহাকে চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হয় এবং তার সৃজনমূলক ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা হয়। কারণ তার মাধ্যমেই সে পরবর্তিকালে সমাজ অগ্রগতিতে নিজের যথার্থতা প্রমাণ করে। তাছাড়া এই সব কাজের মধ্য দিয়ে বৃত্তিমূলক অনুরাগ (Vocational interest) জাগ্রত হবে।

[ছয়] **শৃঙ্খলা (Discipline) :** শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষা শিশুর অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিক শৃঙ্খলার ধারণাকেও পরিত্যাগ করেছে। পরিবর্তে শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার বা মুক্ত শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ, এই ধরনের শৃঙ্খলা ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক।

[সাত] **ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ (Development of Personality) :** শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। পরিপূর্ণ বিকাশ বলতে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক গুণের বিকাশ বুঝায় এবং ব্যক্তির বিকাশকে এই তিন দিক থেকে সহায়তা করার জন্য গতানুগতিক পাঠ ছাড়া সহপাঠ্যক্রমিক কাজেরও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে বিদ্যালয়ে। এই সব কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন হয়।

[আট] **মানবীয় সম্পর্ক (Human relation) :** শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হ'লে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন প্রয়োজন। তাই আধুনিক বিদ্যালয়ে এই ধরনের মানবীয় সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। **শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী** সম্পর্ক (Pupil-Pupil relation),—যার মাধ্যমে নানা ধরনের সামাজিক গুণ বিকাশ লাভ করে। **শিক্ষক-শিক্ষার্থী** সম্পর্ক (Pupil-Teacher relation),—এর মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগী আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হয়। **শিক্ষক-সমাজ** সম্পর্ক **(Teacher-Society relatien)**—এর মাধ্যমে শিক্ষার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়।

এই ধরনের সম্পর্ক যদি বিদ্যালয়ে সার্থকভাবে স্থাপন না করা যায় শিশুর শিক্ষা পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা যাবে না।

[নয়] **মনোবিদ্যার প্রয়োগ (Application of Psychology) :** সবশেষে, বলা যেতে পারে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে মনোবিদ্যার পরীক্ষিত তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে তোলা। শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, শৃঙ্খলার ধারণা সমস্ত কিছুর মধ্যে আধুনিক মনোবিদ্যার জ্ঞানের প্রয়োগ করা হ'য়েছে।

শিক্ষামূলক রচনা

Educational Essays

আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক সমাজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিক্ষা ও সমাজ পরস্পর পরস্পরের পারিপূরক। তাই শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে, তাকে চিন্তান্বিত ক'রে তোলে এবং সে সমাধানের পথে এগিয়ে দেয়। তেমনি সমাজের সমস্যাও শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সমাজ জীবনের কোন বিপর্যয় বা পরিবর্তন সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সংক্রামিত হয়। এদের মধ্যে যে সামাজিক সক্রিয়তার সংযোগ আছে, তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এরকম কয়েকটি সমস্যা এখানে আলোচনা করা হ'চ্ছে।

* সমাজ ব্যবস্থার আধুনিক কালে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন—'গণতান্ত্রিক আদর্শ' গ্রহণ। সমাজ জীবনে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রবর্তনের ফলে ব্যক্তি-জীবনের অনুরূপ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হ'চ্ছে। ফলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'চ্ছে প্রথম রচনায়।

[* গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা (Education for Democracy)]

** আবার সমাজের চাহিদাকে সঠিক ভাবে মেটাতে হ'লে শিশুকে তার আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত করতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুই ভবিষ্যতে সমাজ-জীবনে দায়িত্বশীল নাগরিক হ'য়ে গড়ে উঠবে। তাই সমাজ জীবনের চাহিদার সঙ্গে সমতা রেখে নাগরিকতার শিক্ষা দিতে হবে, এই নাগরিকতার শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় রচনায়।

[** নাগরিকতার জন্য শিক্ষা (Education for Citizenship)]

*** ভারতবর্ষে নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা কৃষ্টির লোক বাস করে। কিন্তু আমরা সংবিধান অনুযায়ী একই ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু একই রাষ্ট্রের নাগরিক কাগজে কলমে বললেও, অন্তরে সে ভাব আমরা আজও প্রকাশ করতে পারিনি। তাই ভাষা নিয়ে গণ্ডগোল, ধর্ম নিয়ে গণ্ডগোল, এমনি আরো নানা

ছোট খাটো ঘটনা নিয়ে প্রায়ই গণ্ডগোল লেগে আছে। জাতির সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার দায়িত্ব কতটুকু, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় রচনায়।

[*** জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষা (Education for National Integration)]

**** আধুনিক মানবতাবাদের যুগে কিছু দার্শনিক বলছেন যে, সুস্থ জীবন যাপন করতে হ'লে চাই পারস্পরিক সৌহার্দ্য। মানুষে মানুষে হিংসা, ঝগড়া, যুদ্ধ সব কিছুকে মুছে ফেলতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তায় আমরা দেখতে পাচ্ছি এক রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ বা কলহে লিপ্ত। চিন্তার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বকে একমাত্র সমাধান করতে পারে শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা আন্তরিকতার বোধ জাগ্রত করা যায়। এ সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে চতুর্থ রচনায়।

[**** আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা (Education for International Understanding)]

***** আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে মানুষের কাজ করা যেমন সহজ হ'য়েছে, তেমনি তার অবসরও অনেক বেড়েছে। এই অবসর সময়ে সে কি করবে, ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে বেশীর ভাগ লোক অশিক্ষিত সেখানে এই অবসর সময় কিভাবে কাটানো যাবে, সেটা একটা মস্ত বড় সামাজিক সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সুস্থ অবসর যাপনের কৌশল জানা থাকে না বলে আমাদের দেশের লোকেরা নানা রকম অসামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে অবসর যাপন করে। এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হ'য়েছে সর্বশেষ রচনায়।

[***** অবসর যাপনের শিক্ষা (Education for Leisure)]

শিক্ষামূলক রচনা ॥ এক ॥

গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষা

Education for Democracy

ইংরেজী 'Democracy' কথাটা এসেছে গ্রীক শব্দ 'Demos' এবং 'Kratos' থেকে। 'Demos' কথার অর্থ হ'ল জনসাধারণ এবং 'Kratos' কথার অর্থ হ'ল "ক্ষমতা"। সুতরাং 'Democracy' কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হ'ল 'জনগণের শক্তি'। প্রাচীন দার্শনিক এ্যারিস্টটল (Aristotle) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "a government of the many"। তাই প্রাচীন কাল থেকেই রাষ্ট্র-শাসনের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রয়োগ করা হ'য়ে থাকে। আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, মানবতাবাদী আব্রাহাম লিঙ্কন (Abrahm Lincoln) গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার উল্লেখ প্রায়ই করা হয়। তিনি বলেছিলেন—"Democracy is a rule of the people, by the people and for the people." অর্থাৎ জনগণের স্বার্থে, জনগণের দ্বারা গঠিত শাসন ব্যবস্থাকেই ব'লবো গণতন্ত্র। এই অর্থেই বাংলায় গণতন্ত্র কথাটা প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আধুনিক কালে কোন চিন্তাবিদ্ বা রাষ্ট্রনীতিবিদ্ (Political theorist) গণতন্ত্রের এই সংব্যাখ্যানকে মেনে নেন না। গণতন্ত্রের এই ধরনের সংজ্ঞা, তার অর্থকে অনেক সংকীর্ণ করে দেয়। এটাকে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র বলতে পারি। প্রকৃত গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

আধুনিক কালে, বিভিন্ন দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ একথা স্বীকার করেছেন। তারা প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে জীবনযাত্রার বিশেষ প্রকৃতিকে বুঝিয়েছেন। জোয়াড (Joad) বলেছেন, "Democracy is a way of living." গণতন্ত্রের আধুনিক ধারণা সমাজ দর্শন (Social Philosophy)-এর উপর ভিত্তি ক'রে আছে। ফলে জীবনের সমস্ত অংশ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক এবং অর্থ নৈতিক-এর অন্তর্গত। এই ধরনের সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করার স্বাধীনতা আছে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করার, অন্যের বিকাশকে ব্যাহত না ক'রে। জন্ ডিউইও বলেছেন—"Democracy is more than a form of government. It is primarily a mode of associated living, of conjoint communicated experience", ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণও এই মতবাদ পোষণ করেন। তিনিও গণতন্ত্রকে জীবন যাপনের ধারা (way of life) হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং ভারতীয় চিন্তাধারা অনুযায়ী বলেছেন, এই জীবনযাপনের পদ্ধতি স্বাধীনতার ও সুযোগের সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক জীবনধারার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার ও ক্রিয়ার সমান সুযোগ থাকবে এবং প্রত্যেকেই সমান অধিকার ভোগ করবে। ভারতবর্ষের সংবিধানেও গণতন্ত্রের এই দার্শনিক আদর্শকে বড় করে দেখা হ'য়েছে। সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে "The Sovereign Democratic Republic of India will secure to all its citizens Justice—social, economic and political,

liberty of thought, expression, belief, faith and worship and equality of rights and opportunity....." ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শই গণতন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্যের পরিচায়ক। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, সমানাধিকার এবং সৌহার্দ্যের মধ্যে প্রকৃত গণতন্ত্রের জীবনীশক্তি অন্তর্নিহিত। ব্যষ্টি জীবনের বিকাশকে ব্যাহত না ক'রে আত্মজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করাই গণতন্ত্রের মূলনীতি। গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার প্রকৃত তাৎপর্যই এখানে। সমাজ দার্শনিকদের মতে এই ব্যবস্থা মানুষকে উন্নততর জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়ে, সমাজ জীবনকে আদর্শের পথে পরিচালিত ক'রে জীবনকে জীবনাতীত লোকের পথে এগিয়ে যেতে যাহায্য করে।

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলনীতি (Basic principles of Democracy): সমাজ দার্শনিকদের মতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ব্যক্তিকে, প্রকৃত জীবনাদর্শের অধিকারী করে। এই জীবনাদর্শ গড়ে ওঠার পেছনে কতকগুলো মূলনীতি কাজ করে। এই মূল নীতিগুলো হ'ল—

॥ এক ॥ **ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা** (Respect for individuality): গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বতাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখা হয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ আছে, ব্যক্তি যদি পিছিয়ে থাকে সমাজও পিছিয়ে যাবে। কে কি কাজে নিযুক্ত আছে সেটা বড় কথা নয়, সে সমাজেরই সভ্য, সেই হিসেবে, তাকে বিচার করতে হবে। প্রত্যেকেই সমাজের বন্ধু। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। কারণ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছাড়া সুস্থ সমাজ জীবন গড়ে তোলা যায় না।

॥ দুই ॥ **সাম্য (Equality):** গণতান্ত্রিক সামজব্যবস্থায় কোন বিশেষ ব্যক্তিকে বড় ক'রে বা ছোট ক'রে দেখা হয় না। এখানে প্রত্যেকের সমান অধিকার আছে। গণতন্ত্রের সমান অধিকার মানে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার নয় (ভোটদানের অধিকারের মাধ্যমে)। সমস্ত রকম সুযোগের দিক থেকে প্রত্যেকের সমান অধিকার দেওয়াই হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার মূলনীতি। প্রত্যেক ব্যক্তির সমান সামাজিক, শিক্ষাগত, বৃত্তিগত অধিকার থাকবে। প্রত্যেক-কেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের জন্য পরিপূর্ণ সুযোগ ক'রে দিতে হবে। এই সাম্যের নীতির উপরই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

॥ তিন ॥ **সহনশীলতা (Tolerance):** সহনশীলতার নীতি গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। এই

নীতি ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখে ও সমাজ জীবনে সংহতি আনতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই স্বাধীনতা আছে, নিজের রুচি, নিজের আগ্রহ, নিজের অভ্যাস অনুযায়ী কাজ করার। প্রত্যেকের মধ্যে যদি সহনশীলতা না থাকে তাহ'লে, কলহের সম্ভাবনা। তাই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নাগরিকরা যাতে পরস্পরের প্রতি সহনশীল মনোভাব পোষণ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখার দরকার। যার মধ্যে এই মনোভাব নেই তিনি গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের উপযোগী নন। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"A true democrat never thinks that his way is the only right way and that those who differ from him, are all in the wrong." এই জন্য গণতান্ত্রিক সমাজের মূলনীতি হ'ল সমস্ত রকম মতবিরোধকে সহ্য করতে হবে।

॥ চার ॥ **সহযোগিতামূলক মনোভাব (Co-operativeness):** গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের মূলকথা হ'ল সহযোগিতা। প্রত্যেক ব্যক্তির যদি এই বোধ না আসে তাহ'লে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ ব্যর্থ হবে। এক ব্যক্তি যদি তার নিজের সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন না হয়, এবং অন্যের সহযোগিতার মূল্য যদি উপলব্ধি করতে না পারে, তাহ'লে সমাজ অগ্রগতি ব্যাহত হবে। তাই গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বোধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি ভ্রাতৃত্বের বোধ নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় কর্ম সম্পাদন করবে।

॥ পাঁচ ॥ **বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবর্তন (Change through Persuation):** গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের মূলনীতি হ'ল—জীবন জড় নয়, গতি ধর্মী, যে-কোন গতিধর্মী সত্তারই পরিবর্তন স্বাভাবিক। সুতরাং গণতান্ত্রিক জীবন যাত্রার কোন মান সর্ব যুগ ও কালের জন্য স্থির থাকতে পারে না। প্রয়োজনের তাগিদে তাকেই পরিবর্তন করতে হবে এবং গণতন্ত্র এই পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী, কিন্তু সেই পরিবর্তন নীতি শক্তির (force) নীতি নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়ার নীতি। সমাজ-জীবনে যদি কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় তা পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই স্থির করতে হবে এবং পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব নিয়ে প্রত্যেকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সবে। প্রকৃত জনমত গঠন ক'রে পরিবর্তন আনতে হবে সমাজ ব্যবস্থায়। আরোপিত পরিবর্তন তা যতই আদর্শগত দিক থেকে ভাল হোক না কেন গণতন্ত্রে তা কাম্য নয়।

॥ ছয় ॥ **শৃঙ্খলা (Discipline) :** শৃঙ্খলা বোধ গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত কাম্য। তবে সেই শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়ার দরকার। যে-কোন জীবনাদর্শকে কার্যকরী করতে হ'লে চাই শৃঙ্খলার সঙ্গে চর্চা। গণতন্ত্রও এক ধরনের মানবাদর্শ। তাই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হ'লে চাই ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত, মুক্ত শৃঙ্খলা।

॥ সাত ॥ **গণতান্ত্রিক জীবনের প্রতি আস্থা (Faith in Democracy) :** গণতন্ত্রের সর্ব কিছুই স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কামনা, বাসনার পরিপূর্ণ বাস্তব ও সমাজ সম্মতরূপই হ'ল গণতন্ত্র। তাই ব্যক্তি যাকে বিশ্বাস করে না, তার প্রতি তার শ্রদ্ধা নেই, তার প্রতি কখনই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া করতে পারে না। গণতান্ত্রিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা যদি না থাকে তা'হলে অন্যান্য কোন মূলনীতিই কার্যকরী হবে না। তাই গণতান্ত্রিক জীবনের প্রতি আস্থার মনোভাব গঠন গণতন্ত্র সংরক্ষণের একটি মূলনীতি।

॥ গণতন্ত্র ও শিক্ষা (Democracy and Education) ॥

গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও মূলনীতি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল, এই সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। গণতন্ত্রের মধ্যে যে ব্যক্তি-সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে, তা ব্যক্তির নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে আসে না; যে ব্যক্তির বিকাশের কথা বলা হ'য়েছে তা প্রচেষ্টা ছাড়া আসতে পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শকে উপলব্ধি করতে হ'লে এবং সেই জীবনযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতে হ'লে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দেশনা (guidance) দিতে হবে। গণতান্ত্রিক আদর্শ অন্য যে-কোন আদর্শের চেয়ে উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনে যা কিছু ভাল তা আমরা সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রচেষ্টা ছাড়া গ্রহণ করি না। ব্যক্তিকে এই আদর্শাভিমুখী করতে হ'লে চাই সচেতন নির্দেশনা (Guidance), 'শিক্ষাই' এই ধরনের নির্দেশনা দিতে পারে। তাই গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার গুরুত্ব এত বেশী। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (রাধাকৃষ্ণণ) তাঁদের রিপোর্টে ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সফলতার জন্য শিক্ষার গুরুত্বের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। কমিশন বলেছেন—"Education is the great instrument of social emancipation by which democracy establishes, maintains and protects the spirit of equality among its members." আবার শিক্ষার নির্দেশনামূলক গুরুত্বের কথাও কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখ করা হ'য়েছে। তাঁরা প্রত্যেক ব্যক্তির

জীবন প্রক্রিয়াকে দুঃসাহসিক অভিযান হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এই অভিযানে শিক্ষাই তাদের নির্দেশ [The function of Education is the guidance of this adventure of the realization, of the potentialities of each individual in the force of the actual world of men and things—*University Education Commission.*]

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, শিক্ষার গুরুত্বের কথা আধুনিক কালের বিখ্যাত দার্শনিক জন ডিউই (Jhon Dewey)-ও বলেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। তিনিও বলেছেন, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে সফল করে তুলতে হ'লে, ব্যক্তিকে শিক্ষা দিতে হবে। সে শিক্ষা এমন হবে যার মধ্যদিয়ে ব্যক্তি নিজের এবং সমাজের উন্নতি সাধন করতে পারে, যে শিক্ষা সমাজ অগ্রগতির ধারাকে বজায় রাখতে পারে, প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা না এনে, তাই হবে গণতন্ত্রের উপযোগী শিক্ষা। তিনি তাই তার 'Democracy and Education বই-এ বলেছেন—"Such a society (Democratic) must have a type of Education which gives individuals a personal interest in social relationship and control and the habits of mind which secure social change without introducing disorder." সুতরাং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রা ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মাধীন আর আদর্শ শিক্ষাই সেই মনোভাব ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারে।

অন্যদিক থেকে বিচার করলেও বলা হয়, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য বা রক্ষার জন্য শুধু শিক্ষার দরকার তা নয়; শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ গড়ে তুলতে হ'লেও তার মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারার আদর্শ সংযোজিত করতে হবে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের জন্য যেমন শিক্ষার দরকার (Education for Democracy), তেমনি শিক্ষার জন্যও গণতন্ত্রের (Democracy for Education) প্রয়োজন। তাই আধুনিক শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'চ্ছে। জন ডিউই বলেছেন—শিক্ষা নির্ভর করে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং দলগত সংযোগের মাধ্যমে। আর এ'দুটিই হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পারস্পরিক ক্রিয়া ও দলগত সংযোগ দুই প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর

এই পরিবেশেই শিক্ষার কাজ ভাল হয়। সুতরাং একদিক থেকে শিক্ষা এবং গণতন্ত্র পরস্পর নির্ভরশীল। সুতরাং গণতন্ত্র ও শিক্ষার মধ্যে একটা প্যারস্পরিক ক্রিয়ার সম্পর্ক (Functional relationship) বর্তমান।

এখন আলোচনা করা যাক, শিক্ষার বিভিন্ন দিকে গণতান্ত্রিক ভারধারার আদর্শ সংযোজন করতে হ'লে, কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক জীবন আদর্শের উপযোগী ক'রে তুলতে হ'লে শিক্ষার বিভিন্ন দিকে (aspects) কি পরিবর্তন আনতে হবে তা এখানে আলোচনা করা হোলো।

॥ এক ॥ **গণতন্ত্র ও শিক্ষার লক্ষ্য (Democracy and Aims of Education):**

শিক্ষাকে গণতন্ত্রের উপযোগী করতে হ'লে শিক্ষার লক্ষ্যও সেইমত নির্দেশ করতে হবে। গণতন্ত্র বাইরের কোন শক্তি (External force) নয় অন্তরের জিনিস। তাই গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন এবং ব্যক্তিত্বের এই বিকাশ গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে করতে হবে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ সঈদীয়ান (K. G. Saiyidian) বলেছেন—"Education must be so oriented that it will develop the basic qualities of character which are necessary for the functioning of democratic life" অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তির মধ্যে সেই সব চারিত্রিক গুণের বিকাশ সাধন করা যার দ্বারা গণতন্ত্রের পরিচালনা সহজ হবে বা গণতান্ত্রিক পরিচালনার অনুকূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এখন প্রশ্ন হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী বৈশিষ্ঠ্য কি কি? এ সম্পর্কে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার) খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা শিক্ষার লক্ষ্যকে বিশেষ ভাবে গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই কমিশনে নাগরিকতার (citizenship), বৃত্তিমূলক উন্নতি (vocational efficiency) ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশ (development of personality) এবং নেতৃত্ব (leadership)—এই কথাটির বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে, ব্যক্তিকে সুনাগরিক হওয়ার জন্য যে সব চারিত্রিক গুণের দরকার তার চর্চার করা। বিশেষ ভাবে সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও সহনশীলতা, যে গুলো গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত কাম্য। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনও শিক্ষার লক্ষ্য নির্দেশ করতে গিয়ে এই বৈশিষ্ট্য-গুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কমিশনের রিপোর্টে বলা হ'য়েছে—

"Special emphasis has to be laid on the development of values as a scientific temper of mind, tolerance, respect for the culture of other national group etc. which will enable us to adopt democracy, not only as a form of government, but also as a way of life". সুতরাং গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রায় উপযোগী মানসিক গুণের অনুশীলন হবে গণতান্ত্রিক শিক্ষার লক্ষ্য। দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করার দরকার, তার কর্ম জীবনে। প্রতেকে ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী উৎপাদন করবে, তবে সমাজের উন্নতি হবে। তাই শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বৃত্তি জীবনের উপযোগী ক'রে দিতে হবে। সুতরাং বৃত্তিমূখী শিক্ষার আদর্শ গণতন্ত্রের মূল নীতির অনুকূল। তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মূল কথা হ'ল ব্যক্তির উন্নতি সাধন এবং ব্যক্তির মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধন। তাই এই শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা। ব্যক্তির উন্নতি হ'লে তার পরোক্ষ ফল সমাজের উপর এসে পড়বে। এই কারণে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে গণতান্ত্রিক শিক্ষার আর একটি লক্ষ্য। সবশেষে শিক্ষার মাধ্যমে নেতৃত্বের ভাব জাগিয়ে তুলতে হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে। আদর্শ নেতা ছাড়া গণতন্ত্র বাঁচতে পারে না, তাই শিক্ষার মাধ্যমে দেহ ও মনের এমন বিকাশ সাধন করতে হবে, যার ফলে তারা পরে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং সমাজের অগ্রগতিকে বজায় রাখতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য হবে—ব্যক্তির সুনাগরিকতার গুণের বিকাশ সাধন করা, ব্যক্তিকে কর্মজীবনের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা এবং এই সব কিছুর সমবায়ে তার মধ্যে যাতে নেতৃত্বের ভাব জাগ্রত হয় তার চেষ্টা করা।

॥ দুই ॥ **গণতন্ত্র ও পাঠ্যক্রম (Democracy and Curriculum)**

শিক্ষাক্ষেত্রে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পাঠ্যক্রম। গণতান্ত্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম হবে পরিবর্তনশীল। এর মধ্যে ব্যক্তির চাহিদা এবং সমাজের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিশুর নিজের ক্ষমতানুযায়ী জীবন বিকাশের যেমন সুযোগ থাকবে তেমনি অপর দিকে সুস্থ গণতান্ত্রিক জীবনযাপনের কৌশলও তাকে আয়ত্ত করার সুযোগ দিতে হবে। এই দুই চাহিদাকে মেটানোর জন্য পাঠ্যক্রমকে দ্বিমুখী করতে হবে। একদিকে পাঠ্যক্রমে এমন বিষয় সংযোজন করতে হবে যার দ্বারা শিক্ষার্থী গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবন

যাপনের উপযোগী প্রয়োজনীয় জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। যেমন— (১) সাধারণ বিজ্ঞান (General science) প্রকৃতি জগতের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাবে এবং কি ভাবে বিজ্ঞানের দ্বারা জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করা হয় তাও জান বে। (২) সমাজ বিদ্যা (Social studies)—এর মাধ্যমে তার সমাজের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। সামাজিক জীবনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে শিখবে, এবং সমাজ অগ্রগতির প্রচেষ্টা তার মধ্যে গড়ে উঠবে। (৩) ভাষা, শিল্পকলা, নীতিবিদ্যা (Language, Art and Ethics) ইত্যাদি তার মনোজগতে প্রক্ষোভমূলক সংহতি আনবে এবং সে সমাজের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবে। (৪) হস্ত শিল্পের (Craft) মাধ্যমে তার বৃত্তিমূলক জীবনের বিকাশ হবে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই এধরনের পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা হ'য়েছে। আমাদের দেশেও মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই ধরনের পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন করা হ'য়েছে। পাঠ্যক্রমের এই অংশকে বলা হয় কেন্দ্রীয় পাঠ্যক্রম (Core-curriculum)। এই অংশের উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তিকে গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের উপযোগী ক'রে তোলা।

পাঠ্যক্রমের অপর অংশ হবে ব্যক্তি-জীবনের উৎকর্ষণমূলক। গণতন্ত্রের মূল কথা হ'ল ব্যক্তি-স্বাধীনতা। ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী বিকাশের অধিকার পাবে। তাই এই অংশে কিছু কিছু জ্ঞানমূলক ও বৃত্তিমূলক বিষয় থাকবে যার মধ্য থেকে ব্যক্তি নিজের ক্ষমতা, চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী বেছে নিয়ে অনুশীলন করবে, বিষয় নির্বাচনে ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।

সুতরাং গণতান্ত্রিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম একদিকে যেমন ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনের ধারার সঙ্গে পরিচিত করবে কেন্দ্রীয় আবশ্যিক পাঠ্যক্রমের (Compulsory Core-curriculum) মাধ্যমে, অন্যদিকে বহুমুখী ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রমের (Multilateral elective curriculum) মাধ্যমে তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশেরও সুযোগ দেবে।

॥ তিন ॥ গণতন্ত্র ও শিক্ষালয় (Democracy and School) :

আধুনিক চিন্তাধারা অনুযায়ী শিক্ষালয় হ'ল সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সুতরাং গণ তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষালয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। গণতান্ত্রিক জীবন যাপনের শিক্ষা শিক্ষার্থী প্রথম বিদ্যালয়ের মধ্যে পাবে। তাই বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যাপারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষালয়ের সাংগঠনিক কাজে তাদের প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের সুযোগ দিতে হবে

বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে, School self-government গঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষাধারার একটি বৈশিষ্ট্য। এছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষামূলক যে কাজ পরিচালনা করা হয়, যাতে শিক্ষার্থী দলগত ভাবে যোগ দিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দলগত ভাবে কাজ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অনেক সামাজিক গুণের বিকাশ হবে যা গণতন্ত্রের পক্ষে একান্ত কাম্য।

॥ চার ॥ **গণতন্ত্র ও শৃঙ্খলা (Democracy and Discipline):**

পূর্বেই উল্লেখ করা হ'য়েছে, গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয় একটি সমাজ সম্প্রসারণ সংস্থা মাত্র যা শিক্ষার্থীদের দ্বারা গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আইন ও শৃঙ্খলা তৈরী করে। নিজেরাই নিজেদের শাস্তি দেয়। শিক্ষার্থীরা যখন বুঝতে শেখে যে তারা শিক্ষালয়ের এক একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এবং যা কিছু নিয়মকানুন আছে, তা তাদেরই তৈরী, তখন তারা স্বাভাবিক ভাবে ঐ সব নিয়ম ভঙ্গ করে না। শিক্ষালয় পরিচালনার ব্যবস্থার জন্য এই ধরনে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে। যদি কোন শিক্ষার্থীর কোন বিচ্যুতি কোন সময় দেখা যায়, তাহ'লে ছাত্রদের দ্বারা বোঝাপড়ার (Persuation) মাধ্যমে তাকে শাসন করা যেতে পারে। তবে সে শাস্তি ছাত্ররাই দেবে, শিক্ষক নয়।

॥ পাঁচ ॥ **গণতন্ত্র ও শিক্ষা-পদ্ধতি (Democracy and Methods of Teaching):**

গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে। গতানুগতিক শিক্ষায় শিশু নিষ্ক্রিয় ভাবে শুনতো এবং শিক্ষক পাঠদান করতেন। গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ কেবলমাত্র সমাজ দর্শনের (Social philosophy) উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এটা বিজ্ঞানও বটে। এই জীবনাদর্শ নিষ্ক্রিয় তাত্ত্বিক চিন্তার মাধ্যমে আসতে পারে না। বিচারশক্তি ও যুক্তিশক্তিকে সক্রিয় ক'রে তুলতে পারলেই গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের প্রতি আস্থাবান হবে শিশুরা। তাই গণতান্ত্রিক শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা হ'ল শিশুর চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে যুক্তির দ্বারা তার সামনে এই আদর্শকে তুলে ধরা। তাই এই শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার (activity principle) উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। কারণ প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ঐ সকল মানসিক গুণের বিকাশ হয়। তাছাড়া কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ ভাবে পাঠে যোগদানের সুযোগ পায়। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিই তাই গণতান্ত্রিক শিক্ষার

একমাত্র পদ্ধতি। এর মাধ্যমে একদিকে শিক্ষার্থীর মানসিক গুণের বিকাশ হয়, অন্যদিকে নানা রকম সামাজিক গুণেরও বিকাশ হয়। যেমন—সহনশীলতা, সমাজ-সেবামূলক মনোভাব ইত্যাদি। আবার এর মাধ্যমে ব্যক্তির বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজের সৃজনী স্পৃহাকে চরিতার্থ করতে পারে এবং তার মাধ্যমে নিজের বিকাশ সাধন করতে পারে।

॥ ছয় ॥ গণতন্ত্র ও শিক্ষক (Democracy and Teacher)

গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের দায়িত্ব যেমন একদিক থেকে বেড়েছে, অন্যদিক থেকে তার ব্যক্তিগত গুণাবলীরও কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষককে তার পুরোনো দায়িত্বের কথা ভুলে যেতে হবে। তিনি শুধুমাত্র জ্ঞানবিতরণের জন্য নন। তাঁর কাজ হবে শ্রেণীকক্ষে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং ঐ গণতান্ত্রিক পরিবেশে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় তিনি নির্দেশকের কাজ করবেন ; শিক্ষার্থীরা তাদের সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখবে। তবে শ্রেণী পরিচালনার ব্যাপারেও তিনি ছাত্রদের সহযোগিতা নেবেন, তিনি কিছু শাসন করবেন না। তাছাড়া ব্যক্তিগত দিক থেকেও তাকে সুচরিত্রের অধিকারী হতে হবে এবং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আস্থাবান হতে হবে। তিনি নিজে যদি এই শিক্ষাব্যবস্থায় আস্থাবান না হন, তাহলে ছাত্রদের মধ্যে সেই মনোভাব সৃষ্টি করতে পারবেন না।

॥ আলোচনা ॥

সুতরাং শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপোযোগী করতে হলে, বা গণতন্ত্রের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হ'লে, তার লক্ষ্য, পাঠ্যক্রম পদ্ধতি, শিক্ষালয় পরিচালনা সমস্ত কিছুকে নতুন ক'রে ভাবতে হবে। শিক্ষর সকল ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন, তাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করতে হবে। শিক্ষা হবে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্থাপনের নির্দেশক। শিক্ষক, সমাজ, শিক্ষালয়, রাষ্ট্র সকলের সমবেত চেষ্টায় এই উদ্দেশ্যের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। প্রত্যেকেই দায়িত্ববোধের সঙ্গে যদি না কাজ করেন তাহ'লে গণতান্ত্রিক সমাজ জীবনের আদর্শ ভেঙ্গে যাবে। তাই শিক্ষার উন্নতির জন্য, ব্যক্তির উন্নতির জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য এই ধরনের

আদর্শই আমাদের কাছে কাম্য। তাই ভারতীয় শিক্ষা-কমিশন (কোঠারী) বলেছেন—"This is a very exacting experiment in living that we have launched upon and no education will be worthwhile if the educated mind is unable to respond to this situation with intelligence and imagination."

প্রশ্নাবলী

1. Write notes on Education for democracy

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য। [C. U. ; B. T. '60]

2. Write a short essay on the Basic principles of democracy in Education. [N. B. U. ; B. T. '66]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

3. Discuss the democratic concept of education, and how to realise it in our schools. [N. B. U. ; B. T. '64]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

নাগরিকতার জন্য শিক্ষা

Education for Citizenship

অনেক সময় 'নাগরিক' কথাটা খুব সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। প্রাচীন গ্রীস দেশে ছোট নগর রাজ্য (city state) ছিল। এই সব নগর রাজ্যের যারা অধিবাসী তাদের বলা হ'ত নাগরিক (citizen) অর্থাৎ শহরে (city) যারা বাস করে তারা হ'ল নাগরিক (citizen)। কিন্তু এই ধরনের সংকীর্ণ অর্থে আর নাগরিক কথাটা ব্যবহার করা হয় না। বর্তমানে রাষ্ট্রের সীমা অনেক বেড়েছে এবং তার ভিতর নগর এবং গ্রাম দুই আছে। তাই আধুনিক সংব্যাখ্যানে নাগরিক বলতে বোঝায় কোন বিশেষ রাষ্ট্রের অধীনে সকল লোককে, যারা রাষ্ট্রের প্রদত্ত সকল অধিকার গ্রহণ করে এবং বিনিময়ে সে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার ক'রে চলে। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী নাগরিকতা একটি নিষ্ক্রিয় অধিকার নয়। এর মূলে আছে সক্রিয় পারস্পরিক সম্পর্ক।

প্রত্যেক আদর্শ নাগরিককে চিন্তা করতে হয় তিনি সমাজ বা রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ এবং সেই হিসেবে তাকে কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের প্রত্যেকের যেমন পরিবারের প্রতি কর্তব্য আছে এবং সুস্থ পরিবার-জীবনে তাঁরা প্রত্যেকে সেগুলো পালন করেন, তেমনি, রাষ্ট্রের নাগরিককেও রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলো দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নাগরিকের মধ্যে দায়িত্ববোধ একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আমরা এমন নাগরিক চাই যারা, উৎসাহের সঙ্গে সমাজ উন্নয়নের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে, যারা নিজের সুখ দুঃখের কথা ভুলে গিয়ে, সমাজ কল্যাণের জন্য নিজেদের নিয়োগ করে। সাধারণতঃ যে-সব মৌলিক দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিককে পালন করতে হয় তাহ'ল—

(১) রাষ্ট্র বা সমাজের প্রতি আনুগত্য ;

(২) রাষ্ট্র বা সমাজের বিধি নিষেধ মেনে চলা ;

(৩) কর প্রদান ;

(৪) রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সহায়তা করা এবং

(৫) নিজের ক্ষমতানুযায়ী উৎপাদনে সাহায্য করা।

অন্যদিকে সমাজ বা রাষ্ট্রও নিষ্ক্রিয় থাকে না। সেও বিনিময়ে ব্যক্তি-কল্যাণের জন্য অনেক সুযোগ সুবিধা দান করে। ব্যক্তিকে সামাজিক, অর্থ-নৈতিক, নৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত রকম নিরাপত্তা (security) দেওয়ার দায়িত্ব সে নেয়। এছাড়া ব্যক্তির সর্বতোমুখী বিকাশ সাধনের জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র তাকে কতকগুলো অধিকার প্রদান করে। এইসব অধিকারগুলো হ'ল—

(১) জীবন সংরক্ষণের অধিকার,

(২) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার,

(৩) ভূসম্পত্তির উপর অধিকার,

(৪) স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার,

(৫) শিক্ষার অধিকার,

(৬) রাষ্ট্র শাসনের অধিকার এবং

(৭) স্বাধীনভাবেই চিন্তা করিবার অধিকার।

সুতরাং নাগরিকতা (Citizenship) একটি ক্রিয়াশীল ধারণা (Active concept)। ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের পারস্পরিক নির্ভরতার মূলতত্ত্বকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে 'নাগরিকতার ধারণা'। বিশেষ ভাবে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই পারস্পারিক নির্ভরশীলতার প্রয়োজন আরো বেশী ক'রে অনুভূত হ'চ্ছে। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিই প্রধান, ব্যক্তি সেখানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, ফলে সমাজের প্রতি তার কর্তব্য বেশী। এখানে ব্যক্তি ও সমাজ সমান। তাই এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন—"Citizenship in democracy is a very exacting and challenging responsibility'........"

॥ শিক্ষা ও নাগরিকতা (Education and Citizenship) ॥

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি যে সব অধিকার পায় বা যে সব দায়িত্ব তাকে পালন করতে হয়, তা খুবই জটিল। সাধারণভাবে যেগুলোকে আমরা অধিকার (Right) বলছি সেগুলো ঠিক দাবী নয়। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেগুলোকেও আমরা কর্তব্যের অন্তর্গত করতে পারি। কারণ

এখানে দাতা এবং গ্রহীতা এক। কিন্তু এই ধরনের ধারণা ব্যক্তির মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে না। মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে একথা ভাবতে পারে না যে সমাজ তাকে যে অধিকারগুলো দিয়েছে, সেগুলোকে ঠিক ভাবে মেনে চলা তার দায়িত্ব। তার বিকৃত প্রয়োগ সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা আনবে। তাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হ'লে সুস্থ নাগরিক জীবন গড়ে তুলতে হবে এবং তা একমাত্র সম্ভব শিক্ষার মাধ্যমে। সুনাগরিকতার বৈশিষ্ট্য জন্ম গতভাবে আসে না; নাগরিকদের গড়ে তুলতে হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক চাহিদা আছে। জন্মের পর সে চায় সেই চাহিদা-গুলোকে পরিতৃপ্ত করতে। এই চাহিদার সবগুলোই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক চাহিদাগুলোর সার্থক উদ্গমন (Sublimation) ক'রে সমাজ কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এইভাবে শিক্ষাকে নাগরিকতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না গেলে, সুনাগরিক গঠন করা সম্ভব হবে না এবং প্রত্যেকে যদি সুনাগরিক না হয়, গণতন্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে যাবে। চিন্তাবিদ্ হাক্স্‌লে (Aldous Huxley) তাই বলেছেন—'If your goal is liberty and democracy, you must teach people the arts of being free and of governing themselves." মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন (মুদালিয়ার)-ও তাঁদের ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে নাগরিকতার শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সুনাগরিক হওয়ার জন্য যে সব মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক গুণ থাকার দরকার তা শিক্ষার মাধ্যমে ছাড়া বিকাশ করা সম্ভব নয় এবং শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের সতর্কতার সঙ্গে নাগরিকতার শিক্ষা দেওয়া।

এই সব দিক বিচার করলে, দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হ'লে, আদর্শ শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তি যাতে আদর্শ নাগরিকের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে তার প্রচেষ্টা করা। 'এটাই গণতান্ত্রিক শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাই মন্তব্য করেছেন—"No education is worth the name which does not inculcate the qualities necessary for living graciously, harmoniously and efficiently with ones fellow man." এবং এই ধরনের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে, সামাজিক দায়িত্ববোধ (civic responsibility), সামাজিক নীতিজ্ঞান (civic morals) এবং

সমাজ অনুকূল মনোভাব (civic attitude) বিকাশ করা। শিক্ষার মাধ্যমে এই ধরনের মনোভাব গড়ে তুলতে হ'লে বিদ্যালয়কে আমরা পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত আদর্শের পথে পরিচালিত করবো।

॥ এক ॥ গোষ্ঠী জীবনের প্রাথমিক মূল্যবোধের বিকাশ (Developing Primary Group Value) :

শিশুগোষ্ঠী জীবন সম্পর্কে ধারণা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে দেওয়া যায় না। আবার সামাজিক জীবন যাপনের কৌশল সেও ব্যক্তির আচরণ ছাড়া অন্য কোন কিছুর মধ্যে প্রকাশ পায় না। আর এই ধরনের আচরণ কেবলমাত্র সমাজের মধ্যেই করতে পারে, অন্য কোথাও নয়। সুতরাং তার মধ্যে সামাজিক মূল্য বোধ জাগ্রত করতে হ'লে তাকে সমাজের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ যদি না হয়, তাহ'লে ব্যক্তি সুনাগরিক হ'তে পারবে না। তাকে এই সব মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। এই সচেতনতা আসবে সমাজ জীবনের মধ্যে। তাই বিদ্যালয়ের কাজ হবে, আদর্শ সমাজ পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে, গোষ্ঠী জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা। এই সচেতনতা থেকে আসবে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের দায়িত্ববোধ, বিদ্যালয়ের সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন থেকে বিকাশ লাভ করবে বৃহত্তর সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের বোধ।

॥ দুই ॥ যথাযথ জ্ঞান ও তথ্য পরিবেশন (Providing knowledge and Information) :

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই অধিকার আছে, যে-কোন পদ বা বৃত্তি গ্রহণ করার। বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রে যে সব পদ আছে, সেই পদ যে কোন ব্যক্তি ভোটের মাধ্যমে বা যে কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকার করতে পারে।

তাই আদর্শ নাগরিকের, এসব পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পরিচিত থাকা উচিত। বিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথ তথ্য ও জ্ঞান এ সম্পর্কে পরিবেশন করা। এই জ্ঞান ও তথ্য তাদের সমাজের দায়িত্ব গ্রহণে সহায়তা করবে তাই নয়, সে সম্পর্কে তাদের সচেতনও ক'রে তুলবে।

॥ তিন ॥ সহযোগিতামূলক সামাজিক কাজের আয়োজন (Organising Co-operative Social Activities) :

শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র তথ্য পরিবেশন করলে চলবে না, সুনাগরিক হিসেবে

গড়ে তুলতে হ'লে, তাদের প্রত্যক্ষ কাজেও নিয়োগ করতে হবে। আমরা যদি তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণের বিকাশ করতে চাই, তাহ'লে তাদের সমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সমাজের প্রতি তাদের যদি মমত্ববোধ না জাগে তাহ'লে, তারা সুনাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। তাই বিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে, সাজের মধ্যে গিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার সুযোগ ক'রে দেওয়া এইজন্য বিদ্যালয়কে বিভিন্ন ধরনের সমাজ-সেবামূলক কাজ হাতে নিতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা ঐসব বার বার অভ্যাস করবে। এর ফলেই সমাজের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ জাগ্রত হবে।

॥ চার ॥ **সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা (Organising Co-curricular Activities) :**

বিভিন্ন ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কাজ নাগরিকতার বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করে। এইসব কাজের আয়োজন করতে হবে বিদ্যালয়ে। যেমন—এন. সি. সি., স্কাউট, এ. সি. সি. এবং অন্যান্য খেলাধূলা। এদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী-গোষ্ঠী জীবনের প্রশিক্ষণ পায়। তাছাড়া যদি মাঝে মাঝে ছাত্রদের বাইরে ভ্রমণে (Excursion) নিয়ে যাওয়া যায়, বা, ক্যাম্প ক'রে কিছুদিন বাইরে যাবার ব্যবস্থা করা যায় তাহ'লে ঐ সব কাজের মধ্য দিয়ে ঐ ধরনের গুণের বিকাশ হয়।

।। পাঁচ ।। **বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন (Organising Self-government in School) :**

নাগরিকতায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থা পরিচালনা করার সুযোগ পাবে এবং এর ফলে তাদের যে প্রশিক্ষণ হবে, তা ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগবে। স্বায়ত্ত শাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থার সম্বন্ধে সচেতন হবে। রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের আদর্শ মনোভাব গড়ে উঠবে।

।। ছয় ।। **আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা (Organising discussion on Current Problems) :**

বিদ্যালয়ে নাগরিকতার শিক্ষা হ'তে পারে যদি আমরা বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা-সভার আয়োজন করি। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি যদি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক

সমস্যা সম্পর্কে নিজের চিন্তাশীল মতামত প্রকাশ করতে না পারে তাহ'লে সে কখনই সুনাগরিক হ'তে পারবে না। বিদ্যালয়ে আলোচনা-সভার আয়োজন করলে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামতকে সহনশীলতার সঙ্গে গ্রহণ করতে শেখে। এই ভাবে বিভিন্ন ধরনের সুনাগরিকতার গুণ বিকাশ করা সম্ভব হয় আলোচনা-সভার মাধ্যমে।

॥ সাত ॥ **শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক (Bringing School and Community closer together) :**

বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে যতদূর সম্ভব নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এতে ক'রে বিদ্যালয় সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারবে এবং সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজস্ব কর্মসূচীর প্রয়োজন বোধে পুনর্বিন্যাস করবে। কারণ, বিদ্যালয় যদি সমাজের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করতে না পারে, তাহ'লে শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে। সুনাগরিকের প্রধান লক্ষণ হ'ল সমাজ-জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান। তাই শিক্ষার্থীকে সমাজ-জীবন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান দিতে হ'লে বিদ্যালয়কে সব সময় সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

॥ আট ॥ **নেতৃত্বের শিক্ষা (Training for Leadership) :**

গণতান্ত্রিক সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নেতৃত্বভাব জন্মগত নয়; এজন্য উপযুক্ত শিক্ষার দরকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকরা যদি সমাজে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত না হয়, তাহ'লে সমাজ-ব্যবস্থাই ভেঙে যাবে। তাই বিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীদের সমাজ পরিচালনার যোগ্য ক'রে গড়ে তোলা। আত্মবিশ্বাস, সাহসিকতা, আগ্রহ, কর্মে শ্রদ্ধা এবং অফুরন্ত জীবনী-শক্তিই নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য—বিদ্যালয়ের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে এই গুণ বিকাশ করা।

॥ **আলোচনা** ॥

নাগরিকতার জন্য শিক্ষা নিয়োজিত করতে হ'লে এই ধরনের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হবে। বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ কর্মসূচীকে পূর্বোক্ত বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে পুনর্গঠিত করতে হবে, গতানুগতিক ব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে। কিন্তু এই সব কিছুর সার্থকতার মূলে আছেন শিক্ষক, যিনি এই সব পরিকল্পনাগুলো

পরিচালনা করবেন। শিক্ষক নিজে যদি আদর্শ নাগরিক না হন, তাহ'লে কোন উন্নত শিক্ষা-পরিকল্পনার দ্বারাই শিক্ষার্থীকে যোগ্য নাগরিক ক'রে তোলা যাবে না। তিনি নিজে হবেন সমাজসেবক; তাঁর সেবামূলক কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হবে। আর তিনি নিজে যদি নিষ্ক্রিয় থাকেন তাহ'লে কোন ব্যবস্থার দ্বারাই শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক ক'রে তোলা যাবে না। শিক্ষক সেবামূলক মনোভাব নিয়ে, যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষা পরিচালনা করবেন এই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে; শিক্ষাব্যবস্থা সমাজের প্রকৃত সেবা করতে পারবে। তাই মুদালিয়ার কমিশনের রিপোর্টে এই সম্পর্কে আলোচনার প্রথমে মন্তব্য করা হয়েছে—" "Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained." এছাড়া নাগরিকতার শিক্ষার জন্য অন্যান্য শিক্ষা সংস্থাকেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সবাই যদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, শিক্ষালয়ের একার পক্ষে তার পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।

1. Write a short essay on Education for citizenship.

Ans: সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য। [N. B. U.; P. T. '61]

2. "Citizenship in a democracy is a very exacting and challenging responsibility for which every citizen has to be carefully trained."—State how the school can help in this training. [C. U.; B.T. 59]

Ans: সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

আবেগমূলক সংহতি ও জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষা

Education for Emotional and National Integration

মানুষ প্রায় সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই দলবদ্ধ ভাবে বাস করছে। দলবদ্ধ ভাবে বাস করার প্রবণতা তার অন্তর্নিহিত। কিন্তু সমাজ বিকাশের ইতিহাস বা মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় তার সবটাই পারস্পরিক হৃদ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই মানব সভ্যতার ইতিহাস এই পরস্পর বিরোধী প্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব বর্তমান, তেমনি একই সমাজের মধ্যেও বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্তমান। এই সমস্যা বর্তমানে বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রগুলোর ক্ষেত্রে, যেখানে বিভিন্ন জাতি, তাদের বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন কৃষ্টি নিয়ে বাস করে। সেখানে তাদের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতা স্থাপনের সমস্যা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর নিজেকে যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং সংবিধানের দ্বারা বিভিন্ন অংশের লোককে একত্রিত করা হ'য়েছে। কিন্তু মনের দিক থেকে কি তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে? তবে ভাষা নিয়ে আন্দোলন কেন? ধর্ম নিয়ে আন্দোলন কেন? রাজ্যের সীমানা নিয়ে আন্দোলন কেন? এবং এই সবের প্রভাব কেন ভয়াবহ ভাবে সমাজ-জীবনে দেখা দেয়?

সুতরাং, জাতির এই পারস্পরিক সম্পর্ককে পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখা দরকার। মুক্ত মন নিয়ে জাতীয় সংহতির সমস্যাকে বিশ্লেষণ ক'রে, তার মূল্যায়ন করতে হবে এবং তা যদি না করতে পারি, তাহ'লে জাতির ভিত্তি ভেঙে যাবে। শুধুমাত্র আইন ক'রে জাতীয় সংহতি আনা যায় না। মনের সংহতি বা জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে আবেগমূলক প্রতিক্রিয়ার সংহতি আনতে হবে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু বলেছিলেন—"Political integration has already taken place, but what I am after in so.nething much deeper than that an emotional

integration of the Indian people so that we may be welded into one strong national unit maintaining at the sametime all our wonderful diversity." (ভারতবর্ষের বা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি যখন সংকীর্ণ সমাজ চেতনাকে অতিক্রম ক'রে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সহানুভূতি গড়ে তুলতে পারবে, তখনই জাতীয় সংহতির সমস্যা সমাধান হবে এবং আবেগমূলক সংহতি প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ভৌগোলিক সীমা ও উপজাতীয় আনুগত্যকে অস্বীকার ক'রে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হওয়াকেই বলা হ'চ্ছে জাতীয় সংহতি।)

জাতীয় সংহতির সমস্যা বর্তমান কালে আরো গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে দু'দিক থেকে। বিশ্বসভ্যতার দ্বিমুখী অগ্রসরতা জাতীর সংহতির সমস্যাকে দ্রুত সমাধান করতে বাধ্য করছে। প্রথমতঃ, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ। এই বিরোধের জন্য দরকার জাতীয়তাবাদ। দেশের প্রত্যেক মানুষ যদি একত্রে মিলেমিশে বাস করতে না শেখে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহ'লে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই সভ্যতার এই দিক রাষ্ট্রের অন্তর্গত সব শক্তির মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে আরো ব্যাপক করার শক্তি দিচ্ছে। এও প্রায় অতীত যুগ। বর্তমান কালে প্রত্যেক চিন্তাবিদ্ ও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ মনে করেন, মানব সভ্যতার আরো অগ্রগতির জন্য চাই বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। তাই যে যুগে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, যে যুগে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে আন্তরাষ্ট্রিক সংহতি আনার প্রচেষ্টা চলেছে, সে যুগে জাতীয় সংহতিকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, সংহতি বা সমন্বয়ের প্রক্রিয়া তার স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমপর্যায়ে অগ্রসর হয়। প্রথম ক্ষুদ্রতম অংশগুলো জুড়ে অপেক্ষাকৃত বড় সংগঠন তৈরী হয়, তারপর ঐ অংশগুলো পরস্পরের মধ্যে সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর সংগঠন গড়ে তোলে। এমনি ভাবেই এগিয়ে যায় সংহতির প্রক্রিয়া (Process of integration)। তাই আজকে যখন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংহতির কথা বলা হ'চ্ছে, তখন রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাথমিক সংহতি স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

ভারতে জাতীয়-সংহতির কারণ (Factors of disintegration in India):

বর্তমান ভারতে অসংহতি নানা কারণে দেখা দিচ্ছে। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণের আমরা পরপৃষ্ঠায় উল্লেখ করছি—

[এক] ভারতবর্ষে বহু ধর্মের লোক বাস করে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। এই আনুগত্য প্রদর্শন করতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে এবং তার বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভয়াবহ ভাবে বিভিন্ন মারামারির মধ্যে। এই ধরনের মনোভাবের ফলেই একদিন ভারত বিভাগ করার প্রয়োজন হয়েছিল। ধর্মের প্রতি গোঁড়া মনোভাব এই ধরনের অসংহতির জন্য দায়ী।

[দুই] আবার, একই ধর্মীয় লোকের মধ্যেও আবার বিভাগ আছে। হিন্দু ধর্মে বর্ণ বিভেদের প্রথা আছে। এই প্রথা ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন নাগরিকদের মধ্যে বিভেদের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

[তিন] ভাষা আর এক ধরনের অসংহতিমূলক উপাদান। ভাষার মাধ্যমেই মানুষ সাংকেতিক ভাবে (symbolically) তার মনের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু ভারতে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক আছে এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের লোকের ভাষা বোঝে না। ফলে ভাবের আদান-প্রদান ঠিক ভাবে হয় না এবং এই কারণে তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয় না। যদিও হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যা অনেক বেড়েই গেছে।

[চার] অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (Economic insecurity) অভাব এবং জাতীয় আয়ের বিষম বণ্টন, বেকার সমস্যা. এই সমস্ত কিছু আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মানসিক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে, যার ফলে তারা জীবন পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থক ভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। ফলে অসংহতি দেখা দিচ্ছে।

[পাঁচ] যথাযথ নেতৃত্বের অভাবে আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতি-বেশীর পরস্পরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে না। এই ধরনের সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য আন্তরাজ্য বিরোধ দেখা দিচ্ছে এবং সেই বিরোধে সাধারণ লোকেরা হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হ'চ্ছে। এই ধরনের উগ্র প্রাদেশিকতা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

[ছয়] জাতীয় নৈতিক মানের অবনতি জাতীয় সংহতির অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। পারস্পারিক অবিশ্বাসের মনোভাব, পরস্পরকে ঠকানোর মনোভাব, অসদুপায়ে অর্থ অর্জনের চেষ্টা—এ সমস্ত কিছু এই নৈতিক মানের

অবনতির ফল এবং এর ফলে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক অসন্তোষের মনোভাব সব সময় থেকে যাচ্ছে।

[সাত] সবশেষে, শিক্ষার অভাব বা নিরক্ষরতা এই জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আবার যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তার দ্বারা যথার্থ নাগরিকত্বের শিক্ষা হ'চ্ছে না, ফলে সুস্থ নাগরিক জীবনের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকার দরকার তা' শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না।

জাতীয় জীবনের এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে না পারলে, জাতীয় সংহতির সমস্যা চিরদিনই থেকে যাবে। তাই জাতীয় সংহতির সমস্যাকে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে সমাধান করতে হ'লে এই সমস্যাগুলোর সার্থক সমাধানের মাধ্যমেই এগোতে হবে। সার্বভৌম শাসনক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন করলে, এবং বিভিন্ন জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে কতকগুলো আইন গঠন করলেই চলবে না। গতানুগতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন করতে হবে মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে।

জাতীয় সংহতি ও শিক্ষা (National Integration and Education):

শিক্ষাই একমাত্র উন্নত ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলো স্থায়ী পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। জাতীয় সংহতির পথে যে সব বাধা আছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার প্রত্যেকটার মূলে আছে শিক্ষার অভাব জনিত অজ্ঞতা। ধর্মীয় বিরোধের মূলে আছে ধর্মের মূল সূত্র সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা। বর্ণাশ্রয়ী সমাজ ব্যবস্থায় আস্থার মূলেও আছে উদারনৈতিক শিক্ষার অভাব। উগ্র প্রাদেশিকতার মূলেও আছে অশিক্ষা বা কু-শিক্ষার প্রভাব। ব্যক্তির নৈতিক মানের অবনতির মূল কারণ হ'ল প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে না পারা। সুতরাং, প্রায় প্রত্যেকটি কারণ একই দিকে নির্দেশিত অর্থাৎ শিক্ষার অভাবের জন্যই এই ধরনের বৈশিষ্ট্য জাতির জীবনে দেখা দিয়েছে। সুতরাং জাতীয় সংহতির সমস্যার সঙ্গে শিক্ষার সমস্যা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষার দ্বারা যদি ব্যক্তির মধ্যে কতকগুলো স্থায়ী পরিবর্তন না আনা যায়, শিক্ষার দ্বারা যদি ব্যক্তির নৈতিক মানের উন্নতি না করা যায় তাহ'লে জাতীয় সংহতির সমস্যা কোনদিনই স্থায়ীভাবে সমাধান করা যাবে না।

আবার অন্য একদিকে বিচার করলেও শিক্ষার উপর জাতীয় সংহতির দায়িত্ব এসে পড়ে। শিক্ষা হ'ল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। তার দ্বারা সমাজের প্রয়োজনও সাধিত হবে। এখন বর্তমান সমাজের (ভারতীয়) সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যদি হয় জাতীয় সংহতি স্থাপন করা, তাহ'লে শিক্ষাকে স্বাভাবিক ভাবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ভারতের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে. এল. শ্রীমালী (Srimali) বলেছেন—"If we are convinced that in the present state of our development, we must make a deliberate effort to develop national consciousness among our people, it is a legitimate demand that our educational system should be geared to fulfil this purpose. ..Education must make the growing youth realize that they are indisolubly bound to the nation and its destiny, if tragedies and joys, its conflicts and settlements, its failures and achievements; if mistakes and wisdom and they should come to regard it with pride and with love and the impelling desire to serve it hole heartedly."

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় সংহতির সমস্যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এই গুরুত্বের কথা ভারতের প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তাবিদ্ উপলব্ধি করেছেন। ১৯৫৮ সালে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা-চক্রে ভারতের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌রা যোগ দেন। সেখানে তাঁরা প্রত্যেকে জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করেন। যদিও তাঁদের আলোচনা বিশেষ ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তবুও তা সকল রকম শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পরে এই আলোচনা-চক্রের ফলাফলকে কার্যকরী করার জন্য এক কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং তাঁরা জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে কিভাবে পরিচালনা করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করেন। তাদের এই সুপারিশগুলো উল্লেখ করলে জাতীয় সংহতির জন্য শিক্ষাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তার পথ নির্ধারণ করা যাবে।

শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ও জাতীয় সংহতি স্থাপন (Reorganisation of Education for National Integration):

জাতীয় সংহতি স্থাপন করতে হ'লে সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

করার দরকার, এবং সম্পূর্ণ শিক্ষাকে ঐ উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আয়োজিত আলোচনা-চক্রে যে পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হয়েছে, তাই সংক্ষেপে আমরা পরপর উল্লেখ করছি—

[এক] জাতীয় সংহতি স্থাপনের জন্য দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে হবে এবং এই ধরনের বৈষম্য দূর করে প্রত্যেককে যথাযোগ্য বিকাশের সমান সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ দিতে হ'লে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে, যাতে ক'রে প্রত্যেক ব্যক্তি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে জীবন-উপযোগী প্রশিক্ষণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

[দুই] ভারতের মানুষের মধ্যে ঐক্যের উপাদানকে বড় ক'রে তুলে ধরার জন্য ইতিহাসের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

[তিন] ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে সুপরিকল্পিত ভাবে বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই শিক্ষালয়ে যাতে বিভিন্ন ভাষার ভাল বইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হ'তে পারে তার জন্য অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন রাজ্যে অন্য রাজ্যের ভাষা যাতে পড়ানো হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে ক'রে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ হবে এবং অজ্ঞতার দরুন অনেক সময় যে ভুল বোঝাবুঝি হয় তা অনেকটা দূর করা সম্ভব হবে।

[চার] বিভিন্ন রাজ্যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময় বিশেষ যত্ন নিতে হবে। যে সব বইয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংহতিকে স্থাপন করা যায় সেই জাতীয় বই নির্বাচন করতে হবে। যদি কোন বিশেষ বই কোন বিশেষ অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে, তাহ'লে সে-সব বই সব সময় ত্যাগ করতে হবে। প্রয়োজন হ'লে তাদের উপর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিষেধ আজ্ঞা জারি করতে হবে।

[পাঁচ] বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণকে সহজ করতে হবে, এতে ক'রে ভিন্ন ভাষীদের পক্ষে যে কোন ভাষা শেখা সহজ হবে।

[ছয়] জাতীয় সংহতি স্থাপনের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে এবং ছাত্রছাত্রী তা যাতে সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

[সাত] শিক্ষালয়ের মাধ্যমে জনশিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে

ক'রে অশিক্ষিত বয়স্কদের সঙ্গে শিক্ষিত ব্যক্তিদের কোন বিভেদের মনোভাব না সৃষ্টি হয়। শিক্ষালয় থেকে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা যদি সপ্তাহে একদিন ক'রে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়ে জনসংযোগ করেন এবং সাধারণ বিষয়ের উপর বক্তৃতার আয়োজন করেন, তাতে ক'রে, সাধারণ লোকের অজ্ঞতাও কমবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপিত হবে।

[আট] বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস পালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে ক'রে তাদের জাতির প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব জাগ্রত হবে।

[নয়] সিনেমা, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জাতীয়তামূলক অনুষ্ঠান পরিবেশ করতে হবে যাতে ক'রে জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে।

[দশ] বিদ্যালয়ের আচরণই পরে সমাজ-জীবনে সঞ্চারিত হবে, সুতরাং বিদ্যালয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলতে হবে এবং ধর্মভেদের নীতিকেও বিদ্যালয়ের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এতে ক'রে অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের ঘৃণার মনোভাব জাগ্রত হবে না।

[এগারো] সবশেষে, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে জাতীয় সংহতি স্থাপনের নেতৃত্ব নিতে হবে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যাতে সমস্ত রকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারে, সেই মনোভাবের অধিকারী ক'রে তাদের গড়ে তুলতে হবে।

॥ **আলোচনা** ॥

দলগত আনুগত্য এবং জাতীয় সংহতি ও আবেগমূলক সংহতি ভারতবর্ষের একার সমস্যা নয়। পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্রেই দলগত বা উপজাতিগত শ্রেণী বিভাগ বর্তমান। আর দলগত বিভাগ—এর কোন শেষ সীমা নেই। এর ক্ষুদ্রতম একক যে কি তা সঠিক ক'রে বলা মুশকিল। কারণ দলকে আবার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে ভেঙে ফেলা যায়। তবে বড় বড় দেশের পক্ষে এই সমস্যা প্রবল—যেমন, সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ইতিহাস আমরা আলোচনা করলে দেখতে পাই চিরদিন ধরে ভারতবর্ষ তার বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য দেখিয়েছে। অধ্যাপক হুমায়ুন কবির বলেছেন—Inspite of these marked divergences, there is equally little doubt that for at least 2000 years or more, there has been a general feeling of Indian-ness which has transcended all these

distinction and made the many Indian communities one Indian people" ভারতবর্ষে সমস্ত লোক কোনদিন, একই ভাষায় কথা বলেনি, কোনদিন একই ধর্ম অনুসরণ করেনি, কোনদিন ভারতের সমগ্র অংশের উপর একজন রাজা রাজত্ব করেননি ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যুগ যুগ ধরে তাদের মধ্যে মানসিক প্রক্রিয়ার সমস্যা দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথও ভারত সাংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষে চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃশংসয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা"।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, বর্তমানে, ভারতবাসীর মধ্যে পারস্পারিক ঈর্ষা যে নেই সেকথা বললে সত্যের অবমাননা করা হবে। তাই জাতীয় সংহতির সমস্যাকে স্থায়ীভাবে সমাধান করতে হ'লে মানসিক বা বৌদ্ধিক-পর্যায়ে তার সমাধান করতে হবে। শুধুমাত্র আবেগমূলক সংহতির মাধ্যমে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। যুক্তি দিয়ে যদি এই সমস্যার সমাধান করতে না পারি, তাহ'লে চিরদিনই এই সমস্যা থেকে যাবে। তাই এই ধরনের বৌদ্ধিক পর্যায়ে জাতীয় সংহতি আনতে হলে, শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং শিক্ষাকে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নতুনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the role of Education in National Integration. What steps do you suggest for the organisation of education to this end.

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. Write a brief essay on Education for India's National Integration.
[N.B.U. ; B.T. 66,'68]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষা

Education for International Understanding

মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আত্মরক্ষা, খাদ্য সংগ্রহ, বসবাসের সংকুলান, অন্যান্য জৈবিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়েই সে একদিন গোষ্ঠী জীবনের সূত্রপাত করেছিল। তার এই চাহিদা থেকে সৃষ্টি হ'ল পরিবারের (Family), পরিবার থেকে গোষ্ঠী (Group), গোষ্ঠী থেকে সমাজ (Society), সমাজ থেকে রাষ্ট্র—এই ভাবে সে এগিয়ে এলো গোষ্ঠী জীবনের ক্রমসংহতির ধারায়। প্রত্যেক পর্যায়েই সে তার যূথজীবনের আনুগত্য স্বীকার করে নিল। দলকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক পর্যায়ে নিজেদের ঐক্যকে প্রমাণিত করলো আত্মত্যাগের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত এই তার ঐক্যের ইতিহাস, এই হ'ল তার সমাজ জীবনের ইতিহাস। তার পরে এলো ভয়াবহ বিশ্ব মহাযুদ্ধ। উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই জন্ম নিল পরপর দুই মহাযুদ্ধ। একদিকে উগ্র জাতীয়তাবাদ, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক সমাজ আদর্শ। যুদ্ধে কার জয় হ'ল, কার পরাজয় হ'ল, সেটা বড় কথা নয়। এর ফলেই জন্ম নিল বিশ্বশান্তি, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ, আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্বনাগরিকতা প্রভৃতির চাহিদা। প্রত্যেক সুস্থ মানুষ চাইল শান্তি, মৈত্রী এবং আন্তর্জাতিক সুস্থ সম্পর্ক।

এমনি ভাবে জন্ম নিল বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকতা (internationalism) মানব সভ্যতার ক্রম পরিণতি হিসেবে। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে শিখলো যুদ্ধ এবং কলহের দ্বারা আন্তর-জাতীয় (inter-national) বিরোধকে দূর করা যাবে না। এই সমস্যার সমাধান হবে একমাত্র বোঝাপড়ার মাধ্যমে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার ভাব নিয়ে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই এদের সমাধান করা যায়। একেই আমরা বলছি আন্তর্জাতিকতার বোধ (International understanding)। পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সমাজকে উপলব্ধি করা এবং বিশ্ব মানব সমাজে নিজের সমাজের দান সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে, বিশ্ব শান্তি ও মৈত্রীর

জন্য চেষ্টা করাই হ'ল আন্তর্জাতিকতা বোধের (International understanding) মূল কথা। UNESCO-এর প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ ডঃ লিউইস্ (Lewis. H. C.) আন্তর্জাতিকতা বোধের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার উল্লেখ করছি। তিনি বলেছেন "International understanding is the ability to observe critically and objectively and appraise the conduct of men everywhere to each other, irrespective of the nationality or culture to which they belong" এবং এই বোধ জাগ্রত করতে হ'লে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কারের প্রভাব মুক্ত হ'য়ে, সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে, অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈর্ব্যক্তিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আধুনিক কালে এই মনোভাবের সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে, বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক কুশলতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানুষকে যত কাছাকাছি এনেছে, অন্য কোন দিন তা সম্ভব হয়নি। তাই পৃথিবীর এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের চিন্তা অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের খুব সহজে প্রভাবিত করছে। সংবাদপত্র, বেতার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মানুষকে তার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে অনেক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করেছে। বিভিন্ন যান্ত্রিক যানবাহন তাদের গতির সীমিত ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে এই অবস্থায় মানুষ যদি সবকিছুকে বিচার বিবেচনার দ্বারা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে দেখতে না শেখে, তা'হলে আবার বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবে। তাই বিংশ শতাব্দী যেমন আন্তর্জাতিকতার জন্ম দিয়েছে, তেমনই তার সমস্যাকে সে জটিল ক'রে তুলেছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হ'তে পারে তত্ত্ব এবং কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে। আর এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা।

॥ শিক্ষা ও আন্তর্জাতিকতা ॥
Education and International Understanding

আন্তর্জাতিকতার বোধ বিকাশে শিক্ষার গুরুত্বের কথা বর্তমান কালে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীকার করেন। আন্তর্জাতিকতা বোধ অন্তরের জিনিস, মানুষ মনে প্রাণে যদি এই আদর্শকে বিশ্বাস না করে তবে তার কর্মের মধ্যে তা প্রকাশ পাবে না। তাই মানুষের মধ্যে এই মানবীয় বোধের আদর্শ জাগাতে

হ'লে, শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যদি আমরা এই বোধ জাগ্রত করতে পারি যে, তারা একই বিশ্ব রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহ'লে আন্ত-র্জাতিকতার বোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত হবেনা। এই নাগরিকতার বোধ শিক্ষার মাধ্যমেই জাগানো যায়। তাই প্রত্যেক শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাবিদ্ শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। UNESCO থেকেই নানা ধরনের শিক্ষা-পরিকল্পনা করা হচ্ছে শিক্ষাকে আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে সংগঠন করার জন্য। শিক্ষার মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক সচেতনতা জাগানো যায়। আর এই সচেতনতার মাধ্যমে সমবেদনামূলক মনোভাব গড়ে উঠবে বিশ্বের সকল নাগরিকদের জন্য।

অন্যদিক থেকে বিচার করতে গেলেও দেখা যায় এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার উপর এসে পড়ে। শিক্ষা হ'ল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া। সুতরাং, সেদিক থেকে তার দায়িত্ব হ'ল পরিবর্তনশীল সমাজ পরিবেশে ব্যক্তিকে অভিযোজনের ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করা। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যখন বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের অনুকূলে, তখন শিক্ষাকে তার কার্যকরী করার দায়িত্ব নিতে হবে। তাই UNESCO এর-এই সম্পর্কিত এক পুস্তিকায় বলা হয়েছে—"…Education like any other institution of society, has a social purpose to fulfil, and must therefore, serve always the changing and increasely complex needs of the modern world." রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা এই মতবাদের উল্লেখ পাই। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করাকে তিনি শিক্ষার মহান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূলনীতি (Principles of Education for International Understanding):

শিক্ষাকে আন্তর্জাতিকতাবোধ বিকাশের জন্য কাজে লাগাতে হ'লে কতকগুলি মূলনীতি অনুসরণ করার দরকার। সেইসব মূলনীতিগুলোর উল্লেখ করছি—

[এক] **নিরপেক্ষ চিন্তনের বিকাশ (Development of in-dependent thinking):**

সংকীর্ণতা মুক্ত হ'য়ে চিন্তা করতে শিখলে আমাদের দেশের যুবক সম্প্রদায় বুঝতে শিখবে বিশ্বশান্তিই একমাত্র উন্নতির পথ, দ্বন্দ্ব ও কলহের

[আট] **জীবনের মূল্যবোধ স্থাপন (Emphasis on the values of Life) :**

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আদর্শ মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারলে সুস্থ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্থাপন হবে। যে-কোন সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ বাস করুক না কেন, জীবনের উচ্চ আদর্শ প্রায় সর্বত্র সমান। সেই আদর্শগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় হোক কি যে-কোন ধরনের রাজনৈতিক তন্ত্রের মধ্যেই হোক, মানুষ মানুষই। তার নিজস্ব জীবনের যে আদর্শগুলো আছে, যে মানবীয় সুপ্ত সত্তা তাঁর মধ্যে আছে তা সর্বক্ষেত্রেই সমান। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সেই সব সুপ্ত মানবীয় উপাদানগুলোকে জাগ্রত করা।

এই মূলনীতিগুলোর উপর ভিত্তি ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালনা করলে শিক্ষার দ্বারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম হবে। এই সম্পর্কে UNESCO-ও এক মত। UNESCO থেকে এই বিষয়ে যে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে, তাতেও এই সব নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এই সংস্থাও আটটি মূল নীতির উপর গুরুত্ব দিতে বলেছেন—(১) রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্দেশ্য সাধনের উপর গুরুত্ব, (২) রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, (৩) রাষ্ট্রের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, (৪) মানুষের কৃষ্টিগত পার্থক্যের কারণ, (৫) মানব সভ্যতার অগ্রগতির মূলে আছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দান, (৬) রাষ্ট্রসংঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনের ইচ্ছার দ্বারা পুষ্ট, (৭) বিশ্বশান্তি স্থাপনের দায়িত্ববোধ এবং (৮) সুস্থ সমাজ-জীবনের বিকাশ সাধন। এই সব উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করলে, তা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বোধ জাগাতে সাহায্য করবে।

বিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিকতার শিক্ষা (School and the Education for international understanding) :

এখন সবচেয়ে প্রশ্ন হ'ল মূল নীতিগুলো শুধু মাত্র ঠিক করলে চলবে না। তাদের কার্যকরীও করতে হবে এবং একে কার্যকরী করার দায়িত্ব স্বভাবিক ভাবে বিদ্যালয়ের উপর এসে পড়ে। বিদ্যালয় তার কার্যসূচী এমন ভাবে পরিচালনা করবে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই সমস্ত গুণের বিকাশ হয় এবং তার দ্বারা আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত হয়। বিদ্যালয়ের দুদিক থেকে কার্য পরিচালনা করার এই কর্মসূচীকে সফল করার জন্য একদিকে আন্তর্জাতিকতার বিরুদ্ধে

যে সব মানসিক গুণ সেগুলোকে দূর করার চেষ্টা করবে এবং অন্যদিকে যে সব গুণ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বভাব জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে সেগুলোর বিকাশ করবে চর্চার মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের গতানুগতিক দায়িত্বের পুনর্বিন্যাস ক'রে তার কর্মসূচীর মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। বিদ্যালয়ে কি কি ধরনের কাজ করলে ভাল হয় সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা ক'রে এই সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবো।

[এক] **পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের পুনর্বিন্যাস (Reorganisation of Curriculum and Text-book):**

বিদ্যালয়ের কাজ হ'ল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক ও প্রক্ষোভময় জীবনের বিকাশ সাধন করা এবং তা করতে গিয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্বশান্তির অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে বিশ্ব মনুষ্য সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। ডঃ সি. ডি. দেশমুখ, (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি,) এ সম্পর্কে বলেছেন" It is in their minds that must take real ideas, leading to the realization of the common heritage of man, an understanding and appreciation of differences among peoples, a recognition of the basic human dignity which must be respected and safe gurded, an awareness of the interdependence of nations and the consequent need for international co-operation," সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিষয়ের শিক্ষা এমন হবে, যাতে ক'রে শিক্ষার্থীর, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকের সম্পর্কে অজ্ঞানতা না থাকে, বা তাদের সম্পর্কে সে নিষ্ক্রিয় মনোভাব না পোষণ করে। ভূগোল ঠিকমত পড়ালে, ছাত্ররা অন্যান্য দেশের লোক সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তারা জানবে আমরা যে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করি তা বহু দেশের সমবেত চেষ্টায় তৈরী হয়। এক দেশের লোক তুলা উৎপাদন করে, এক দেশের লোক যন্ত্রপাতি তৈরী করে, অন্য দেশের কলে কাপড় বোনা হয়, সেই কাপড় ব্যবহার করি. শিক্ষার্থীরা যদি এই ধরনের পারস্পরিক নির্ভরতার কথা জানতে পারে, তাহ'লে স্বাভাবিক ভাবে, তাদের মধ্যে ঐ সব দেশের লোকের প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠবে। ইতিহাসে শুধুমাত্র যুদ্ধের বিবরণ না দিয়ে যদি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব

দেওয়া হয়, তাহ'লে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত হবে। সাহিত্যও যদি ঠিকমত পড়ানো হয়, শিক্ষার্থীরা মানব সমাজের চিন্তামূলক দিকের ধারণা পাবে। এমনি ভাবে পৌরনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের ঠিকমত পুনর্বিন্যাস ক'রে শিক্ষার্থীদের সামনে যদি উপস্থাপন করা যায়, তাহ'লে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত হবে। এই ভাবে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করতে হবে এবং আন্তর্জাতিকতার অনুকূল গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্য পুস্তকে আলোচনা করতে হবে।

[দুই] **বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী (Different activities in School) ঃ**

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমেও আন্তর্জাতিকতার বোধ বিকাশ করা যায়। এইসব কাজের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষ্টিমূলক কাজই প্রধান। যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন মনীষীর জন্ম দিবস পালন করা। এর মাধ্যমে প্রত্যেক দেশের কৃষ্টিমূলক ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্ররা পরিচিত হবে এবং বিভিন্ন দেশের সভ্যতার প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস পালন, যেমন রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস (U. N. Day), মানব-অধিকার দিবস (Human Rights Day), বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস (World Health Day) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের যে বিভিন্ন চেষ্টা চলছে তার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারবে। এছাড়া বিদ্যালয় UNESCO-এর বিভিন্ন কাজের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে, কারণ তার প্রত্যেকটির এই উদ্দেশ্য নিয়ে পরিচালনা করা হয়।

[তিন] **শিক্ষকের নিজস্ব দায়িত্ব (Teacher's responsibility) ঃ**

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বও নানা ভাবে আন্তর্জাতিকতা বোধের শিক্ষায় সহায়তা করে। প্রথমতঃ, শিক্ষকের নিজের যদি এই আদর্শের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহ'লে তিনি ছাত্রদের মধ্যে কখনও ঐ মনোভাব জাগাতে পারবেন না। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মানসিক গঠন এবং প্রবণতা এমন হবে যাতে ক'রে তিনি সুষ্ঠুভাবে এই আদর্শের পথে পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারেন। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ছাত্রদের অনুপ্রেরণা জোগাতে পারেন। এক কথায় শিক্ষককে বিশ্ব মনোভাবাপন্ন হ'তে হবে তবেই তিনি আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত করতে পারবেন। একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বলেছেন—'A world-minded teacher is an integrated individual, skilled in the art of science of

human relations and conscious of the variety of behaviour patterns in the world to which he may have to adjust." শিক্ষাবিদ্ ক্যাসেল (Castle E. B.) আন্তর্জাতিকতা বোধ জাগ্রত করার জন্য শিক্ষকের কি কি গুণ থাকা উচিত সে সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি যে সব গুণের কথা বলেছেন তাহ'ল—

(১) আত্মসুখের চেয়ে, সাধারণের সুখকে বড় ক'রে দেখার ক্ষমতা ; (২) আদর্শ উদ্দেশ্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আদর্শ পন্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা ; (৩) সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা ; (৪) স্বচ্ছ চিন্তার ক্ষমতা ; (৫) বিশ্লেষণমূলক বিচারণ করণের ক্ষমতা ; (৬) অন্যের সৎচিন্তাকে গ্রহণ করার ক্ষমতা এবং অসৎ চিন্তাকে ত্যাগ করার ক্ষমতা ; (৭) সমাজ-জীবনকে সুস্থ বিকাশ করার দায়িত্ব বোধ, (৮) প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ; (৯) এবং সবশেষে সুস্থ কল্পনা করার ক্ষমতা। এদের সমন্বয়ে যে ব্যক্তিত্ব গঠন হবে, তাই হবে শিক্ষকের গুণাবলী, যার দ্বারা তিনি তার ছাত্রদের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার বোধ জাগ্রত করতে পারবেন।

[চার] **শিক্ষক ও ছাত্র বিনিময়ের পরিকল্পনা (Programme of Pupil and Teacher Exchange) :**

বিদ্যালয় থেকে শিক্ষক এবং ছাত্রদের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা উচিত। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ে ভাবের আদান প্রদান করতে পারবে অন্যদেশের নাগরিকদের সঙ্গে। এই ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য UNESCO থেকে এক পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের কাজ হবে এই পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করা এবং সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করা। এই পরিকল্পনা আধুনিক কালে খুব জনপ্রিয় হ'য়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও অনেক শিক্ষক এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছেন এবং অনেক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করছে।

॥ **আলোচনা** ॥

'শিক্ষা' সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ সংযোগধর্মী শক্তি (integration factor)। বর্তমান যুগে যখন মানুষ পরস্পরের উপর ঈর্ষাপরায়ণ, একজন আর একজনকে অবিশ্বাস করেনা, তখন সমাজ-ব্যবস্থাকে সুস্থ ভাবে গড়ে তুলতে একমাত্র শিক্ষাই পারে। মানব সভ্যতার বিবর্তনের ধারা অনুশীলন করলে আমরা দেখতে পাই, তা কখনও থেমে নেই, এক মানুষ যেদিন পরিবার সৃষ্টি

করেছে, তার পর থেকেই বির্বতনের ধারায় সেই গোষ্ঠীজীবন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। তাই বিংশ শতাব্দীর এই আন্তর্জাতিকতার জাগরণ, স্বাভাবিক নিয়মেই এসেছে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে। এটাই সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তন, পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে বিশ্বরাষ্ট্রের দিকে। এই সামাজিক বির্বতনের সঙ্গে যদি শিক্ষা সমান তালে চলতে না পারে, সমাজের পক্ষে তা অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়বে। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, সে শিক্ষার পুনর্বিন্যাস ক'রে আন্তর্জাতিকতা বোধের জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাতে হবে। এটাই হ'ল আন্তর্জাতিকতার জন্য শিক্ষার মূল তাৎপর্য। কারণ শিক্ষাই মানুষের মধ্যে এই প্রেরণা আনতে পারে—' সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on Education for International Understading

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য। (C. U. ; B. T. 59)

———

অবসর যাপনের শিক্ষা
Education for Leisure

প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী অবসরকে শিক্ষার বিপরীত-ধর্মী বলে মনে করা হ'ত। অবসরকে বলা হ'ত কর্মহীন নিষ্ক্রিয় মানসিক অবস্থা। আর শিক্ষা হ'ল মানসিক সক্রিয়তা। তাই অত্যধিক অবসরকে শিক্ষার পক্ষে অনুকূল মনে করা হ'ত না। অলস জীবনযাপনকে প্রাচীন শিক্ষকরা বিশেষ ভাল চক্ষে দেখতেন না। কিন্তু বর্তমানে এই ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। অবসর কথার তাৎপর্যের পরিবর্তন হয়েছে। অবসর মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়। মনোবিদরা বলেছেন, মন কোন সময়েই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। ক্রিয়াহীন মনের কোন অস্তিত্ব নেই। আর মন যদি সক্রিয় থাকে, সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করবেই। অপরদিকে আধুনিক সংব্যাখ্যানে শিক্ষা সীমিত কোন পর্যায়ের প্রচেষ্টার ফল নয়। মানুষের জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন চলছে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারই সমবায় হ'ল শিক্ষা। সুতরাং এদিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায়, অবসর এবং শিক্ষা বিপরীতধর্মী নয়, বরং পরস্পর পরিপূরক। অবসর সময়েও মন সক্রিয় থাকে ব'লে শিক্ষাও হ'য়ে থাকে। তাছাড়া দৈহিক কর্মের অভাবকে যদি অবসর মনে করা হয় তাহ'লে তা শিক্ষার প্রতিকূলে যায় না। দৈহিক অবসাদ দূর করার জন্য অবসরের প্রয়োজন যে আছে একথা আধুনিক সমস্ত রকম দেহতত্ত্বের নীতিতে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু দৈহিক অবসাদ (Physical Fatigue) দূর করার জন্য কেবলমাত্র দেহযন্ত্রের বিশ্রাম দরকার। সেক্ষেত্রে দেহযন্ত্রকে অবসর দিয়ে মনকে যদি সক্রিয় ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে ব্যক্তির কাছে তা বোঝা স্বরূপ মনে হয় না। আর তার মধ্যে নতুনত্ব আসে বলে, অবসাদও তাড়াতাড়ি দূর হয়। এদিক থেকেও শিক্ষা—অবসাদের বিপরীত নয়। শিক্ষা যেমন অবসর জীবনকে প্রভাবিত করে, তেমনি অবসরও শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। এই কারণে আধুনিক কালে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবসর যাপনের শিক্ষা (Education for leisure) কথাটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

অবসর যাপনের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of education for Leisure):

আধুনিক সমাজ-জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অবসর যাপনের শিক্ষাকে একান্ত প্রয়োজনীয় ক'রে তুলেছে। অবসর যাপনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতীতে এত অনুভূত হয়নি যা বর্তমান কালে যতটা অনুভব করা যাচ্ছে। তার কারণ হ'ল বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বিভিন্ন কর্মকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন—

[এক] **কারিগরি কুশলতা বিকাশ (Technological Development):** প্রাচীন কালে মানুষের অবসর ছিল কম, কারণ, তাকে সারাদিন পরিশ্রম ক'রে জীবন ধারণের সামগ্রী সঞ্চয় করতে হ'ত। সব সময় আত্মরক্ষার পন্থা চিন্তা করতে হ'তো। তাই তার জীবন ছিল কর্মময়। যখন সমাজে বিশেষজ্ঞের জন্ম নিল, অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগলো এবং বিনিময় প্রথার প্রচলন হ'ল তখন দেখা গেল, সে জীবনের অন্যান্য সামগ্রীর বিনিময়ে লাভ করার জন্য দিনরাত্রি কাজ করে চললো। অবসরের কোন সুযোগই সে পেল না। কিন্তু যন্ত্রশিল্প বা কারিগরি কুশলতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র মানুষের হ'য়ে উৎপাদন করতে লাগলো। পূর্বে যে জিনিস তৈরী করতে কোন ব্যক্তিকে তার ছোট খাটো হাতিয়ার দিয়ে একদিন সময় লাগতো, আজ তার চেয়ে অল্প সময়ে সে ঐরকম একশ জিনিস তৈরী করতে পারছে। ফলে যন্ত্র তাকে জীবনযাপনের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম থেকে বাঁচিয়েছে এবং তার জীবনে অবসরের সুযোগ ক'রে দিয়েছে। আর এই অবসর সে কোন গঠনমূলক কাজে নিয়োগ করতে পারে না বলে, তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। অলস অর্থহীন আলোচনা ও কাজকর্মের মাধ্যমে সময় কাটাতে বাধ্য হয়; তাছাড়া অনেক সময় অসামাজিক কাজেও লিপ্ত হয়। এই কারণে বর্তমান যুগে অবসর যাপনের জন্য প্রকৃত কোন শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

[দুই] **অবসরের ক্ষতিকর প্রভাব (Baneful effect of Leisure):** আধুনিক সমাজের অগ্রগতির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুগামিতা (cultural lag)। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি যে হারে হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি বা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশল (Means of social control) তত তাড়াতাড়ি গড়ে তুলতে পারছি না এবং এটা স্বাভাবিক,

নিয়ম। অর্থাৎ, সব সময়, নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বা সংস্কৃতির দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে থাকছি। ফলে সব সময় আমরা সমাজের ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে পারছি না। একেই বলা হচ্ছে সাংস্কৃতিক অনুগামিতা (cultural lag)। যেমন ধরা যাক, দাঁত পরিষ্কার করার জন্য ব্রাস ও পেস্টের আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু যেদিনই ব্রাস, পেস্ট আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই দিনই আমরা সবাই দাঁতন ছেড়ে দিয়ে তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিইনি। ধীরে ধীরে এটাকে আমরা সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত করেছি। যে কোন প্রকারের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও সম্পূর্ণরূপে সমাজ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। এর মাঝের যে সময়টা তাকেই বলা হয় সাংস্কৃতিক অনুগমন (caltural lag), এবং এই সময়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কৌশলের অভাবে আমরা ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। ঠিক এমনি অবস্থা হয়েছে অবসরের ক্ষেত্রেও। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতির ফলে, মানুষের জীবনে অবসর এসেছে, কিন্তু আমাদের হাতে কোন নিয়ন্ত্রণ কৌশল নেই যা দিয়ে আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। ফলে শিল্পাঞ্চলে দেখা যায় ব্যক্তিরা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে, এবং জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ ক্রমশই কমে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে শিক্ষাই একমাত্র সামাজিক কৌশল যা ব্যক্তির এই আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; তাই বর্তমানে অবসর যাপনের শিক্ষার উপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

[তিন] **শিক্ষার সংগঠন (The structure of Education):** আধুনিক শিক্ষার সংগঠন অবসরকালীন শিক্ষার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। বর্তমানে শিক্ষা বিশেষ ভাবে সমাজের প্রয়োজন ও ব্যক্তির প্রয়োজনকে বড় করে দেখেছে। তাই খুব অল্প বয়স থেকেই শিক্ষার্থীদের বিশেষ জ্ঞানের (specialized knowledge) উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে সেইভাবে সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজানো হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানমূলক শিক্ষা (General education) ব্যক্তির নৈতিক ও সামাজিক বিকাশ সাধন করবে। তা প্রায় ১৪ বৎসর বয়সেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, তারপর শুরু হচ্ছে পারদর্শিতার শিক্ষা। এই বিশেষ পরিদর্শিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে এত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের বিকাশ হয় যে, এই স্তর থেকে সাধারণ জ্ঞানমূলক শিক্ষা প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায়। ফলে, শিক্ষার্থীর নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর এই শিক্ষার অপূর্ণতা স্বাভাবিক ভাবে

সমাজ-জীবনের উপর কুফল বিস্তার করবে। অন্যদিকে যান্ত্রিক সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবসর ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর এমন অনেক দেশ আছে যেখানে কর্মীদের দুদিন ছুটি দেওয়া হয়, আমাদের দেশেও এরকম অনেক সংস্থা আছে। তাই এই অবসরকে বৃথা নষ্ট না হ'তে দিয়ে, এই সময়ে শিক্ষার্থীর অপূর্ণ শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করার সুযোগ দিতে হয়। তার কর্মময় জীবনে অবসরটুকুই খালি। ঐ অবসরটুকুতে সে যদি তার নৈতিক ও সামাজিক জ্ঞানমূলক বিষয় ও কৌশলের চর্চা করে তবেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ হবে। এতে ক'রে একদিকে যেমন ব্যক্তির উন্নতি হবে, সে সুস্থ সমাজ-জীবন যাপন করতে শিখবে, অন্যদিকে, শিক্ষার কাজও সম্পূর্ণ হবে। এই কারণে অবসর যাপনের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

[চার] **শিক্ষার আধুনিক তাৎপর্য (Modern concept of Education):** পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শিক্ষার আধুনিক অর্থ অবসরের পরিপূরক। শিক্ষা হ'ল ব্যক্তির জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া। আধুনিক মনোবিদ্‌দের ধারণায় ব্যক্তির প্রত্যেক আচরণই শিক্ষামূলক। কোন প্রচেষ্টাই ব্যর্থ নয়। সব রকম প্রতিক্রিয়াই তার আভ্যন্তরীণ সাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এ সেই অর্থে শিক্ষামূলক। তাই ব্যক্তি অবসর সময়ে যে আচরণ করছে, তার আলোচনা শিক্ষার অন্তর্গত হওয়া উচিত। সেই সব আচরণ ব্যক্তি-জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য এবং প্রয়োজন হ'লে তার পুনর্বিন্যাসের জন্য শিক্ষা ব্যক্তির অবসর জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে।

[পাঁচ] **শিক্ষার দায়িত্বের সম্প্রসারণ (Extension of range of responsibility of Education):** আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। সমাজ শিক্ষা সংস্থাকে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন কুশলের ভার ছেড়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সমাজ চায় ব্যক্তি তাকেও সেবা করুক। আধুনিক শিক্ষার ভাবধারায় তাই আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সমন্বয় দেখতে পাই এবং সমাজের উন্নয়নের জন্য; সমাজ সংরক্ষণের জন্য যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার ভার সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। এই কারণে অবসর যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ভারও বিদ্যালয়কে গ্রহণ করতে হবে।

অবসর যাপনের শিক্ষার মূলনীতি (Principles of Education for Leisure) :

অবসর বলতে আমরা আধুনিক অর্থে কাজের অভাবকে বলি না। অবসর হ'ল কর্মান্তর। অবসর যাপনের শিক্ষার মূল ভিত্তি হ'ল ব্যক্তির অবসর জীবনকে যথাযোগ্য শিক্ষামূলক কর্মের দ্বারা ভরে তোলা। অবসর মানুষের প্রয়োজন—দেহের বা মনের অবসাদ দূর করার জন্য। কিন্তু সেই অবসাদকেও কাটিয়ে ওঠা যায় যদি আমরা তাকে অন্যরকম কাজ দিই। আর তাছাড়া অবসর সময়ে মন যখন নিক্রিয় থাকে না, তখন নিশ্চয় সে স্বাভাবিক ভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে প্রস্তুত। এই অবস্থায় গতানুগতিক কাজের গণ্ডীর বাইরে যে কোন অভিজ্ঞতাই দেওয়া হোক তা সে গ্রহণ করবে। তাই এই অবস্থায় তাকে এমন শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা দিতে হবে যার মধ্যে সে তৃপ্তি পায়, যার দ্বারা তার অবসাদ দূর হয় এবং যার মাধ্যমে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আদর্শ গড়ে ওঠে। এছাড়া অবসরকালীন শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় আরো কতকগুলো মূলনীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন—

[এক] অবসরের উদ্দেশ্য হ'ল একঘেঁয়েমি দূর করা, অবসাদ দূর করা। সুতরাং অবসর যাপনের শিক্ষার উপাদানগুলো এমন হবে যার দ্বারা এই সকল মনের ভাব দূর করা যায়।

[দুই] অবসরকালীন শিক্ষার অভিজ্ঞতা নির্বাচনের সময় ব্যক্তির আগ্রহ ও রুচির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। যে সব কাজ সে করতে খুব আগ্রহী সেই কাজের মাধ্যমে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করতে হবে। তা না করতে পারলে সে বিরক্তি বোধ করবে।

[তিন] আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের কর্মজীবনে ব্যক্তির নিজস্ব কাজ করার স্বাধীনতাকে হরণ করেছে। সে গতানুগতিক ভাবে একই কাজ ক'রে চলেছে দিনের পর দিন। কিন্তু অবসর যাপনের ক্ষেত্রে যদি তারই পুনরাবৃত্তি হয় তাহ'লে সে স্বাভাবিক ভাবে বিরক্তি প্রকাশ করবে। তাই অবসর যাপনের শিক্ষার জন্য যে-সব কাজ নির্বাচন করা হবে তা যেন সৃজনধর্মী হয় এবং ব্যক্তির সৃজনীস্পৃহা বিকাশের সুযোগ থাকে। তাহ'লে সে স্বাভাবিক ভাবে এই কাজে আগ্রহী হবে।

[চার] অবসর যাপনের শিক্ষায় সে সব অভিজ্ঞতা নির্বাচন করা হবে তার

মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ সম্ভব হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।

[পাঁচ] অবসর যাপনের শিক্ষার জন্য যে সব কার্জ নেওয়া হবে তার মাধ্যমে ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাকে চরিতার্থ করতে হবে।

[ছয়] ব্যক্তির জীবনে আদর্শ মূল্যবোধ জাগাতে পারে এমন অভিজ্ঞতা এই ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জীবনের মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারলেই শিক্ষার জন্য আর বাইরের কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে না।

[সাত] অবসর যাপনের শিক্ষার কর্মসূচী নির্বাচন করার পূর্বে ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ দক্ষতা আছে কিনা তা বিচার করে দেখার দরকার। প্রত্যেকের মধ্যে জন্মগত ভাবে কিছু-না-কিছু বিশেষ দক্ষতা থাকে। অবসর যাপনের শিক্ষার মাধ্যমে, সেগুলোকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহ'লে ব্যক্তি যেমন পরিতৃপ্ত হবে, অন্যদিক থেকে সমাজও উপকৃত হবে।

[আট] যদি কোন ব্যক্তির বিশেষ কাজের প্রতি ঝোঁক থাকে সেগুলোকেও অনুশীলন করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে অবসর সময়ে এবং সেই সব কাজের মাধ্যমে শিক্ষা পরিচালনা করা যেতে পারে।

অবসর যাপনের শিক্ষার পরিচালনা (Organising Education for Leisure) : জন্মের পর থেকেই শিশুর কর্মময় জীবনের সূত্রপাত। দায়িত্বহীন প্রাক্ শিক্ষালয় জীবন একেবারে কর্মহীন নয়; সেখানেও তার খেলাধূলার পর অবসর আছে। আবার শিক্ষালয়ের দৈনন্দিন সময় তালিকা অনুসরণ করার পরও সে অবসর পায়। আর কর্মজীবনে তো তার অবসর আছেই। তাই অবসর যাপনের জন্য শিক্ষাকে পরিচালিত করতে হ'লে তা হবে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শুধুমাত্র প্রাপ্ত জীবনে কর্মক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ নয়।

বিদ্যালয়েই প্রতিষ্ঠিত হ'বে বর্তমান জীবনের অভ্যাস যা ভবিষ্যৎ জীবনেও কার্যকরী হবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করতে হবে, যার মধ্যে তারা খুব স্বাভাবিক ভাবে অবসর যাপন করতে পারে। বিদ্যালয়ের কাজগুলোকে আমরা এই দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি—(১) অভ্যাস গত এবং (২) মনোপ্রকৃতিগত। অবসর যাপনের জন্য প্রকৃত শিক্ষা দিতে হ'লে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিদ্যালয় থেকেই কতকগুলো অভ্যাস গঠন করার চেষ্টা করতে হবে এবং পরে এই সব অভ্যাসের বশবর্তী হ'য়ে তারা অবসর জীবন যাপন করতে পারবে। এই সব কর্মসূচীর মধ্যে, খেলাধূলার আয়োজন করা, সাহিত্য-সভা, আলোচনাচক্র, নাটক, ইত্যাদি পড়ে। এইসব কাজের

মাধ্যমে শিশুদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে অন্যদিকে পুনরাবৃত্তির ফলে তাদের যে প্রবণতার বিকাশ হবে তা তারা ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগাতে পারবে। অন্যদিকে কিছু মনোপ্রকৃতিগত কাজের অনুশীলন করার সুযোগ দিতে হবে বিদ্যালয়ে, যাতে ক'রে সেগুলো পরিপক্ক হয়। বিভিন্ন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রতি ঝোঁক আছে। এইগুলোকে সুযোগ দিয়ে পরিপক্ক ক'রে তুলতে পারবে, পরবর্তী জীবনে সে সুস্থভাবে অবসর জীবন যাপন করতে পারবে। এইভাবে বিদ্যালয়ে দ্বিমুখী প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের অবসর বিনোদনের জন্য শিক্ষা দিতে পারি।

কিন্তু আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের বাইরে প্রাপ্তবয়স্কদের 'অবসর যাপনের শিক্ষা দেওয়ার অনেক অসুবিধা আছে যেখানে শিশুরা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে এসেছে এবং তার কর্মসূচীর মাধ্যমে অবসর যাপনের শিক্ষা পেয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের সুসংবদ্ধ শিক্ষার আর কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত, তাই তাদের ক্ষেত্রে অবসর বিনোদনের শিক্ষা বিশেষ ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণেরই শিক্ষা হবে। তার কারণ শিক্ষার চেয়ে বড় ব্যক্তির উন্নতিকামী আর কিছু হ'তে পারে না। তাই তাকে যদি অবসর যাপনের শিক্ষা দিতে হয়, তবে এমন শিক্ষাই দিতে হবে, যা তার অজ্ঞানতাকে দূর করতে পারে। এছাড়া কিছু সাধারণ চিত্তবিনোদনমূলক কাজেরও ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই ধরনের শিক্ষার দায়িত্ব আজকাল সমাজ গ্রহণ করেছে এবং তাই এখন বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে কর্মী-কল্যাণ কেন্দ্র (Employee Welfare Centre) দেখা যায়। এর উদ্দেশ্য হ'ল সাধারণ কর্মীদের সুস্থ অবসর যাপনের সুযোগ দেওয়া। জাতির উন্নতি করতে হ'লে, ব্যক্তির উন্নতি করতে হ'লে এই ধরনের কেন্দ্রে বাধ্যতামূলক উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. Write a short essay on Education for Leisure—its Aims and Methods.

Ans সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য। [N. B. U., B. T. '67.]

2. What is meant by 'Education for Leisure ?' How will you organise your school for achieving such ends.

Ans সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষামূলক চিন্তা
Educational Thoughts

বিভিন্ন চিন্তাবিদ্ মনীষী বিভিন্ন যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেছেন। তাঁদের জীবনদর্শন নানাভাবে আধুনিক শিক্ষা-চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর সকল শিক্ষা নায়কদের সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শিক্ষা-চিন্তা আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করবো। এই আলোচনায় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়, কারণ যে সব মনীষীদের জীবন আদর্শ ও শিক্ষাদর্শ আমরা আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছি, তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক এবং তাঁদের মধ্য দিয়ে শিক্ষার ভাবধারা বিকাশের ইতিহাসের যে সামগ্রিক আলোচনা সম্ভব হবে, তা নয়। তবে তাঁদের শিক্ষার নীতির দ্বারা আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি কতটা প্রভাবিত হ'য়েছে তার ধারণা পাওয়া যাবে।

এই সব শিক্ষা নায়কদের শিক্ষাদর্শকে প্রকৃত ভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে তাদের জীবন ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার দরকার। কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন পরিবেশ তার জীবনাদর্শকে নির্ণয় করে।

প্লেটো (Plato): জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৪২৭ অব্দে এবং মৃত্যু খৃষ্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে। প্লেটো প্রাচীন গ্রীস দেশের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তাঁর যে সময় জন্ম হয় তখন গ্রীস দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় জীবনে এক পরিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি তাঁর জীবন দর্শনের শিক্ষা পেয়েছিলেন সক্রেতিসের (Socrates) কাছে, এবং তাঁরই দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর নির্ধারিত পথেই অগ্রসর হ'য়ে গ্রীস-বাসীদের আদর্শ নৈতিক জীবন গঠনের চেষ্টা করে গেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে তিনি তাঁর সুসংবদ্ধ মতবাদ একত্রে কোথায় উপস্থাপন করেননি। তবে তাঁর Republic এবং Law-এর মধ্যে তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কীয় ভাবধারায় কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়।

রুশো (Rousseau): ১৭১২-১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ। জন্মের সময় তাঁর মা মারা যান, ফলে নিকট আত্মীয়ের কাছে মানুষ হন। তার অভিভাবিকার এবং পিতার প্রভাবে অল্পবয়সে রোমাঞ্চকর কাহিনী পাঠের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। এই সব কাহিনী তাঁর মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাবের সঞ্চার করে। একটু বড় হ'য়ে বসি (Bossy) নামে এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে তাঁকে একবার অল্প অপরাধে গুরু শাস্তি পেতে হয়। তখন তিনি অভিমানে বিদ্যালয় ছেড়ে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে থাকেন জীবিকা অর্জনের জন্য। নিয়মমাফিক শিক্ষা তাঁর আর হয়নি। কিন্তু তা সত্বেও তিনি ইতঃস্তত জ্ঞান আহরণের সুযোগ পান। জীবনে তিনি বহু নারীর সংস্পর্শে আসেন এবং অবৈধ সম্পর্কে আবদ্ধ হন। নারী জাতির প্রতি তাঁর চিরকালের অশ্রদ্ধার ভাব ছিল। তবুও প্যারিসে থাকাকালীন তিনি এক স্থূল রুচিসম্পন্ন মহিলার সংস্পর্শে আসেন এবং তার গর্ভে তাঁর কয়েকটি সন্তান হয়; কিন্তু তিনি তাকে কোনদিন স্ত্রীর মর্যাদা দেননি বা সন্তানদের শিক্ষারও ব্যবস্থা করেননি।

মধ্য বয়সে তাঁর সাহিত্য ও রাজনীতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়। ১৭৫০ সালে Academy of Dijon একটি রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার পান। প্রবন্ধের বিষয় ছিল "Has the progress of sciences and arts contributed to corrupt or to purify morales?" তিনি এই প্রবন্ধের বিষয়ের প্রথম অংশকে সমর্থন করেন এবং তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে গতানুগতিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর এই প্রবন্ধ বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এর পরের বছর এই প্রবন্ধেই আরো বিস্তারিত ভাবে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের নাম ছিল "Discourse on equality" এই প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আরো তীব্র সমালোচনা করেন। ১৭৬১ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "The New Heloise" প্রকাশ করেন এবং ১৭৬২ সালে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তামূলক বিখ্যাত গ্রন্থ "The Social Contract" প্রকাশ করেন। প্রত্যেক জায়গায়ই তিনি গতানুগতিক রাজতান্ত্রিক ও যাজকতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেছেন। ফলে যাজকশ্রেণী তাঁর উপর ক্রমেই অসন্তুষ্ট হ'য়ে উঠছিল। ফলে তাঁর দেশে থাকা আর হ'য়ে উঠলো না। বিভিন্ন দেশ ঘুরে অবশেষে ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই মারা যান।

রুশোর শিক্ষা-চিন্তামূলক বই এমিল (Emile) ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয়।

তার পূর্বে 'The New Heloise'-এ তিনি শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-চিন্তা সম্পর্কে তার প্রামাণ্য বই হ'ল 'এমিল'। এখানে নির্ভীক ভাবে তিনি তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে ব্যক্ত করেছেন—এমিল নামে এক বালকের শিক্ষা-পরিকল্পনার মাধ্যমে। রুশো সম্পূর্ণ ইওরোপের চিন্তাধারার গতানুগতিকতার মধ্যে এক আলোড়ন এনেছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের একজন স্রষ্টা।

পেস্তালাৎসী (Pestalozzi)ঃ ১৭৪৬-১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ। পেস্তালাৎসী অতিশৈশবে পিতৃহীন হন। বাল্যকাল তাঁর কাটে মা আর এক পুরাতন ভৃত্যের সাহচর্যে। তাঁর জীবনে সেই জন্য মায়ের প্রভাব খুব বেশী ক'রে দেখা যায়। তাঁর মা ছিলেন ধর্মভীরু, সৎ এবং নিঃস্বার্থপর। তাঁর জীবনে ধর্মযাজক পিতামহের প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। পিতামহের সঙ্গে ছোট বেলা থেকে রুগ্ন ও দরিদ্রদের সেবা করতে ভালবাসতেন। তাঁর এই জীবন পরিবেশ পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। পেস্তালাৎসীর কথায় জড়তা ছিল এবং বিশেষ কোন বিষয়ে তাঁর কোন ব্যুৎপত্তি ছিল না। এই সব তার পরবর্তী জীবনের সফলতার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। পিতামহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি ধর্মযাজক হ'তে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হ'তে না পেরে আইন পড়তে আরম্ভ করেন। এই সময় সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবাদে এক পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁকে কিছুদিন জেল খাটতে হয়।

এই সময় তিনি রুশোর 'এমিল' পড়ে সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে কৃষিবিদ্যা শিখতে আরম্ভ করেন। ১৭৬৯ সালে নিউহফ্ (Neuhof) নামে এক খামারবাড়ী ক'রে সেখানে চাষবাস ক'রে জীবনযাপন করতে থাকেন। খামারের উন্নতি তিনি করতে পারেননি। খামার ভাল না চলায়, তিনি জীবন পথ পরিবর্তনে উৎসাহী হন। ১৭৭৪ সালে নিউহফে দরিদ্র বালক বালিকাদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এই অনাথ আশ্রমের সব রকম খরচ তিনি নিজে চালাতে লাগলেন। কিন্তু অর্থের অভাবে এই বিদ্যালয় চালানো মুশকিল হ'য়ে পড়লো। এই সব শিশুদের শিক্ষা-পরিচালনার অভিজ্ঞতা তিনি কয়েকটি বই-এ প্রকাশ করেন। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বই হ'ল 'The evening hour of a Hermit'. তাঁর "Leonard and Gertrude' বইয়েও কিন্তু শিক্ষা সমস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এরপর ১৭৯৮ সালে সুইজারল্যাণ্ডের স্ট্যাঞ্জ শহরের সকল অনাথ বালকবালিকার শিক্ষার ভার তিনি

গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তিনি খুব অল্পদিনের মধ্যে সাফল্য লাভ করেন। এই শিক্ষার জন্য তিনি বিশেষ কোন উপকরণ ব্যবহার করেননি, শিক্ষার্থীদের মনোপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে পাঠদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি এই সময় আরো কয়েকটি শিক্ষাসংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ "How Gertrude teaches her children". তাঁর শেষ জীবনের সাধনার ক্ষেত্র ছিল ইভারডুন বিশ্ববিদ্যালয়।

হার্বার্ট (Herbart): ১৭৭৬-১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ। হার্বার্টের বাবা ছিলেন উকিল এবং মা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিতা। তাই ছোটবেলা থেকেই তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে। যৌবনে তিনি বিভিন্ন দার্শনিকের সংস্পর্শে আসেন। বি. এ. পরীক্ষা না দিয়েই তিনি গভর্ণরের ছেলের গৃহশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। এই সময় থেকেই তিনি তাঁর শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারার প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন এবং শিক্ষক হিসেবেও তাঁর খুব সুনাম হয়। পরে তিনি পেস্তালাৎসীর শিক্ষানীতিতে আকৃষ্ট হন এবং বার্গডর্ক-এ পেস্তালাৎসীর বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এর পর তিনি আবার বি. এ. পাশ করেন। ১৮০৮ সালে কাণ্টের মৃত্যুর পর কেনিংসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ও স্থাপন করেন। সেখানে বহু ছাত্র পড়তে আসে। এই সময় শিক্ষা-সংক্রান্ত ও মনোবিদ্যা-সংক্রান্ত বহু গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর পত্রের মধ্যে "Observations on a Pedagogical Essay'তে তিনি তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন।

ফ্রয়েবেল (Froebel): ১৭৮২-১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। এক যাজককুলে তাঁর জন্ম। শৈশবে মা মারা যান; তাই বিমাতার কাছে মানুষ হন। কিন্তু স্নেহ ঠিক মত পাননি। স্নেহবঞ্চিত হ'য়ে ফ্রয়েবেল প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রকৃতির প্রতি তাঁর সমবেদনামূলক মনোভাব জাগ্রত হয়। তাঁর মামাও ছিলেন যাজক। ফলে পারিবারিক পরিবেশ তাঁকে ধর্মবিশ্বাসী ক'রে তোলে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে বনবিভাগে চাকরী নেন। এই সময় প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি তার খুব ঝোঁক দেখা যায়। তাঁর ভগবৎ চিন্তা ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে অপূর্বভাবে মিশে যায়। পরে তিনি জীবিকা অর্জনের জন্য নানা রকম চাকরী নেন। কিন্তু পরে পেস্তালাৎসীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ

করেন। তিনি এই বৃত্তিকে মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন এবং সুনামও অর্জন করলেন। পরে তিনি ইভারডুন বিদ্যালয়ে পেস্তালাৎসীর ছাত্র হন। ১৮১১ সালে গ্যেটিঞ্জেন এবং পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৮১৬ সালে তিনি এক বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে তার পরিচালনার ভার নেন। এখানেই তার কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির শুরু হয়। এই সময় তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব সংক্রান্ত বই 'The Education of Man' প্রকাশিত হয়। ১৮২৭ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়' স্থাপন করেন, তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে প্রয়োগ করার জন্য। কিন্তু তাঁর জীবিতকালে, তিনি নিজের দেশে বিশেষ সমাদর পাননি।

মন্তেস্বরী (Montessori): ১৮৭০-১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ। ডাক্তারী পাস্ করে তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সাইকাট্রিক ক্লিনিকে (Psychiatric Clinic) সহকারী চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত হন। এই সময় স্বল্পবুদ্ধি শিশুদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ফরাসী চিকিৎসক সেগুঁই যে পরীক্ষা করছিলেন, তার দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হন। সেগুঁই-এর চিকিৎসার রীতি ছিল, ঐ সব শিশুদের ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার দ্বারা কর্মক্ষম ক'রে তোলা। এর পর তিনি রোমে অর্থোফ্রেনিক বিদ্যালয়ের ডাইরেকট্রেস্ নিযুক্ত হন এবং শিক্ষা-সংক্রান্ত পরীক্ষা চালান। তিনি সেগুঁই-এর পদ্ধতিকে একটি পরিপূর্ণ আকার দেন। এ বিষয়ে হেলেন কিলারের জীবনী তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায়। ১৯০৭ সালে তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগের জন্য ক্যাসা ডি-ব্যাম্বিনি বা 'শিশু নিকেতন' স্থাপন করেন। তিনি তাঁর বই-এ তাঁর পদ্ধতি-সংক্রান্ত মতবাদ সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে গেছেন।

ডিউই (Dewey): ১৮৫৯-১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ। বিদ্যালয় জীবনে তাঁর প্রতিভার বিশেষ কোন স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় না। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ ক'রে ভারমণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের ধর্মীয় মত বাদ ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ দ্বারা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। তিনি জীববিদ্যা ও দর্শন-সংক্রান্ত অনেক বই পড়েন এবং উনিশ বছর বয়সে দার্শনিক হিসেবে তাঁর অল্পবিস্তর খ্যাতি লাভ হয়। তিনি কিছুদিন গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু পরে জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। সেখানে তিনি প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ স্ট্যান্লী হল এবং দার্শনিক চার্লস পিয়ার্স দ্বারা প্রভাবিত হন এবং ভাববাদী দর্শনকে সঠিক ব'লে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর এই

চিন্তাধারা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। তিনি আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন এবং ক্রমে উইলিয়াম জেমস্-এর প্রয়োগবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁর প্রয়োগবাদী দর্শন গড়ে তোলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সময় তিনি তাঁর সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন; ১৯০১ সালে তিনি তাঁর গবেষণামূলক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রামাণ্য বই হ'ল—"Democracy and Education', 'Education Today' এবং 'Experience and Education.''

রবীন্দ্রনাথ (Rabindra Nath): ১৮৬১-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার এবং সংস্কার-আন্দোলন—এই দুই ধারার সমন্বয় হ'য়েছিল ঠাকুর পরিবারের মধ্যে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতীয় অধ্যাত্মবাদেরও সার্থক সমন্বয় আমরা দেখতে পাই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে। এই পরিবারের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল। শৈশবে পরিবারের শৃঙ্খলা, প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণ, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মজীবন এবং জীবন-দর্শনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। শৈশবে বিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা পরবর্তিকালে তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই গতানুগতিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব ছোটবেলা থেকেই পোষণ করতেন এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাও তিনি গ্রহণ করেননি বললেই চলে। তিনি তাঁর জীবনস্মৃতিতে এক জায়গায় বলেছেন—"আমি বেশ বুঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর বেশ কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু তবু যে বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, জেলখানা, হাসপাতাল জাতীয় একটা বিভীষিকা, তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোন মতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না"।

এই পরিবেশ ও এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ গড়ে উঠেছে। তাঁর শিক্ষার মধ্যে প্রকৃতির প্রভাবের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, অন্যদিকে জ্ঞানেরও সমন্বয় সাধন করা হ'য়েছে। তিনি ১৯০৯ সালে 'শান্তি নিকেতন" প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরো বৃহত্তর সমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন।

বিবেকানন্দ (Vivekananda) : ১৮৬২-১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা দেশের নবজাগরণের আর এক প্রতীক পুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু ক'রে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাঙালীর মন ও জীবনকে বিভিন্ন দিক থেকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলার জন্য যে সব যুগ পুরুষ আত্মনিয়োগ ক'রে গেছেন, বিবেকানন্দ তাঁদের প্রথম সারিতে পড়েন। তিনি ভারতীয় জনমনে আধ্যাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের ধর্মগুরু হিসেবে পরিচয়। শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল এবং পরবর্তিকালে শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতবাসীদের নৈতিক মান উন্নত করতে হ'লে তাদের আধ্যাত্ম-চেতনা জাগ্রত করতে হবে ; তাদের নিজস্ব কৃষ্টির অধিকারী করতে হবে। এর জন্যই প্রয়োজন শিক্ষার। শিক্ষা মানুষকে একদিকে যেমন সংকীর্ণতামুক্ত করবে অন্যদিকে তার জীবনকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে। তিনি তাঁর শিক্ষাবিস্তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ক'রে যেতে পারেননি।

মহাত্মা গান্ধী (Mahatma Gandhi) : ১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। গান্ধী ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু গান্ধীজি তাঁর সারা জীবন ধরে ভারতবাসীর সামগ্রিক উন্নতির চেষ্টাই ক'রে গেছেন। সামগ্রিক উন্নতি বলতে তিনি রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলেছেন। আর তিনি বুঝেছিলেন, ভারত-বাসীর সামগ্রিক উন্নতি করতে হ'লে চাই আদর্শ শিক্ষা। আত্মনির্ভরশীল সৎ ব্যক্তিই সমাজের পক্ষে আদর্শ। তাই গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি আত্মনির্ভরশীল এক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন। এই শিক্ষা-পরিকল্পনা তিনি পরীক্ষামূলক ভাবে ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন টলস্টয় ফার্মে প্রয়োগ করেন এবং পরবর্তিকালে শাবরমতী এবং সেবাগ্রামে এই পরিকল্পনার পরীক্ষা করেন। পরে 'হরিজন্' পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই পরিকল্পনার মধ্যে আধুনিক শিক্ষার অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই বর্তমান। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল তিনি পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান থেকে এই নীতি রচনা করেছেন।

প্লেটো
Plato

প্রাচীন গ্রীসদেশে সোফিস্ট (Sophist) নামে এক ধরনের সম্প্রদায় ছিল যাদের কাজ ছিল বিদ্যা বিক্রয় করা। অবশ্য তাঁরা বলতেন, ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষার্থে তাঁরা বিদ্যা প্রচার ক'রে বেড়ান। তাঁরা মনে করতেন এর মাধ্যমে ব্যক্তির মানকে উন্নত করা যায়। সক্রেতিস (Socrates), প্লেটো (Plato) প্রভৃতি চিন্তাবিদ এই ধরনের ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। প্লেটো তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীসদেশের শিক্ষাচিন্তা তখন এই দুই প্রান্তীয় মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে চালিত হ'ত। প্লেটোর শিক্ষাচিন্তা উন্নত জীবনাদর্শ ও শিক্ষাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি তাঁর কল্পিত সাম্য ভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী শিক্ষাদর্শন রচনা ক'রে গেছেন।

॥ প্লেটোর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য ॥
Plato's Educational Philosophy and Aim of Education

শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ণয়ে প্লেটো তাঁর গুরু সক্রেতিসেরই পথ অনুসরণ করেছেন। শিক্ষাকে তিনি জ্ঞান আহরণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছিলেন গ্রীসদেশের সমাজ-ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে, ব্যক্তি-জীবনের নৈতিক মানকে উন্নত করতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নতুন আলোকে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি নীতিবোধকে বড় ক'রে দেখেছেন। মানুষ শিক্ষার মাধ্যমে তার জীবনের নৈতিক প্রাণধর্মকে খুঁজে পাবে। মনরো প্লেটোর শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"Plato attempted to formulate a new basis for the moral life which gives sufficient scope for the individual while at the same time providing an ample basis for institutional life." তাই প্লেটোর শিক্ষা দর্শনের মূলকথা হ'ল ব্যক্তির জীবনের নতুন নৈতিক আদর্শ গড়ে তুলে তার ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ

করা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের জীবনধারণের উপযোগী ক'রে তাকে গড়ে তোলা। প্লেটোর শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জন ডিউইও একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তার অনুভূতির সঙ্গে সমাজের স্থিতিস্থাপকতা ও ঐক্যের সঙ্গতি স্থাপনই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে অনুসরণ করা ও সেই সম্বন্ধে সচেতন করাই হ'ল তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য।

প্লেটো বাইরের কোন বস্তুধর্মী প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে অবিহিত করেননি। তিনি শিক্ষাকে আত্মার পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি শিক্ষাকে Conversion বা পুনর্জন্মের প্রক্রিয়া মনে করেন ব্যক্তির অন্তরাত্মাকে প্রকৃত আদর্শের দিকে পরিচালিত করাই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য।

"The purpose of Education is to turn the whole soul round, in order that the eye of the soul or reason may be directed to the right quarter. Education does not generate or infuse a new principle : it only guides and directs a principle already in existance."—এটাই হ'ল শিক্ষার সম্পর্কে প্লেটোর মূল কথা।

॥ প্লেটোর শিক্ষা-পদ্ধতি (Plato's Methods of Education) ॥

প্লেটো বলেছেন শিশুর শিক্ষা খুব অল্প বয়সে শুরু হবে না। তাকে শিক্ষা দিতে হবে গল্প বলার মাধ্যমে। তিনি শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে খেলাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন। তিনি তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই অনুকরণের মাধ্যমে শিশুর নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা স্বয়ংক্রিয় ভাবে সংগঠিত হবে।

প্লেটো তাঁর শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে গিয়ে রাস্ক (Rask) যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তাহ'ল যে, শিশুকে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হবে না যা শিশুর নীতিবোধ জাগ্রত করতে পারে না (Nothing must be admitted in education which does not conduce to the promotion of virtue)। তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের ভিতর ভবগৎ চিন্তা সম্পর্কীয় গল্পকে অন্তর্গত করার কথা বলেছেন। এই সব গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে জীবনের সম্পর্কে সত্যাদর্শ গড়ে তোলা যাবে। এই সব গল্পের মধ্যে অসৎ ব্যক্তি বা চরিত্রকে যাতে বড় ক'রে দেখা না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুর কল্পনাশক্তিকে বিকাশ করার জন্য শিল্প চর্চা এবং হাতের কাজের ব্যবস্থা রাখার কথাও প্লেটো বলেছেন। তিনি বিশেষ ভাবে

আত্মার বিকাশের জন্য সংগীতের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন —"Musical training is a more portent instrument than any other, because rhythm and harmony find their way into the inward places of the soul, on which they mightily fasten, imparting grace,……"

প্লেটো বলেছেন বাধ্যতামূলক শরীর চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে শিক্ষাক্ষেত্রে, কিন্তু, অন্যদিকে জ্ঞানের শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে হবে। এছাড়া উচ্চস্তরে শিক্ষার জন্য তিনি পাঠ্যক্রমে, গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ও নির্বাচন করেছেন। এই বিষয়ের মাধ্যমেও তিনি যুক্তিশক্তির বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তোলার কথাই বলেছেন। তাই তাঁর উচ্চ শিক্ষায় পাঠ্যক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাস্ক (Rask) একটা সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন—"Through mathematics to Metaphysics."

॥ **আলোচনা** ॥

গ্রীক চিন্তাধারার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল সমন্বয়। তাই প্রাচীন গ্রীসের চিন্তাধারার মধ্যে আমরা অন্যদেশের আদর্শের সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই এবং এই কারণে তার উপযোগিতা কালের সীমাকে অতিক্রম ক'রে বর্তমান শিক্ষাচিন্তাকেও প্রভাবিত করেছে। প্লেটোর শিক্ষাদর্শন বিশেষ ভাবে তার দেশের নাগরিক গঠনের পরিকল্পনা হিসেবে রচিত হ'য়েছিল। নাগরিকতার জন্য শিক্ষা (Education for citizenship) এবং জাতির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য শিক্ষা (Education for leadership) তার শিক্ষা চিন্তার অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করেছে। আর সেই নাগরিকতার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করা আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

প্রশ্নাবলী

1. Critically evaluate the Education Theory of Plato.

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. Discuss the Educational Thoughts of Plato with special reference to his Republic and the Laws.

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

রুশো
Rousseau

রুশো অষ্টাদশ শতাব্দীর গতানুগতিক চিন্তাধারায় আলোড়নের সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রনীতি, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা, দার্শনিক চিন্তাধারা সব ক্ষেত্রেই তিনি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। তাঁর চিন্তাধারা গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিল, রুশো তাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ান নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। রুশোর চিন্তাধারা শুধু ফরাসী দেশে নয় সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছিল। মোর্লে (Morely) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"It was in Rousseau that polite Europe first harkened to strange voices and faint reverberations from out of the vague and cavernous shadow in which common people move." রুশোর চিন্তাধারা শুধুমাত্র যে যুগের সমাজ-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল তাই নয়, শিক্ষানীতিকেও প্রভাবিত করেছিল। তাই আধুনিক কালে রুশোকে শিক্ষাচিন্তার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হ'য়েছে।

॥ রুশোর জীবন দর্শন (Rousseau's Life Philosophy) ॥

রুশোর জীবন দর্শনকে প্রকৃতিবাদ (Naturalism) বলা হয়। তাঁর দর্শনের মূলতত্ত্ব তাঁর Social Contract বইয়ের প্রথম কয়েকটি ছত্রে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে। তিনি বলেছেন—"Man is born free, and everywhere he is in chains. One man thinks himself the master of others but remains more of slave than they are." তিনি বলেছেন—শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে সৎ হ'য়ে জন্মায়, কিন্তু সমাজ এবং পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তারা অসৎ হয়। তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা জীবন ধরে প্রতিবাদ ক'রে গেছেন। তাঁর এই প্রতিবাদের মধ্যেই

তাঁর জীবনদর্শন ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, মানুষকে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে বাস করার সুযোগ দিতে হবে, তবেই তার মধ্যে মানবীয় গুণের বিকাশ হবে। এমন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যার মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মেই হয়। তিনি তাঁর প্রথম চিন্তামূলক প্রবন্ধে বলেছেন—রাষ্ট্রের মূলে আছে অসাম্য ও দুর্বলের প্রতি অবিচার। তাই তিনি তাঁর 'Social Contract'-এ 'প্রাকৃতিক সমাজ' (Natural state) গঠনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। 'প্রাকৃতিক সমাজ' বলতে তিনি আদিম সমাজ-ব্যবস্থার কথা বলেননি বা তার পুনরাবৃত্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন, এই সমাজ মানুষের সমবায়ে গঠিত হবে, পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে। এই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকবে নিজের ক্ষমতানুযায়ী বিকাশ করার। এই প্রাকৃতিক সমাজের নাগরিক হবে 'প্রাকৃতিক মানুষ' (Natural man)। এই মানুষ তার নিজের স্বভাবের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে বাইরের থেকে আরোপিত কোন নিয়ম দ্বারা নয়। তিনি বলেছেন—"A natural man is complete in himself." তাঁর প্রকৃতিবাদের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল—স্বাধীনতা (Freedom), বিকাশ (Growth), আগ্রহ (Interest) এবং সক্রিয়তা (Activity)।

রুশোর শিক্ষাদর্শন (Rousseau's Educational Philosophy):

রুশোর শিক্ষাদর্শনে তাঁর সাধারণ দর্শন ও সমাজ-দর্শনেরই প্রত্যক্ষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বমূলক গ্রন্থ এমিল (Emile)-এ তিনি একই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন—"Everything is good as it leaves the hands of the author of Nature ; everything degenerates in the hands of the men." তার শিক্ষাদর্শনে সেই প্রকৃতিবাদেরই পুনরাবৃত্তি দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর মতে প্রকৃতিই (Nature) মানুষের একমাত্র শিক্ষক হওয়ার যোগ্য। একমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের সকল সত্তার বিকাশ হওয়া সম্ভব। তাঁর এই মতবাদ তখনকার দিনের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে আঘাত করেছিল। তিনি মনে করতেন মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে শৃঙ্খলিত করে মাত্র, তাঁর মনে উন্মুক্ততা এনে দিতে পারে না। তাই তিনি শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলেছেন। রুশো তাঁর এই শিক্ষা-

সংক্রান্ত তত্ত্ব তাঁর এমিল উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। এক কাল্পনিক শিশুকে কেন্দ্র ক'রে রুশো তাঁর শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন। প্রাকৃতিক বিষয় ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধির মাধ্যমে যে শিক্ষা তাই প্রকৃত শিক্ষা। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান শিক্ষক হ'লেন প্রকৃতি।

রুশোর আদর্শ অনুযায়ী শিশু তিন রকমে শিক্ষকের কাছ থেকে পাঠ গ্রহণ করবে—প্রকৃতি, মানুষ এবং বস্তু-সামগ্রী। এই ত্রিশক্তির প্রভাব যখন ব্যক্তির মধ্যে সুসমঞ্জস আকার ধারণ করে, তখন আমরা মানুষকে বলি সুশিক্ষিত। মানুষ এবং বস্তুকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতি আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। তাই শিক্ষাকে প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তিনি এই প্রকৃতিগত শিক্ষানীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রকৃতিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার করেছেন—

[এক] **মানসিক প্রকৃতি (Psychological Nature) :** রুশো তাঁর প্রকৃতিবাদে শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশুর শিক্ষা হবে তার জন্মগত প্রকৃতি অর্থাৎ, তার প্রবৃত্তি, চাহিদা, ইচ্ছা, আবেগ, অনুরাগ অনুযায়ী। এখানে প্রকৃতি বলতে তিনি মনো-প্রকৃতিকেই বুঝিয়েছেন। সে যুগের শিক্ষাব্যবস্থায়, শিশুর মনোবৃত্তি বিকাশের কোন সুযোগ দেওয়া হ'ত না। তার উপর কতকগুলো জ্ঞানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। শিক্ষকরা সেই দায়িত্ব পালন করতেন। ফলে সমাজের চাহিদানুযায়ী শিশু শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং ধরে নেওয়া হ'ত সে প্রাপ্তবয়স্কদেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ফলে সামাজিক প্রয়োজনই শিক্ষানীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। ফলে এই শিক্ষার মাধ্যমে মনের যে কৃষ্টি সাধন হ'ত তা দাসত্বের জন্যই। তিনি বলেছেন—"Civilized man is born, lives and dies in a state of slavery." রুশোই প্রথম বললেন, শিক্ষার জন্য শিশু নয়, শিশুর জন্যই শিক্ষা। শিক্ষাকে শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী রচনা করতে হবে। শিক্ষক তার অনুরাগ, চাহিদা প্রকৃতিমূলক প্রবণতা সব কিছু লক্ষ্য ক'রে শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। এটাই হ'ল রুশোর শিক্ষানীতির মূল কথা।

[দুই] **জাগতিক প্রকৃতি (Physical Nature) :** রুশো 'এমিলের' শিক্ষার জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছেন। শহর জীবনের মধ্যে প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ কম, তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হ'লে পল্লী পরিবেশই উপযুক্ত স্থান। তিনি বলেছেন "Cities are the graves of

human species"। শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হ'লে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিতে হবে। গাছপালা, নদনদী, পশু পাখী ইত্যাদির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মাধ্যমে সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, সেটাই হবে তার শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ। প্রকৃতি হবে তার যোগ্য এবং একমাত্র শিক্ষক।

[তিন] জৈবিক প্রকৃতি (Briological Nature): প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই জীব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বর্তমান। স্বাভাবিক ভাবে সে কতকগুলো জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায় এবং তার এই জৈবিক সত্তা, বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে ক্রমে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। তার এই জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরে সমাজিক পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার করছে। রুশো বলেছেন, সমাজ সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে (Natural state) মানুষ বাস করতো। তখন মানুষ ছিল সামাজিক প্রভাবমুক্ত। রুশোর মতে শিশু তার জৈবিক সত্তার নিয়ম অনুযায়ী প্রকৃতির রাজ্যে যেমন ভাবে বিকাশ লাভ করতো, ঠিক তেমনি ভাবেই বিকাশ লাভ করবে। সে তার জৈবিক চাহিদার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, সামাজিক প্রভাব দ্বারা নয়। এইজন্য শিশুকে সমাজ পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে রাখতে হবে। রুশো বলেছেন, "We must choose between making a man and a citizen for we cannot make both at once".

রুশো 'এমিল'-এ এই তিন ধরনের প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষার বৈশিষ্ট্যকে একটি মাত্র বাক্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন—"The internal development of our organs and faculties in the education of nature; the use we are taught to make of that development, is the education given by men; and the acquisition made by our experience on the objects that surround us, is our education from things. 'প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষা' ('education according to nature') বলতে রুশো এই তিন ধরনের প্রকৃতির কথাই বুঝাতে চেয়েছেন।

রুশো শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে পৃথক ভাবে কোথাও কিছু উল্লেখ করেননি। তবে তার সমগ্র বক্তব্য থেকে এসম্পর্কে একটা মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার আধ্যাত্মিক (spiritual), সামাজিক (social) বা বৃত্তিমূলক (vocational) কোন লক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য

ব'লে বিবেচনা করেননি। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির পরিপূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশ, যে বিকাশের মাধ্যমে সে সুসমঞ্জস, স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকারী হবে। তিনি বলেছেন—'To live is not merely to breathe. It is to act, to make use of our organs, senses, our faculties and all those parts of ourselves, which give us the feeling of our existance." রুশোর শিক্ষার লক্ষ্য এমনি জীবনযাপনের অধিকারী ক'রে ব্যক্তিকে গড়ে তোলা। এছাড়া, রুশো বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধেও নির্দেশ করেছেন। শৈশব কালে শিশুর শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে, সুনিয়ন্ত্রিত স্বাধীন জীবনযাপনের অধিকারী করা। বাল্যকালে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুকে সেই সব জ্ঞান দান করা যার মাধ্যমে তার চাহিদাগুলো চরিতার্থ হয়। কৈশোরের লক্ষ্য হ'ল তাকে মানবীয় গুণের অধিকারী করা যার দ্বারা সে শান্তিপূর্ণ সমাজ-জীবন যাপন করতে পারবে। স্ত্রী-শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি পৃথক ভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন স্ত্রী-শিক্ষার লক্ষ্য পুরুষদের থেকে আলাদা হবে। তাদের সাধারণ জ্ঞানের পরিবর্তে পারিবারিক জ্ঞান দিতে হবে। স্ত্রী-শিক্ষার লক্ষ্য হবে, নারীদের পুরুষের যোগ্য সঙ্গী হিসেবে গড়ে তোলা। তিনি বলেছেন—"A woman of literary education is the plague of her husband, her childen, her family, her servant. and everybody."

॥ রুশোর পাঠ্যক্রম (**Rousseau's Curriculum**) ॥

গতানুগতিক পাঠ্যক্রমের বিরোধী ছিলেন রুশো। কিন্তু তিনি নিজেও আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার কোন সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রচনা ক'রে যাননি। তিনি 'এমিলের' শিক্ষার মধ্যে ইতস্ততঃ বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন মাত্র। তার থেকে বোঝা যায় তিনি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম রচনার একেবারে বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন "I hate books because they are a curse to children.…Instead of making the child stick to his book, I keep him busy in the workshop, his hands will work to the profit of his mind." তাঁর এই মন্তব্য পূর্বের আলোচনাকেই সমর্থন করে। তাঁর পাঠ্যক্রমের মধ্যে শিশুর সক্রিয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদির দ্বারা শিশুরা প্রাকৃতিক জগত থেকে

জ্ঞান আহরণ করবে। এছাড়া শৈশবে শরীর চর্চার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এমিলের জন্য শুধুমাত্র 'রবিনসন ক্রুশো' পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই শরীর চর্চা, হাতের কাজ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে তিনি পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়েছেন। তাঁর পাঠ্যক্রমে তিনি নৈতিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে একেবারে শেষ পর্যায়ে তিনি কিছু নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানের কথা বলেছেন।

রুশোর শিক্ষা পদ্ধতি (Rousseau's Mtehod of Education) :

রুশোর শিক্ষা নীতির প্রত্যক্ষ পরিণাম হিসেবে তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে রুশো তাঁর একটা প্রধান ত্রুটির কথা বলেছেন—তাহ'লে সেই শিক্ষা হবে ইতিবাচক (Positive Education)। এই শিক্ষা পদ্ধতির মূলে, এই ধারণা ছিল যে, শিশুরা স্বভাবতঃই অসৎ। শিক্ষার দ্বারা তাদের এই অসৎ প্রকৃতির পরিবর্তন করতে হবে। শিশুর প্রকৃতি হবে সমাজ নির্ধারিত প্রকৃতি। তিনি বলেছেন "I call a positive education one that tends to form the mind prematurely and to instruct the child in the duties that belong to a man. তিনি একেই বললেন ইতিবাচক শিক্ষা (Positive education)। এর পরিবর্তে তিনি নেতিবাচক শিক্ষার (Negative education) কথা বললেন। নেতিবাচক শিক্ষা বলতে তিনি শিক্ষার অভাবকে বোঝাতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন গতানুগতিক চিন্তাধারায় পরিবর্তন। যে শিক্ষায় জ্ঞানের পূর্বে জ্ঞান গ্রহণের বস্তু সামগ্রীকে উপযুক্ত ক'রে তৈরী করা হয় তাকেই তিনি নেতিবাচক শিক্ষা বলেছেন। শিশুর প্রকৃতি স্বভাবতই সৎ, অবিকৃত এবং পবিত্র। তার আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য তাকে দিতে হবে স্বাধীনতা। তার মন যাতে অসৎ-এর দিকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রুশো মনে করতেন বুদ্ধির বিকাশ নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের বিকাশের উপর। তাই তিনি ইন্দ্রিয়ের পরিচালনার (Sense exercise) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর পদ্ধতির মূল কথা হ'ল নেতিবাচক শিক্ষা যার বৈশিষ্ট্য হ'ল ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জন এবং যুক্তিশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ক'রে শিক্ষাদান। তিনি বলেছেন, —"I call negative education one that tends to perfect organs that are the instruments of knowledge before giving this knowledge directly, and that endeavours to

prepare the way for reason by the proper exercise of senses."

নেতিবাচক শিক্ষার নীতি অনুযায়ী শিশুকে মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। সে সব কিছু সৎ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। সুতরাং এই সময় তার অভ্যাস গঠনের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন "The only habit he should form is to form no habit at all." স্বাভাবিক ভাবে প্রাকৃতিক প্রভাবে শিশুর মানসিক, শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা হবে। এই শিক্ষা পদ্ধতিতে মানুষের বদলে প্রকৃতি হবেন শিক্ষক। শিশুর ভাল বা মন্দ কাজের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি প্রকৃতির কাছ থেকেই পাবে। এইভাবে নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা তার যে শিক্ষা হবে সেটাই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। আগুনে হাত দিলে, হাত একবার পুড়বে, কিন্তু তার পরে সে আর কোন দিন আগুনে হাত দেবে না। এর জন্য শিশুকে বাধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। জলে ভিজলে অসুখ করবে, ঘরে বন্দী থাকতে হবে; কুখাদ্য খেলে পেটের অসুখ করবে, এসব অভিজ্ঞতা শিশু পড়ে জানবে না, নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করবে। ভাল মন্দের বিচার সে নিজেই করবে। একে রুশো বলেছেন প্রাকৃতিক ফলজাত শৃঙ্খলা (Disciplne of natural consequences)। রুশো 'এমিল'-এর শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ করেছেন। এমিল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে এবং আত্মনির্ভরশীলতার শিক্ষা লাভ করেছে। যতদিন না এমিল নিজে নানারকম অসুবিধায় পড়ে পড়তে শেখার তাগিদ অনুভব না করেছে, ততদিন তাকে বই পড়াতে দেওয়া হয়নি।

একদিন এমিলের নামে এক চিঠি এলো—তার বন্ধুর জন্মদিনে সে তাকে নিমন্ত্রণ করেছে খাওয়ার জন্য দুপুরে। কিন্তু এমিল পড়তে না জানায়, তাকে শিক্ষকের অপেক্ষায় বসে রইতে হ'ল। যখন সে চিঠির বিষয়বস্তু জানতে পারলো, তখন নিমন্ত্রণের সময় পেরিয়ে গেছে। সে মনে মনে বেদনা অনুভব করলো এবং বই পড়ার জন্য আগ্রহান্বিত হ'ল। একদিন শিক্ষকের সঙ্গে জঙ্গলে যেতে যেতে পথ হারালো এমিল। তখন শিক্ষক নক্ষত্র দেখে কিভাবে পথ নির্ণয় করতে হয় তা তাকে শেখালেন। ক্রমে জ্যোতির্বিদ্যায় (Astronomy) সে আগ্রহী হ'ল। এইভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতির উল্লেখ করে রুশো তাঁর 'এমিল'-পুস্তকে প্রমাণ করলেন, কিভাবে প্রাকৃতিক ফলাফলের মাধ্যমে শিক্ষা দান করা যায়।

রুশোর শিক্ষা পদ্ধতির আর একটা প্র হ'ল বিভিন্ন বয়সের শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন। এমিলের শিক্ষাকালীন বয়সকালকে তিনি কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন এবং তার উপন্যাসের কাহিনীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ে এক একটি পর্যায়ে শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন। রুশোই প্রথম এই জীবন বিকাশের স্তর অনুযায়ী শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার কথা বলেন।

॥ প্রথম পর্যায় ॥ [এক বছর থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত]

রুশোর মতে এই বয়সেই শিশুদের ইন্দ্রিয়ের বিকাশ হয় এবং শিশুরা বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই সময় তার শারীরিক বিকাশের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। বয়সোচিত ব্যায়াম ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পর্যায় শিশুর শারীরিক উন্নতি করতে না পারলে, পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা-পদ্ধতি সার্থক ভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া রুশো মনে করেন, মানুষের মধ্যে অসৎ ভাব দুর্বল স্বাস্থ্য থেকে জাগ্রত হয়। তিনি বলেছেন "A child is bad because he is weak ; make him strong and he will be good." এই বয়সে বাবা হবেন, শিশুর আদর্শ শিক্ষক এবং মা হবেন তার উপযুক্ত ধাত্রী। শিশুর অবাধ স্বাধীনতায় তাঁরা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবেন না। এমন কি শিশুর পোশাকও হবে ঢিলে যাতে ক'রে সে মুক্ত ভাবে চলাফেরা করতে পারে। প্রচলিত বিধি-নিষেধ বা শাস্তি শিশুর উপর আরোপ করা চলবে না। মানসিক ও নৈতিক বিকাশের উপর কোন জোর দেওয়া চলবে না এই বয়সে। এমন কি শিশুকে বেশী কথা বলতে দেওয়ারও প্রয়োজন নেই।

রুশো এই পর্যায়ে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার (Sense-training) কথা বলেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন এই পর্যায়ে। তাই এই বয়সের শিক্ষার জন্য পল্লী-পরিবেশকে বিশেষ সুবিধাজনক মনে করেছেন রুশো। কারণ, স্বাভাবিক পরিবেশ ছাড়া শিশু তার স্বাভাবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে না সার্থক ভাবে।

॥ দ্বিতীয় পর্যায় ॥ [পাঁচ বছর থেকে বার বছর বয়স পর্যন্ত]

রুশোর মতে এই সময় শিশুর জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা দু'টো মূল নীতির দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। প্রথমতঃ,

নেতিবাচক শিক্ষার নীতি (Negative education) এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক ফলাফলের সাহায্যে নৈতিক শিক্ষা (Moral training)। এই পর্যায়ে শিশুর পুস্তক পরিচিতি হবে না এবং শিশুর মনও থাকবে নিষ্ক্রিয়। এই পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা জোর ক'রে তার উপর আরোপ করা হবে না। শিশুকে সব রকম সামাজিক বাধা নিষেধ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে পবিত্র পল্লী জীবনের পরিবেশে নিয়ে যেতে হবে, যাতে শহর জীবনের কলুষিত পরিবেশ তার উপর প্রভাব বিস্তার না করে। প্রাকৃতিক শক্তি ও ঘটনার স্পর্শে এসে নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা তারা নৈতিক মূল নীতিগুলোর সঙ্গে পরিচিত হবে। শিশুর শারীরিক পেশীসমূহ শক্তিশালী করা, শরীর চর্চার ব্যবস্থা করার কথা রুশো এই স্তরে বিশেষ ভাবে ব্যবস্থা করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, এই পর্যায়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, সুস্থ ও সবল মানুষ হিসেবে জীবন গঠনে শিশুকে সহায়তা করা। প্রশ্নোত্তর ও গল্পের ছলে তাকে বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণে সাহায্য করতে হবে।

রুশো এই পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন -"Exercise the body, the organs, the senses and powers, but keep the soul lying fallow as long as you can".

॥ তৃতীয় পর্যায় ॥ [বার বছর থেকে পনর বছর বয়স পর্যন্ত]

এই বয়সে শিশুদের চাহিদার চেয়ে শক্তি অনেক বেশী থাকে। রুশোর মতে এই পর্যায় শিশুর জ্ঞান আহরণের পর্যায়। এই সময়ে দেখা যায়, শিশুরা সঙ্গী খোঁজে। এই সময়ে শিশুদের যৌথ প্রবৃত্তি ও কৌতূহল প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়। সেইজন্য এই পর্যায়ে শিশুকে সামাজিক রীতিনীতির শিক্ষা দিতে হবে। তার কৌতূহল প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের জ্ঞান দিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ে শিশুর ইতিবাচক শিক্ষা (Positive education) শুরু হবে। তবে বিষয়গুলোর শিক্ষা গতানুগতিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে না।

রুশো বলেছেন—"Let us then reject from our primary studies those branches of knowledge for which man has not a natural taste, and let us limit ourselves to those which instinct leads

us to pursue," তাঁর মতে প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুর প্রবণতাকে কেন্দ্র ক'রে জ্ঞান দিতে হবে। মাঠ, ঘাট, নদনদী, গাছপালা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ক'রে ভূগোল শিক্ষা দিতে হবে। আবার, ইতিহাস শেখানো হবে ছোট ছোট গল্প, ভ্রমণ, রোমাঞ্চকর অভিযান ইত্যাদির মাধ্যমে। নৈসর্গিক ঘটনার পরিচিতিতে জ্যোতির্বিদ্যা শিখবে। কথোপকথনের মাধ্যমে সাহিত্য শিখবে। তিনি কোন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধুমাত্র 'রবিনসন ক্রুশো' পড়ানোর কথা বলেছেন। কারণ এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক জীবনযাপনের প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ধারণা পাবে। এছাড়া হাতের কাজ শিক্ষার কথাও রুশো বলেছেন এই পর্যায়ে। রুশো এই পর্যায় শেষে এমিলের উন্নতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"Emile has little industrious, temperate, patient, firm and full of courage……He has little knowledge, but what he has is really his own."

॥ **চতুর্থ পর্যায়** ॥ [**পনর বছর বয়স থেকে কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত**]

এ পর্যন্ত এমিল-এর শিক্ষা ছিল ইন্দ্রিয় পরিচালনা-কেন্দ্রিক। দৈহিক পরিচালনা ও বুদ্ধির বিকাশ সাধন করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। চতুর্থ পর্যায়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, হৃদয়বৃত্তির বিকাশ সাধন করা। এর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মপ্রচেষ্টামূলক। ঐ পর্যায়গুলির শিক্ষার মূল ভিত্তি ছিল আত্মবিশ্বাস। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশু-জীবন উপযোগী ক'রে গড়ে তোলা। অন্যের প্রতি সমবেদনা বোধ জাগ্রত করা এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য। তাছাড়া নৈতিক বিশ্বাস এবং আবেগ-মূলক জীবনের বিকাশও এই পর্যায়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ই শিশুর সামাজিক শিক্ষা শুরু হয়। তবে সব কিছু শিক্ষাই হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। কোন শিক্ষাই উপদেশের মাধ্যমে দেওয়া চলবে না। ভাল কাজে উৎসাহ দিতে হবে। তাহ'লেই শিশু বুঝতে শিখবে কোন কাজ ভাল, কোন কাজ মন্দ। সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক গুণ বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই স্তরে শিশুর নৈতিক শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি হবে।

কিন্তু এই পর্যায়ে তিনি মেয়েদের শিক্ষার কথা আলোচনা করতে গিয়ে

সম্পূর্ণ বিপরীত মতবা'দ প্রচার করেছেন। তিনি মেয়েদের জন্য এই ধরনের শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাদের শুধুমাত্র সংসারের বিভিন্ন কাজ শেখানোর কথা বলেছেন।

॥ আলোচনা ॥

রুশোর শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে অনেক পরস্পরবিরোধী মতবাদ স্থান পেয়েছে; অনেক জায়গায় প্রচলিত ব্যবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে অতিরঞ্জন করেছেন; তাঁর অনেক তত্ত্বই আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের বিচারে ভ্রান্ত ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে রুশোর অবদানকে কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করা হয়। তাঁর বিভিন্ন তত্ত্ব বিভিন্ন সময়ে তাঁর অনুবর্তীদের দ্বারা পরিমার্জিত হ'য়ে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। কুইক (Quick) তাঁর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন—"Rousseau did in the world of ideas what French Revolution afterwards did in the world of politics. He made a clean sweep and endeavoured to start a fresh" তাঁর বই এমিল (Emile) সম্পর্কে পেইনী (Payne) বলেছেন—"The Emile has justly been called the Gospel of Childhood."

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাকে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার জনক বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"Childhood has ways of seeing, thinking and feeling peculiar to itself; nothing can be more foolish than to substitute our ways to them." শিশুর চাহিদা, প্রবৃত্তি, আগ্রহ অনুযায়ী এক কথায় তার প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিতে হবে। রুশোর এই চিন্তাধারা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌দের প্রত্যক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষায় শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা আদর্শ স্থান লাভ করেছে।

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের নীতিকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর আগ্রহ, প্রবৃত্তি ইত্যাদিকে স্বীকার ক'রে নিয়ে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টা করেছেন। শিশুর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার আরো এক প্রচেষ্টা তাঁর শিক্ষানীতিতে

দেখতে পাই। তাছাড়া, জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী শিক্ষা পরিচালনাও মনোবিজ্ঞানসম্মত।

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন শিক্ষা পদ্ধতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিশু সক্রিয়ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশা ক'রে শিখবে। তাঁর শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন—"Let him know nothing because you have told him but because he has learnt it himself. Let him not be taught science, let him discover it." তাঁর এই শিক্ষাপদ্ধতি-সংক্রান্ত নীতিকে বর্তমানে Heuristic বলা হয়। তার প্রাকৃতিক ফললাভের নীতি (Theory of nature consequence) পরবর্তিকালে, হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbart Spencer) সমর্থন করেছেন। তাই রুশোকে আমরা বৈজ্ঞানিক ধারারও (Scientific tendency) প্রবর্তক বলতে পারি।

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানকে বস্তুকেন্দ্রিক করার পক্ষপাতী ছিলেন। যে বিষয়ের জ্ঞান শিশুকে প্রত্যক্ষ বস্তুর মাধ্যমে দেওয়া যায় না, সে জ্ঞান পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন—"In general, never substitute the sign for the thing itself, save when it is impossible to show the thing."

রুশো শিক্ষাক্ষেত্রে, মুক্ত বা স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলার ধারণা প্রথম প্রবর্তন করেছেন। শিশু স্বাভাবিক নিয়মে চলাফেরা ক'রে প্রকৃতির সংস্পর্শে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। তিনি শাস্তি বা শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন। অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে, স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলাই শিক্ষার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

রুশোকে আমরা শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক ভাবধারারও (Sociological tendency) জনক বলতে পারি। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে হাতের কাজ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সুতরাং আমরা বলতে পারি রুশো আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা এবং পদ্ধতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। তাঁরই চিন্তাধারার উৎস থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ আধুনিক শিক্ষার ভাবধারাকে তাদের কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত করে এনেছেন। তাই মনরো (Monroe) বলেছেন—"He was the fore-runner of so

many, who have followed in the trails he blazed through the forest until now they have become the broad highway of common travel."

যোহান হেনরিক্ পেস্তালাৎসী
Johan Henrich Pestalozzi

রুশো তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই আঘাত ছিল খুবই আকস্মিক এবং সম্পূর্ণ ভাবে নেতিবাচক। তিনি সংগঠনমূলক কিছু কাজ ক'রে যাননি। কিন্তু তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে পরবর্তী যুগে যে সব শিক্ষাবিদ্ এবং চিন্তাবিদ্ তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃত পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন পেস্তালাৎসী তাঁদেরই অন্যতম। মন্‌রো (Monroe) পেস্তালাৎসীর অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—"...Pestalozzi but made positive and concrete the negative and general educational principles enunciated by Rousseau."

॥ পেস্তালাৎসীর জীবন দর্শন (**Pestalozzi's Philosophy**) ॥

পেস্তালাৎসীর কর্মভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন দর্শনের প্রতিফলন হ'য়েছে। মানব কল্যাণ সাধনাই তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল। শৈশব অবস্থা থেকেই দেখা যায় তিনি আর্তের সেবায় জীবন নিয়োগ করেছেন। মানব কল্যাণের স্পৃহাকে চরিতার্থ করার জন্যই তিনি পরে ধর্ম যাজক হ'তে চেয়েছিলেন। মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য তিনি সমস্ত জীবন ধরে চেষ্টা ক'রে গেছেন। তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রুশোর প্রকৃতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন—সেইজন্য দেখি তাঁর খামার বাড়ীর প্রতি উৎসাহ। তাঁর প্রকৃতিবাদী মনের পরিচয় পাই তাঁর নিজের এই মন্তব্যের মধ্যে—"All the pure and beneficient powers of humanity are neither the products of art nor the result of change. They are really natural possession of every man. Their development is human need." সৎচরিত্র গঠন ক'রে সামাজিক উন্নতি করতে পারলে মানবের পরম কল্যাণ হবে। চরিত্র গঠনের জন্য অন্তর্নিহিত গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ করার দরকার।

আর এই বিকাশের জন্য চাই যে পরিবেশ তা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবেই মনুষ্য জীবনের বিকাশ হয়, তাই সেই পরিবেশ যাতে সে সহজ ভাবে পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি বলেছেন, 'The path of nature which develops the forces of humanity, must be easy and open to all." এই জীবন দর্শন তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে।

পেস্তালাৎসীর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Pestalozzi's Educational Philosophy and Aim of Education) :

পেস্তালাৎসী বিশ্বাস করতেন শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজ সংস্কার সম্ভব। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে একদিকে যেমন রুশোর প্রকৃতিবাদের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখতে পাই, তেমনি অন্যদিকে যে সমাজ সংস্কারের বন্যা পূর্ববর্তী যুগে ইওরোপে এসেছিল তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখতে পাই। পেস্তালাৎসী শিক্ষাকে সমাজ সংস্কারের পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি শিক্ষাকে গণচেতনা জাগরণের পন্থা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন শিক্ষার লক্ষ্য হবে উন্নততর সমাজ-জীবনের উপযুক্ত মানুষ তৈরী করা। শিক্ষা মুষ্টিমেয় জন-সাধারণের জন্য নয়; শিক্ষার লক্ষ্য হ'বে সর্বজনীন উন্নতি। এইজন্য নিউহফ্-এ তিনি অনাথ শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

শিক্ষার এই সামাজিক উদ্দেশ্য ছাড়াও ব্যক্তি-জীবনের বিকাশের উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন রুশোর মত। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করা। তিনি বলেছেন—শিক্ষার লক্ষ্য হবে 'Natural, progressive and harmonious development of all powers of the human being.' শিশুর শিক্ষা শুরু হবে তার অন্তর্নিহিত চাহিদাকে কেন্দ্র ক'রে। তার মধ্যে যে সব শক্তিগুলো আছে তার স্বাভাবিক এবং ক্রমিক সুসামঞ্জস্য বিকাশ সাধন করাই হবে সমস্ত রকম শিক্ষামূলক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। তিনি বলেছেন—"Sound education stands before me symbolized by a tree planted near fertilized waters,···The whole tree is an uninterrupted chain of organic parts, the plan of which existed in its seed and root.·········In the new born child are hidden those faculties which are to unfold during life. It is not the educator who puts new powers

and faculties into man, and imparts to him breath and life. He only takes care that no untoward influence shall disturb nature's march of development. তাই শিক্ষা হ'ল জৈবিক বিকাশের নামান্তর মাত্র।

ব্যক্তির উন্নতি সাধন করতে গিয়ে এবং সামাজিক কল্যাণ করার আদর্শকে কাজে লাগাতে গিয়ে তিনি শিক্ষার আর একটি লক্ষ্যের কথা বলেছেন। তা হ'ল মানুষকে স্বাবলম্বী ক'রে তোলা; প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষার শেষে উপার্জনশীল হ'য়ে উঠতে পারে সে জন্য তিনি শিল্পকাজ শেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন। এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হবে। প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করতে শিখবে। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিকাশ না করতে পারলে, শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হবে না। তাই পেস্তালাৎসীর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্যের মূল কথা হ'ল—ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ, যে বিকাশ তার জৈবিক বৃদ্ধিরই (organic growth) সামিল এবং যে বিকাশের লক্ষ্য হ'ল - ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক এবং সামজিক ও নৈতিক জীবনের উৎকর্ষণ।

পেস্তালাৎসীর পাঠ্যক্রম (Pestalozzi's Curriculum):

পেস্তালাৎসী তাঁর শিক্ষাচিন্তার মধ্যে, ব্যক্তির ও সমাজের প্রয়োজন উভয়কেই স্থান দিয়েছেন। তাই তাঁর পাঠ্যক্রমও তিনি ঐ দিকে লক্ষ্য রেখে রচনা করেছেন। তিনি লেখা, পড়া এবং গণিত (Reading, Writing and Arithmetic) শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে মানসিক গণিতের (Mental arithmetic) উপর তিনি খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অঙ্কনেরও (Drawing) ব্যবস্থা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

এছাড়া নিয়মিত পাঠ্যবিষয়গুলোকে তিনি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। বিশেষভাবে, প্রকৃতি পরিচয় (Nature study), ভূগোল (Geography) এবং ইতিহাস (History) শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা পেস্তালাৎসী বলেছেন। তিনিই প্রথম প্রকৃতি পরিচয় (Nature study) এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকে (Observation of Nature) পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য তিনি শরীর চর্চাকে রুশোর মত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। তাঁর বিদ্যালয়ে সংগীত চর্চারও ব্যবস্থা ছিল। সবশেষে. শিক্ষার্থীদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার

কথাও তিনি বলেছেন। নানা রকম বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে নীতিশিক্ষা দেওয়ারও পক্ষপাতী ছিলেন তিনি।

পেস্তালাৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতি (Pestalozzi's Method of Instruction):

পেস্তালাৎসী রুশোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'লেও তিনি রুশোর ন্যায় শুধুমাত্র শিক্ষার সমস্যা উল্লেখ ক'রে, বা, তাঁর নীতি নির্ধারণ ক'রেই ক্ষান্ত হননি। নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে তিনি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির উল্লেখ ক'রে গেছেন। পেস্তালাৎসী গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি শিশুদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ ক'রে গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতির কিভাবে সমালোচনা করেছেন সে সম্বন্ধে আমরা ধারণা পাই তাঁর এই উদ্ধৃতি থেকে—"Their powers and thier experience both are great at this age ; but our unpsychological schools are essentia-lly only artificially stifling machines for destroying all the results of the power and experience that nature herself brings to life in them." দরিদ্র অবহেলিত মানুষের শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন পোস্তালাৎসী। তবে সেই পদ্ধতি হবে গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি থেকে পৃথক। এই পদ্ধতি হবে বস্তুকেন্দ্রিক এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক। মৌখিক শিক্ষার কোন মূল্য নেই। মৌখিক শিক্ষা ব্যক্তিকে জীবনাদর্শ গ্রহণে সহায়তা করতে পারে না। প্রকৃত জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে হ'লে, শিক্ষাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হ'লে বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। তিনি বলেছেন—"A man who has only word wisdom is less susceptible to truth than a savage"

তাঁর শিক্ষার মূল কথা হ'ল শিশুকে সহজভাবে ক্রম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। জ্ঞানের বিষয়কে মনের ধর্ম অনুযায়ী বিশ্লেষণ ক'রে ছোট ছোট অংশে ভাগ ক'রে কাঠিন্যানুসারে সাজিয়ে শিশুর সামনে উপস্থাপন করতে হবে এই ধরনের ক্ষুদ্রাংশগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন সিলেবারীজ (Syllabaries)। যেমন, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন—শিশুরা ab, eb, ib, ob, ub, বা ac, ec, ic, oc, uc—এই সব উচ্চারণের অনুশীলনের সাহায্যে a, e. i, o, u ইত্যাদির উচ্চারণগুলো শিখবে। লেখা

এবং অঙ্কন শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি বলেছেন, সরলরেখা, কোণ, ইত্যাদি মৌলিক উপাদানগুলো থেকে অনুশীলন আরম্ভ ক'রে ক্রমে তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগ সাধন করতে হবে। গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন মৌলিক কৌশল থেকে অনুশীলন শুরু করতে বলেছেন।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি শিশুর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তাঁর এই শিক্ষা পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য দিনের পর দিন পরীক্ষা ক'রে গেছেন। তাঁর এই পরীক্ষাতে তিনি যে ফল লাভ করেছেন তা এইভাবে প্রকাশ করেছেন—"Meanwhile the consciousness began daily to develop in me that it must be absolutely impossible to remedy school evils as a whole if one cannot succeed in reducing the mechanical formulas of instruction to those eternal laws, according to which human mind rises from more sense imperssion to clear ideas. তিনি স্থিরভাবে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষাকে যদি বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে পারা যায় এবং বিদ্যালয় পরিচালনা যদি মনোবিদ্যা সম্মত করা যায় তাহ'লে শিশুর শিক্ষা গ্রহণের পরিশ্রম অনেক কমে যাবে এবং তার শিক্ষাও অনেক কার্যকরী হবে।

পেস্তালাৎসী বলেছিলেন—"I wish to psychologize education" এবং তার এই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য তিনি শিক্ষা পদ্ধতিকে মনোবিদ্যা সম্মত করার চেষ্টা ক'রে গেছেন। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য তিনি শিশুর মানসিক সামর্থ্য ও শক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা-পদ্ধতি রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। শিশু তার নিজের প্রয়োজনানুযায়ী শিখবে সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এই পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলেছেন শিক্ষকের কর্তব্য হবে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপূর্ণ আচরণ করা। এছাড়া শিশুর ব্যক্তিত্বকে মর্যাদা দিতে হ'লে তাকে কোন কিছুই খুব তাড়াতাড়ি শেখানো চলবে না। তাঁর মতে শিশুর শারীরিক বিকাশের মত মানসিক বিকাশও হবে ধীরে ধীরে। আর তার মানসিক বিকাশানুযায়ী যদি তাকে শিক্ষা দিতে হয়, সে শিক্ষাও হবে সুপরিকল্পিত এবং ধীর গতিসম্পন্ন।

পেস্তালাৎসীর শিষ্য মর্ফ (Morf) তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পর্যালোচনা ক'রে বলেছেন। পেস্তালাৎসীর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হ'ল—

(১) শিক্ষাদানের মূল ভিত্তি হবে পর্যবেক্ষণ (observation) এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি (sense perception or intuition)।

(২) ভাষা শিক্ষা দিতে হবে মূর্তবস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত ক'রে।

(৩) শিক্ষণের সময় বিচার বা সমালোচনার কোন সুযোগ থাকবে না।

(৪) যে-কোন বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য প্রথম সহজতম উপাদান থেকে শুরু করতে হবে এবং শিশুর বিকাশের সঙ্গে রক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে জটিল বিষয়বস্তুর দিকে অগ্রসর হ'তে হবে।

(৫) শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে পরিপূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হবে এক একটি এককের (unit) জন্য।

(৬) শিক্ষা দানের উদ্দেশ্য হবে শিশুর জীবন বিকাশ, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা নয়।

(৭) শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়ে পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন।

(৮) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন করা, তাকে জ্ঞান দান করা নয়। শিশুর যাতে মানসিক ক্ষমতার বিকাশ হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখেই পাঠদান করতে হবে।

(৯) শিক্ষা-পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানের সামগ্রীকে শিশুর মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

(১০) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক হবে প্রীতিপূর্ণ এবং বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এই প্রীতিপূর্ণ ভার বজায় রাখতে হবে।

(১১) সবশেষে, শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষা দানই মূল কথা নয়। শিক্ষা দান. শিক্ষার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য, একথা সব সময়ে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে।

পেস্তালাৎসী ও শিক্ষক-শিক্ষণ (Pestalozzi and Teacher's Training):

পেস্তালাৎসী প্রথম শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যে শিক্ষা-পদ্ধতির কথা বলেছেন সেই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। তিনি এই

উদ্দেশ্যে অনেক প্রচেষ্টাও করেছেন। বহু দূর দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পাওয়ার জন্য আসতে আরম্ভ করেছিল। তার এই প্রচেষ্টার ফলে তিনি বহু যোগ্য শিষ্য তৈরী ক'রে রেখে গেছেন। এইসব শিক্ষকদের তিনি নানা ভাবে শিক্ষা দিতেন। কিভাবে শিশুর মানসিক অবস্থা অনুশীলন করে, তার প্রাথমিক চাহিদাগুলোকে নির্ণয় করা যায়, কিভাবে 'সিলেবারীজ' তৈরী করতে হয় এবং প্রয়োগ করতে হয়, কিভাবে পরীক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা শিক্ষা দিতে হয় এসব কিছু সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারণা দেওয়া হ'তো। এছাড়া শিক্ষা-পদ্ধতির কিভাবে উন্নতি করা যায়, সে সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য তিনি ঐ সব শিক্ষকদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর এই অনুপ্রেরণা শিক্ষা জগতের অনন্য সম্পদ। ফলেনবার্জ, হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল প্রত্যেকেই পেস্তালাৎসীর শিক্ষা চিন্তা ও গবেষণা-মূলক মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হার্বার্ট (Herbert), পেস্তালাৎসীর পদ্ধতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"The Pestalozzian method, therefore, is by no means qualified to crowd out any otner method, but to prepare the way for it."

॥ **আলোচনা** ॥

পেস্তালাৎসী শিক্ষা জগতে এক বিতর্কিত ব্যক্তি। তাঁর মনে অনেক উচ্চ চিন্তা-ভাবনা ছিল, কিন্তু কোনটাই তিনি সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পারেননি। তাঁর জীবন ইতিহাস তাঁর অকৃতকার্যতারই স্বাক্ষর। তাঁর শিক্ষার মধ্যে অভিনবত্বের বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি তার নিজের চিন্তা-ধারার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর সব কিছুর মূলে আছে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতার অভাব। তাঁর এক শিষ্য রুমার (Raumer) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"The source of the internal contradiction which runs through the life of Pestalozzi was, as we have seen from his own confessions, the fact that inspite of his grand ideal which comprehended the whole human race, he did not possess the ability and the skill requisite for conducting the smallest village school" এ কথা পেস্তালাৎসীও নিজে অনেক জায়গায় স্বীকার করেছেন, এবং প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিক শিক্ষার অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে একই কথা বলেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে আধুনিক কালে শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাসে পুরোভাগে স্থান দেওয়া হ'য়েছে। তার কারণ হ'ল—

॥ এক ॥ তিনি রুশোর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা যা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষা-পদ্ধতিকে স্থায়ী ভাবে প্রভাবিত করেছে, তাকে বাস্তবধর্মী ক'রে তোলার চেষ্টা করেছেন। রুশোর পরবর্তী যুগে তাঁর অনেক অনুগামীই এই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের পরিপূর্ণ রূপ আমরা পেস্তালাৎসীর বিদ্যালয়ের মধ্যে দেখতে পাই। তিনিই প্রথম বিশ্বের সামনে রুশোর তত্ত্বের প্রয়োগমূলক সার্থকতাকে প্রমাণ করেছেন এবং তাঁর প্রতি বিশ্বের মানবের আস্থা জন্মাতে সহায়তা করেছেন।

॥ দুই ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে শুরু ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত মানুষের চিন্তা জগতে এক বিরাট বিপ্লব এসেছিল। রুশো, ভল্‌তেয়ার, হেগেল, ডেকার্তে, লক প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় সমাজ জীবনে ও দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও কমিনিয়াস, রুশো প্রভৃতির চিন্তাধারায় গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছিল। এই সব আদর্শকে পেস্তালাৎসী প্রত্যক্ষ-রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাই পেস্তালাৎসীকে আমরা প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির ও আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সংযোজক ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করতে পারি। আধুনিক শিক্ষার বহুমুখী বিকাশের সূচনা হ'য়েছিল পেস্তালাৎসীর মধ্য দিয়ে; তাই শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছেন।

॥ তিন ॥ পেস্তালাৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতি আধুনিক কালের পাঠ্যক্রম রচনার একটি মূল তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছে। পাঠ্য-বিষয়কে শিশুর মানসিক ক্ষমতানুযায়ী ক্রমানুসারে সাজানোর নীতির কথা পেস্তালাৎসী প্রথম বলেন। এদিক থেকে বিবেচনা করলে তাকে শিক্ষায় বৈজ্ঞানিক ভাবধারার প্রবর্তক (Scientific tendency) বলা যেতে পারে।

॥ চার ॥ তিনিই প্রথম শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক শিক্ষায় এই সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

॥ পাঁচ ॥ পেস্তালাৎসী শিক্ষার যে সামাজিক উপযোগিতার কথা বলেছিলেন তা আধুনিক কালেও স্বীকৃতি পেয়েছে। শিক্ষাকে তিনি সমাজ উন্নতির পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং সমাজের সকলকে শিক্ষার সুযোগ

দানের কথা বলেছেন। এই দিক থেকে বিচার করলে তাঁকে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজ বৈজ্ঞানিক ধারার (Sociological tendency) প্রবর্তকও বলতে পারি।

॥ ছয় ॥ পেস্তালাৎসী শিক্ষার তত্ত্ব নির্ধারণ করেননি। তার প্রয়োগের জন্য সারা জীবন চেষ্টা করে গেছেন। এই হিসেবে তাঁকে প্রয়োগমূলক শিক্ষা-বিজ্ঞানের (Experimental education) প্রবর্তক বলা যেতে পারে।

॥ সাত ॥ সব শেষে, পেস্তালাৎসী শিক্ষাকে মনোবিদ্যাসম্মত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যক্ষ ভাবে মনোবিদ্যার সঙ্গে তার বিশেষ কোন যোগা-যোগ ছিল না। তাই তাঁর তত্ত্বের মধ্যে অ-মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও স্থান পেয়েছে। যেমন, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি যে সিলেবারীজের কথা বলেছেন, তা একেবারে অর্থহীন। আর এই অর্থহীন বিষয়বস্তু দিয়ে শিক্ষাদান কোন সময় মনোবিদ্যাসম্মত হ'তে পারে না। তার চিন্তাধারার মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকলেও তিনি যে আদর্শের জন্য সারা জীবন প্রচেষ্টা করে গেছেন, তা পরবর্তী শিক্ষাবিদ্‌দের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তিনি বলেছিলেন—"I shall put skill into the hands of the mother." তা হয়তো তিনি পারেন নি। কিন্তু তা হ'লেও আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক ধারার (Psychology tendency) প্রবর্তক হিসেবে তাঁকে আমরা যোগ্য স্থান দিতে পারি। এক কথায় শিক্ষাক্ষেত্রে পেস্তালাৎসীর অবদানের ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

॥ **আলোচনা** ॥

পেস্তালাৎসী ও রুশো (Pestalozzi and Rousseau) ঃ রুশোর শিক্ষামূলক চিন্তার দ্বারা পেস্তালাৎসী প্রভাবিত হ'য়েছিলেন ; তাই তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে অনেক মিল দেখা যায়। দু'জনেই ছিলেন মানব প্রেমিক। সমাজের অবহেলিত মানুষের প্রতি উভয়ে সমবেদনামূলক মনোভাব পোষণ করে গেছেন, গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন এবং শিক্ষাকে সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির পন্থা হিসেবে বিবেচনা ক'রে গেছেন। রুশোর প্রকৃতিবাদ দ্বারা পেস্তালাৎসী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করতেন শিক্ষা স্বাভাবিক বিকাশের নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে। শিশুর চাহিদা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার কথা তাঁরা দু'জনেই বলেছেন।

তাঁদের মধ্যে এত মিল থাকলেও পার্থক্যও যথেষ্ট ছিল। রুশো শুধুমাত্র তাঁর চিন্তাধারার দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। বাস্তব প্রয়োগের কথা চিন্তা করেননি। কিন্তু পেস্তালাৎসী তার চিন্তাধারাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি তত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। এই প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি নানা দিক থেকে রুশোর চিন্তাধারার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শিশুর উপর সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছেড়ে দেননি, বা সম্পূর্ণ শিক্ষার ভারও ছেড়ে দেননি। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। পেস্তালাৎসীর শিক্ষাচিন্তা এই কারণে অনেক বাস্তববাদী। তিনি না এলে রুশোর শিক্ষাচিন্তার অনেক কিছু বাস্তবে রূপায়িত হ'ত না।

যোহান ফ্রেড্‌রিক হার্বার্ট
Johann Frederic Herbart

অষ্টাদশ শতাব্দীর নীরস শৃঙ্খলা-ভিত্তিক পুঁথি-সর্বস্ব শিক্ষাধারার প্রতিবাদে রুশো শিক্ষা জগতে যে আলোড়ন শুরু করেছিলেন এবং শিক্ষার নতুন নীতি নির্ধারণ করেছিলেন, পেস্তালাৎসী পরীক্ষার ভিত্তিতে সেই আলোড়নের বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হ'য়ে আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তুলেছিলেন। পেস্তালাৎসীর পরে তাঁরই ছাত্র যোহান ফ্রেড্‌রিক হার্বার্ট লকের দর্শনবাদ, রুশোর প্রকৃতিবাদ এবং পেস্তালাৎসীর পরীক্ষা-ভিত্তিক মনোবিদ্যার সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন শিক্ষানীতি এবং শিক্ষাপদ্ধতি গঠনে প্রয়াসী হ'য়েছিলেন। তিনিই প্রথম শিক্ষার একটি সম্পূর্ণ দর্শন-ভিত্তিক মতবাদ এবং শিক্ষা পদ্ধতির একটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে সক্ষম হ'য়েছিলেন।

॥ **হার্বার্টের জীবন দর্শন (Herbart's Philosophy of Life)** ॥

রুশো, কাণ্ট্, পেস্তালাৎসী ইত্যাদি মনীষীদের চিন্তাধারার দ্বারা হার্বার্টের জীবনদর্শন প্রভাবিত হ'য়েছিল। তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চিন্তাধারার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন চিন্তাধারার সূত্রপাত করেছিলেন। তিনি একই সঙ্গে ছিলেন দার্শনিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। দার্শনিক অন্তর্নিহিত সত্তা। মানুষের অন্তর্জগতের স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশকে নীতিজ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করেছেন (the idea of inner freedom which has developed into abiding actuality in an individual)। এদিক থেকে তাঁর দর্শন কাণ্টের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। মানুষের 'আত্ম প্রতিজ্ঞ' (Self-determined) হতে হ'লে এই নীতিজ্ঞানের প্রয়োজন। এই নীতিবোধ জন্মগত হ'লেও তার সুসম বিকাশ হয় জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। এই বিকাশকে সুসম্পূর্ণ করার জন্য চাই সুশিক্ষা। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস কাজ করছে, এই নীতিজ্ঞান বিকাশের মূলে।

শুধুমাত্র নীতিজ্ঞান নয়, সৌন্দর্য বোধও তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল। যা সত্য তাই সুন্দর। তিনি সত্য-সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াকে এবং অসুন্দরের প্রতি ঘৃণার ভাব জাগ্রত হওয়াকেই জীবনের আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়ে

ছিলেন। তিনি বলেছিলেন—" Aesthetics elaborartes the ideas involved in the expression of taste called forth by those relations of objects which acquire for them the attribute of beauty or the reverse. The beautiful is predicted absolutely and in voluntarily by all who have attained the right standpoint." অ্যারিস্টটল (Aristotle) এবং কান্ট (Kant) মনে করতেন, মানুষের ইচ্ছা শক্তি (will) মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং এই শক্তি আত্মজ। কিন্তু হার্বার্ট বললেন এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের অভিজ্ঞতার প্রভাবমুক্ত নয়।

মনোবিদ্ হিসেবে হার্বার্ট মনের এককত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর এই মতবাদ প্রাচীন মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) থেকে ভিন্ন। প্রাচীনপন্থীরা মনকে কতকগুলো পরস্পর নিরপেক্ষ শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু হার্বার্ট বললেন মনের মধ্যে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হ'লেও সেখানে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক সমন্বয়মূলক প্রক্রিয়া কাজ করছে। সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার সামগ্রীকে একীভূত করে, মন এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সংগঠন গড়ে তুলেছে সব সময়। অন্যদিকে তিনি লক্-এর (Locke) মত বিশ্বাস করতেন, মন বা আত্মা কোন জন্মগত গুণ নিয়ে জন্মায় না, জন্মের সময় মন থাকে একেবারে সাদা কাগজের মত ফাঁকা। এই সময় মনের কেবল একটি মাত্র ক্ষমতা থাকে। তাহ'লো স্নায়ুতন্ত্রের সাহায্যে বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ক'রে, পরিবেশের সার্থক অভিযোজন করার ক্ষমতা। মনরো (Monroe) হার্বার্টের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন—"To Herbart, the soul is a unity not endowed with inborn faculties, but blank at birth, possessing but the one power of entering into relation with the environment." হার্বার্ট লক্-এর মানসিক শূন্যতা মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। লক্-এর নির্ধারিত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ায়ও তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। লক্ বলেছেন—"External-perception and internal perception are the two windows through which the light of the external world penetrates into the dark chamber of Mind." হার্বার্টও মনে করেন বহির্জগতের উদ্‌বোধক (stimulus), ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মনের উপর ক্রিয়া করলে, চেতনার (consciousness) ক্ষুদ্রতম উপাদান ভাবের (idea) উদয় হয়। এই ভাবগুলো নিষ্ক্রিয় নয়, এরা গতিধর্মী এবং

তাদের গতিধর্মিতার দরুণ তারা আত্ম সংরক্ষণে সচেষ্ট হয়,। এর পর এই প্রাথমিক জ্ঞানগুলো মনের মধ্যে সামান্যীকরণ (Generalization), বিচারকরণ (Judgment) ও যুক্তিকরণ (Reasoning) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াকে জাগ্রত করে। এই ভাবে অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন হয়।

নতুন নতুন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কিভাবে সঞ্চয় করা হয় সে সম্পর্কে আরো ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হার্বার্ট বলেছেন, প্রাথমিক ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের ভিত্তি। এই সব অভিজ্ঞতাগুলো পরে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে সংযুক্ত বা বিযুক্ত হয়। যেগুলো সহধর্মী সেগুলো অভিজ্ঞতাকে দৃঢ়তর করে এবং চেতন মনের উপাদানের সৃষ্টি করে। এই সব অভিজ্ঞতা পারস্পরিক সংযুক্তির মাধ্যমে একটি পুঞ্জের (System) সৃষ্টি করে। একেই বলা হয় অভিজ্ঞতা-পুঞ্জ (Apperceptive mass)। ব্যক্তি কোন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'লে, তার অভিজ্ঞতা-পুঞ্জ নতুন অভিজ্ঞতাকে এই পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়াসী হয়। যদি এই সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়, তাহ'লেই মন এই নতুন অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করবে। পুরাতন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, এই অভিজ্ঞতাকে মনে স্থান দেওয়াকে মনোবিদ্যায় 'অ্যাপারসেপ্সান' (Apperception) বলা হয়। [Apperception is the assimilation of ideas involved in relationship of a new experience by means of ideas already acquired)। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে হার্বার্ট মনের দু'টি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—[এক] মনের গ্রহণধর্মিতা এবং [দুই] যে পদ্ধতিতে মন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে এবং অতীত অভিজ্ঞতা-পুঞ্জের সঙ্গে সমন্বিত করে।

হার্বার্টের শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Herbart's Philosophy of Education and Aim of Education):

হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন তার দার্শনিক চিন্তা এবং মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর মতে শিক্ষার মূল ভিত্তি হ'ল নীতিজ্ঞান (Morality)। নীতিজ্ঞানই মানুষকে অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা দিয়ে তার আত্মকর্তৃত্বের বোধ জাগ্রত করে। এই নীতিজ্ঞান মানুষের জন্মগত সম্পদ হ'লেও হার্বার্ট বলেছেন, অভিজ্ঞতার দ্বারা তার বিকাশ করা যায়। তাই তাঁর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল মন সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপস্থাপন ক'রে এই নীতিবোধ বিকাশে সহায়তা করা। মানসিক শক্তিবাদে অবিশ্বাসী হার্বার্ট মনে করতেন এই অভিজ্ঞতাগুলো

পরস্পর বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মনের মধ্যে থাকতে পারে না। নীতিবোধ নির্ভর ক'রে অভিজ্ঞতার সুসামঞ্জস বিন্যাসের উপর। এই নীতিবোধকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করাই হ'বে শিক্ষার উদ্দেশ্য। মানুষ যে ভাবেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুক না কেন, অভিজ্ঞতা প্রাকৃতিক বা সামাজিক যে-কোন শক্তির প্রভাবেই আসুক না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে সুসামঞ্জস ভাবে তাদের মনের মধ্যে পুঞ্জীভূত করা এবং একটি স্থায়ী কেন্দ্রের অধীনে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখানো। মানুষের সৎ ও অসৎ ভাব নির্ভর করে, তার অভিজ্ঞতা অর্জন ও অভিজ্ঞতার সংগঠন ও কেন্দ্রীকরণের উপর। শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পরিধি (Circle of thought) নির্ধারণ করা। হার্বার্ট বলেছেন, নীতিবোধ (Morality) নির্ভর করে সৎ ইচ্ছা-শক্তির (Goodwill) ও জ্ঞানের (Knowledge) উপর। আবার নীতিবোধ নির্ভর করে প্রাথমিক অভিজ্ঞতার (Primary presentat.on) ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার উপর। তাই শিক্ষার আপাতঃ লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করা।

অন্যদিকে হার্বার্ট শিক্ষার চরম লক্ষ্য হিসেবে নীতিবোধ বা চরিত্র গঠনকে স্থির করেছেন। শিশুর অভিজ্ঞতাকে অভিজ্ঞতা-পুঞ্জের apperceptive mass) সক্রিয়তার দ্বারা পরিবর্ধন করতে পারলে চরিত্র গঠিত হবে। তাই তিনি শিক্ষার চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য অভিজ্ঞতা-পুঞ্জের সক্রিয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে তিনি তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ করেছেন। তিনি মনে করেন—অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সক্রিয়তা শিশুর অনুরাগের উপর নির্ভর করে। তাই তিনি বলেছেন, শিক্ষার কাজ হবে, শিশুর বহুমুখী আগ্রহের (interest) বিকাশ সাধন করা। অভিজ্ঞতা হ'ল অতীত অভিজ্ঞতার দ্বারা নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রবণতা বা প্রচেষ্টা। হার্বার্ট নিজে লক্ষ্য করেছেন যে, যে বিষয়ে শিশু আগ্রহী সে বিষয়গুলো সে তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। আগ্রহ যে বিষয়ের প্রতি নেই, সে বিষয় সে শিখতে পারে না। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষাবিদ্‌দের ধারণা ছিল, শিশুর আগ্রহ তার খেয়াল-খুশী মত সৃষ্টি হয়। কিন্তু হার্বার্ট তার আগ্রহের তত্ত্বে (Theory of interest) ভিন্ন মতবাদ স্থাপন করলেন। শিক্ষা শিশুকে শুধুমাত্র কতকগুলো তথ্য (information) সংগ্রহে সহায়তা করবে তাই নয়, এই সব তথ্যের দ্বারা তার মধ্যে নতুন নতুন আগ্রহের সৃষ্টি করবে। শিশুর মধ্যে বহুমুখী আগ্রহ সৃষ্টি করা হবে শিক্ষার গৌণ লক্ষ্য।

হার্বার্ট বলেছেন, এই আগ্রহের আবার দুটি দিক আছে—ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (subjective) এবং বস্তু-কেন্দ্রিক (objective)। শিক্ষার আপাতঃ উদ্দেশ্য হবে এই বস্তু-কেন্দ্রিক আগ্রহ সৃষ্টি করা। বস্তুজগতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ক্রিয়ার মাধ্যমে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় তাকেই তিনি বলেছেন বস্তুকেন্দ্রিক আগ্রহ। এই বস্তুকেন্দ্রিক আগ্রহ আবার দু'রকমের হ'তে পারে—জ্ঞান-সম্পর্কিত আগ্রহ এবং সমাজ-সম্পর্কিত আগ্রহ। তিনি জ্ঞান-সম্পর্কিত আগ্রহের তিনটে দিকের কথা বলেছেন—(১) প্রকৃত ঘটনা (Actual phenomena)-সম্পর্কিত আগ্রহ, (২) বিজ্ঞান-সম্পর্কিত আগ্রহ (Scientific Laws) এবং (৩) সৌন্দর্য-সম্পর্কিত আগ্রহ (Aesthetic relation)। আবার সমাজ-সম্পর্কিত আগ্রহকেও তিনি তিন ভাগে ভাগ করেছেন—(১) মানবীয় আগ্রহ (Human interest), (২) সামাজিক আগ্রহ (Social interest) এবং (৩) ধর্মীয় আগ্রহ (Religious interest)। হার্বার্টের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে, এই ছয় রকম আগ্রহের সুসমন্বিত বিকাশ সাধন করা।

সুতরাং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন তাঁর সাধারণ দর্শন ও মনোবিদ্যার দ্বারা প্রভাবিত। তিনি নিজেই তাঁর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন—"Pedagogy as a science is based on practical philosophy and on psychology. The former points out the aim of culture, the latter the way, the means and the obstacles". হার্বার্টের শিক্ষা দর্শন এই চিন্তাধারারই প্রতীক।

॥ হার্বার্টের পাঠ্যক্রম (Herbart's Curriculum) ॥

হার্বার্টের পাঠ্যক্রম সাধারণতঃ দুটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে আছে। কৃষ্টি যুগ তত্ত্ব (Culture-epoch theory) এবং আগ্রহতত্ত্ব (Theory interest)। তিনি মনে করেন, শিশুর নীতিবোধ জাগ্রত করতে হ'লে, মনুষ্য সভ্যতার যথার্থ মূল্য তার সামনে তুলে ধরতে হবে। সুদীর্ঘকাল ধরে যে বিবর্তনের ধারা অনুসরণ ক'রে মানব সভ্যতা, যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, যে মানবকৃষ্টির বিকাশ সাধন করেছে, তার সমস্ত উপাদান শিশুর সামনে পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ, পাঠ্যক্রমে ইতিহাসকে প্রধান স্থান দিতে হবে। জাতির বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর পাঠ্যক্রম রচনা করতে হ'লে ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যক্রম রচনার সময় এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে যাদের মাধ্যমে শিশুর বহুমুখী আগ্রহ (Many-sided interest) চরিতার্থ হয়। শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহকে বিশ্লেষণ ক'রে তিনি শিক্ষণীয় বিষয়কে দু'ভাবে ভাগ করেছেন—

॥ এক ॥ সামাজিক বা ঐতিহাসিক আগ্রহ-সংক্রান্ত বিষয়—এর মধ্যে থাকবে ইতিহাস, ভাষা এবং সাহিত্য।

॥ দুই ॥ বৈজ্ঞানিক আগ্রহ-সংক্রান্ত বিষয়—এর মধ্যে থাকবে, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত ও কারিগরী বিদ্যাসমূহ।

পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় প্রতিক্ষেত্রেই মানসিক সামঞ্জস্যের কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ শিশুর মনে বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের কোন মূল্য নেই। তাই শিক্ষাকে মনোধর্মী করতে হ'লে এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে যারা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং যারা সহজভাবে শিশুর অভিজ্ঞতা-পুঞ্জের মধ্যে মিশে যেতে পারে।

॥ হার্বার্টের শিক্ষা-পদ্ধতি (Herbart's Method of Instruction) ॥

হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁর শিক্ষাদর্শনের অনুবর্তী। তিনিই শিক্ষা জগতে প্রথম বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করেন। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির মূলে আছে তাঁর অনুবন্ধের তত্ত্ব (Theory of Correlation)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীর সামনে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন বিষয় মন সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের, ভূগোলের সঙ্গে অঙ্কের, অঙ্কের সঙ্গে বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃতি পরিচয়ের যে সম্পর্ক আছে তা উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে হবে। অন্যদিকে পড়ার সঙ্গে উচ্চারণ এবং লেখার যে সম্পর্ক আছে তাও শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। হার্বার্ট মনের এককত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই তিনি এই পদ্ধতির উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সামান্যীকরণ হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতির মূল কথা। তাঁর এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্‌রো বলেছেন, "Such instruction, then, which modifies the groups of ideas already possessed by the mind causing them to form a new unity or harmonious series of unity and which thus determines conduct, is alone educative."

তাঁর এই অনুবন্ধের তত্ত্বের সঙ্গে আগ্রহের তত্ত্ব স্বাভাবিক ভাবে যুক্ত। বিষয়বস্তু যদি সুসংবদ্ধ না হয় তাহ'লে শিক্ষার্থীর বহু আগ্রহ সৃষ্টি করতে তা সক্ষম হবে না। যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে না, সে শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা শিক্ষালক্ষ্যে পৌছানো যাবে না। তিনি বলেছেন—"The word interest stands in general for that kind of mental activity which it is the business of the instruction to incite". শিক্ষা-পদ্ধতি বা শিক্ষকের কাজ হবে শিশুর বহুমুখী আগ্রহের সঙ্গে তার ব্যক্তিসত্তাকে যুক্ত করা।

শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা হার্বার্টই প্রথম উপলব্ধি করেছেন। শিশুর মনের সুসমঞ্জস বিকাশের জন্য এই ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা অধুনিক কালে সকল শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন। এই পদ্ধতি নির্ণয়ে হার্বার্ট চার রকমের মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগ্রহ থেকে চরিত্র গঠন হয় তাহ'ল—পর্যবেক্ষণ (Observation), প্রত্যাশা (Expectation), তাগিদ (Demand) এবং ক্রিয়া (Action)। সুতরাং শিক্ষাপদ্ধতিতেও এরকম চারটি সোপান থাকবে। এই সোপানগুলো হ'ল—(১) অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টতা (Clearness), (২) অভিজ্ঞতার সংযোগ (Association), (৩) সমন্বয় সাধন (Systen) এবং (৪) সূত্র নির্ণয় (Methód)। অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টতা বলতে তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী বিশেষ বস্তুকে পর্যবেক্ষণ ক'রে দেখবে। শিক্ষা-পদ্ধতির দ্বিতীয় পর্যায় সংযোগ স্থাপনের (Association) স্তরে পূর্বের পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে শিক্ষার্থী অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশিয়ে নেবে, প্রাথমিক ভাবে। পরে তৃতীয় পর্যায়ে আরো বৃহত্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে ঐ বিষয়-সংক্রান্ত সাধারণ ধারণাকে অতীত ধারণাপুঞ্জের সঙ্গে একত্রিত করবে। এই সোপানের নাম হ'ল সমন্বয়ন (System)। সর্বশেষ স্তরে, শিক্ষার্থী প্রয়োগের মাধ্যমে তার নতুন অভিজ্ঞতাকে আরো সামান্য করণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

হার্বার্টের এই পদ্ধতির পরে সম্প্রসারণ করেন তাঁর শিষ্য জিলার (Ziller)। তিনি হার্বার্টের চারটি সোপানের পরিবর্তে পাঁচটি সোপানের কথা বলে এবং এই পদ্ধতি আধুনিক কালে বিশেষ প্রচলিত। তিনি হার্বার্টের অভিজ্ঞতার

সুস্পষ্টকরণের (Clearness) সোপানের পরিবর্তে দু'টি সোপানের উল্লেখ করেছেন -(১) আয়োজন (Preparation) এবং উপস্থাপন (Presentation)। এই পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করেছি। হার্বার্ট শিক্ষা পদ্ধতির (Instruction) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আদর্শ শিক্ষা-পদ্ধতি গঠন তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—"Instruction will form the circle of thought, and education the character. The last is nothing without the first. Herein contained the whole sum of my pedagogy."

॥ আলোচনা ॥

হার্বার্ট শিক্ষাক্ষেত্রে দর্শন এবং মনোবিদ্যার সার্থক সমন্বয় সাধন করেছেন। রুশো যা অনুভব করেছিলেন, পেস্তালাৎসী যে চেষ্টা করে ব্যর্থ হ'য়েছেন, হার্বার্ট তা সার্থকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। হার্বার্টের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক মন্‌রো (Monroe) একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য থেকে হার্বার্টের অবদান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন—"The movement which Locke began in making the child the centre of educational endeavour and pedagogical theory ; which Rousseau established in general form through his brilliant and critical destructive work in the form of investigative literature ; which Pestelozzi brought down to the school room and made concrete in the hands of every teacher ; that movement Herbart made permanent by giving it an actual basis in place of the imaginative one of Rousseau and the empirical one of Pestalozzi." হার্বার্ট শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিদ্যার সার্থক প্রয়োগ ক'রে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থায়ী বন্দোবস্ত করেছেন।

হার্বার্টের আগ্রহের তত্ত্ব শিক্ষায় আর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে শিক্ষাদানের অপরিহার্য উপাদান হিসেবে মেনে নেওয়া হ'য়েছে। আগ্রহ-ভিত্তিক শিক্ষার কথা তিনিই প্রথম বল্লেন।

তাঁর আগ্রহতত্ত্বের পরিবর্তন অনেক হ'য়েছে, কিন্তু আগ্রহ যে শিক্ষার মূল ভিত্তি একথা সকলে স্বীকার করেন।

হার্বার্টের শিক্ষাপদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ। তিনি পেস্তালাৎসীর স্বাধীন বিকাশের তত্ত্বকে গ্রহণ না ক'রে সুপরিকল্পিত পাঠদান পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা-পদ্ধতির নানা ত্রুটি থাকলেও তাঁর নির্ধারিত মূলনীতি অনুসরণ ক'রে, আধুনিক কালেও পাঠ্যক্রম রচনা করা হয়। এই পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে হার্বার্ট শিক্ষকের কাজের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই কারণে তাঁর তত্ত্বকে অনেকে সমালোচনা করেছেন।

প্রশ্নাবলী

1. Estimate Herbart's contribution to Education.

   Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য। [C. U. ; B. I. '60]

2. Discuss the major contribution of Herbart in Education,

   [C. U. ; B. A. '65]

   Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

3. Critically estimate Herbart's methodology in Edu:ation.

   Ans : ৪৪০ হইতে ৪৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ফ্রেড্রিক উইলহেলম্ অগস্ট ফ্রয়েবেল
Fredrich Wilhelm August Froebel

ফ্রয়েবেল হার্বার্টের সমসাময়িক। কিন্তু শিক্ষাচিন্তার দিক থেকে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ফ্রয়েবেলের চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষাচিন্তার মধ্যে পেস্তালাৎসীর অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার অন্যদিকে তাঁর শিক্ষাচিন্তা গভীর জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর চিন্তার মধ্যে দার্শনিক আধ্যাত্মবাদ, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ এবং মনোবৈজ্ঞানিক কর্মবাদ একাকার হ'য়ে গেছে। তাই বোধ হয় তাঁর শিক্ষাচিন্তা এত সার্থক হ'য়ে উঠেছে। মন্‌রো (Monroe) বলেছেন—"In general one may say that whenever the emphasis in school work is placed upon the activities of the child rather than upon the technique of the process of instruction, and whenever development of character and of personality is sought, rather than mere impartation of information and training of intellectual abilities, that there the Froebelian influence is to be recognised."

॥ ফ্রয়েবেলের জীবন দর্শন (Froebel's Philosophy) ॥

ফ্রয়েবেলের জীবন দর্শন একদিকে যেমন কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি ভাববাদী দার্শনিকদের চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত, আবার অন্যদিকে ল্যামার্ক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের অভিব্যক্তিবাদ (Theory of evolution) দ্বারাও প্রভাবিত। তিনি এই দুই বিপরীত চিন্তাধারার অপূর্ব সমন্বয় করেছেন তার জীবন দর্শনে। তাঁর জীবন দর্শনের মধ্যে আমরা প্রাচীন ভারতের উপনিষদেরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। জগতের সমগ্র জীবন ও প্রকৃতি সত্তার মধ্যে একটি শক্তি বিরাজ করছে। 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" এই শক্তি (ঈশ্বর) মানুষের জীবনের সবকিছু ঘটনাকে এক নিয়মের মধ্যে গ্রথিত ক'রে রেখেছে। ফ্রয়েবেল বিশ্বাস করতেন, মানব জীবন ও সমস্ত বস্তু জগতের মূলে আছে এক

একক আধ্যাত্মশক্তি। যিনি মনে প্রাণে একান্ত ভাবে বিশ্বাস করেন এই শক্তিতে, যিনি শান্ত-স্বচ্ছ মানসিক দৃষ্টি দ্বারা অন্তরের সঙ্গে বাইরের সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, যিনি অন্তরের যুক্তির উপলব্ধির আলোকে বহির্জগতের পরিণতিকে বিচার করতে পারেন,—তিনিই এই ঐক্য উপলব্ধিতে সক্ষম। ফ্রয়েবেল তাঁর 'The Education of Man' বই-এ তাঁর এই দার্শনিক চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—"The whole world—the All, the Universe—is a single great organism in which an eternal uniformity manifest itself. This principle of uniformity expresses itself as much in external nature as in spirit. Life is the union of the spiritual with the material. Without mind or spirit matter is lifeless." তিনি বলেছেন, এই সর্বব্যাপী নিয়মানুবর্তিতা ভিত্তি ক'রে আছে সর্বব্যাপী সক্রিয়, প্রাণবন্ত, আত্ম-সচেতন, শাশ্বত একক শক্তির উপর। বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই সর্বব্যাপী এককতাকে উপলব্ধি করা যায়। স্বচ্ছ জাগ্রত দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই শাশ্বত ঐক্যকে উপলব্ধি করতে ভুল করেন না।

ঐ শাশ্বত একক শক্তিই ঈশ্বর। এই ঈশ্বর থেকে সব কিছুর সৃষ্টি। এই সবকিছুর ঐক্যের মূলে আছেন ঈশ্বর, সকল বস্তুর উৎসই এই ঈশ্বর, ঈশ্বরই সববস্তুতে বিরাজমান ["All things have come from the Devine Unity and have their origin in Devine Unity. All things live and have their being in and through the Devine Unity. The Devine effluence that lives in each thing is the essence of each thing"—*The Education of Man*]. ফ্রয়েবেলের মতে মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হ'ল এই আধ্যাত্মিক ঐক্যকে, এই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ভাবে মনের যোগ স্থাপনের মাধ্যমেই তাঁর এই জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের এই ঐক্যকে আত্ম-সচেতনতার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে। ঈশ্বর বাইরের কোন সত্তা নন, আন্তরিক সত্তা, উপলব্ধির বস্তু। (The absolute no longer matters, it is spirit—self-conscious spirit'—*Monroe*]

বিশ্ব জগতের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করার পর, সেই পথ অনুসরণ ক'রে তিনি তার বিকাশের ধর্ম অনুশীলনে অগ্রসর হ'লেন। এখানে তিনি রুশো এবং

প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। তাঁরা যে জীবনের পরস্পর বিচ্ছিন্ন স্তরের মাধ্যমে বিকাশের কথা বলেছিলেন, ফ্রয়েবেল তার বিরোধিতা করলেন। তাঁর মতে জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলি অবিচ্ছিন্নতার নিয়মে আবদ্ধ। তাঁর মতে সৃষ্টির বিকাশ সাধনে (Development) একটা সুনির্দিষ্ট ধারা আছে। প্রত্যেক স্তরের বিকাশ তার পূর্বস্তরের সম্পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভরশীল। কোন একটি নির্দিষ্ট বয়সের জন্য কেউ বালকত্ব বা যৌবনত্ব পায় না। তার পূর্বের সকল স্তরগুলোতে, দেহ, মন ও অনুভূতির উপযুক্ত পরিণতিতেই সে বালকত্ব বা যৌবনত্ব লাভ করে। তিনি বলেছেন- "God creates and works productively in uninterrupted continuity. Each thought of God continue to work with creative power in endless productive activity to all eternity". ফ্রয়েবেলের মতে জীবজগৎ ও প্রকৃতি জগৎ এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি এই ক্রম-বিকাশের ধারা (evolution) অনুসরণ ক'রে চলেছে। তিনি এই ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াকে মানুষের আন্তরিক সত্তার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। গাছের সব কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন তার অঙ্কুরের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, মানব শিশুর মধ্যেও তেমনি পূর্ণবয়স্ক শিশুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকে। উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে তার উন্মেষ (Unfoldment) হয়। ['That which lies in the whole , lies in the smallest part ; thus, that which lies in humanity as a whole also expresses itself even in the smallest and the youngest of it's children'—*Froeble*]

ফ্রয়েবেলের এই জীবন দর্শন এবং ভগবৎ প্রীতি পরবর্তিকালে তাঁর শিক্ষা চিন্তাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। ভগবৎ বিশ্বাস তাঁকে তাঁর বৃত্তিতে প্রেরণা জুগিয়েছে। ঈশ্বর তাঁকে যে কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন, সেই কাজ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করেছেন।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার উদ্দেশ্য (Frobels Educational Philosophy and Aim of Education) :

ফ্রয়েবেলের শিক্ষাদর্শন তার সাধারণ দর্শন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত। তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে দু'টি—

প্রথমতঃ সমস্ত বিশ্বজগৎ এক একক আধ্যাত্মিক শক্তির নিয়মাধীন। বিশ্বের জড় ও চেতনাময় জগতে সর্বত্র বিরাজ করছে ঐক্যের নিয়ম। বিশ্বজগতের

মূল শক্তি এবং অবিনশ্বর ঈশ্বর (God), মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যকে উপলব্ধি করা। এই যদি হয় জীবনের চরম লক্ষ্য তাহ'লে শিক্ষার লক্ষ্য হবে এই চরম সত্যকে এই আধ্যাত্মিক ঐক্যকে নিজের আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করায় শিশুকে সহায়তা করা। সকল রকম জড় ও চেতন বস্তুর মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিশ্লেষণ ক'রে এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করাই হবে শিক্ষার লক্ষ্য। [To Froebel then this spiritual essence, or reality, was the source of all life, of all existance ; and it was the purpose of education to expand the life of the individual and comprehend this existance through participation in this all pervading spirit—*Monroe*].

দ্বিতীয়তঃ, বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী—ফ্রয়েবেল মনে করতেন শিশু সব গুণ নিয়েই জন্মায়। শিক্ষার লক্ষ্য হবে, এই সব গুণের বা সম্ভাবনার উন্মেষণ (Unfoldment)। শিক্ষা বাইরে থেকে চাপানো কোন শক্তি নয়, এটি আসবে অন্তর থেকে। তাঁর Education of Man-এ তিনি বলেছেন—"God neither ingrafts nor inoculates. He develops the most trivial and imperfect things in continuously ascending series, and in accordance with enternal, self-grounded and self-developing laws." শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে ঐ অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার উপলব্ধিতে সহায়তা করা।

সুতরাং ফ্রয়েবেলের শিক্ষাচিন্তার মূল বৈশিষ্ট হ'ল—তিনি শিক্ষার সব কিছুকে একটি কথার দ্বারাই প্রকাশ করেছেন। সেটা হ'ল—বিকাশ বা উন্মেষণ (Development, or, Unfoldment)। তাঁর কাছে শিক্ষার প্রক্রিয়ার প্রকৃতি হ'ল বিকাশ, শিক্ষার লক্ষ্য হ'ল বিকাশ (The process of education is development ; the aim of education is development)। ফ্রয়েবেল তাঁর শিক্ষাদর্শনের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষা হ'ল এক ধরনের বিকাশ যার দ্বারা ব্যক্তি উপলব্ধি করতে শেখে যে সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যের মধ্যে একটি একক। শিক্ষা হ'ল সেই বিকাশের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে প্রকৃতি ও মনুষ্য সমাজের মধ্যে নিজের সত্তাকে একীভূত করে। তিনি বলেছেন—"It is development by which man's life

broadens until it has related itself to nature ; until it enters sympathetically into all activities of society ; until it participates in the achievement of the race and aspirations of humanity." তাঁর এই উক্তি থেকে লক্ষ্য করা যায়, তিনি ব্যক্তির বিকাশের উপর গুরুত্ব দিলেও সামাজিক বিকাশকে অবহেলা করেননি। বরং এই দুই ধারণার সার্থক সমন্বয় করেছেন।

॥ ফ্রয়েবেলের পাঠ্যক্রম (**Froebel's Curriculum**) ॥

ফ্রয়েবেল তার শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাঠ্যক্রম সম্পর্কে এক সুচিন্তিত মতবাদ প্রকাশ করেছেন। জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য তিনি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের কথা বলেছেন বিদ্যালয়ে। যেমন—

।। এক ॥ পেস্তালাৎসীর মত ফ্রয়েবেল গণিত শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন—"Human intellect is as inseparable from mathematics as the human heart from religion." গণিত মানুষের যুক্তি-শক্তিকে বিকাশ ক'রে বিশ্বজগতের ঐক্যের সূত্র খুঁজে বের করতে সহায়তা করবে।

।। দুই ।। ভাষা শিক্ষা—ফ্রয়েবেলের মতে ভাষা হ'ল সাংকেতিক ভাব যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বসত্তার সঙ্গে একীভূত করবে। তাই ভাষা শিক্ষার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তিনি 'পড়ার' চেয়ে 'কথা বলার' উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই আসবে। লেখাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি বিশেষ ধরনের অঙ্কন হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

।। তিন ।। প্রকৃতি পরিচয়—ফ্রয়েবেলের পাঠ্যক্রমে প্রকৃতি পরিচয়কে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হ'য়েছে। পেস্তালাৎসী প্রকৃতি পরিচয়ের কথা বলেছিলেন, কেবলমাত্র বস্তুজগতের সঙ্গে শিশুকে পরিচিত করার জন্য। কিন্তু ফ্রয়েবেলের কাছে প্রকৃতি পরিচয়ের গুরুত্ব অনেক গভীর। তিনি বলেছেন, প্রকৃতি জগত শিশুর কাছে এক বিরাট ঐক্যের সংকেত বহন ক'রে নিয়ে আসে। এই সংকেতের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'লে শিশু তার মানসিক জীবনে ঐক্য আনবে; তার নৈতিক জীবনের বিকাশ করবে এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

।। চার ।। অঙ্কন বিদ্যা—অঙ্কন বিদ্যাকে ফ্রয়েবেল পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ এর দ্বারা শিশুর জ্ঞানের প্রকাশ পায় এবং তার সৌন্দর্য বোধের বিকাশ হয়।

।। পাঁচ ।। মাটির কাজ—মাটির বস্তু গঠনের দ্বারা শিশুর আত্ম-সক্রিয়তা চরিতার্থ হয়, বিভিন্ন বস্তুকে মাটির মধ্য দিয়ে রূপদান ক'রে সে সৃষ্টির আনন্দ পায়, স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে শেখে। তিনি বলেছেন—"God created man in his own image; therefore man should create and bringforth like God."

।। ছয় ।। কায়িক পরিশ্রম—একই উদ্দেশ্যে ফ্রয়েবেল পাঠ্যক্রমে কায়িক পরিশ্রমকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। পেস্তালাৎসী জীবিকা অর্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রমের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেল কায়িক পরিশ্রমকে তাঁর শিক্ষামূলক উপযোগিতার জন্য পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

।। সাত ।। এছাড়া ফ্রয়েবেল ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদি পাঠের কথাও বলেছেন এবং এই বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ স্থাপন ক'রে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও তিনি বলেছেন।

।। আট ।। 'গান', 'নাচ' ইত্যাদিকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথাও তিনি বলেছেন।

।। নয় ।। সবশেষে, পাঠ্যক্রমের মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির কথা তিনি বিশেষ ভাবে বলেছেন। এই সব বিষয়ের মাধ্যমে শিশুদের ঈশ্বর চেতনা জাগ্রত হবে।

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ফ্রয়েবেলের মূল বক্তব্য হ'ল যে, শিক্ষার্থীর সামনে বিশ্ব-জগতের এক পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে হবে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-পদ্ধতি (Froebel's Methed of Teaching) :

ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-পদ্ধতি 'কিণ্ডারগার্টেন' পদ্ধতি নামে পৃথিবী বিখ্যাত। কিণ্ডারগার্টেন কথার অর্থ হ'ল শিশু-উদ্যান। বিদ্যালয় হ'ল একটি উদ্যান-স্বরূপ। শিশুরা সেই উদ্যানে চারাগাছ স্বরূপ এবং শিক্ষক হলেন তার মালী। শিক্ষার দ্বারা শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের চেষ্টা করা হয়। ফ্রয়েবেলের মতে শিক্ষা বাইরের থেকে জোর ক'রে চাপিয়ে দেওয়া যায় না। শিক্ষা-পদ্ধতিতে শারীরিক শাস্তি ও শাসন ইত্যাদির স্থান গৌণ হওয়া উচিত। ফ্রয়েবেলের মতে শিশু তার স্বাভাবিক আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করবে।

স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর মধ্যে এই স্বতঃস্ফূর্ততা সব সময়ই দেখা যায়। স্বাভাবিক ভাবেই সে সক্রিয়। এই সক্রিয়তাকে তিনি আত্ম-সক্রিয়তা—(Self-activity) বলেছেন। এই ধরনের সক্রিয়তা শিশুর নিজের প্রেরণার দ্বারা নির্ধারিত হয়, নিজের আগ্রহ দ্বারা জাগ্রত থাকে এবং নিজের মানসিক শক্তি তাকে ক্রিয়াশীল রাখে। তিনি মনে করেন এই ধরনের আত্মজ-ক্রিয়াশীল সত্তাই মনের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে। ["Activity determined by one's own motives, arising out of one's own interests, sustained by one's power—can alone produce this evolution of mind, can secure that which is held to be the aim of education."—*Monroe*] ফ্রয়েবেল বলেছেন—এই ধরনের সক্রিয়তাকে স্বতঃস্ফূর্ত না ব'লে বাধ্যতামূলকও বলা যেতে পারে। কারণ এটা ব্যক্তির আন্তরিক সত্তার নিয়ন্ত্রণেই হ'য়ে থাকে। কিন্তু তাহ'লে তিনি বলেছেন, যেহেতু ব্যক্তি বাইরের কোন সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, তাঁর নিজের অন্তরের তাগিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সে দিক থেকে বিবেচনা ক'রে একে আমরা তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া বলতে পারি। এই আত্মসক্রিয়তাকে তিনি শিক্ষার মূল পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি হবে সেই পদ্ধতি যাতে শিশুর এই আত্মসক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে পাঠ-দানের কাজ পরিচালনা করা হবে। শিশুর প্রথম আত্ম-সক্রিয়তার প্রকাশ পায় পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে গিয়ে এবং যে-কোন শিক্ষা-পদ্ধতি তার এই স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ক্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠবে, এটাই হ'ল তার পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তি।

শিশুর এই আত্ম-সক্রিয়তার বিকাশ হয় খেলার মাধ্যমে। সেইজন্য ফ্রয়েবেলই প্রথম শিক্ষাবিদ্ যিনি খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। তাঁর মতে খেলার মধ্য দিয়েই শিশু জগৎ-সংসারের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাওয়ানোয় প্রয়াসী হয়; তার মধ্য দিয়েই সে চির-শাশ্বত সত্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারে। ফ্রয়েবেল খেলার এই গুরুত্বের কথা শুধু মুখে বলেননি, প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর কিণ্ডারগার্টেন-এ প্রয়োগ ক'রে দেখিয়েছেন।

রুশোর মত ফ্রয়েবেলও তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে প্রকৃতির (Nature) সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কেবলমাত্র বই মুখস্থ ক'রে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে তিনি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন—'Nature

reveals God to the child.' তিনি রুশোর মত শিশুকে সামাজিক পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে প্রকৃতির কোলে স্বাধীন ক'রে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে পেস্তালাৎসীর মত বস্তুভিত্তিক শিক্ষা প্রদ্ধতি এবং হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। বস্তুগুলোর তিনি নাম দিয়েছেন উপহার (Gift) এবং কাজগুলোর নাম দিয়েছেন বৃত্তি (Occupation)। এই সব বস্তুগুলোর মাধ্যমে ফ্রয়েবেল জগতের নিয়মাবলীকে সাংকেতিক ভাবে শিশুর কাছে পরিবেশ করতে চেয়েছেন। এই সব বস্তুগুলোর মাধ্যমে শিশু বস্তুজগত সম্পর্কে ধারণা পায়। এগুলো তার অন্তর্দর্শনে সাহায্য করে। এদের মধ্য দিয়ে শিশুর ঘনবস্তু সম্পর্কে ধারণা জন্মে, এর থেকে গণিতের ধারণা জন্মে এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য (Beauty of symetry) সম্বন্ধে সে অবগত হয়। বৃত্তি বলতে তিনি বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজকে নির্বাচন করেছেন। কাগজের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস নির্মাণ করা, কাঠের কাজ, তাঁত বোনা, ছবি আঁকা ইত্যাদিকে বৃত্তি হিসেবে নির্বাচন করেছেন। এই ধরনের কাজের মাধ্যমে শিশু নিজের সত্তাকে প্রকাশ করার সুযোগ পায়।

ছড়া ও গানের মাধ্যমে শিক্ষাদান ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য। শিশু মাত্রই ছন্দ এবং সুর ভালবাসে। গানকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—মায়ের গান এবং খেলার গান। তিনি সাতটি মায়ের গান এবং পঞ্চাশটি খেলার গানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। গানের উপযোগিতার দিক থেকে তাদের তিনি চারটে শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) ছোট শিশুদের জন্য রূপকথার গান; এ দ্বারা শিশুর কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করা হয়; (২) অপেক্ষাকৃত বড়দের জন্য বিভিন্ন পরিচিতির গান; (৩) চন্দ্র, সূর্য, তারা এবং নৈসর্গিক-ঘটনা সম্বলিত গান; এবং (৪) নৈতিক চরিত্র গঠনের উপযোগী উপদেশমূলক গান। এই সব গান গাইবার সময় উপযুক্ত অঙ্গ সঞ্চালন করা হয় এবং ছন্দময় নাচেরও ব্যবস্থা থাকে।

ফ্রয়েবেলের শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা হ'ল—শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে আনন্দময় ক'রে তোলা। শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উপলব্ধি করতে সহায়তা করা। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি। এই

শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে রাস্ক্ (Rusk) বলেছেন—"By his methodological arrangement of the gifts and occupation, Froebel nevertheless founded a new type of educational institution and although his system lent itself to formalism by later generations of the teachers who had not the spirit of the master, it ameliorated the lot of countless children."

ফ্রয়েবেল ও শিক্ষালয় (Froebel and School) :

ফ্রয়েবেল শিক্ষালয় সম্পর্কে আধুনিক ধারার প্রবর্তন করেছেন। তিনি মনে করেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে ঐক্য বিরাজ করছে, শিক্ষালয় জীবনেও সেই ঐক্যের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে। তিনি বলেছেন, শিক্ষালয় হবে সমাজের প্রতিচ্ছবি। বিদ্যালয়ের সমাজ জীবনে বসবাসের মাধ্যমেই সে জীবনের প্রয়োজনীয় কৌশলগুলো আয়ত্ত করবে। মন্‌রো (Monroe) ফ্রয়েবেলের শিক্ষালয় সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন —"The school, to Froebel, was a place where the child should learn the important things of life, the essential of truth, justice, free personality, responsibility, initiative, casual relationship, and the like ; not by learning them, but by living them out." হিউগস্ (Hughes)-ও কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ ক'রে একই কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ের কাজ পাঠদানের মধ্য দিয়ে শিশুর উপর কিছু জ্ঞান আরোপ করা নয়। ফ্রয়েবেলের কাছে, শিক্ষা আর শিক্ষাদান এক জিনিস নয়, বা, শিক্ষাদান কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের কাজ নয়। শিক্ষাদান (Instruction) হ'লো শিশুর জীবন বিকাশের একটা পর্যায় মাত্র, যা শুরু হ'ল শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তা থেকে এবং শেষ সেই সক্রিয়তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে পৌঁছানোতে। ফ্রয়েবেলের শিক্ষালয় একটি ছোট সমাজ (Miniature society)।

॥ আলোচনা ॥

পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার নবযুগ শুরু হ'য়েছে রুশো থেকে। তাঁর পরবর্তী কালের সব সংস্কারকই তাঁর চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছেন। তাই রুশোর চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েবেলের চিন্তাধারার অনেক মিল দেখতে পাই। কিন্তু ফ্রয়েবেল রুশোর মতবাদকে মেনে নেননি। তিনি রুশোর মত সমাজকে

বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। শিশু স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সমাজ পরিবেশের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর শিক্ষালয়কে সমাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে সাজিয়ে ছিলেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

রুশো শিক্ষকের গুরুত্বকে শিক্ষাক্ষেত্রে একেবারে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েবেল শিক্ষকের হাতে গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষকের কাজ গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী জ্ঞানের ভাণ্ডারকে শিক্ষার্থীর সামনে উন্মুক্ত করা নয়, তার আত্ম-সক্রিয়তাকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালনা করা। তিনি যথাযোগ্য সুযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীকে তার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুযায়ী বিশ্বের ঐক্য উপলব্ধির মাধ্যমে আত্মবিকাশে সহায়তা করবেন। তার স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয়তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, তার থেকে ভাল ফল পাওয়া যাবে না।

ফ্রয়েবেল, পেস্তালাৎসীর মনোবিদ্যা-ভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে যে ত্রুটি ছিল, তাকে দূর করেছেন। তিনি শিশুর সক্রিয়তাকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ ক'রে, শিক্ষাক্ষেত্রে সার্থকভাবে মনোবিদ্যার প্রয়োগ করেছেন। শিশুর শিক্ষা তার স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম থেকে শুরু করার কথা ফ্রয়েবেল বলেছেন। ফলে শিশুর কর্ম নির্বাচনের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা তিনি দান করেছেন। শিশু তার মনোধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা করবে—এটাই তার শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা। তিনি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বে তাঁর নিজস্ব মর্যাদা দান করেছেন। শিক্ষাকে খেলাভিত্তিক করার কথা তিনি প্রথম বলেছেন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষারও তিনি সার্থক প্রবর্তম করেছেন তার বৃত্তি (occupation)-গুলির মাধ্যমে।

এক কথায় বলা যেতে পারে, ফ্রয়েবেল শিক্ষায় আধুনিক ভাবধারার প্রতীক। আধুনিক শিক্ষার যা কিছু বৈশিষ্ট্য শিশুর উপর গুরুত্ব দিয়েছে, তার সবটাই ফ্রয়েবেলের দান। আধুনিক কালের বিখ্যাত চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই তাঁর এই অবদান কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করেছেন, তাঁর 'Democracy and Education' বই-এ। তিনি মন্তব্য করেছেন—"Although his love of abstract symbolism often got the better of his sympathetic insight Froebel's recognition of the significance of the native capacities of children, his loving attention to them and his influence inducing other to study them, represent perhaps the

most effective single force in modern educational theory, in effecting wide spread acknowledgement of the idea of growth."

মাদাম মারিয়া মন্তেস্বরী
Madame Maria Montessari

মাদাম মন্তেস্বরী শিক্ষা ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর নির্ধারিত শিক্ষাপদ্ধতি পৃথিবীর সমস্ত দেশেই শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। তিনি শিক্ষাতত্ত্বের উপর শুধু তাত্ত্বিক আলোচনাই করেননি, তাঁর শিক্ষা-নীতির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ পদ্ধতি বর্তমানে মন্তেস্বরী পদ্ধতি নামে প্রচলিত। শিক্ষাকে তিনি খুব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা-তত্ত্বের মধ্যে আমরা তাত্ত্বিক আলোচনার থেকে প্রয়োগমূলক দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেখতে পাই। তাঁর এই বাস্তবধর্মী চিন্তা রাখলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থায়ী ভাবে সংযোজিত হ'য়েছিল বলা যেতে পারে।

মন্তেস্বরীর জীবন দর্শন (Montessari's Life-philosophy):

মন্তেস্বরীর জীবনের মূলে আছে সেবামূলক মনোভাব। চিকিৎসক হিসেবে তিনি যে সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে বৃত্তি নির্বাচন করেছিলেন তা ক্রমে আর্তের সেবায় নিয়োজিত হয়। মানুষের সামগ্রিক মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সেবার মনোভাব নিয়ে তিনি সারাজীবন ধরে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নতির জন্য নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন।

মন্তেস্বরীর শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষার লক্ষ্য (Montessari's Educational Philosophy and Educational Aim):

মন্তেস্বরী সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি তিনি শিক্ষাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছেন। তাই তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বের কোন স্থান নেই। তবে তাঁর শিক্ষা চিন্তায় অনেকাংশে ফ্রয়েবেলের শিক্ষা চিন্তার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেছেন, শিশুর স্বাভাবিক জীবন বিকাশের জন্য যে সহায়তা তাকে দেওয়া হয়, তাই হ'ল শিক্ষা ("Education is the active help given to the normal expansion of the life of the child")। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক শিশুই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং জন্মগত ক্ষমতার অধিকারী এবং প্রত্যেক শিশুই এই জন্মগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক শিশুকে

তার জন্মগত ক্ষমতা অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে সার্থক ভাবে অভিযোজন করতে সহায়তা করা। তিনি আরো বলেছেন, যেহেতু প্রত্যেক শিশু নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য নিয়ে একটি নিরপেক্ষ সত্তা, সেহেতু তাকে শিক্ষা দিতে হ'লে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে, তার ক্ষমতানুযায়ী শিক্ষা দিতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, প্রত্যেক শিশু তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী অন্তর থেকে বিকাশ লাভ করবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক শিশুর আত্মবিকাশে সহায়তা করা, যে বিকাশের জন্য সে দেহ-মনে প্রস্তুত। তিনি বলেছেন—"The child is a body which grows and a soul which develops. Such a mysterious thing should neither be marred nor stifled. Educational activities should be so planned that child's individuality must be unfolded to the full." ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব মন্তেস্বরীর শিক্ষা-দর্শনের মূল কথা। প্রত্যেক শিশুকে যোগ্য শিক্ষার মাধ্যমে তার নিজস্ব ক্ষমতানুযায়ী পরিপূর্ণ বিকাশের পথে এগিয়ে দেওয়াই হবে শিক্ষার মূল কাজ, বা এক কথায় বলা যেতে পারে, মন্তেস্বরীর শিক্ষাচিন্তানুযায়ী শিক্ষা হ'ল বিকাশের প্রক্রিয়া আর তার লক্ষ্য হ'ল ব্যক্তি-জীবনের বিকাশ।

মন্তেস্বরীর পাঠ্যক্রম (Montessari's Curriculum):

মন্তেস্বরীর শিক্ষাচিন্তা বিশেষ ভাবে শিশুদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই পাঠ্যক্রম সম্পর্কে তিনি বিশেষ কিছু বলেননি। নিয়মমাফিক পাঠ্যক্রমে তিনি শিশুদের জন্য লেখা (Writing', পড়া (Reading) এবং (Arithmetic) —এই তিনটে বিষয়ের কথা বলেছেন। এছাড়া জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলো অভ্যাস এবং দক্ষতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কি ভাবে নিজের দৈহিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হয়, কিভাবে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে হয়, কিভাবে ঘর পরিষ্কার রাখতে হয়—এই সব শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া কিছু ব্যায়ামের ব্যবস্থাও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। হাতের কাজকে পাঠ্যক্রমে তিনি স্থান দিয়েছিলেন।

মন্তেস্বরীর শিক্ষাপদ্ধতি (Montessari's Method of Teaching):

মন্তেস্বরীর শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল শিক্ষণ-পদ্ধতি। বিশেষ করে তিনি শিক্ষা-পদ্ধতিতে নানা দিক থেকে নতুনত্ব এনেছেন। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতি প্রধানতঃ তিনটে মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার (sense training) উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই আমরা বহির্জগৎ থেকে জ্ঞান আহরণ করি। তিনি মনে করতেন মানসিক অনগ্রসরতার (Mental difficiency) জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী হ'ল ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের অক্ষমতার দরুণ অনগ্রসরতা দেখা দেয়। তাই শিশুকে শিক্ষা দিতে হ'লে প্রথমে তার ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষণ সাধন করতে হবে। এই কারণে তিনি বিভিন্ন ধরনের ডিডাকৃটিক যন্ত্র তৈরী করেন যার মাধ্যমে শিশুরা সহজেই বিভিন্ন ধরনের উদ্‌বোধকের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি তার পূর্বস্থরীদের মত শিশুর আত্মপ্রচেষ্টার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় যা শিখবে তাই হবে প্রকৃত শিক্ষা। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার্থীরা যখন নিজেরা কোন জিনিস শিখবে, তখন তাতে তারা আনন্দ পাবে এবং শিক্ষা তাদের কাছে অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। তাঁর ডিডাকৃটিক যন্ত্রে শিক্ষার্থীদের ভুল ও ত্রুটি দূর করার জন্য আচরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। এতে ক'রে সব রকম মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে সহজে শিক্ষাদান করা যায়। এই ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতিকে তিনি স্বয়ং শিক্ষা (auto-education) বলেছেন।

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীদের স্বয়ং শিক্ষার সুযোগ দিতে হ'লে, তাকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। মন্তেশ্বরী বলেছেন, শিক্ষা হ'ল আত্ম-ক্ষমতার বিকাশ। আর সেই আত্ম-ক্ষমতার বিকাশ পরিপূর্ণ ভাবে করতে হ'লে শিশুকে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। তিনি এই স্বাধীনতাকে শিক্ষার একমাত্র যোগ্য মাধ্যম (Medium) হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"The school must permit the free, natural manifestation of the child if he is to be studied in a scientific manner. The method of observation is established upon one fundamental base—the liberty of the pupils in their spontaneous manifestations, necessitates independence of action on the part of the child."

মন্তেশ্বরীর শিক্ষা-পদ্ধতি এই তিনটে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সার্থক ভাবে শিক্ষা পরিচালনা করতে হ'লে প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জন করতে হবে (Principle of sense-training)। ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জন

ক'রে তাকে জ্ঞান আহরণের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষার্থীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে কাজ করার (Principle of liberty) এবং এই স্বাধীনতার মধ্যে শিশুরা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে (Dedactic apparatus) নিজেরাই শিখবে (auto-education)। মন্তেস্বরী এই পদ্ধতির শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা করেননি, তিনি শিক্ষাদানের পদ্ধতিও প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন।

তিনি ছ' বছর পর্যন্ত বয়স শিশুদের শিক্ষার জন্য এই তিন ধরনের অনুশীলন পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন—

॥ এক ॥ **জীবনোপযোগী কাজের অনুশীলন (Exercises for Practical Life):**

তিনি শিক্ষার্থীদের জীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু সাধারণ কাজের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দাঁত মাজা, নখ কাটা, আসবাবপত্র পরিষ্কার করা, জুতো পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ শিশুদের শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে। মন্তেস্বরী মনে করতেন, পরনির্ভরশীলতা স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, তাই তাকে পরবর্তী স্তরে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হ'লে প্রথমে আত্মনির্ভরশীল হ'তে হবে এবং এই কারণেই তিনি এই ধরনের ছোটখাটো দৈনন্দিন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এছাড়া, শিশুদের দেহের পেশী সঞ্চালনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যায়ামেরও কিছু ব্যবস্থা করেছিলেন। এই শিক্ষা দেওয়ার জন্যও তিনি বিভিন্ন রকমের যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্য নেন। হাতের কাজ, হাঁটা ইত্যাদির মাধ্যমে এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা মন্তেস্বরী করেন। এই সব কাজের মাধ্যমে দু'রকম ফল পাওয়া যায়। একদিকে শিশুর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ দৈহিক বিকাশ হয় এবং অন্যদিকে জীবনের প্রত্যক্ষ কাজের সঙ্গে তাদের পরিচিতি হয় এবং সেই অনুযায়ী তারা প্রশিক্ষণ লাভ করে।

॥ দুই ॥ **ইন্দ্রিয় পরিমার্জনমূলক অনুশীলন (Exercises for Sense-training):**

মন্তেস্বরী তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষণ, চিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। এই কারণে তিনি বিভিন্ন

ধরনের ডিডাকটিক্ যন্ত্রের (Dedactic apparatus) আবিষ্কার করেন। এই সব যন্ত্রের দ্বারা শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিকাশ হয় এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-উপযোগী দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি আসে। এই ধরনের যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে কাঠের বিভিন্ন আকারের টুকরো, কাগজ, আসবাব-পত্র, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, পেন্সিল, বিভিন্ন রঙের উল, বাক্স, ঘন্টা, ঝনক, রঙ, বিভিন্ন তাপমাত্রার জল ইত্যাদি। এই সব বস্তুর সাহায্যে শিশুদের আকার, ওজন, স্পর্শ, শ্রবণ এবং রঙ্ প্রভৃতির প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা গঠনে সহায়তা করা হয়। স্পর্শেন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রার জল পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। অনেক সময় শিরিশ কাগজও স্পর্শ করতে দেওয়া হয়। আকার সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাঠের চোঙ্ (cylinder) এবং বিভিন্ন ধরনের কাঠের টুকরা ব্যবহার করা হয়। শব্দানুভূতি জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন বাক্সে বিভিন্ন পরিমাণ পাথরের নুড়ি রেখে শব্দ উৎপাদন করা হয়। ওজন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ওজনের জিনিস তুলনামূলক ভাবে পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। রঙের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য বিভিন্ন রঙের কাঠ এবং উল পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। এইসব ডিডাকটিক যন্ত্রের সাহায্যে শিক্ষাদানের পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনটি মনোবিজ্ঞানসম্মত মূলনীতির উপর এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত। সংযোগ (Association), প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognition) এবং পুনরুদ্রেক (Recall) এই তিন পর্যায়ে মানসিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।

॥ তিন ॥ **লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষার অনুশীলন (Exercises for Teaching 3R's) :**

ইন্দ্রিয়ের প্রশিক্ষণের পর আসে লেখা, পড়া ও গণিত শিক্ষা। মন্তেশ্বরী পদ্ধতিতে পড়ার (Reading) আগে লেখা (Writing) শেখানো হয়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে মন্তেশ্বরী শিক্ষা সঞ্চালনের তত্ত্ব (Transfer of training) কে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। সাধারণ প্রস্তুতিমূলক সঞ্চালনকে ধীরে ধীরে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় এই পদ্ধতিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন "Preparatory movements could be converted and reduced to a mechanism by means of repeated exercises, not in the work itself, but in that which prepares for it."

হাতের লেখা শেখানোর জন্য তিনটে স্তরের উল্লেখ করেছেন—(১) প্রথমে

বিভিন্ন বর্ণের আকারের সঙ্গে পরিচিত হওয়া (Recognition of form of different alphabet)। শিক্ষার্থীকে এই আকার সম্পর্কে পরিচিত করার জন্য শিরিশ কাগজে বিভিন্ন বর্ণ কেটে বোর্ডের মধ্যে আঁঠা দিয়ে আটকানো হয় এবং তাদের হাতের দ্বারা স্পর্শ ক'রে অনুভব করতে দেওয়া হয়। এরপর ধীরে ধীরে পেন্সিলের ব্যবহার ক'রে সেই স্পর্শানুভূতিকে সঞ্চালিত করা হয়। (২) শিক্ষার্থীরা যখন এইভাবে বর্ণগুলোর উপর হাত দিয়ে স্পর্শ করতে অভ্যাস করতে থাকে তখন শিক্ষিকা সেগুলোর উচ্চারণ তাদের শোনান। শিশুদেরও ঐ শব্দ পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়। এমনি ভাবে পড়ারও প্রস্তুতি হ'তে থাকে। (৩) পরবর্তী পর্যায়ে শিশুদের বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে পেন্‌সিলের উপর আয়ত্ত আনার চেষ্টা করা হয়। এইজন্য একটা পাতলা চার কোনা লোহার ফ্রেম ব্যবহার করা হয়। ঐ ফ্রেমটা কাগজের উপর রেখে পেন্‌সিল দিয়ে ওর ভেতরের এবং বাইরের ধার বরাবর লাইন টানতে বলা হয়।

'পড়া' শেখানোর ব্যাপারে মন্তেস্বরী বলেছেন—লেখার সময় যে প্রস্তুতি আসবে তার সঞ্চালনের মাধ্যমে শিশুরা পড়তে শিখবে। পড়া শেখানোর জন্য মন্তেস্বরী কার্ড ব্যবহার করেছেন। এক একটি কার্ডে বিভিন্ন শব্দ লেখা থাকে। শব্দগুলো সাধারণতঃ শিশুর পরিচিত বস্তুর নাম। সে শব্দগুলো বার বার পুনরাবৃত্তি ক'রে এবং যখন ঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে তখন সে কার্ডটাকে ঠিক সেই বস্তুর নিচে রাখতে বলা হয়, যার নাম ওতে লেখা আছে। বাক্য শেখানোর ক্ষেত্রেও ঐ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

গণিত শিক্ষা মন্তেস্বরীর মতে লেখা এবং পড়া শিক্ষার পর হবে। তবে গণিত শেখানোর জন্য তিনি নতুন কিছু পদ্ধতির কথা বলেননি। প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে গণনা শিক্ষা এবং অন্যান্য গণিতের কৌশল শেখানোর জন্য "লং স্টেয়ার" (Long stair) ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে নানা রকম হাতের কাজ এবং চারিত্রিক গুণ বিকাশের উপযোগী বিভিন্ন রকমের পাঠেরও ব্যবস্থা করা হ'য়ে থাকে।

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে শিক্ষক (Teacher in Montessari System) :

মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে শিশুকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হ'য়েছে এবং স্বয়ং শিক্ষার (auto-education) উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাই তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষিকার দায়িত্ব হ'ল শিশুদের এই স্বয়ং শিক্ষার প্রক্রিয়াকে

নির্ধারিত পথে পরিচালনা করা। শিক্ষিকার কাজ হবে সঠিকভাবে শিশুদের পরিচালনা করা। তাঁর পদ্ধতিতে শিক্ষিকাকে তাই পরিচালিকা (Directress) বলা হয়। পরিচালিকা শিশুদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং একান্ত প্রয়োজন হ'লে তাদের সাহায্য করবেন। তিনি স্বয়ং শিক্ষার প্রক্রিয়াকে অন্তরাল থেকে পরিচালনা করবেন। মন্তেস্বরী শিক্ষিকার গুণাবলী সম্পর্কে বলেছেন—"Virtues and not words are the main qualifications of the teacher. She should be partly a scientist, partly a doctor and completly religious."

॥ **আলোচনা** ॥

মন্তেস্বরীর শিক্ষাচিন্তা আধুনিক শিক্ষাতত্ত্বকে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে। বিশেষ ক'রে তার প্রবর্তিত পদ্ধতি আধুনিককালে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে অনবদ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। মন্তেস্বরী চিকিৎসক হিসেবে তাঁর জীবন শুরু করেন, ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বিজ্ঞানসম্মত। তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষাক্ষেত্রে পদ্ধতি উপকরণই শেষ কথা নয়; বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ ছাড়া শিক্ষা সার্থক হবে না।

ফ্রয়েবেলের মত তিনি ইন্দ্রিয় পরিমার্জনার (sense-training) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই দিক থেকে তাঁর তত্ত্ব মনোবিদ্যাসম্মত। তিনি জীবনের উপযোগী প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন, স্বয়ং শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; অবশেষে তিনি শিক্ষার্থীর অবাধ স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সব তত্ত্বগুলোকে তার শিক্ষার মধ্যে স্থান দেওয়ায়, তার পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের (Teaching) চেয়ে শিক্ষণের (Learning) উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক সকল শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বর্তমান।

মন্তেস্বরী শ্রেণী-শিক্ষার পরিবর্তে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত শিক্ষার (Individual teaching) উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আধুনিক মনোবিদ্যার একটি পরীক্ষামূলক তত্ত্বকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন (Theory of individual difference)। প্রত্যেক শিশুকে পৃথকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, পৃথকভাবে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। তাই তিনি ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের (individualized instruction) ব্যবস্থা করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মন্তেস্বরীর তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় শিশুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়েছেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আন্দোলনকে তিনি আরো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন—"The childs' soul which is pure and very sensitive, requires our most delicate care." তিনি শিশুদের সহানুভূতিশীল মনোভাব নিয়ে দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর কাছে শিশুরা হ'ল ভগবানের অংশ, আর শিক্ষালয় হ'ল তাঁর কাছে মন্দির। তিনি তাঁর নীতিকে প্রয়োগ করার জন্য যে 'শিশু নিকেতন' স্থাপন করেন, সেখানে শিশুদের এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখা হ'ত। মন্তেস্বরী এই মতবাদ প্রচারের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভারতবর্ষেও কিছুদিন তিনি ছিলেন এবং তাঁর পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন।

ডিডাকৃটিক যন্ত্রের আবিষ্কার তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে অভিনবত্ব এনেছে। এই সব স্বয়ং শিক্ষার উপকরণের উপযোগীতা তিনি সর্বসমক্ষে প্রমাণ করেছেন। শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর ধারণা শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের সৃষ্টি করেছে। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুই হবে সক্রিয় সত্তা—শিক্ষক হবেন তার পরিচালক এবং সহায়ক। তিনি প্রয়োজন ছাড়া শিশুর স্বাভাবিক কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। মন্তেস্বরী তাঁর বৈশিষ্ট্য গতানুগতিক শিক্ষকের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন —"Instead of facility of speech, she has to acquire the power of silence ; instead of teaching, she has to observe ; instead of the proud dignity one who claims to be.unfallible, she assumes the gesture of humanity."

মন্তেস্বরীর পদ্ধতির অসুবিধা সম্পর্কে আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। কিন্তু তার বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, আধুনিককালে তার বহুল প্রচার হ'য়েছে। এর একমাত্র কারণ, গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক উন্নত।

॥ আলোচনা ॥

ফ্রয়েবেল ও মন্তেস্বরী (Froebel and Montessari):

ফ্রয়েবেল এবং মন্তেস্বরী দু'জনেই শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছেন, তাঁদের মতবাদ এবং পদ্ধতির মধ্যে অনেক মিল আছে। তাই অনেকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে একজনের মতবাদ আর একজনের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। তাঁদের মতবাদের মধ্যে মিলও যেমন

আছে অমিলও প্রচুর—(১) তাঁরা উভয়েই প্রাক্ শিক্ষালয় (pre-school) স্তরের শিশুদের জন্ম শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। (২) দু'জনেই শিক্ষাকে ব্যক্তির আত্মবিকাশ (unfoldment) হিসেবে বিবেচনা করেন। (৩) ফ্রয়েবেল আত্মসক্রিয়তাকে (self-activity) এবং মন্তেস্বরী স্বয়ং শিক্ষাকে (auto-education) শিক্ষার একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। (৪) দু'জনেই শিশুর শিক্ষার জন্ম স্বাধীন পরিবেশের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। (৫) উভয়েই ইন্দ্রিয় মার্জনার কথা বলেছেন। তাই ফ্রয়েবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি এবং মন্তেস্বরীর পদ্ধতিতে আমরা বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা দেখতে পাই। (৬) শিক্ষকের দায়িত্ব সম্পর্কে দু'জনে একই মত প্রকাশ করেছেন। (৭) দু'জন শিক্ষাবিদ্ই তাঁদের শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগের জন্ম নিজস্ব বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এত মিল থাকা সত্ত্বেও তাঁদের পদ্ধতি ও চিন্তাধারার মধ্যে নিম্নলিখিত দিক থেকে অমিল আছে—

॥ এক ॥ ফ্রয়েবেলের শিক্ষাতত্ত্ব বিশেষভাবে দার্শনিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু মন্তেস্বরীর শিক্ষাতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত। ফ্রয়েবেল তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু মন্তেস্বরী ক্ষীণবুদ্ধি শিশুদের পরিচালনা করতে গিয়ে যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তাকেই শিশু কল্যাণের জন্ম শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

॥ দুই ॥ ফ্রয়েবেল তাঁর কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিশুকে দলগতভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মন্তেস্বরী শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা হ'ল ব্যক্তিগত শিক্ষা (individualized instruction)।

॥ তিন ॥ মন্তেস্বরী পদ্ধতিতে সামাজিক শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি শিশুর সামাজিক গুণ বিকাশের দিকে কোন গুরুত্বই দেননি। কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বিশেষভাবে শিশুর সামাজিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। এইজন্ম কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে খেলাধূলা, গান, নাচ ইত্যাদিকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগানো হ'য়েছে।

॥ চার ॥ ফ্রয়েবেলের পদ্ধতিতে শিশুর কল্পনা-শক্তি বিকাশের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। তাই কিণ্ডারগার্টেনে তিনি গল্প, গান, অভিনয় ইত্যাদিকে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। কিন্তু মন্তেস্বরী শিশুর কল্পনাশক্তি বিকাশের দিকে গুরুত্ব দেননি।

॥ পাঁচ ॥ মন্তেশ্বরী পদ্ধতিতে আমরা নিয়মমাফিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম কিছু পরিমাণে দেখতে পাই। তিনি পড়া, লেখা এবং গণিত শিক্ষার কথা বলেছেন এবং এই সব বিষয় শিক্ষাদানের কৌশলও প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু ফ্রয়েবেলের পদ্ধতিতে আমরা এই ধরনের নিয়মিত কোন বিষয়ের উল্লেখ পাই না।

॥ ছয় ॥ মন্তেশ্বরী পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবনের কাজের উপর গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে, কিন্তু কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে মাটির কাজ, বাগানের কাজ, কাঠের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে সক্রিয় করার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

॥ সাত ॥ কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত সক্রিয়। তিনি ইচ্ছা করলে শিশুর কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারেন যদি বোঝেন যে, শিশু উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু মন্তেশ্বরী পদ্ধতিতে শিক্ষক একেবারে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার কারণ, ডিডাক্‌টিক যন্ত্রগুলোর মধ্যে আত্ম-ভ্রম সংশোধনের কৌশল (self-correcting) আছে।

॥ আট ॥ সবশেষে, প্রয়োগের দিক থেকে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি অনেক সহজ এবং এই পদ্ধতির প্রয়োগ যে-কোন পরিস্থিতিতে করা যায়। কিন্তু মন্তেশ্বরী পদ্ধতি প্রয়োগের নানা রকম অসুবিধা আছে। সম্পূর্ণ বিদ্যালয়ের পরিচালনার ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করলে, এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না।

প্রশ্নাবলী

1. **Critically consider the contribution of Madame Montessari to child education.** **[N. B.U. ; B. T '65]**

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. **Discuss the relative influence of Pestalozzi, Herbart and Montessari on the development of Modern Educational Practice.** **[N. B. U. ; B. T.'67]**

Ans : ৪৬০ হইতে ৪৬২ পৃষ্ঠা, ৪৩১ হইতে ৪৩৪ পৃষ্ঠা এবং ৪৪২—৪৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. **Critically estimate the contribution of Madame Montessari in the field of instruction.**

Ans : ৪৫৬ হইতে ৪৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জন ডিউই

John Dewey

জন ডিউই-এর শিক্ষা চিন্তা আধুনিক কালে পৃথিবীর সব দেশেরই শিক্ষা পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁর শিক্ষা-দর্শন একদিকে যেমন আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত অন্য দিকে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের ক্ষমতা রেখে তা সংগঠিত। তাঁর শিক্ষা দর্শনের মধ্যে এই উপাদানের সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। এই কারণে তার শিক্ষা-চিন্তা পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই শিক্ষার বিকাশকে সহায়তা করেছে। জন ডিউই-এর শিক্ষাচিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল—তিনি যে শুধু তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করেছেন তাই নয়, পরীক্ষামূলক ভাবে তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে প্রয়োগ করার চেষ্টাও করেছিলেন।

ডিউই-এর জীবন দর্শন (Dewey's Philosophy of Life) :

ডিউই-এর জীবন দর্শনে আমরা তিন ধরনের চিন্তাধারার সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে তিনি প্রকৃতিবাদ (Naturalism) এবং আদর্শবাদকে (Idealism) একদিকে যেমন সমন্বয় সাধন করেছেন তেমনি অপর দিকে তাদের সঙ্গে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের (Theory of Evolution) সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। ফলে তিনি উইলিয়ম জেমস্-এর প্রয়োগবাদ (Pragmatism) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপন করেন। তাই তাঁকে শুধুমাত্র প্রয়োগবাদী (Pragmatist) না ব'লে, তাঁর দর্শনকে পরীক্ষণমূলক প্রয়োগবাদ (Experimental Pragmatism or Instrumentalism) বলা যায়। ডারউইনের (Darwin) মত তিনিও বিশ্বাস করতেন বিশ্বজগৎ চির গঠনশীল এবং এই জগতে জীব-জীবনও সদা পরিবর্তনশীল। তাঁর মতে জীবনেরও চিরন্তন নির্দিষ্ট মান বা লক্ষ্য নেই। জীবনের লক্ষ্য ও মান স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়। মানুষ নিজেই নিজের জীবনাদর্শ নির্ণয় করে। তিনি বলেছেন—"Everything is provisional ; nothing ultimate. Knowledge is always a means, never an end itself" ডিউই বিশ্বাস করতেন জ্ঞান এবং চিন্তা কর্মের সঙ্গে একাত্ম ভাবে সংযুক্ত। প্রত্যেক জ্ঞানকে কর্ম দিয়ে পরীক্ষা ক'রে

দেখতে হবে ; ফলের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এর তাৎপর্য এই নয় যে, ডিউই কর্মকে জ্ঞান ও চিন্তার চেয়ে বড় ক'রে দেখেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হ'ল চিন্তা ও কর্ম একত্রে সমন্বিত হ'লে তাদের যৌগিক ফল জ্ঞানকে সার্থক রূপদান করে।

ডিউই-এর জীবন দর্শনের আর একটি মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল ব্যক্তি এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। আত্মার বিকাশ নির্জনেও হয় না, প্রাকৃতিক পরিবেশেও হয় না। পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের (Natural environment) যেমন দরকার তেমনি মনুষ্য পরিবেশ Human environ ment or social environment)-ও দরকার। (He is a citizen growing and thinking in a vast complex and interactions and relationships.)। তাঁর এই মতবাদকে তিনি আরো বিস্তৃত করে পরিপূর্ণ একক মানব সভ্যতা বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর চিন্তা-ধারার সার অংশ হ'ল ধর্ম, ভাষা, বর্ণ এবং রাষ্ট্র নিরপেক্ষ এক বিশ্বসমাজ গড়ে তোলা। আর শিক্ষা এই আদর্শের পথে সহায়তা করবে।

ডিউই-এর শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Dewey's Educational Philosophy and Educational Aim) :

আধুনিক যুগে দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি শিক্ষাকে এক অপরিহার্য প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জীবনের ক্ষেত্রে পুষ্টিকর খাদ্যের যেমন প্রয়োজনীয়তা, সমাজ-জীবনের পক্ষে শিক্ষারও প্রয়োজনীয়তা রকম। তিনি বলেছেন—"What nutrition and reproduction are to physiological life education is to social life." শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের উৎকর্ষণ হয়। শিক্ষা ব্যক্তির সেই সব গুণের বিকাশ করবে, যার দ্বারা ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে পারবে এবং সমাজ জীবনের দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করতে সক্ষম হবে। তিনি বলেছেন—"Education is development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his responsibilities." শিক্ষা তাঁর কাছে দ্বিমুখী প্রক্রিয়া (Dipolar process)। একদিকে আছে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য, অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশ। এই দুই দলের

(force) মধ্যে সার্থক সমন্বয়ের মধ্যেই শিক্ষা। ডিউই-এর শিক্ষা দর্শনকে বিশ্লেষণ করলে, চারটে মূল উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়—(১) শিক্ষাই হ'ল বিকাশ (Education is growth), (২) শিক্ষাই জীবন (Education is life), (৩) শিক্ষাই হ'ল সামাজিক উৎকর্ষণের উপায় (Education as means of gaining social efficiency) এবং (৪) শিক্ষাই অভিজ্ঞতার পুনর্সংগঠনের মাধ্যম (Education as reconstruction of experience)।

ডিউই বিশ্বাস করেন, জীবনের ধর্ম হ'ল বিকাশ, আর সেই বিকাশের কোন শেষ নেই। শিক্ষার কাজ হ'ল সেই বিকাশে সহায়তা করা। এই বিকাশের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। বিকাশ অভিমুখীতাই এই বিকাশের মূল কথা। তেমনি শিক্ষাভিমুখীতাই শিক্ষার মূল ধর্ম। শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিপক্বতার মাধ্যমে শিক্ষা তার মধ্যে জীবনব্যাপী জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ক'রে তুলবে। ডিউই-এর শিক্ষা দর্শনের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল—তিনি শিক্ষা এবং জীবনকে পৃথকভাবে দেখেননি। শিক্ষাকে তিনি জীবনোপযোগী কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেননি। শিক্ষাই তার কাছে জীবন (Education is life itself)। তিনি বলেছেন—"Life is a byproduct of activities and education is born out of these activities." শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী প্রকৃত জীবন সমস্যার সঙ্গে পরিচিত হবে, এবং এই সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের শিক্ষা হবে। এইজন্য তিনি শিক্ষালয়ের জীবনের সঙ্গে সমাজ জীবনের সম্পর্ক স্থাপন করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিক্ষালয়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের জীবনের প্রত্যক্ষ পরিস্থিতিকে নির্ভিক ভাবে গ্রহণ করতে এবং তার সমাধান করতে শেখাতে হবে। শিক্ষার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে তিনি শিক্ষার্থীর সামাজিক সক্ষমতা (social efficiency) বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষ সামাজিক জীব ; এবং সে সব সময় জীবন বিকাশের জন্য সমাজ থেকেই শক্তি সঞ্চয় করছে, সমাজ থেকে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করছে। সমাজ চেতনার মাধ্যমেই তার রুচি, ভাষা অভ্যাস এবং সকল রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হয়। শিক্ষার কাজ হবে অসামাজিক, অপরিপক্ব শিশুকে সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় শিক্ষা হ'ল এক ধরনের সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সামাজিক সক্ষমতার (Social efficiency) বিকাশই হ'ল শিক্ষার উদ্দেশ্য। সবশেষে, ডিউই

বলেছেন, শিক্ষা হ'ল অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজ জীবনের বিকাশের প্রক্রিয়া। তিনি বলেছেন—"We should so regulate the learning and experiencing activities of the young, that a newer and better society will arise in the end." প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিকে নতুন অভিজ্ঞতাভিমুখী ক'রে তোলে এবং প্রত্যেক নতুন অভিজ্ঞতা অতীত অভিজ্ঞতার পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে সহায়তা করে। জীবন এবং শিক্ষা অবিচ্ছিন্ন-ধর্মী, আর প্রত্যেক অভিজ্ঞতাই এই অবিচ্ছিন্ন বহমানতাকে বজায় রাখতে সহায়তা করে। জীবন হ'ল—জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার স্রোতে ভেসে যাওয়া জীবনী-শক্তির প্রকাশ মাত্র। ব্যক্তির জীবন বিকাশের জন্য তাই প্রয়োজন অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার ধারা। শিক্ষার্থীকে অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিয়ে তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক জীবনের বিকাশে সহায়তা করতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষাই সে কাজ করতে পারে অর্থাৎ, তাঁর মতে শিক্ষা হ'ল এক ধরনের প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনঃসংযোজন সাধিত হয়।

ডিউই শিক্ষার চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। শিক্ষার নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য তিনি স্থির ক'রে দেননি। তিনি মনে করেন যেহেতু প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ উভয়েই পরিবর্তনশীল, সেহেতু শিক্ষার কোন স্থির লক্ষ্য নির্ণয় করা যায় না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সর্বকালের জন্য স্থির হ'তে পারে না। তাঁর ধারণা অনুযায়ী শিক্ষাই জীবন। পরিবর্তনশীল জীবনের উপযোগী শিক্ষার জন্য পরিবর্তনশীল লক্ষ্যই প্রয়োজন। তাই সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যকেও নতুন ক'রে স্থির করতে হবে। গতানুগতিক কোন নিয়মবাধা পথে শিক্ষা যদি এগিয়ে চলে তা জীবনধর্মী হ'তে পারবে না।

ডিউই-এর পাঠ্যক্রম (Dewey's Curriculum) :

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে ডিউই-এর বক্তব্যের মধ্যেও নতুনত্ব আছে। তিনি পাঠ্যক্রমের সর্বাধুনিক সংব্যাখ্যান দিয়েছেন। তাঁর মতে পাঠ্যক্রম বলতে শুধুমাত্র পাঠ্য-বিষয় বা বইয়ের অন্তর্গত জ্ঞানকে বোঝায় না। বিশেষ নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বা পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত জ্ঞানের মাধ্যমে মানব-অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। তাঁর মধ্যে সৃজনাত্মক উপাদান নেই। তাই পাঠ্যক্রম বলতে তিনি শিক্ষার্থীর সকল রকম অভিজ্ঞতাকেই বুঝিয়েছেন। শিশু আত্মসচেতনার মাধ্যমে যে সব

কাজ করবে এবং যত অভিজ্ঞতা অর্জন করবে তাই তার পাঠ্যক্রম। পাঠ্যক্রম বাইরের কোন সংস্থার দ্বারা শিশুর উপর আরোপিত জ্ঞানের সমষ্টি নয়। এই জন্য তিনি পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তু ঠিক ক'রে দেননি। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তাদের আগ্রহ, প্রবণতা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের পাঠ্যক্রম রচনা করবে। তাঁর মতে পাঠ্যক্রমের মধ্যে এমন সব কাজ এবং সমস্যা থাকবে যার সম্পাদন ও সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন ও পুনঃ সংযোজন করতে সক্ষম হবে। এইজন্য তিনি বৃত্তিমূলক কাজ এবং হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তার পাঠ্যক্রমের মধ্যে। এছাড়া ব্যক্তি-জীবনের উন্নতির জন্য নৈতিক এবং ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করার ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন, এবং অনুরূপ ভাবে পাঠ্যক্রম রচনার কথা বলেছেন। কিন্তু এই ধরনের শিক্ষার জন্যও যে পাঠ্যক্রম হবে তাও অভিজ্ঞতা এবং কর্মভিত্তিক। শুধুমাত্র মৌখিক জ্ঞানের দ্বারা নীতিবোধ জাগালে চলবে না। শিক্ষার্থীকে যথাযোগ্য পরিস্থিতিতে স্থাপন ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমকে তার সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সমাজ-জীবনে যে সব অভিজ্ঞতার চাহিদা সে অনুভব করবে, তাই দিয়ে রচনা করবে তার নিজের জন্য পাঠ্যক্রম এবং সেটাই হবে তার কাছে আদর্শ পাঠ্যক্রম। তিনি বিশ্বাস করেন, "Purposeful activity and a curriculam comprising standard factors of social life, would give the children more interest and insight, through the functioning of intelligence and will, in the achievement of self-control and the appreciation of social values." শিশুর সামাজিক চাহিদা এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য উভয়ের উপর সমান গুরুত্ব দিতে হবে তার পাঠ্যক্রম রচনার সময় এবং তা সম্ভব কেবলমাত্র উদ্দেশ্যমুখী কর্মের মাধ্যমে যদি পাঠ্যক্রম রচনা করা যায়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন এবং কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম (Activity curriculum) রচনা করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ডিউই-এর শিক্ষাদানের পরিকল্পনা (Dewey's Scheme of Education):

ডিউই শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করারও পক্ষপাতী ছিলেন। তাই তিনি সম্পূর্ণ শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকে শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সমতা

রেখে রচনা করার কথা বলেছেন। শিশুর জীবনকে তিনি মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনটে পর্যায় বা স্তরে ভাগ করেছেন—(এক) খেলার প্রাধান্যমূলক স্তর (Play period), (দুই) স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের স্তর (Period of spontaneous attention) এবং (তিন) মননশীল মনোযোগের স্তর (Period of reflective attention)। প্রথম স্তরের সময়কাল হিসেবে তিনি ৪ থেকে ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত নির্দেশ করেছেন। এই স্তরের প্রথমের দিকে শিশু পরিবারের (Home) মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজের অনুশীলন করে খেলার মাধ্যমে। এর পরে, গৃহ পরিবেশ ছাড়াও সমাজের অন্যান্য কাজও সে অনুশীলন করতে আরম্ভ করে ; বিশেষভাবে সেই সব কাজের প্রতি তার ঝোঁক দেখা যায় যার জন্য তার পরিবারকে সমাজের উপর নির্ভর করতে হয় এবং অবশেষে, এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সে অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবে। ডিউই বলেছেন, এই স্তরেরই শেষের দিকে শিশুকে সাধারণ ভাবে লেখা, পড়া এবং ভূগোল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দিতে হবে।

দ্বিতীয় স্তরের সময়কাল হিসেবে ডিউই ১২ বৎসর (৮—১২) বয়স সীমাকে নির্দেশ করেছেন। এই বয়সে শিশুরা লক্ষ্য এবং উপায় (Means and ends)-এর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। এখন সে জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যা সমাধানের উপযোগী হ'য়ে উঠে। এই সময় থেকে তাকে প্রত্যক্ষ সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। বিভিন্ন ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে তাকে স্থাপন ক'রে সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিতে হবে। এ ছাড়া এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সমাজ বিদ্যা (Social studies) পড়ানোর কথা বলেছেন। কারণ, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানব সভ্যতার বিকাশের ধারার সঙ্গে পরিচিত হবে। সে বুঝতে শিখবে, কিভাবে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুগে যুগে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাকে আয়ত্তে এনেছে। ১২ বৎসরের পরবর্তী কালকে তিনি মননশীল মনোযোগের স্তর হিসেবে নির্দেশ করেছেন। এই বয়সের পর শিশুরা নতুন নতুন সমস্যার নিজেরাই সৃষ্টি করতে পারে এবং নিজেরাই সমাধান করতে পারে। এই স্তরের শিক্ষা এমন হওয়ার দরকার যে, তার পরেই শিক্ষার্থীরা সমাজ-জীবন যাপনের উপযোগী হয়।

ডিউই শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনোবিদ্যা সম্মত ক'রে রচনা করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন মন হ'ল সক্রিয়তার ফল এবং সক্রিয়তার মাধ্যমেই তার বিকাশ হয়। মনের চিন্তন-প্রক্রিয়াকে জাগ্রত করার জন্য উদ্‌বোধকের

প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যসাধক সমস্যাভিত্তিক না হ'লে চিন্তন প্রক্রিয়ার পেছনে প্রেরণা থাকতে পারে না। শিক্ষা-পদ্ধতির পরিকল্পনা রচনা করতে গিয়ে ডিউই এই তত্ত্বকে প্রয়োগ করেছেন। শিশুর আগ্রহ এবং প্রবণতাকে কাজে লাগাতে হ'লে শিক্ষাকে সমস্যা-ভিত্তিক করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহ এবং প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ নির্বাচন করবে এবং যখনই সে এই ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তখনই সে তার সমাধানের কথা চিন্তা করবে। এই সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং পরে সেগুলোকে সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাবে। এই ভাবে যখন সে সমস্যা সমাধান করতে পারবে, তখন সেই জ্ঞান সে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রে পরীক্ষা করবে। এই পদ্ধতিকে ডিউই নাম দিয়েছেন 'সমস্যামূলক পদ্ধতি (Problem Method)'। পরবর্তিকালে এই পদ্ধতির সংস্কার সাধনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে প্রোজেক্ট পদ্ধতি (Project Method)।

ডিউই-এর এই পদ্ধতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাঁচটি সোপান বা স্তর দেখতে পাই। তিনি বলেছেন, এই সমস্যা পদ্ধতিতে পাঁচটি স্তর অবশ্যই থাকা প্রয়োজন এবং এর প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য। এই পাঁচটি স্তর হ'ল—

[এক] প্রথম স্তরে শিক্ষার্থী পরিস্থিতিকে এমন ভাবে সাজাবে যাতে ক'রে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক ভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে তার প্রবণতা অনুযায়ী। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে যখনই সে বাধার সম্মুখীন হবে তখনই সমস্যার সৃষ্টি হবে। তাই সমস্যা সৃষ্টি করা শিক্ষার্থীর নিজেরই কাজ।

[দুই] এই ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'লে শিক্ষার্থী তা সমাধানের জন্য বিভিন্ন ধরনের সম্ভাব্য কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করতে আরম্ভ করবে। এটাই হ'ল দ্বিতীয় স্তর। এখানেও শিক্ষার্থী মানসিক স্তরে সক্রিয়।

[তিন] পরবর্তী স্তরে সে তার চিন্তা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম বা তথ্য সংগ্রহে অগ্রসর হবে। কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের জন্য তার যে সব হাতিয়ার বা তথ্যের প্রয়োজন তা সে সমস্ত [illegible] মধ্যে সংগ্রহ করবে।

[চার] এর পর চতুর্থ স্তরে সে সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম সম্পাদন করবে। তার চিন্তালব্ধ পদ্ধতিতে অগ্রসর হ'য়ে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমস্যার প্রকৃত সমাধান করবে।

[পাঁচ] সবশেষে, সে বিশেষ সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলো, তা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ ক'রে তার যথার্থতা বিচার করবে, তবেই জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে।

ডিউই-এর এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক ভাবে কাজ করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সমবেত চেষ্টা বিশেষে কোন সমস্যার সমাধান করে। এই সমবেত ভাবে কাজ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে সামাজিক মনোভাবের বিকাশ হয়। ফলে, তাঁর এই শিক্ষা-পদ্ধতি তাঁর শিক্ষার দ্বিমুখী উদ্দেশ্যের অনুকূল।

ডিউই-এর শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষকের দায়িত্ব (The role of teacher in Dewey's Scheme of Education):

ডিউই-এর শিক্ষা পদ্ধতিতে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করবে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষক বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন, তিনি পরিকল্পনা রচনা করেন, তিনিই পাঠদান করেন এবং সবশেষে ছাত্রদের জ্ঞান প্রয়োগ করার সুযোগ দেন। কিন্তু ডিউই-এর পদ্ধতিতে এই প্রত্যেকটি পর্যায়েই শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং ডিউই বলেছেন, শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করবেন না। তবে তিনি পরোক্ষভাবে পাঠের সব অংশেই অংশ গ্রহণ করবেন। তাঁর দায়িত্ব গতানুগতিক পাঠদানের দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশী। শিক্ষার্থীরা যখন সমস্যা নির্ধারণ করবে, তখন তিনি পরোক্ষভাবে তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করবেন। তার কারণ সমস্যা যাতে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উপযুক্ত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই তিনি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে তাদের বিষয়-নির্বাচনে সহায়তা করবেন। তিনি সব সময় সচেতন থাকবেন বিশেষ শিক্ষার্থী যে বিশেষ সমস্যা নির্বাচন করেছে, তা সে তার মানসিক ক্ষমতার দ্বারা সমাধান করতে সক্ষম। এছাড়া সমস্যাগুলো যাতে জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বন্ধু, সহায়ক এবং যোগ্য নির্দেশকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

ডিউই-এর শিক্ষাতত্ত্বের প্রয়োগ (Application of Dewey's Educational Theory) :

ডিউই তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে প্রত্যক্ষরূপ দেওয়ার জন্য ১৮৯৬ সালে শিকাগোতে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় গবেষণামূলক বিদ্যালয় (Laboratory or Experimental School) নামে পরিচিত। এখানে ডিউই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ ক'রে যাচাই ক'রে দেখেন। এই বিদ্যালয়ে গতানুগতিক কোন উপকরণ ছিল না। এমন কি তিনি এখানে কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী পাঠ পরিচালনার ব্যবস্থা করেননি। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজের ইচ্ছানুযায়ী সমস্যা নির্বাচন করতো। সব শিক্ষার্থীকে একটা সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত করা হ'ত। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঠিক সামাজিক নিয়মে বিষয় নির্বাচনের পর শিক্ষার্থীরা দলগত ভাবে তার সমাধানে অগ্রসর হ'ত। শিক্ষক তাদের সহায়করূপে কাজ করতেন, শিক্ষার্থীদের সমস্যা হিসেবে হাতের কাজ, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক খেলা দেওয়া হ'ত। এছাড়া নানা ধরনের বাস্তব সমস্যাও দেওয়া হ'ত যার সমাধানের জন্য তাদের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন হতো। এমনি ভাবে বিভিন্ন কাজের বা সমস্যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এই গবেষণামূলক বিদ্যালয়ে শিক্ষা করতো। প্রত্যক্ষভাবে সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। ডিউই নিজে এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছন—"In intent whatever the failure in accomplishment, the school was Community Centred."

শিক্ষালয় সম্পর্কে তাঁর যে মতবাদ তার পরিপূর্ণ প্রয়োগ আমরা এই বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তিনি এই বিদ্যালয়কে দ্বিমুখী উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি গতানুগতিক বিদ্যালয় পরিচালনার পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর মতে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে সমাজ-জীবনে যে পরিবর্তন হ'য়েছে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে হ'লে শিক্ষালয়ের পুনর্গঠন প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনকে এই ধরনের পরিবর্তনশীল সমাজের সঙ্গে সার্থক ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য সাহায্য করতে হ'লে শিক্ষালয় সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণাকে পরিবর্তন করতে হবে। এইজন্য তিনি বলেছেন, বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পুনর্বিন্যাস করতে

হবে। তবে সমাজের সব কিছু গুণই তার মধ্যে থাকবে না, তার ভালগুলোই থাকবে। তিনি একে তাই 'Purified, simplified and better balanced society' বলেছেন। সমাজ-জীবনের মাধ্যমেই সামাজিক বিকাশ সম্ভব। তাই তিনি তার গবেষণামূলক বিত্যালয়কে এই আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে শিক্ষার্থীরা সমাজ জীবনের মধ্যে বসবাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চারিত্রিক গুণের চর্চা করতো। ডিউই-এর এই পরিকল্পনার মধ্যে নীতিগত কোন বিশেষ ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রয়োজনমূলক নানা রকম অসুবিধা এই গবেষণামূলক বিত্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষ্য করা গেল। তাই তাঁর অনুগামীরা পরবর্তিকালে ডিউই-এর শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তনের কথা বললেন তাঁর পদ্ধতিরই পরিবর্তনের দ্বারা।

॥ আলোচনা ॥

জন ডিউই-এর শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা তাঁর চিন্তাশীল মনের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। তাঁর শিক্ষাচিন্তা আধুনিক আমেরিকার শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে প্রচুর ভাবে, সেই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নানা ভাবে প্রভাবিত ক'রে। আধুনিক শিক্ষার যে সব বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তার সবকিছু উপাদানই ডিউই-এর শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে বর্তমান ছিল। বহু শতাব্দী ধরে পুনরাবৃত্তির ফলে শিক্ষার মধ্যে যে জড়ত্ব এসে গিয়েছিল, যে শিক্ষায় প্রাণ সঞ্চার করার জন্য রুশো, পেস্তালোৎসী, ফ্রয়েবেল, হার্বার্ট প্রভৃতি চিন্তাবিদ্‌রা প্রচেষ্টা ক'রে গিয়েছিলেন, ডিউই সেই শিক্ষাকে জড়তামুক্ত করেছেন। তাকে বিংশ শতাব্দীর মানব মনের উপযোগী ক'রে গড়ে তোলার সার্থক নির্দেশ দিয়েছেন। তার প্রগতিধর্মী শিক্ষাচিন্তা এবং জীবনাদর্শ শিক্ষার সম্পূর্ণ অঙ্গেই নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়ে গেছে। তাই ডিউইকেই শিক্ষার আধুনিক ভাবধারার প্রতীক বলা যায়। তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর সারসংক্ষেপ উল্লেখ করলে তাঁর অবদানের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে পারা যাবে।

[এক] তিনি শিক্ষকদের সামনে শিক্ষার এক নতুন তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। শিক্ষা এবং জীবন পৃথক নয়। শিক্ষাই জীবন। শিক্ষার এই তাৎপর্য আধুনিক শিক্ষা জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে সর্বজন সমর্থিত।

[দুই] পাঠ্যক্রম রচনার ব্যাপারেও তিনি যে নতুন ধারণার পরিচয় দিয়েছেন তা আধুনিক কালে শিক্ষাজগতে সমর্থিত হ'য়েছে এবং ঐ নীতিকে

মেনে নেওয়া হয়েছে। তিনি পাঠ্যক্রমকে শুধু পাঠ্যবিষয় বলেননি। জীবনের সব অভিজ্ঞতাকে পাঠ্যক্রম বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সক্রিয় পাঠ্যক্রম (Activity Curriculum) রচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

[**তিন**] ডিউই-এর পদ্ধতির মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। তিনি শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানসম্মত করার চেষ্টা করেছেন, শিক্ষার্থীর প্রবণতা, আগ্রহ এবং মানসিক ক্ষমতাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে তেমনি অন্যদিকে সমাজ-জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলেছেন। তাঁর সমস্যাভিত্তিক পদ্ধতিতে (Problem Method) তিনি সমস্যার মাধ্যমে একদিকে শিশুর আগ্রহকে সক্রিয় করার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে সমাজ-জীবনের সঙ্গে তার সার্থক যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

[**চার**] ডিউই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে পরস্পর-বিরোধী দুই মতবাদের সার্থক সমন্বয় করেছেন। বিভিন্ন চিন্তাবিদ্‌ বিভিন্ন যুগে ব্যক্তিতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের যে-কোন একটিকে সমর্থন করে গেছেন। কিন্তু ডিউই বলেছেন, শিক্ষা ব্যক্তির সমাজজীবনের মধ্যে সক্রিয়তার মধ্যেই সংঘটিত হবে। তিনিই প্রথম এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মধ্যে সার্থক সমন্বয় করেছেন। এই সমন্বয়ী চিন্তাধারা আধুনিক শিক্ষার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য।

[**পাঁচ**] জন ডিউই শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছেন। গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হ'ল সহযোগিতামূলক মনোভাব। তাঁর গবেষণামূলক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় সমস্যা সমাধানে নিজেদের নিয়োগ করতো। এছাড়া তিনি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপনের জন্য শিক্ষাকে ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং সকল রকম বিভেদের রেখাকে মুছে ফেলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বলেছেন।

[**ছয়**] তাঁর শিক্ষা-পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ে যে শৃঙ্খলার কথা তিনি বলেছেন, তা শৃঙ্খলার আধুনিক ধারণার মতই। তিনি বলেছেন, শিশুরা নিজের আগ্রহেই কাজ করবে, সুতরাং তার মধ্যে বিশৃঙ্খলার কোন সুযোগ থাকবে না। তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন করবে।

[**সাত**] শিক্ষক সম্পর্কে তাঁর ধারণাও আধুনিক চিন্তা-ধারার অনুরূপ। শিক্ষক হবেন শিক্ষার্থীর বন্ধু এবং নির্দেশক।

সমস্ত দিক বিবেচনা ক'রে বলা যায় জন ডিউই শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা, যার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল

সমন্বয় সাধন (Eclecticism), জন ডিউই তার সূত্রপাত করেছেন। তাঁর শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয়, পদ্ধতির সঙ্গে লক্ষ্যের সমন্বয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সমন্বয়, এতগুলি সমন্বয় দেখতে পাই। তাই তাঁরই এই প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আধুনিক শিক্ষার নবধারার প্রবর্তন হ'য়েছে। এরও হয়তো পরিবর্তন হবে, নিশ্চয়ই হবে, ডিউই তা বিশ্বাস করেন। কিন্তু ডিউই-এর অবদান শিক্ষাক্ষেত্রে চিরকাল স্মরণযোগ্য হ'য়ে থাকবে। তাই রাস্কের একটি সুন্দর মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা এই আলোচনা শেষ করছি। "In education we cannot but be grateful to John Dewey for his great services in challenging the old static cold storage ideal of knowledge and in bringing education more into accord with actualities of present day life."

প্রশ্নাবলী

1. Discuss critically John Dewey's view on Education.

[C. U.; B. T. '62. N. B,U.; B. T. '67]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. Discuss fully the meaning and purpose of Education with reference of Dewey's view on natural development and social efficiency as aims of Education. [N. B. U.; B. T. '64]

Ans : ৪৬৫ হইতে ৪৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

3. Education is essentially a social process. Discuss this dictum of John Dewey. [C. U.; B. T. '61]

Ans : ৪৬৫ হইতে ৪৬৮ পৃষ্ঠা এবং ৪৭৪ হইতে ৪৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

4. Discuss John Dewey's main contribution to Educational theory and Practices. [C. U.; B. A. '53. '61, '66, '68]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
Rabindranath Tagore

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি। কিন্তু মানব-জীবনের এমন কোন অভিজ্ঞতা নেই যাতে তাঁর চিন্তার ছোঁয়াচ লাগেনি। মানব-অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের উপর তিনি তাঁর প্রভাব বিস্তার ক'রে গেছেন। শিক্ষাও তার থেকে বাদ পড়ে নি। তাঁর শিক্ষা-চিন্তা শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তিনি নিজেই তার প্রয়োগও ক'রে গেছেন। তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মধ্যে কল্পনা বিলাসের বিশেষ কোন স্থান নেই। তিনি শিক্ষাকে "অশক্তকে শক্তি দেবার উপায়" হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব বিশেষভাবে বাস্তববাদী।

(১) ॥ **রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন (Rabindranath's Life Philosophy)** ॥

দার্শনিক চিন্তাধারার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভাববাদী (idealist) বলতে পারি। তিনি উপনিষদীয় চিন্তাধারায় প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, সৃষ্টির মূলে আছে এক সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক শক্তি। এই শক্তি সৃষ্টির মধ্যেই সতত প্রকাশমান। পৃথিবীর সবকিছুর মধ্যেই এই সত্তা প্রকাশিত। প্রকৃতি জগতে, মানব সমাজে এবং অন্তর আত্মায়—সর্বত্রই এই শক্তির বিকাশ। একে তিনি বলেছেন বিশ্বচেতনা। এই বিশ্বচেতনা সুসামঞ্জস রূপে সর্বত্র বিরাজমান। তার "একটি প্রকাশ জগতের মাঝে, আর একটি প্রকাশ মানব সমাজে, আর একটি মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং"। রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, মানুষ এই বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধি করার জন্য সতত চেষ্টিত এবং তাঁকে লাভ করা যায় পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে অন্য প্রাণীর পার্থক্য হ'ল সে চেষ্টার দ্বারা লক্ষ্যে পৌছুতে পারে। বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম জেনে মানুষ নিজের নিয়মেই বিকাশ লাভ করে, তার ফলে পরমানন্দ লাভ করে এবং এই পরমানন্দ লাভের মধ্যে তাঁকে লাভ করা হয়। তাই তাঁর জীবনাদর্শের মূল বক্তব্য হ'ল—বিশ্ববৈচিত্র্যেরমাঝে এক শক্তি বিরাজ করছে। বহু বৈচিত্র্যের

মাঝে তার ঐক্যের যে নিয়ম, সেই নিয়মকে জেনে আনন্দরূপে তাকে লাভ করাই হ'ল মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। আর এই লাভ করার পন্থা হিসেবেও তিনি ভারতীয় প্রাচীন দর্শনের মূলতত্ত্বকে অনুসরণ করেছেন। এই পন্থা হ'ল প্রেম আর ভালবাসা। মানুষকে ভালবাসার মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের জীবনে যা অতিরিক্ত তারই অন্তহীন দেশে থাকেন প্রেমের দেবতা, তিনি আমাদের চেতনাকে বিচ্ছেদবোধের মায়া থেকে মুক্ত করেন"···এই মুক্তিই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূল বক্তব্য। তাঁর এই জীবন দর্শনের উপরই ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে তাঁর শিক্ষা-চিন্তা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Rabinbranath's Philosophy and Aim of Education) :

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন দ্বারাই প্রভাবিত। তাঁর এই শিক্ষা-দর্শন একদিকে যেমন ভাববাদী (Idealist) চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত অন্যদিকে প্রয়োগের সময় দেখা যায় তিনি প্রকৃতিবাদী বা স্বভাববাদী (Naturalist) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। তিনি যেমন বিশ্বমানবাত্মার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেছেন, শিক্ষার সংজ্ঞাও দিয়েছেন সেই ভাবে। তিনি বলেছেন—"তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" তিনি গতানুগতিক শিক্ষাকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন, কারণ তার মধ্যে আমাদের দেশের রীতিনীতি, আদর্শ, কোন কিছুকে স্থান দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষ চিরদিনই এই সব নৈতিক গুণগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে; চিরদিনই সে বিশ্বসত্তার বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে এসেছে। তাই তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য, তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতীক হিসেবে যদি দেখা না দেয়, তাহ'লে তা সমাজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে না। অতএব যদি আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের এই সাধনাতে দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে ইহা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।" তিনি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয় করতে গিয়ে ভাববাদী দর্শনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সংযোগ স্থাপন করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি পরিপূর্ণ বিকাশের

অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্তি-জীবনের যে সব গুণের কথা বলেছেন, তাতে ক'রে বোঝায় তিনি ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে সমন্বয়েরই চেষ্টা করেছেন। তিনি শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে—(১) শিক্ষার্থীর জীবন বিকাশ, (২) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করা যার সাহায্যে শিক্ষার্থী বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবে, (৩) শিক্ষার্থীর মধ্যে ধর্মীয় মনোভাব জাগানো, এবং (৪) সামাজিক গুণের বিকাশ সাধনকে স্থির করেছেন। তার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে, মানুষকে তার শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ক'রে গড়ে তোলা, তার প্রকৃত জীবনাদর্শ গঠনে সাহায্য করা, তার প্রকাশ-ভঙ্গীকে ছন্দ-ময় ক'রে তোলা এবং সবশেষে চরিত্রের বলিষ্ঠতা এনে দেওয়া।

-) **রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার পাঠ্যক্রম (Curriculum according to Rabinbranath):**

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-চিন্তায় পাঠ্যক্রমের ব্যাপক সংজ্ঞাকেই গ্রহণ করেছেন। পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে সংস্কৃতির পূর্ণ রূপটি তুলে ধরতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে বিশ্বমানবের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো, তাহ'লে পাঠ্যক্রম হবে এই সংস্কৃতির বাহক। পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এতে "মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়াছে।" রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়কে মানব সংস্কৃতির অনুশীলনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। আর পাঠ্যক্রম রচনার জন্য সেই সব বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে যা মানব-সংস্কৃতিকে প্রকাশ করতে পারে এবং যার মধ্যে 'মনের প্রাণীন ধর্ম' বর্তমান। এইজন্য তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের ভিতর ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সংগীত, নৃত্য, পল্লী-উন্নয়নমূলক কাজ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি ইংরেজী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মাতৃভাষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি গতানুগতিক শিক্ষা সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন—"…ইংরেজী শিখিতে গিয়ে না হইল শেখা না হইল খেলা; প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অধিকার থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনা রাজ্যে প্রবেশ করিবার দ্বার রুদ্ধ রহিল।" ভাষা শিক্ষার জন্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় স্থাপনের জন্য রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ ও মহাভারতকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। অন্যান্য ভাষা শিক্ষার কথাও তিনি বলেছেন, বিশেষ ভাবে সংস্কৃতের কথা। অভ্যন্তর

অগ্রগতির জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন এবং জীবনের অগ্রগতির জন্য সার্থক জীবন দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বিজ্ঞান ও দর্শনকে তিনি পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্তির কথা বলেছেন। তাছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যকে সার্থক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য শিল্পকলাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। আবার শিশুকে তার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করবার জন্য সংগীত ও নৃত্যকলাকেও বিদ্যালয়ে চর্চা করতে হবে। সবশেষে, সমাজ-জীবনের প্রতি সমবেদনামূলক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য এবং শিক্ষার্থীর সামাজিক বিকাশে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা রাখতে হবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠ্যক্রমের ভিতর সম্পূর্ণ মানবের শিক্ষার উপযোগী বিষয় নির্বাচন করেছেন।

) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতি (Method of teaching according to Rabindranath):

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক শিক্ষা-পদ্ধতিকে সমালোচনা করেছেন; কিন্তু আধুনিক পরস্পর-বিরোধী শিক্ষাপদ্ধতিরও কোন একটিকে মেনে নেননি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শিক্ষা-কৌশল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রকম। তাকে একই নিয়মের বন্ধনে বেঁধে ফেলা যায় না। "সুখও তাঁকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাঁকে শিক্ষা দেয়; শাসন নইলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নইলেও তাহার রক্ষা নাই।" রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-পদ্ধতি তিনটে মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত—(১) স্বাধীনতা (Freedom), (২) সৃজনশীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ (Creative self-expression) এবং (৩) প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংযোগ (Active communication with nature and man)।

স্বাধীনতা বলতে রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাচারের অধিকারকে বোঝাননি। এর অর্থ হ'ল ব্যক্তিত্বের সমস্ত শক্তি উন্মোচন করা এবং বন্ধনমুক্ত এই শক্তিগুলোর সাহায্যে বিশ্বের চিরন্তন শক্তিগুলোর সঙ্গে অবাধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আয়োজন করা। শিক্ষার্থী পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে কাজ করার। তিনি স্বাধীনতাকে আত্মকর্তৃত্বের সমতুল্য হিসেবে বিচার করেছেন। তাই তাঁর বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদের যেমন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালনের কথা বলেছেন, তেমনি দেহ-মনের বিকাশের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তাই

তিনি বলেছেন—"ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁত খুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে।"

এই স্বাধীনতা বা আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ হ'ল সৃষ্টি-কর্তৃত্ব। স্বাধীনতা ভাব থেকেই সৃজন প্রতিভার বিকাশ পাবে এবং তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে বিকশিত করে। তাই তিনি তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতিতে গান্ধীজির মত সৃজনাত্মক কাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—"শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ। আর "আমরা মন খাটাইয়া সজীব ভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মনুর সঙ্গে মিশিয়া যায়।" তাই রবীন্দ্রনাথ তার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশুর সক্রিয়তার সুযোগ রেখেছেন। এদিক থেকে তাঁর পদ্ধতির সঙ্গে প্রোজেক্ট পদ্ধতি বা বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির যথেষ্ট মিল আছে। তিনি বাগান পরিচর্যা করার কাজ, লাইব্রেরী গোছানোর কাজ, নাটক রচনা, অভিনয়, সংগীত, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ ইত্যাদির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর পদ্ধতির মধ্যে।

সবশেষে তিনি প্রকৃতি ও সমাজের সংযোগ রেখে শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। শিশুকে তার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষা দিতে হবে এবং শিক্ষার মাধ্যমে যাতে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে আত্মিক সূত্র স্থাপন হয় তার ব্যবস্থা করতে বলেছেন। শিক্ষার মাধ্যমে যদি বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ না ঘটে সে শিক্ষার কোন মূল্য নেই। তিনি বলেছেন—"Children have their active sub-conscious mind which like a tree, has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them atmosphere is a great deal more important than rules and methods, buildings, appliances, class-teaching and text-books." মানুষের জন্ম বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানব-সমাজ এই দু'য়ের মধ্যে জন্মায়। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ এই দুই উপাদানকে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, শিখবার জন্য আলো, বাতাস, গাছপালা, মুক্ত আকাশ, ঠিক বোর্ড, পুঁথি ইত্যাদির মত অবশ্যকীয়। এই কারণে তিনি আশ্রমিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। "আমার আশা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা, পাখীই এদের শিক্ষার ভার নেবে।"

রবীন্দ্রনাথ নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেননি। তিনি মনে

করতেন শিক্ষক যদি আদর্শ হ'ন তাহ'লে পদ্ধতির নতুনত্বের বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন—"মানুষ মানুষের কাছ থেকে শিখতে পারে, যেমন জলের দ্বারা জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারা শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারা প্রাণের সঞ্চারিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেননি বা কাউকে স্বীকার করেননি। তবে বিভিন্ন জায়গায়, তিনি প্রয়োজন মত পদ্ধতি গ্রহণ করার কথা বলেছেন। তিনি ইন্দ্রিয়ের পরিমার্জনার কথাও বলেছেন, প্রোজেক্ট পদ্ধতি ও সামগ্রিক পদ্ধতির কথাও বলেছেন। আদর্শ শিক্ষক যে পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে শিশু মনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন তাই তাঁর পদ্ধতি।

শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগ (Santiniketan and application of Educational Ideas]:

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক-শিক্ষা ব্যবস্থার বিরোধিতা চিরদিন ক'রে গেছেন। তাঁর নিজের শৈশব অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা তার মনে দৃঢ়বদ্ধ হ'য়েছিল, তাই তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার জন্য ১৯০১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য স্থাপন করতে গিয়ে বলেছেন—"আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে।···এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম"। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় আশ্রমিক শিক্ষার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন আশ্রমিক শিক্ষার সব বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে আমরা দেখতে পাই। তিনি এখানে ব্রহ্মচর্যের তপস্যার কথা বলেছেন শিক্ষার্থীদের জন্য। সরল ভারতীয় জীবন যাপনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এতে ক'রে মনের উদারতা আসে। তাই তিনি বলেছেন—"আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভাল। অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে..." তাছাড়া গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি এখানে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে। তিনি বলেছেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধার মধ্য দিয়েই শিক্ষা হ'তে পারে, শিক্ষার্থী যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান আহরণ করবেন, তেমনি শিক্ষকও শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ করবেন। তিনি বলেছেন, "শ্রদ্ধায় সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা

সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই, সেখানে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে।"

পরবর্তিকালে শান্তিনিকেতনের এই বিদ্যালয়কে বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয় ১৯২১ সালে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যের কথা তিনি ব্যক্ত করেছেন—" প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্ব-প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশঃ আমার মনে হ'ল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত ক'রে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে।" তিনি বিশ্বভারতীতে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়ের চেষ্টাই করেছেন। তিনি বলেছেন—"যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে পাতবো।" যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্।

রবীন্দ্রনাথের আশ্রমিক শিক্ষার মধ্যে আমরা যে সব বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই তার উল্লেখ ক'রে আমরা এই আলোচনা শেষ করছি—

(১) তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছেন। শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়ানোর ও খেলাধূলা করার সুযোগ দেওয়া হ'ত। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় এক হাস্যকর কাহিনীর অবতারণা ক'রে এই স্বাধীনতার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এক অভিজ্ঞ শিক্ষক পড়াতে এলেন এবং কয়েকদিন সব দেখে-শুনে রবীন্দ্রনাথকে বললেন—'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এত ভাল নয়।" রবীন্দ্রনাথ বললেন—"দেখুন আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তে দিন না। গাছ যখন ডাল পালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে থাকলই বা।"

(২) রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল উন্মুক্ত প্রান্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রেখে মনের চর্চা করার কথা তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে বলেছেন এবং তার প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করেছিলেন শান্তি নিকেতনে। শ্রেণীকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না।

(৩) এই বিদ্যালয়ে শিশুদের সৃজনমূলক কাজ এবং বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে। নানা ধরনের

উৎসব পালন করারও ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। এই সবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে।

(৪) এই বিদ্যালয়ে গতানুগতিক সময় তালিকার বিশেষ স্থান ছিল না। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য বিচারে তা নির্ধারণ করা হ'ত।

(৫) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কে এখানে অনেক সহজ। পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা হ'ত। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ সম্পর্ক না গড়ে উঠলে শিক্ষা সম্ভব হবে না; রবীন্দ্রনাথ সে সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

॥ **আলোচনা** ॥

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনে যেমন বিভিন্ন কৃষ্টির সমন্বয় হ'য়েছিল; চিন্তা জগতেও যেমন বিভিন্ন দার্শনিক ভাবধারার অপূর্ব সময় হ'য়েছিল, ঠিক তেমনি তাঁর শিক্ষা দর্শনের মধ্যেও আমরা বিভিন্ন ধারার সমাবেশ দেখতে পাই। তিনি প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার পদ্ধতি ও দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের যা কিছু ভাল তার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি শুধুমাত্র ভারতীয় উপনিষদের জ্ঞানকে চরম হিসেবে বিবেচনা করেননি। তিনি জানতেন আধুনিক যুগে বাঁচতে হ'লে ইওরোপীয় বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রসার প্রয়োজন। তিনি তাই তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। কি শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে, কি তার পদ্ধতি নির্ণয়ে, কি তার পাঠ্যক্রম নিয়ে সর্বত্রই এই সমন্বয়ের ভাব আমরা দেখতে পাই। এখানেই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং তিনি শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মধ্যে তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে কার্যকরী করার জন্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সাধনা ক'রে গিয়েছেন।

প্রশ্নাবলী

1. Evaluate the contribution of Rabindranath in the field of Education.

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. "In Rabindranath—we find a combination of Idealistic and Nationalistic Philosophy"—Discuss the statement with special reference to his method of instruction.

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

স্বামী বিবেকানন্দ
Swami Vivekanada

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় চিন্তা জগতে অনেক দিক থেকে আলোড়ন আনার চেষ্টা করেছেন। তাই আধুনিক চিন্তাধারায় তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। পরাধীন ভারতবাসীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাদের ধর্মীয় চেতনাকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে বিশেষ ভাবে পরিচয়। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর তাত্ত্বিক ধারণাও কম নয়। তিনি ভারতীয় উপনিষদ ও বেদান্তের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং ভারতবাসীকে সেই উদ্দেশ্যের পথে ধাবিত হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর শিক্ষার প্রয়োগমূলক কোন দিকই নেই, সবই তত্ত্বভিত্তিক। তিনি তাঁর শিক্ষা-চিন্তার প্রয়োগের কোন সুযোগই পাননি। তবে তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব এতই বিজ্ঞানসম্মত যে, তাঁর ভাব আধুনিক শিক্ষাকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।

বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন (Educational Philosophy of Vivekananda) :

বিবেকানন্দ শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন—"Education is the manifestation of perfection already in man." তাঁর মতে জ্ঞান মানুষের অন্তরের জিনিস। বাইরে থেকে জ্ঞান আসে না। মানুষের মন হ'ল বিশ্ব-প্রকৃতির জ্ঞানের ভাণ্ডার, সেখানেই সমস্ত জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। সাধারণ অর্থে আমরা যাকে বলি "শিক্ষা করছি" আসলে তা ঠিক নয়, বলা উচিত 'নিজে আবিষ্কার করছি'। মনের মধ্যে থেকে যখন আবরণকে আমরা সরিয়ে দিতে পারি তখন আমাদের আত্মজ্ঞান প্রকাশ লাভ করে। চকমকি পাথরের মধ্যে আগুন জ্বলার সম্ভাবনা আছে বলেই ঘর্ষণের ফলে তা জ্বলে উঠে, আগুন বাইরে থেকে আসে না। মনের মধ্যে জ্ঞানের উৎস আছে বলেই তার প্রকাশ পায় অনুভাবনের মাধ্যমে (Like fire in a piece of flint, knowledge

exists in the mind ; suggestion is the friction which brings it out), তাই তাঁর মতে শিক্ষা হ'ল আন্তরিক সত্তার প্রকাশ, বাইরের কোন প্রচেষ্টা নয় এবং এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মেই হবে।

বিবেকানন্দের এই শিক্ষা-চিন্তা যদিও ভারতীয় দর্শনের অতি জটিল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহ'লেও এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক উপাদানেরও সংযোজন আছে এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই মতবাদ অতি আধুনিক মতবাদের সঙ্গে মিলে যায়। বিবেকানন্দ বলেছেন, শিক্ষা হ'ল আভ্যন্তরিক মহত্ত্বের প্রকাশ। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে, দু'টো শব্দের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে হয়। প্রথমতঃ, মহত্ত্ব (Perfection), দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ (Manifestation)। অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব বলতে তিনি ব্যক্তির নিজস্ব গুণাবলীর কথাই বলতে চেয়েছেন। মানবতাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত তিনি তাই ব্যক্তির সকল রকম নিজস্ব সত্তাকেই তিনি মহৎ দেখেছেন অর্থাৎ এই সত্তাকে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের (Individuality) দিক বলতে পারি। অর্থাৎ, ব্যক্তি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী বিকাশ লাভ করবে। এই মতবাদই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, তিনি শিক্ষায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

অন্যদিকে 'প্রকাশ' (Manifestation) কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে আমরা অন্য জিনিস দেখতে পাই। কোন কিছুর প্রকাশ একটা বিশেষ মাধ্যমেই হওয়া স্বাভাবিক। কোন বিশেষ পরিবেশের মধ্যে যদি প্রকাশিত না হয়, তাহ'লে ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি যতই থাকুক না কেন তার কোন মূল্য নেই। তাই বিবেকানন্দ 'মহত্ত্বের' উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি তার প্রকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। যে মহত্ত্ব অন্তর্নিহিত তার কোন মূল্যই নেই তা যদি যথাযোগ্য পরিবেশে প্রকাশ লাভ না করে। তাই ব্যক্তির এই অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের প্রকাশের একমাত্র স্থান হ'ল মনুষ্য সমাজ। মহত্ত্বকে মহত্ত্ব বলে উপলব্ধি করবে কে, যদি তা সমাজ পরিবেশের মধ্যে প্রকাশিত না হয়? তাঁর এই 'প্রকাশ' কথার মধ্যে আমরা সামাজিক গুরুত্বের ইঙ্গিত পাই। এদিক থেকে বিবেকানন্দ, সমাজতান্ত্রিক মতবাদকে (Socialistic view) সমর্থন করেছেন। সুতরাং, বিবেকানন্দের শিক্ষা-দর্শনের মধ্যে আমরা ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক মতবাদের (individualistic and Socialistic view) সার্থক সমন্বয় দেখতে পাই।

তিনি শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে সমাজ চেতনার সমন্বয় সাধন করেছেন। তিনি তাই মনুষ্যত্বের শিক্ষার (Man-making education) কথা বলেছেন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু কতকগুলো তথ্য পরিবেশন করা নয়; ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথার্থ সামাজিক পথে পরিচালিত করাই হ'ল শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি বলেছেন—"Education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot there undigested all your life. We must have life-building, man-making, character-making, assimilation of ideas." তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন—"The end of all education, all training, should be man-making. The end and aim of all training is to make the man grow."

পাঠ্যক্রম (The Curriculum):

পাঠ্যক্রম সম্পর্কে বিবেকানন্দ বিশেষ কিছুই বলেননি। তাঁর শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে আমরা ব্যবহারিক দিকের চেয়ে তত্ত্বের সন্ধানই বেশী পাই। তিনি ভারতবাসীর সাধারণ অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে তাদের জন্য সর্বজনীন শিক্ষার (Mass education) কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—"A nation is advanced in proportion as education and intelligence spread among the masses." এই সর্বজনীন শিক্ষার জন্য যে পাঠ্যক্রমের কথা বলেছেন, তার মধ্যে তিনি তাঁদের আধ্যাত্মিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি সমস্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষার কথা বলেছেন এবং মাতৃভাষার চর্চার কথা বলেছেন। এছাড়া তিনি বলেছেন, যেহেতু ভারতীয় চিন্তাধারার সব মূল অংশ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, সুতরাং সংস্কৃত চর্চারও ব্যবস্থা রাখতে হবে পাঠ্যক্রমের মধ্যে। তা'ছাড়া কর্ম সম্পর্কে তাঁদের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা দেওয়ার ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমে রাখার কথা তিনি বলেছেন। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উন্নতিতে আস্থাবান ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের মাধ্যমেই মনুষ্য জীবনের কর্মক্ষমতা (efficiency) বাড়ানো যায়। তাই পাঠ্যক্রমে তিনি বিজ্ঞানকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এছাড়া, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য ইত্যাদি পাঠের কথাও বলেছেন। তিনি তাঁর পাঠ্যক্রমের দ্বারা ভারতীয়দের একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত

করতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তাদের বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের কর্ম-ক্ষমতার সমান অধিকারী ক'রে গড়ে তুলতে চেয়েছেন।

শিক্ষা-পদ্ধতি (Method of Teaching) :

বিবেকানন্দ শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে স্বয়ং শিক্ষাকে (self-education) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। "No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself." শিশু তার নিজের নিয়মেই বিকাশ লাভ করবে। তাকে জোর ক'রে কিছু করানো যাবে না এবং তার এই বিকাশে সহায়তা করবে মনের কেন্দ্রীকরণ (Concentration)। যার মধ্যে এই ক্ষমতা যত বেশী হবে সে তত জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হবে। বিবেকানন্দ বলেছেন—"High achievements in arts, music etc. are the result of concentration." মনকে কেন্দ্রীভূত ক'রে যে কোন বস্তুর উপর প্রয়োগ করতে পারলেই তাকে লাভ করা যাবে। প্রাচীন গ্রীক দর্শনে এরূপ বাহ্যিক কেন্দ্রীকরণের কথা বলা হ'য়েছে, ভারতীয় যোগ দর্শনে আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীকরণের কথা বলা হ'য়েছে। যেরূপই হোক না কেন কেন্দ্রীকরণ শিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আর, এই কেন্দ্রীকরণ করার জন্য যে শক্তির দরকার তা আসবে ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে। তিনি বলেছেন ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে জৈবিক শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়; ফলে, কেন্দ্রীকরণের জন্য অনেক শক্তি পাওয়া যায়। পদ্ধতি সম্বন্ধে শেষ কথা হ'ল আত্মবিশ্বাস। অর্থাৎ, একত্রে বলা যায়, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মনকে কেন্দ্রীভূত ক'রে, আত্ম-প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষা করাই হ'ল শিক্ষার মূল পদ্ধতি। এছাড়া তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মনোবিদ্যার (Science of Mind-psychology) প্রয়োগের কথা বলেছেন—"The utility of this science is to bring out the perfect man, and not let him wait and wait for ages, just a plaything in the hands of the physical world, like a log of drift-wood carried from wave to wave and tossing about in the ocean."

বিবেকানন্দ শিক্ষার পরিবেশ হিসেবে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার পরিবেশকে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, গুরুগৃহে বাস ক'রে গুরুর আদর্শ জীবন দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হবে। "My idea of education is Gurugriha-vasa without the personal life of the

teacher, there would be no education." এই কারণে তিনি শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আগুন যে সব কিছুকে গ্লানি মুক্ত করে, তেমনি শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রের প্রভাব শিশুর সব কিছু সংকীর্ণতাকে দূর করবে। তিনি বলেছেন—"One should live from his boyhood with one whose character is a blazing fire and should have before him a living example of highest teaching."

এছাড়া বিবেকানন্দ নারী-শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করতেন মাতৃ জাতির উন্নতি করতে পারলে, সমগ্র ভারতবাসীর উন্নতি করা সম্ভব হবে।

॥ **আলোচনা** ॥

বিবেকানন্দের শিক্ষা-চিন্তা তাঁর বলিষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতীক। তিনি যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রচনা করতে চেয়েছিলেন, তা যদি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হ'ত তাহ'লে তাঁর বিশ্বাসের ভারত যে গড়ে উঠবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে বিশ্বাস নিয়ে তিনি বিরাট একটা জাতিকে "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত......" বলে আহ্বান করেছিলেন, সেই মনোবল যদি প্রয়োগ করতে পারতেন তাঁর শিক্ষা-চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে, তাহ'লে সমগ্র জাতিই যে জেগে উঠতো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু, ভারতবাসীকে সেই ফললাভে বঞ্চিত করেছে।

তাঁর শিক্ষা-বিস্তারের মধ্যে আমরা ভারতীয় বেদান্ত দর্শনের উপাদান যেমন দেখতে পাই, তেমনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানেরও প্রয়োগ দেখতে পাই। তাঁর শিক্ষা-চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই সমন্বয়।

প্রশ্নাবলী

1. Give a critical estimate of the contribution of Vivekananda in the field of Education.

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

2. "Education is the manifestation of perfections already in man."—Critically discuss the statement. [N. B. U. ; B. T. '69]

Ans : সম্পূর্ণ অংশ দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা গান্ধী
Mahatma Gandhi

পরাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে গান্ধীজির দান অপরিসীম। তিনি যে শুধু সমগ্র জাতিকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন তাই নয়, ভারতবাসীর নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য তার সমস্ত জীবন নিয়োগ করেছেন। ভারতবাসীর উন্নতির জন্য তাঁর মত সর্বোতমুখী প্রচেষ্টা আর কেউ কোনদিন করেননি। তাই রাজনীতিবিদ্, অর্থনীতিবিদ্, শিক্ষাবিদ্, ধর্মযাজক হিসেবে চিরদিন ভারতবাসী তাঁর কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে। গান্ধীর শিক্ষা-চিন্তা একদিকে যেমন তাঁর আদর্শবাদী দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্যদিকে গভীর সমাজ দর্শনের যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

॥ গান্ধীর জীবনদর্শন (Gandhian Philosophy) ॥

গান্ধীজিকে আমরা আদর্শবাদী দার্শনিক (idealist) বলতে পারি। যে-কোন আদর্শবাদীর মত ভগবানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তিনি ঐশ্বরিক শক্তিকে বিশ্বাস করতেন। তিনি বলেছেন, ভগবানই একমাত্র স্থির, তিনিই তাঁর লীলার মধ্যে সৃষ্টি করছেন, আবার ধ্বংস করছেন। মানুষ সম্পর্কেও তাঁর ধারণা ছিল অধ্যাত্মবাদী। তিনি প্রত্যেক মানুষকে সেই একই ব্রহ্মের অংশ হিসেবে কল্পনা করেছেন। সূর্যের আলো বিভিন্ন পথে এলেও তা যেমন একই উৎস থেকে আসে, মানুষও একই উৎস থেকে সৃষ্টি। তাঁর মতে জীবনের উদ্দেশ্য হ'ল—সেই স্রষ্টা পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। তিনি মনে করতেন, মানুষের উৎস যেমন পরম ব্রহ্ম থেকে, তার জীবনের উদ্দেশ্যও সেই পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা। তিনি আরো বলেছেন, আত্মোপলব্ধিই হ'ল ভগবানকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। গান্ধীজির হিন্দু দর্শনের উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অন্যান্য আদর্শবাদীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হ'ল এই যে, তিনি শুধুমাত্র তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, তাঁকে প্রয়োগমূলক দার্শনিক বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং চিন্তাধারাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

ভগবানকে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে হ'লে কি কি কৌশল অবলম্বন করতে হবে তাও তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং নিজের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ ক'রে তার ফলাফল সম্পর্কেও পরীক্ষা ক'রে গেছেন। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে হ'লে, সত্যাচরণ (Truth), প্রেম (Love) এবং অহিংসা (Ahimsa)—এই তিনটে জিনিসের প্রয়োজন। সত্যাচরণকে তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"I have no God to serve but truth" সত্যাচার শুধুমাত্র কথায় এবং আচরণে প্রকাশ পায় না। তার একটা নৈসর্গিক তাৎপর্যও আছে। ঈশ্বর উপলব্ধির একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ উপায় হ'ল সত্যাচার। মানব-প্রেম ভগবানকে উপলব্ধি করার আর এক উপায়। প্রত্যেকের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রণ করবে প্রেম। কারণ পাশাপাশি বস্তু-সামগ্রীকে যদি ভালবাসার চোখে দেখা না যায়, তাহ'লে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগবে না, ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যাবে না। গান্ধী বলেছেন—"To see the universal and all prevailing spirit of truth face to face, one must be able to love the nearest of creation as oneself." এই মানব প্রেম গান্ধীজিকে সকল রকম কাজে অনুপ্রেরণা যোগাতো। তিনি সৃষ্টির প্রতি প্রেম প্রদর্শন ক'রে স্রষ্টাকে জয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই প্রেমের নীতির বিস্তৃতি (Extension) হিসেবে অহিংসার তত্ত্ব স্থাপন করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন কোন কিছু খারাপকে খারাপ ভাব দিয়ে জয় করা যায় না। মন্দকে ভাল দিয়েই জয় করা সম্ভব। ঘৃণা এবং হিংসাকে প্রেম ও অহিংসার দ্বারাই জয় করা যায়। তিনি বলেছেন, সত্যাচার এবং অহিংসা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অহিংসার অর্থ আনুগত্য নয়। অহিংসার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মানবীয় গুণ—সহনশীলতা, ধৈর্য, উদ্যম্, আত্মোৎসর্গের ভাব, ইত্যাদি। তিনি বলেছেন, অহিংসাই হ'ল মানুষের বৈশিষ্ট্য—হিংসাগুলো পাশবিক গুণ। অহিংসা ও প্রেমের বন্ধনে সমগ্র মানুষকে আবদ্ধ করতে পারলে ঈশ্বর উপলব্ধি হবে। এটাই হ'ল জীবনদর্শনের মূল কথা।

গান্ধীজির জীবনদর্শনের উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর সমাজদর্শন গড়ে উঠেছিল। তিনি ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন জাতিকে সামগ্রিক ভাবে উন্নত করতে হ'লে তার সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। গান্ধীজি তাই বুঝলেন জাতির উন্নতি করতে হ'লে তার

মধ্যে ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে হবে এবং বিদেশী শাসনের প্রভাবে সমাজের মধ্যে যে কৃত্রিম স্তরের সৃষ্টি হ'য়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলতে হবে। প্রত্যেক মানুষ পারস্পরিক আন্তরিকতা বজায় রেখে পাশাপাশি বাস করবে, তবেই সমাজের উন্নতি হবে। তিনি এমন এক সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চেয়েছিলেন যেখানে প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ বিকাশের জন্য সমান সুযোগ পাবে। সর্বোদয় সমাজ স্থাপনের আদর্শ তাঁর এই জীবনদর্শন দ্বারা প্রভাবিত। এছাড়া সামাজিক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বলেছেন। কোন আদর্শ সমাজেই একজনকে অবহেলা ক'রে অন্যের বিকাশের সুযোগ ক'রে দেওয়া উচিত নয়। অর্থনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থাকে ঠিক রেখে সমাজের মধ্যে এই বৈষম্যকে দূর করার কথা তিনি বলেছেন। সবশেষে সমাজ জীবনের উন্নতির জন্য তিনি নাগরিকতার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রত্যেক নাগরিককে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ক'রে সে সমাজে তার নিজের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করতে পারে। এই ধরনের জীবনদর্শন ও সমাজ-দর্শন দ্বারা গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন প্রভাবিত। তিনি বলেছেন—"I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country, in whose making they have an effective voice, an India in which there shall be no high class or low class of people, an India in which communities shall live in perfect harmony." এবং শিক্ষা এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করবে।

গান্ধীজির শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষার লক্ষ্য (Gandhi's Philosophy of Education and Educational Aims) :

গান্ধীর শিক্ষাদর্শন তাঁর জীবনদর্শন ও সমাজ দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তিনি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা (Means) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। শিক্ষা বলতে তিনি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশকে বুঝিয়েছেন ("All round drawing out of the best in child and man—body, mind and spirit.")। তিনি বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য বস্তুতান্ত্রিক নয়; শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তার বিকাশ সাধন করা। গান্ধীজি বলেছেন—"True education should result not in material power but in spiritual force." এই লক্ষ্যকেই তিনি শিক্ষার

চরম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শিক্ষার এই ধরনের আদর্শগত লক্ষ্যের কথা বললেও গান্ধীজি আধুনিক জগতের আপাতঃ উদ্দেশ্য সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় জনগণের সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আরো কতকগুলো উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন।

তিনি নাগরিকতার শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি মনে করতেন শ্রম-বিমুখ ভারতবাসীকে প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা শ্রমের প্রতি প্রকৃত মর্যাদা দিতে শেখানো যাবে। তাই তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এছাড়া এই ধরনের শিক্ষা তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা এনে দেবে; তাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে দৃঢ় করবে। আত্মসংযমের মাধ্যমে চরিত্রকে দৃঢ়তর করতে না পারলে শিক্ষার কোন মূল্য থাকবে না। তিনি বলেছেন—"All our learning or recitation of the vedas, correct knowledge of Sanskrit, Latin or Greek and what not, will avail us nothing, if they do not avail us to cultivate absolute purity of heart. The end of knowledge must be the building of character."

তিনি শিক্ষাকে সামাজিক উন্নতির পন্থা হিসাবেও গ্রহণ করেছেন, শিক্ষা সকল মানুষের উন্নতি করবে, তাদের মানবীয় গুণে সমৃদ্ধ করবে এই ছিল তার ইচ্ছা।

গান্ধীজির পাঠ্যক্রম (Gandhi's Curriculum):

গান্ধী গতানুগতিক ইংরেজী শিক্ষা-ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমকে বিশেষভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, শিক্ষা শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত হওয়ার দরকার। তাকে কতকগুলো অর্থহীন বিষয় শেখালে চলবে না। তাতে ক'রে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ থাকবে না। তাই পাঠ্যক্রম, নির্বাচনের সময় এমন সব বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে যার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সমাজ-জীবনের সম্পর্ক আছে। ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয় শিশুর সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শেখাতে হবে। তিনি মাতৃভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি মাতৃভাষাকে পাঠ্যবিষয় এবং পাঠদানের মাধ্যম—দুই হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তশিল্পের উপর গুরুত্ব তাঁর সমাজ দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। তিনি বলেছেন—"It will provide a healthy and moral basis of relationship

between the city and the village and thus go along way towards eradicating some of the worst evils of the present social insecurity and poisoned relationship between the classes." হস্তশিল্পের মাধ্যমে নগর-জীবন এবং গ্রামীন জীবনের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন হবে ; শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মাবে। এর মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব, দায়িত্ববোধ, উৎসাহ, ইত্যাদি জাগ্রত হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হবে। গান্ধীজির এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি ক'রে জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার এক পাঠ্যক্রম রচনা করেন। এই পাঠ্যক্রম পরবর্তিকালে আরো পরিবর্তিত হ'য়েছে। তাহ'লে পাঠ্যক্রমের মূল বিষয়গুলো নিম্নরূপ হবে—

(১) মূল হস্তশিল্প—সুতা কাটা, তাঁত বোনা, কৃষিকাজ, কাগজের কাজ, কাঠের কাজ বা ধাতুর কাজ। (২) মাতৃভাষা—পাঠ্যবিষয় এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চর্চা। (৩) গণিত—কেবলমাত্র ব্যবহারিক গণিত, বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প পরিচালনা করতে গিয়ে যতটুকু প্রয়োজন। (৪) সমাজ বিদ্যা—ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান পৃথক পৃথক ভাবে না শিখিয়ে, সামগ্রিকভাবে সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য। (৫) সাধারণ বিজ্ঞান —বিজ্ঞানের সব শাখার প্রয়োজনীয় ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা। (৬) ছবি আঁকা। (৭) সংগীত। (৮) বাধ্যতামূলক শরীর চর্চার ব্যবস্থা।

গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, এই ধরনের পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ করা সম্ভব হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির গভীর সংযোগ স্থাপন হবে।

গান্ধীজির পদ্ধতি (Gandhi's method of Teaching) :

গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে অনুবন্ধ প্রণালীর (Principle of correlation) প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন সমস্ত কিছু পাঠ্য বিষয় একটি মূল হস্তশিল্পকে কেন্দ্র ক'রে শেখাতে হবে। তাঁর পদ্ধতি একদিকে সক্রিয়তা তত্ত্বের উপর (Principle of activity) প্রতিষ্ঠিত অন্যদিকে তাঁর পদ্ধতিতে তিনি অনুবন্ধ প্রণালীকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন। হস্তশিল্পের মাধ্যমে পাঠদান করলে, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখা যায়। ফলে শিক্ষার্থীর আগ্রহের অভাব হয় না। তাই গান্ধীজির হস্তশিল্প-ভিত্তিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি আধুনিক মনোবিদ্যার যুক্তির দ্বারা সমর্থিত। তিনি এ বিষয়ে,

ফ্রয়েবেল, মন্তেশ্বরী, ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে এক মত। অন্য দিকে তিনি বলেছেন, জ্ঞান মনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে অবস্থান করে, সুতরাং, মন জ্ঞানকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে গ্রহণও করবে। এর জন্য তিনি একটি মূল হস্তশিল্পকে (Basic craft) কেন্দ্র ক'রে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান দিতে বলেছেন। ফলে এদিক থেকে তিনি আধুনিক অনুবন্ধ পদ্ধতিকেও তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে স্থান দিয়েছেন। গান্ধীজির শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে ডিউই-এর শিক্ষাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রোজেক্ট পদ্ধতির অনেক মিল আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধতিতে বিশেষ একটি প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহে সহায়তা করা হয়, তেমনি গান্ধীজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায়ও একটি বিশেষ হস্তশিল্পের সাহায্যে অন্যান্য জ্ঞান সরবরাহ করা হয়। তিনি বলেছেন—The principle idea is to impart the whole education of the body and the mind and the soul through the handicraft that is to be taught to the children. You have to draw out all that is in the child through teaching all the processes of the handicraft, and all your lessons in history, geography and arithmetic will be related to the craft." এই পদ্ধতির ভিত্তি সমাজবৈজ্ঞানিক (Sociologcal), মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological) এবং দেহবৈজ্ঞানিক (Physiological) তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

॥ আলোচনা ॥

গান্ধীজির প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে অনেক ত্রুটি ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে সব ত্রুটিও দূর করার চেষ্টা করা হ'য়েছে পরবর্তিকালে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আজও স্থায়ী আসন ক'রে নিতে পারেনি। গান্ধীজি ভারতের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা-পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য এক কথায় বলতে হয়—এই শিক্ষা জীবনের মাধ্যমে জীবনের শিক্ষা (Education for life through life)। কিন্তু তাঁর এই শিক্ষা-পদ্ধতির অন্তরালে যে জীবন দর্শন আছে, তাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে, এই শিক্ষা-পদ্ধতিকে কার্যকরী করতে পারা যাবে না। শিক্ষক এবং দেশবাসী যদি এই জীবনদর্শনকে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারেন এই শিক্ষা পরিকল্পনার শুধুমাত্র বাহ্যিক প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যাবে না। ১৯৫৫ সালে ভারত সরকার এক কমিশন

নিয়োগ করেন বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করার জন্য। জি. রামচন্দ্রনের (G. Ramachandran) নেতৃত্বে এই কমিটি ১৯৫৬ সালে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন এবং তাতে বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাই বলেছেন। কিন্তু তার কোনটাই আজ পর্যন্ত কার্যকরী করা হয়নি। অন্যদিকে ভারতের সকল শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (Indian Education Commission) নিয়োগ করা হ'ল ১৯৬৪ সালে। ফলে দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন আমাদের হ'ল না। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে ঢেলে সাজানোর কথা বলা হ'ল। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলা হ'ল না। তাঁরা কার্যভিত্তিক অভিজ্ঞতার (work-experience) কথা বললেন। বাইরের অনুকরণে এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য নানান কথাই বললেন। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে কিছু বললেন না। বরং বললেন কার্যভিত্তিক অভিজ্ঞতা (work-experience) যে বুনিয়াদী শিক্ষা নয়, সে কথা উল্লেখ করলেন। ভারত সরকার নীতিগত ভাবে এই কমিশনের রিপোর্ট মেনে নিয়েছেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি ক'রে জাতীয় শিক্ষা নীতি গঠন করা হ'ল, কিন্তু সেখানেও বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নীরবতা বজায় রাখা হ'য়েছে।

তাহ'লে বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ কি? এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কি তুলে দেওয়া হবে? গান্ধীজি এখানেই মস্তবড় ভুল করেছেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে কিছু ব্যক্তির মধ্যে তিনি হয়তো সেন্টিমেন্ট গড়ে তুলতে সক্ষম হ'য়েছিলেন, তাঁর নীতির প্রতি বিশ্বাস জাগাতে পারেননি। তাই তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনদর্শনের নেতৃত্ব গ্রহণ করার মত ব্যক্তিত্বের অভাব বুনিয়াদী শিক্ষাকে ব্যর্থতায় পর্যবেশিত করেছে।